Vol. VIII.) Shilpa O' Sahitya. (Parts I to XII,

শিল্প ও সাহিত্য

সচিত্র

মাসিক পত্র।

৮মঃ খণ্ড। ১৩১৫—১৬ বঙ্গাব্দ।

শিল্প জাগতিক উন্নতি ও সুখ সৌকর্য্যের প্রধান সাধন ; সাহিত্য তাহার প্রাণ,
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।
৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
Printed and Published by Shyam Lall Chakravarty
92, Bowbazar Street, Calcutta.

সূচী।

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
অন্তরলি (পত্ম)	শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।	৫০
অহল্যাবাই (পত্ম)	শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।	৭৪
আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবাদ।	কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন।	১৯৫, ২৩২, ২৪৯
আলিঙ্গন (পত্ম)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	২৪৩
আহ্বান (পত্ম)	ঐ	২০২
উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা।	শ্রীক্ষিতিনাথ দাস।	২০৩
উমাশশী (পত্ম)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়।	২২৯
কা'র (পত্ম)	শ্রীক্ষিতিনাথ দাস।	২৭১
কাশীধাম।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।	২১৩, ২৩৬, ২৬০
কাশীধাম পুনর্দ্দর্শনে।	শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।	২৭৮
কৃষিকার্য্যে মূলধন।	শ্রীনিকুঞ্জবিহারি দত্ত।	১৩৮
চিত্র পরিচয়।	... ...	১৮৮
জীবন (পত্ম)	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী। ...	১৯৪
ঠাকুরমা।	শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।	৪৬, ৭০, ৯১
তন্ত্র কি?	শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী।	... ২২, ২৭, ৫১, ৮১, ১০০, ১২৬, ১৪৪, ১৩৭, ১৮৯
ত্রিবর্ণ চিত্র মুদ্রিত করণ।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।	১৫৬
ত্রিরত্ন বিজয়।	শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।	১২, ৩৯, ৫৫, ৯৫, ১৩৪, ১৫৮, ১৮১, ২৩১
দেবতা (পত্ম)	শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।	২২৪
দেশের দুরবস্থা।	শ্রীক্ষিতিনাথ দাস।	২৫২
ধার ও নগদ (পত্ম)	শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, বি, এ।	৯৪
ধুতুরা।	শ্রীকৃষ্ণলাল দাস, এম, এ। ...	১১৪
নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দু	... ...	৪৩
নিবেদন!	... ...	২৭৯
পরশুরাম কাব্য।	শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।	১৮, ৬৩, ১০৭
পেশাওয়ারস্থ বৌদ্ধমন্দির।	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।	২২৯
প্রার্থনা (পত্ম)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। ...	৯৪
বঙ্গমাতা (পত্ম)	শ্রীবেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়।	২২০
বসন্ত (পত্ম)	শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত। ...	১৬৮
বর্ণ চিত্রণ।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।	৩৩, ৭৫, ১০৯, ১৫০, ১৯৭, ২৪৩
বিবিধ প্রসঙ্গ।	... ...	২৪, ১১৬
বিবিধ শিল্প ও শিল্পোপকরণ (প্রস্তর চিত্রণ)।	শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।	১৬, ১৮৪
বোধন (সঙ্গীত)	শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, বি, এ। ...	১
ভক্তের ভক্তি (পত্ম)	শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।	৪৯
ভাস্কর্য্য।	শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।	৫, ৫৮, ৮৫, ১১৯, ১৬৮, ২২৪, ২৭২
ভুল (পত্ম)	শ্রীঅভয়াপদ গঙ্গোপাধ্যায়।	২৪৯
লাল কুয়ার।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সোমদার।	১৬৫
শিক্ষা-রহস্য।	শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব। ...	২, ২৬৪
শ্মশান ধর্ম্ম।	শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।	১৬০
সমালোচনা।	... ...	১৬৩, ১৮৬
সাধু হাসানন্দ।	... ...	২৫৩
সান্ত্বনা (পত্ম)	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী। ...	১৩৪
সাফল্য (পদ্য)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। ...	১৫৫
সাহিত্য (পদ্য)	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ...	২১
সাহিত্য সম্মিলন।	... ...	২৫

চিত্র সূচি।

সংখ্যা।	নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	কংশবধ	১
২।	বাল্মীকি ও ব্যাধ	১৬
৩।	নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী	২৭
৪।	অহল্যাবাই	৭১
৫।	ধার ৬। নগদ	৭৫
৭।	স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯৫
৮।	কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন	১১
৯।	হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সারদাচরণ মিত্র	১১৯
১০।	ত্রিবর্ণ চিত্র (১ম)	১৪৩
১১।	ত্রিবর্ণ-চিত্র (২য়)	১৫৬
১২।	মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ	১৬৫
১৩।	আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা	১৯৮
১৪।	কাশী—বিশ্বেশ্বরের মন্দির	২১৩
১৫।	শ্রীযুক্ত বাবু হাসানন্দ বর্ম্মা	২২১
১৬।	সন্ন্যাসীবেশে সাধু হাসানন্দ	২৩৬
১৭।	শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু	২৩৬
১৮।	দুর্গাবাড়ী ও বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির চিহ্ন	২৬০

শিল্প ও সাহিত্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৪৫
৮

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড। } সন ১৩১৫—আশ্বিন। { ১ম সংখ্যা।

বোধন।

(সঙ্গীত)

মাকি আমার এলি গো,
মাকি আবার এলি গো?

সারা বরষ ধরিয়ে   আছি যে মা পথ চেয়ে,
কভু বসে কভু শুয়ে   কভু উপবাস দিয়ে,
যমের যাতনা স'য়ে   রাজদণ্ড মাথে বয়ে—
প্রাণ শূন্য দেহ ল'য়ে,   মনে কি পড়েছে গো

কঠর-জ্বালায় জ্বলি   শোন্ গো মা তোরে বলি—
কাঁধে লয়ে ভিক্ষাঝুলি   যদি কারো দ্বারে বুলি
খেদায় পাড়িয়া গালি   শূন্য সব(ই) গৃহস্থলী
নিজে যবে গেছ চলি   (কেন) 'লক্ষ্মী' নিয়ে গেলি গো!

কাশি প্রয়াগ নদীয়া   দ্রাবিড় কি বোধগয়া
মিথিলা বঙ্গ ভ্রমিয়া   এসেছি সব দেখিয়া;
সারা দেশ নিরখিয়া   বিদ্যা গরিমা মুছিয়া—
লুকায়ে 'বাণীরে' নিয়া   ভাল কি করেছ গো!

শুধুই কি দেহ ক্ষীণ   আত্মরক্ষা(য়) শক্তিহীন
আর্য্যের তনয় মোরা   (দেখ) হয়েছি কত মলিন,
(এমন) বিবর্ণ দুর্ব্বল দীন   রব আর কতদিন—
চরণে মিনতি ভিক্ষা,   'কুমারে' ফিরে দেগো!

অনাচারে হয়ে ভ্রষ্ট   তপস্যা করিয়া নষ্ট
হয়েছি আমরা দুষ্ট   তাই পাইগো এতই কষ্ট,
সাধিতে দেশের ইষ্ট   পুরাও মা গো অভীষ্ট—
হওমা হওগো তুষ্ট   'সিদ্ধিদাতা' দাও গো!

অশিব-নাশিনি শিবে,   কত আর কষ্ট দিবে,
অসুর পীড়িত সবে   দেখে গো কত হাসিবে,
(আবার) দশ প্রহরণ নিবে   শিবেরে লয়ে আসিবে—
এ সুদিন হবে ভেবে (মোরা)   'বোধন' করেছি গো!

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র বি, এ,।

শিক্ষা-রহস্য।

—o—

ঊনবিংশ অধ্যায়।

(গত বর্ষের ২১৫ পৃষ্ঠার পর)

আহারের পর মনোরঞ্জন বলিল "আমি বাড়ি যাব কখন ?"

দুর্গাদেবী পূর্ব্ব হইতেই এ প্রশ্নের উত্তর শিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "তোমার বাপ এলেই যাবে এখন।"

মনোরঞ্জন কাঁদিতে লাগিল।

দুর্গাদেবী বলিলেন "বাবা, কেঁদ না; আমার কোলে এস।" এই বলিয়া তিনি মনোরঞ্জনের মস্তক নিজের ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে শয়ন করাইলেন।

মনোরঞ্জন সমস্ত দিনের পর জননীর আদরের মত আদর পাইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন "শুন মনোরঞ্জন, একটা গল্প বলি। "এই দেশে, অযোধ্যায় দশরথ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর চারটি ছেলে ছিল। তুমি তাঁদের নাম শুনেছ কি ?"

মনোরঞ্জন বলিল "না।"

রামেশ্বর বলিলেন "তাঁদের নাম রাম, লক্ষ্মণ ভরত আর শত্রুঘ্ন।"

দুর্গা বলিলেন "রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্ন যখন তোমাদের মত ছোট ছেলে ছিলেন, তখন রাজা তাঁদের মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে লেখা পড়া শিখ্‌তে পাঠিয়েছিলেন।"

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসিলেন "আশ্রম কি পিসি মা ?"

দুর্গা বলিলেন "ঐ মাঠের ও পারে যেমন বন আছে দেখ্‌তে পাও। রাজা দশরথের রাজ্যের বাহিরে সেইরূপ বন ছিল। সেই বনের মধ্যে খানিকটা জায়গা আমাদের এই বাগানের মত পরিষ্কার ক'রে তাতে মুনিরা ঘর তৈয়ার করে বাস কর্‌তেন। সে ঘর সাহেবের ঘরের মত নয়—এই আমাদের ঘরের মত বেড়া দেওয়া খড়পাতা দিয়ে ছাওয়া। অনেক মুনি-ঋষি সেখানে ঐ রকম ঘর করে থাক্‌তেন। তাঁদের সেই স্থানকেই আশ্রম বলে। সেখানে যত মুনি ছিলেন, তার মধ্যে বশিষ্ঠ প্রধান। এই জন্য সেই আশ্রমকে বশিষ্ঠের আশ্রম বলা হতো। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন সেই আশ্রমে গেলেন। সে কালে লেখা পড়া শেখবার জন্য ঐরূপ আশ্রমে যেতে হতো। লেখা পড়া শিখবার সময় তাঁরা সেখানেই থাক্‌তেন এবং পরিশ্রম করে লেখা পড়া শিখ্‌তেন। রামচন্দ্র আর তাঁর ভাই তিনটি কিছু দিন সেই খানে থেকে, যা কিছু শেখ্‌বার সব শিখে ফেল্‌লেন। তারপর তাঁরা গুরু বশিষ্ঠকে পূজা ক'রে, আবার পিতা মাতার কাছে এসেছিলেন। রামেশ্বরের পৈতে হয়ে গেলে রামেশ্বরকে গুরুদেব তাঁর আশ্রমে নিয়ে যাবেন শুনিচি। কেমন রামেশ্বর তোমার কি কষ্ট হবে ?"

রামেশ্বর বলিলেন "কেন কষ্ট হবে পিসিমা ? বাপ মার যা ইচ্ছা, তা কর্‌তে কি ছেলের কষ্ট হতে আছে ?"

দুর্গা বলিলেন "তোমায় কিন্তু সেখানে অনেক দিন থাক্‌তে হবে।"

রামেশ্বর বলিলেন "তা হলোই বা পিসিমা। যিনি বাবার গুরুদেব, আমার ত তাঁর কাছে থাক্‌তে কষ্ট হবার কথা নয়। এই দেখুন না কেন আমি ত এখানে কত দিন থাকি, কখন ত কষ্ট হয় নি। তখনত তবু তুমি ছিলে না পিসিমা। থাক্‌তে হলে আমায় ফল মূল খেয়ে থাক্‌তে হতো। ভাত কি রুটি খেতে পেতাম না। বাবা বলেছেন, দরকার হলে সব কষ্ট সইতে হয়। তবে মানুষ হতে পারা যায়।"

মনোরঞ্জন বলিলেন "আমারও কষ্ট হয় না; তবে মাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।"

দুর্গা বলিলেন "আমি পিসিমা রয়েছি আমার কাছে কি দু একদিন থাক্‌তে নেই আমি কি তোমায় যত্ন করি না ?

মনোরঞ্জন একথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না।

দুর্গা বলিলেন "যাও বাবা, তোমরা দুটিতে শোও গে। আমি একটু জপ করি।"

রামেশ্বর উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জনও উঠিল। তাহারা দুই জনে শয়ন করিলে অচিরেই নিদ্রিত হইল।

দুর্গাদেবী আসনে উপবেশন পূর্ব্বক জপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় অদূরে গান হইল—

"তুমি সে সকল রূপাময়।
ভাঙ্গ গড় অনুক্ষণ যেবা তব মনে হয়।
এই বিশ্ব চরাচর চলিতেছে নিরন্তর
তব ইচ্ছা বশে সদা সৃজন পালন লয়॥

গান করিতে করিতে গুরুদেব গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা দেবী উঠিয়া প্রণাম পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

গুরুদেব আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "বৎসে, দুটি বালকের ভবিষ্য জীবনের শুভাশুভ আজ তোমার হস্তে ন্যস্ত হয়েছে। তুমিই এখন এদের মাতৃস্থানীয়া হয়ে, যাতে এদের ভবিষ্য জীবন সুখময় হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হও। যতক্ষণ এরা তোমার কাছে থাকে, যেন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। সেই সমুদায় কার্য্য যেন তাদের বা অন্য কাহারও অনিষ্টজনক না হয়। সর্ব্বদা সদুপদেশ দ্বারা তাদের মন সৎপথে প্রবর্ত্তিত কর্‌বে। এই সময় আমি শিশুজীবন সম্বন্ধে দু চারিটি কথা তোমায় বল্‌তে চাই। ভগবদিচ্ছায় সে গুলি তোমার সহায় হউক। রামেশ্বরের জন্য বিশেষ কষ্ট হবে না, কিন্তু মনোরঞ্জনের জন্য তোমাকে যথেষ্ট উদ্বেগ সহ্য করতে হবে। তোমার নিকট খেলাইবার নানা প্রকার দ্রব্য থাক্‌বে, সর্ব্বদাই মনোরঞ্জনকে ব্যাপৃত রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। যখনি সে বাটীর কথা উত্থাপন কর্‌বে, তখনই তাকে বল্‌তে হবে—যে শীঘ্রই তার বাপ এসে তাকে নিয়ে যাবেন। তাকে যথেষ্ট যত্ন করতে হবে; কিন্তু কোনও অন্যায় আবদার যাতে সে না করতে পারে তার জন্যে যত্ন করতে হবে। কাল প্রাতে কতকগুলি চিত্র তুমি পাবে। যখনি অবসর পাবে তখনি সেইগুলির বিষয় যথাশক্তি তাহাদিগকে বুঝিয়ে দেবে। বৎসে তুমি শৈশবে বিধবা হয়েছিলে।

সেই সময় হতে, আজ পর্য্যন্ত তোমায় বিবিধ বিষয় শিক্ষা দিয়েছি। আজ তুমি বৃদ্ধা। লোকে দেখলে তোমাকে আমার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা মনে করে। এই পঞ্চাশৎ বর্ষ কাল আমার চেষ্টায় ও শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় যে জ্ঞানলাভ করেছ তার ফলে তুমি অনায়াসেই শিশু দুটিকে মানুষ করতে পারবে সন্দেহ নাই। অবসর সময়ে এদের দুজনকে, আশ্রমবাস, ব্রহ্মচর্য্য ধারণ ও ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে কার্য্যতঃ তদ্বিষয়ে দক্ষ করতে যত্ন করবে। শ্রীরামচন্দ্র, প্রভৃতির জীবন, এবং প্রাচীন ঋষিকুমারগণের জীবনের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে তোমার যথেষ্ট সহায়তা করবে। আমি কাল এ অঞ্চল থেকে চলে যাব। আমার জড়দেহ; স্থানান্তরে থাকলেও আমি যে তোমাদের থেকে দূরস্থ নই, একথা তোমায় বলা অত্যুক্তি মাত্র। এই বলিয়া সুমধুর স্বরে গাহিলেন—

"একো দেবো সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥
একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং
একো বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূণাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতিনে চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশঃ
সংসার মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥
সতন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্ব্বিদ্যতে ঈশনায়॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

গান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাদেবী শ্রীগুরুদেবের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

গুরুদেব বলিলেন—"এখন আর অধিক জাগরণ করা কর্ত্তব্য নয়। এইবার একটু নিদ্রা সেবা কর।" এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

ভাস্কর্য্য।

(গত বর্ষের ২২০ পৃষ্ঠারপর)

শয়নাসনের পর সিংহাসন ও অন্যান্য উপবেশনাসনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিংহাসন দেবতা ও রাজন্য বর্গের উপবেশনার্থে চিরদিন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'সিংহাসন' এই শব্দ হইতেই বোধ হয় উহার গঠন সম্বন্ধে এইরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, সিংহাকৃতি, সিংহের আকার বা সম্বন্ধ বিশিষ্ট কোন রূপ আসন হইবে, কিন্তু উহার মুখ্য অর্থ ঐ রূপ হইলেও প্রাচীন শব্দ-সমুদ্র দেখিয়া উহার গৌণ অর্থে ভিন্নরূপ বলিয়া মনে হয়। যে কোন আসনই হউক না কেন, নৃপতির উপবেশনার্থে যাহা ব্যবহৃত হইবে তাহাই সিংহাসন-নামধেয়। হইতে পারে অতি পুরাকালে বা সিংহাসনের প্রথম ব্যবহার সময়ে সিংহের মূর্ত্তিযুক্ত আসনই প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাহার গঠনে নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইলেও রাজকীয় আসনের সাধারণ নাম সিংহাসনই রহিয়া গিয়াছে। কারণ প্রাচীন সাহিত্যাদির মধ্যে পদ্ম-সিংহাসন, গজ-সিংহাসন, হংস-সিংহাসন, মৃগ-সিংহাসন, ঘট-সিংহাসন, হয়-সিংহাসন, ময়ূর-সিংহাসন, বৃষ-সিংহাসন, গরুড়-সিংহাসন ও বত্রিশ-সিংহাসনাদি বহু শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নৃপতিবৃন্দ স্ব স্ব বিশেষত্ব রক্ষার নিমিত্তই বোধ হয় এই প্রকার সিংহাসনের বিভিন্নরূপ নাম ও গঠন-কল্পনা করিতেন। যাহাহউক এই সকল সিংহাসন সাধারণ তক্তপোষের অনুরূপেই গঠিত হইত, তবে উহার পায়ার কারুকার্য্য বা অলঙ্কার-পারিপাট্য বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্নরূপ জীবাদির আকার খোদিত বা মুদ্রিত হইত এবং সেই অনুসারেই সিংহাসনের বিভিন্ন নাম পরিকল্পিত হইত। "যুক্তিকল্পতরুর" মতে উহার পরিমাণ দ্বিবিধ। প্রথম "রাজাপাত্র সিংহাসন," ইহা অষ্ট হস্ত পরিমিত দীর্ঘ এবং উচ্চতায় চতুর্হস্ত পরিমাণ, এবং দ্বিতীয় 'রাজাসন' চতুর্হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ এবং দুই হস্ত পরিমাণ উচ্চ। এই আসনগুলি সকল সময় সম্পূর্ণ চারি কোণ বিশিষ্টও হইত না, অধিকাংশ সময়ে উহার কোণগুলি কাটিয়া ষড়কোণ, অষ্টকোণ, দশকোণ বা বহুলকোণ-বিশিষ্ট করা হইত। এই সিংহাসনে আরোহন ও অবরোহনজন্য তাহার সম্মুখে সুন্দর সোপানশ্রেণী রক্ষিত হইত, তাহাও সিংহাসনের অঙ্গ বা উহার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। কখন কখন এই আসনের তিনদিকে সুন্দর বৃতি বা রেলিং দ্বারা বেষ্টিত থাকিত, পশ্চাতে বৃহৎ উপাধান বা তাকিয়া ঠেস দিবার জন্য রক্ষিত হইত।

যে আসনগুলি গাম্ভারকাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া সুবর্ণ ও মাণিক্য বা চুনী দ্বারা সজ্জিত হইত, যাহার পার্শ্বদেশ কমলমালার আদর্শে অলঙ্কৃত এবং পায়াগুলি কমল-কলিকার আকারে গঠিত হইত, তাহাকেই কমল বা পদ্মসিংহাসন বলা হইত। পশ্চাৎ ও উপরিভাগ ঘোর লোহিতবর্ণ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত হইত এবং উপরের বৃতিগুলির রক্ষাকল্পে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত আট দশটী কাষ্ঠ খোদিত মানবমূর্ত্তি তাহার সহিত আবদ্ধ করা হইত। এইরূপ যে আসন পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া রজত ও স্ফটিক-প্রস্তরাদিতে খচিত হইত, যাহার পায়া ও চতুষ্পার্শ্ব শঙ্খাকারে খোদিত হইয়া

শুভ্র বস্ত্রাবৃত হইত, তাহাকে শঙ্খসিংহাসন বলা হইত। ইহার রক্ষাকল্পে সপ্তবিংশতি খোদিত মূর্ত্তি আবদ্ধ করা হইত। যে আসন কাঁঠাল কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া সুবর্ণ, নীলকান্ত মণি ও প্রবালাদি রত্ন-খচিত হইয়া হস্তি-যুথের অলঙ্কার ও গজ-শীর্ষের পায়ায় শোভিত হইত, তাহাকে গজসিংহাসন বলা হইত। ইহাতেও ঘোর লোহিত বস্ত্রের আবরণ থাকিত। এইরূপ হংস-সিংহাসন,—শালকাষ্ঠে সুবর্ণমণ্ডিত পীতবস্ত্রাচ্ছাদিত; হস্তিসিংহাসন চন্দনকাষ্ঠে সুবর্ণমণ্ডিত, হীরক ও মুক্তা খচিত, শুভ্রবস্ত্রাচ্ছাদিত; চম্পক কাষ্ঠে সুবর্ণমণ্ডিত, পান্নাখচিত, নীল বস্ত্রাচ্ছাদিত—ঘটসিংহাসন; নিম্বকাষ্ঠে সুবর্ণ ও ফেরোজা প্রস্তরে নীলবস্ত্রে মণ্ডিত—মৃগসিংহাসন এবং হরিদ্রকাষ্ঠে সুবর্ণ ও বিবিধ রত্নাদি খচিত ও বিবিধ বর্ণের বস্ত্রমণ্ডিত চতুর্সপ্ততি মূর্ত্তি শোভিত সিংহাসনকে হয়-সিংহাসন বলিয়া উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত ময়ূরাসন, গরুড়াসন ও বৃষাসন সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক কথা লিখিত আছে।

অনেক স্থলে যে কোন একটী সাধারণ তক্তপোষের উপর ভাল করিয়া বিছানা পাতিয়াও রাজসিংহাসনরূপে ব্যবহৃত হইত। আবার কখন কখন তাহার পায়াগুলি কোন জীব জন্তু বা মনুষ্যাকারে গঠিত হইত। এইরূপ আসন সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাঁচ প্রকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—১ম, স্থখাসন; ২য়, জয়াসন; ৩য়, শুভাসন; ৪র্থ, সিদ্ধাসন; ৫ম, সম্পতাসন। ইহার পরিমাণ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,—

স্থখাসন দীর্ঘে ৩ ফিট, প্রস্থে ১ ফুট, উচ্চে ৯ ইঞ্চি।
জয়াসন ,, ৬ ,, ,, ৩ ,, ,, ৬ ,,
শুভাসন দীর্ঘে ৯ ফিট, প্রস্থে ৪ ফুট, উচ্চে ২৭ ইঞ্চি।
সিদ্ধাসন ,, ১২ ,, ,, ৬ ,, ,, ৩৬ ,,
সম্পতাসন ,, ১৫ ,, ,, ৭ ,, ,, ৪৫ ,,

এতদ্ব্যতীত জনক, রাজপীঠ, কেলিপীঠ ও অঙ্গ পীঠ প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার আসনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার বিশেষকিছু বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এই সকল আসনের উপাদান সম্বন্ধে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ধাতুর মধ্যে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও পিতলই প্রশস্ত কিন্তু লৌহ একেবারেই পরিত্যাজ্য অর্থাৎ লৌহের সিংহাসন হইত না। প্রস্তরের মধ্যে মরকত আদি সকল প্রস্তরই প্রশস্ত কেবল মাত্র কঙ্করযুক্ত বালিপাথরই অব্যবহার্য্য! ইহা ব্যতীত উহার বর্ণাদি সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিত আছে। কোন্ বর্ণের পাথরের উপর কোন্ গ্রহের কিরূপ আধিপত্য এবং তাহার ফলাফল সম্বন্ধে অনেক কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা করিতে বিরত হইলাম। কাষ্ঠ সম্বন্ধে আম, জাম, কদম্ব আদি হালকা কাষ্ঠ যেরূপ আসনাদি প্রস্তুত করণে অনুপযুক্ত, সেইরূপ অত্যন্ত ভারি গেঁটে বা খুব গাঁটবিশিষ্ট অথবা যাহার আঁশ অসমান অর্থাৎ এলো মোলো সে সকল কাষ্ঠও পরিত্যাজ্য। শাস্ত্রকারগণ চন্দন, গাম্ভার, শাল, শিশু, আবলুস ও বকুল কাষ্ঠেই আসনাদি নির্ম্মানে প্রশস্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন।

প্রাচীন সময়ে বেতের মোড়ারও খুব প্রচলন ছিল, ভাস্কর্য্যমধ্যে তাহার বহু আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। মিঃ ফার্গুসনের সংগৃহীত অমরাবতির ভাস্কর্য্যমধ্যে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে এবং

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে এখনও মোড়ার যথেষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

কাষ্ঠের চৌকি বা (Stool) টুলেরও বহু বিধ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি মোটা কাষ্ঠেরগুঁড়ি হইতে কুঁদিয়া একটী মাত্র টুল প্রস্তুত করা হইয়াছে, এরূপও আদর্শ অনেক দেখা গিয়াছে। সে গুলির আকার দেখিতে ঠিক 'ডমরু' নামক বাদ্যযন্ত্রের অনুরূপ; আজ কাল য়ুরোপীয় গার্ডেন্-সিটও ঐরূপ ধরণের দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক প্রকার কাষ্ঠের চৌকির আদর্শ দেখা গিয়াছে, সেগুলি কতকটা সাধারণ ক্যাম্প-টেবিলের মত অথবা মুসলমানদিগের কেতাব রাখিবার জন্য ইংরাজি X অক্ষরের অনুরূপ যে চৌকি ব্যবহৃত হয়, উহা তাহারই মত। সে কালে এই চৌকি কেবল যে বসিবার জন্যই ব্যবহৃত হইত তাহা নহে, পুস্তকাদি রাখিবার টেবিলরূপেও ব্যবহৃত হইত। তাহাও মুক্তেশ্বর আদির মন্দির-ভিত্তিতে দেখা গিয়াছে।

বেঞ্চ ও চেয়ার দেখিয়া এতদিন আমাদের ধারণা ছিল যে, এসকল জিনিস ইংরাজেরাই এদেশে আনিয়াছে। সে কালে আমাদের এরূপ কোন বসিবার আসন ছিল না। কিন্তু ভারতের ভাস্কর্য্য-আলোচনায় সে ভ্রম দূর হইয়াছে। সেকালে আর্য্যগণ ঠিক এই বর্ত্তমান কালের ন্যায়ই বেঞ্চি, চেয়ারের আবিষ্কার ও ব্যবহার করিতেন। আমরাবতীর মন্দিরগাত্রে দীর্ঘ-উপবেশনাসন বা বেঞ্চির বহুবিধ সুন্দর সুন্দর আদর্শ দেখা গিয়াছে। তাহাদের কোনও কোনটীর খুব উচ্চ ঠেস দিবার ব্যাক (Back) এবং হাতল (Arm-rest) বা হাত রাখিবার ব্যবস্থা আছে। পায়াগুলিও কোনও কোনটীর বেশ কোঁদা, বসিবার স্থান কোন গুলির একখানি তক্তাদ্বারা আচ্ছাদিত, আবার কোনও গুলির বাতা (Battened) মারা।

এখানে তাহারই দুই প্রকার আদর্শানুরূপ চিত্র দেওয়া হইল।

এইবার বিশিষ্টাসন বা চেয়ার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই আসন অধ্যায় শেষ করিব। মিঃ ফার্গুসনগৃহীত চিত্র হইতে দুই একটী চিত্রও প্রদান করিতেছি, ইহাতে সাধারণ পাঠক স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, সেকালে চেয়ার বা বিশিষ্ঠাসনের কিরূপ সুন্দর গঠন ও রুচি বিশুদ্ধিতা ছিল। কোনও কোনও

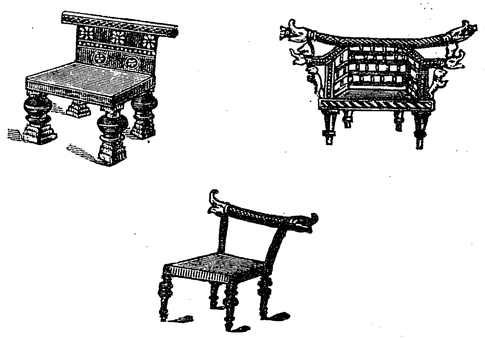

স্থলে ইহার উপর গদি (Cushions) ব্যবহার হইত এরূপও আভাস পাওয়া গিয়াছে। যাহাহউক উপরি প্রদত্ত প্রথম আসনটী অতি প্রাচীন ধরণের বলিয়া বোধ হয়, কারণ অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবেই

উহা গঠিত হইয়াছে এবং উহার পৃষ্ঠও অনুন্নত, কিন্তু অন্য দুইটী আসন বেশ আধুনিক আকারের। একটীর হাতল আছে, অন্যটীর হাতল নাই (Arm less) এতদ্ব্যতীত আরও নানাবিধ আসনের আদর্শ প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এসকল দেখিয়াও আমরা পূর্ব্বাচার্য্য আর্য্য-ঋষিগণের জ্ঞান-গবেষণায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। ইহা কি কম আক্ষেপের কথা!

আর্য্যদিগের আসনাদির পর ছত্র, চামর ও ব্যজনাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীনিচয়ের কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ছত্রসম্বন্ধে ভাস্কর্য্যের মধ্যে যে সকল আদর্শ পাওয়া যায়, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে ইহার ব্যবহার ছিল, আবার বেদাদি শাস্ত্র-সমুদ্র হইতে এমনও আভাস পাওয়া যায় যে, আর্য্যগণই ইহার আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহাদের পূর্ব্বে ছত্রের নামও জগতের কোনও জাতির নিকট পরিজ্ঞাত ছিল না। ছত্রের আবিষ্কারপ্রণালী অবশ্যই সম্পূর্ণ অনুমান-সাপেক্ষ, কারণ তত প্রাচীন কোন গ্রন্থ বা আদর্শ নাই। বেদ, যাহা জগতের সুপ্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া জগতের সুধীমণ্ডলী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাও আর্য্যদিগের জ্ঞান-গবেষণার সেই যৌবন-কালের বলিতে হইবে, সুতরাং তাহারও কোন্ সুদূর অতীতে আর্য্যদিগের অতি শৈশব সময়ে বা আর্য্য সভ্যতার নূতন বিমল আলোকে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা ও করকা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথম আবিষ্কর্ত্তার নয়নে ছত্রের অভাব পরিলক্ষিত হইল। জানি না সেকালে ছত্রের গঠন কি প্রকার হইয়াছিল, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, লতা পাতা সাহায্যে কোন প্রকারে ছত্ররূপে তাহা ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বৈদিকযুগে যখন আর্য্যদিগের জ্ঞান-গর্ব্বের অতি প্রখর দীপ্তিতে সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তখন ছত্র অতি উন্নত ভাবেই নির্ম্মিত হইত ও আর্য্যের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। অতি সামান্য ব্যক্তি হইতে চক্রবর্ত্তী রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই ছত্র ব্যবহার করিতেন। নরপতিদিগের দণ্ড ও মুকুটাদির ন্যায় ছত্রও রাজচিহ্ন বা অবশ্য গ্রহণীয় ও অতি সম্মানার্হ সামগ্রী বলিয়া বেদাদি সকল শাস্ত্রেই উল্লেখ আছে। এমন কি 'ছত্রপতি' সম্রাট-সূচক আর একটী নামই এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি নৃপতিবৃন্দ ছত্রপতি অধীশ্বর ছিলেন। বেদ বৈদিক ব্যাকরণকার পাণিনীও ছত্রসম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছে। সংহিতা, স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণাদি সকল স্থানেই ছত্রের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের 'দানধর্ম্ম' অংশে লিখিত আছে ;—

"ছত্রং হি ভরতশ্রেষ্ঠ যঃ প্রদদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে।
শুভ্রং শতশলাকং বৈ স প্রেত্য সুখমেধতে॥
স শক্রলোকে বসতি পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ।
অপ্সরোভিশ্চ সততং দেবৈশ্চ ভরতর্ষভ॥"

মর্ম্মার্থ এইরূপ—শুভ্র শতশলাকা বা শতশির বিশিষ্ট ছত্র ব্রাহ্মণকে দান করিলে, দেব, দ্বিজ ও অপ্সরাগণের পূজ্য হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিতে পারা যায়। এই শ্লোকের ভাবানুসারে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যেরূপ আটশিক্ বা বারশিক্

ছাতা আমরা এখন ব্যবহার করি, পুরাকালে প্রায় এইরূপই, বরং ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর শতশিক্ বিশিষ্ট ছাতা ব্যবহৃত হইত। আজকাল অতি হেয় ও অকর্ম্মণ্য সামগ্রী যাহা ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তাহা 'দেনো' বলিয়া উপেক্ষার বস্তু, কিন্তু সেই প্রাচীনযুগে সেরূপ ছিল না, যাহা উৎকৃষ্ট, ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাই দানযোগ্য সামগ্রী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইত। আমাদিগের শৈশবসময়ে যখন ভারতপরিব্যাপ্ত এই বিলাতী ছাতার সেরূপ প্রচলন ছিল না, তখন গোলপাতার ছাতাই এদেশে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসব উপলক্ষে সম্ভ্রান্ত বা বর্দ্ধিষ্ণু লোকের শোভা-যাত্রায় বস্ত্রাচ্ছাদিত ও বেত্রশলাকায় বিরচিত বৃহৎ বৃহৎ ছত্র দেখিতাম, তাহা ভৃত্যগণদ্বারা বাহিত হইত। তাহা দেখিয়া তখন বিস্মিতও হইতাম, কিন্তু সে সময় হৃদয়মধ্যে অলক্ষ্যেও স্থান পাইত না যে, উহা আর্য্য-ছত্রের অতি প্রাচীন আদর্শ, বরং এই বিলাতীরই অনুকরণ বলিয়া তখন মনে করিতাম। কিন্তু প্রাচীন ভাস্করশিল্পে ছত্রের নানারূপ আদর্শ দেখিয়া ও শাস্ত্রাদির মধ্যে ঐ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা পাঠ করিয়া সেই অমূলক ধারণা দূর হইয়াছে। অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ "যুক্তিকল্পতরু"র মধ্যে ছত্রের বিভিন্ন আকার, গঠন ও নাম সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে, এ স্থলে তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা পাঠে বোধ হয় সকলেই তৃপ্তি-লাভ করিতে পারিবেন।

"বিশেষশ্চাথ সামান্যং ছত্রস্য দ্বিবিধা ভিদা।
রাজ্ঞশ্ছত্রং বিশষাখ্যং সামান্যং চান্যদুচ্যতে॥
সদণ্ডঞ্চাথ নির্দণ্ডং তজ্জ্ঞেয়ং দ্বিবিধং পুনঃ।
সদণ্ডং তত্র বিজ্ঞেয়ং সারণাকুঞ্চনাত্মকম্॥
দণ্ডঃ কন্দং শলাকাশ্চ রজ্জুর্বস্ত্রঞ্চ কীলকঃ।
ষড়্ভিরেতৈঃ সুসন্দিষ্টৈশ্ছত্রমিত্যভিধীয়তে॥
দ্বিগষ্টষট্চতুর্হস্তদীর্ঘো দণ্ডোযুগক্রমাৎ।
ষড়্বাণবেদনয়নবিতস্ত্যা কন্দ উচ্চতে॥
শতান্যশোতিঃ ষষ্টিশ্চ চত্বারিংশদ্ব্যক্রমাৎ।
শলাকাঃ ষট্পঞ্চবেদত্রিহস্তৈঃ সম্মিতাঃ ক্রমাৎ॥
বিশুদ্ধকাষ্ঠস্য তু দণ্ডকন্দৌ তথা শলাকা অপি শুদ্ধবংশজাঃ।
রজ্জুশ্চ রক্তা বসনঞ্চ রক্তং ছত্রপ্রসাদং নৃপতের্বদন্তি।
প্রসাদমিতি প্রসাদর্হং।
নীলো দণ্ডশ্চ বস্ত্রঞ্চ শিরঃ কুম্ভস্ত কানকঃ।
সৌবর্ণং যুবরাজস্য প্রতাপঃ নাম বিশ্রুতম্॥
চান্দনৌ দণ্ডকন্দৌ চেৎ সুশুক্লে রজ্জুবাসসী।
ছত্রং মনোহরং রাজ্ঞং স্বর্ণ কুম্ভোপশোভিতম্॥
শুক্লানি রজ্জুবাসাংসি স্বর্ণকুম্ভস্তথোপরি।
ইদং কনকদণ্ডাখ্যং ছত্রং সর্ব্বার্থসাধকম্॥
দণ্ডকন্দশলাকাশ্চ শুদ্ধস্বর্ণেন নির্ম্মিতাঃ।
কীলকং স্বর্ণঘটিতং অশুক্লে রজ্জুবাসসী॥
কুম্ভাদিরথ হংসাদিশ্চামরাদির্যথাক্রমম্।
কুম্ভাদাবপহংসাদৌ নবরত্নানি রক্ষয়েৎ॥
দ্বাত্রিংশন্মৌক্তিকো মালা দ্বাত্রিংশত্তত্রদাপয়েৎ।
সর্ব্বোপরি ব্রহ্মজাতিং বিশুদ্ধং হীরকং ন্যসেৎ॥
দণ্ডান্তে কুরুবিন্দাংশ্চ পদ্মরাগংশ্চ বিন্যসেৎ।
স্বামিহস্তৈকমানেন চামরঃ সিত ইষ্যতে॥
ইত্যয়ং নবদণ্ডাখ্যশ্ছত্ররাজো মহোভুজাম।

মর্ম্মার্থ—'বিশষ' বা রাজছত্র ও 'সামান্য' বা

সাধারণ ছত্র ভেদে ইহা দ্বিবিধ। পুনরায় উহা 'সদণ্ড' ও 'নির্দণ্ড' ভেদে দুই প্রকার। সদণ্ড অর্থাৎ যাহা আবশ্যক অনুসারে প্রসারণ ও কুঞ্চন করিতে পারা যায় বা যে ছাতাগুলি খোলা ও বন্ধ করা যায়, তাহা আজকালের এই বিলাতী ছাতারই অনুরূপ। শাস্ত্রকার নির্দণ্ডের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, না দিলেও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যে ছাতাগুলি আবশ্যক মত খোলা ও বন্ধ করা যায় না, তাহাই নির্দণ্ড, বোধ হয় পূর্ব্ব প্রচলিত গোলপাতার ছাতার মতই হইবে অথবা দণ্ড বিহীন, পল্লীগ্রামের প্রচলিত টোকার মত কোনরূপ হইতে পারে। কিন্তু সদণ্ড ছত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রকার অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। দণ্ড, কন্দ, শলাকা, রজ্জু, বস্ত্র ও কীলক এই ষড়্-বিধ সামগ্রীই উহার উপাদান। দণ্ড বা ছাতার বাঁট, সে কালে যথাক্রমে দশ আট, ছয় ও চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইত, উহার কন্দ বা কল সেই অনুসারে যথাক্রমে ছয়, পাঁচ, চারি ও তিন বিতস্তি বা বিঘৎ দীর্ঘ হইত। শলাকা বা ছাতার শিক সেই অনুপাতে যথা ক্রমে ছয়, পাঁচ, চারি ও তিন হস্ত পরিমিত হইত, সুতরাং বস্ত্র শলাকার দ্বিগুণ হইবে এবং কীলক বা খিল যাহাকে আমরা এখন ইংরাজী শব্দে স্প্রিং বলি, তাহা প্রায় অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ হইত। এই বিভিন্ন পরিমাণের ছত্র অবশ্যই অবস্থা অনুসারে ব্যবহৃত হইত। রাজছত্র সম্বন্ধে আরও বহু বিভিন্ন নিয়মাদি আছে। এক্ষেত্রে দুই একটীর আভাস প্রদত্ত হইতেছে। ঐ সকল ছাতার বাঁট ও কল সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট কাষ্ঠেই প্রস্তুত হইত এবং তাহার শিকগুলি পাকা বাঁশের বাখারি হইতে সূক্ষ্ম করিয়া চিরিয়া তৈয়ার করা হইত। উহার বস্ত্র ও রজ্জু রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইত। ইহাই রাজন্যবর্গের সাধারণ ব্যবহারের উপযুক্ত। ইহার নাম 'প্রসাদ' ইহা শান্তি প্রদায়ক। যাহার দণ্ড ও বস্ত্র নীলবর্ণের এবং উপরিভাগ সুবর্ণমণ্ডিত, তাহার নাম 'প্রতাপ', তাহাই শাস্ত্রানুসারে নৃপকুমারের ব্যবহার্য্য। যাহার দণ্ড চন্দন কাষ্ঠে বিনির্ম্মিত, রজ্জু এবং বস্ত্র শুক্লবর্ণের এবং উপরি ভাগ সুবর্ণ কলস দ্বারা শোভিত তাহার নাম 'কনকদণ্ড' ছত্র, তাহা রাজাদিগের সর্ব্বার্থসাধক বলিয়া বিশেষ আদরের বস্তু। এতদ্ব্যতীত 'নবদণ্ড' নামক আর এক প্রকার ছত্রের উল্লেখ আছে, তাহা রাজ্যাভিষেক, শোভাযাত্রা ও রাজ-বিবাহাদি উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার দণ্ড, কন্দ, শলাকা বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত, কীলক তাহাও স্বর্ণঘটিত, রজ্জু বস্ত্র সমস্তই অতি উজ্জ্বল, বিচিত্র বা শুভ্র বর্ণের, উপরে সুবর্ণ কলস, রথ-হংস ও চামরাদির মাঙ্গলিক চিহ্নচিত্রে সুশোভিত এবং বত্রিশটী মুক্তাহার ঝালরের মত চারি ধারে বিন্যস্ত, সর্ব্বোপরি ব্রহ্মজাতীয় বিশুদ্ধ হীরকখণ্ড খচিত থাকিত, দণ্ডের নিম্নদেশে পদ্মরাগাদি মণি মাণিক্য খচিত থাকিত এবং এক হস্ত পরিমিত মনোহর চামর তাহাতে বিলম্বিত হইত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্মৃতি, সংহিতা ও পুরাণাদির মধ্যে ছত্রের আকার বা গঠন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। 'অগ্নি পুরাণে'র মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজ ছত্রে বস্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্যান্য উপাদানও ব্যবহৃত হইত। রাজকুমারগণ রাজহংস ময়ূর বা বকের পালকে অতি সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত ছাতা ব্যবহার করিতেন। এই সকল পালক আবার নানা জাতির

বিমিশ্র হইলে চলিবে না। ইহা ছাড়া ক্ষত্রিয়গণ শুক্ল বর্ণের এবং ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন বর্ণের ছাতা ব্যবহার করিবেন এইরূপ নিয়ম আছে। পরিমাণ সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিত আছে। ব্রহ্মসংহিতাকার তিনিও রাজহংস, ময়ূর, বন্যকুক্কুট ও সারসের পালক ও নব বস্ত্রের ছাতা ব্যবহার করিবার কথা লিখিয়াছেন। এবং শুভ্র ছত্রে মুক্তামালার ঝালর আদি শোভিত করিতে বলিয়াছেন। উহাদের পরিমাণ সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, সাধারণ ব্যক্তিও নিজ নিজ পছন্দ মত বস্ত্র কিম্বা ময়ূর ছত্র ব্যবহার করিতে পারেন কিন্তু তাহার আকার চতুষ্কোণ বা চার শিকবিশিষ্ট এবং তাহার বাঁট গোল হইবে।

এ সকল ছত্রাদি কেবল যে ব্রহ্মণ্যযুগেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে। বৌদ্ধ এবং মোসলমান আধিপত্য কালেও ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বৌদ্ধ যুগের ভাস্কর্য্যমধ্যে ভগবান বুদ্ধের যে সকল প্রতিমূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ছত্রের আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শারনাথ স্তূপের নিকটস্থ মৃত্তিকা গর্ভ হইতে যে সকল মূর্ত্তি উত্থিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ছত্রের খণ্ড খণ্ড কয়েকটী অংশ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেটী পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ছত্রের অনুরূপ অর্থাৎ তাহার গঠনপ্রণালী দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, তাহা কুঞ্চিত বা প্রসারিত করিতে পারা যাইত। সম্পূর্ণ গোলাকার ছত্র, উহার পরিধি অনুমান ১০।১২ ফুট হইবে। উহার প্রত্যেকস্থান বিচিত্র কারুকার্য্যে শোভিত। একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধ-মূর্ত্তির মস্তকে ঐ ছত্রটী বিন্যস্ত ছিল। প্রাচীন ভাস্করশিল্পের অন্তর্গত চিত্রের যে সকল আদর্শ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোনও স্থলেই কোন নৃপতির প্রতিমূর্ত্তি বা তৎসহ তাঁহাদের ব্যবহৃত ছত্রের আভাস নাই, অধিকাংশ স্থলেই দেব-দ্বিজের শিরোপরি নির্দণ্ড গোলাকার ছত্রের আকারে খোদিত আছে। প্রাচীন আর্য্য জাতির এই মৌলিকভাব ক্রমে প্রতিবেশী অন্যান্য জাতির মধ্যেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং এ পর্য্যন্ত তাহা অতি সম্মানেই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'ছত্রপতি' শব্দ রাজাদিশব্দেরই অন্যতম। এ স্থলে ছত্র অর্থেই রাজা। কারণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের বা ছত্রের যিনি অধিপতি তিনিই ছত্রপতি বা সম্রাট। যুধিষ্ঠির অশোক ও দিল্লীর সম্রাটবর্গ ভারত বিজয় করিয়া প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে অধীন বা করদ-রাজ্যরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। এই আদর্শে চীন, বর্ম্মা প্রভৃতি এখনও ছত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বর্ম্মার অধীশ্বর চতুর্বিংশতি ছত্রের অধিপতি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। সুতরাং সর্ব্বসাধারণ সামান্য ছত্র এবং সকল রাজাই রাজ-ছত্র ব্যবহার করিতেন বটে কিন্তু ছত্রপতি উপাধিতে কেহই সম্মানিত হইতে পারিতেন না, তাহা কেবলমাত্র মহারাজাধিরাজ সম্রাটেই প্রযুজ্য হইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্রিরত্ন বিজয়।

দূত মুখে।

শিপ্রার প্রশান্তবাহিসলিলবিধৌত তটভূমির উপর একটি সুন্দর বৃক্ষ-বাটিকা, শরতের মৃদু শীতল সমীরণ সঞ্চারে—মন্দ মন্দ আন্দোলিত যূথিকা, মালতী ও শেফালিকার সৌরভে চারিদিক সুবাসিত, সেই মনোহর বৃক্ষবাটিকার মধ্যস্থলে একটী সুন্দর প্রাসাদ, প্রাসাদটী আয়তনে ছোট হইলেও দেখিতে যেন একখানি ছবি, —ঐশ্বর্য্যের অভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য যাহা যাহা প্রকৃষ্ট উপকরণ, তাহা সকলই সেই ক্ষুদ্র প্রাসাদের সৌভাগ্য সম্পদ্‌কে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

মণিমাণিক্যোদ্ভাসিত সারি সারি সুবর্ণময় দীপমালা, রত্নখচিত চিত্র বিচিত্র পুষ্পাধার, ভিত্তি বিভূষণ ভাবোদ্দীপক আলেখ্যাবলী, নীল পীত হরিত ও রক্ত বর্ণের চীন দেশজাত কৌষেয় বস্ত্রের বিচিত্র যবনিকা-সমূহ, স্থানে স্থানে মণিমুক্তা প্রবালের বিচিত্র বিন্যাস গবাক্ষোপরি লম্বমান মণিমণ্ডিত মুক্তাঝালর, এই সকল বহুমূল্য উপকরণে সুসজ্জিত প্রাসাদের দ্বিতলে একটী প্রশস্ত-কক্ষে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া, রাজকুমার অশোক নির্ম্মুক্ত বাতায়নের অবারিত সান্ধ্য-সমীরণ সেবা করিতেছেন, রাজ কুমার অশোকের বয়স পঁচিশের অধিক নহে, দেখিতে পরম সুন্দর যুবা, ভারতসম্রাট্ বিন্দুসারের অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপে লালিত পালিত ও শিক্ষিত কুমার অশোক—উজ্জয়িনীতে রাজ প্রতিনিধির পদে আসীন, দিবসে বিশালমালবের গুরুতর রাজকার্য্য-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সন্ধ্যা কালে শান্তির অপনোদন করিতেছেন্ তিনি প্রায় প্রত্যহই, এই শ্রিপ্রাতীরের বৃক্ষ বাটিকায় সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত করেন। দুই পার্শ্বে দুইটী ব্যজনধারিণী অনিন্দ্যসুন্দরী পরিচারিকা কোমলকরসঞ্চারে চামর ঢুলাইতেছে। দিব্য ধূপের সৌরভের সহিত সন্ধ্যা-প্রস্ফুটিত যূথিকার সুগন্ধভার মিশিয়া মিশিয়া কক্ষময় সৌরভিত করিতেছে, রাজকুমারের বদন মণ্ডলে কিন্তু প্রসন্নতার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছেনা, যৌবনের আবেশময় দৃষ্টির সঙ্গে ললাটে ঈষৎ রক্তাভ চিন্তারেখার মিলনে যেন কেমন একটা গম্ভীরে ও মধুরে মেশামিশি করিতেছিল।

গণ্ডদেশ বামহস্ততলে বিন্যস্ত করিয়া, মৃদুবাহিনী শিপ্রার সান্ধ্য-পবনান্দোলিত লহরীমালার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া, তিনি যে কি ভাবিতেছেন তাহা বুঝিবে কে? পরস্পর মুখাবলোকিনী চামরধারিণী দুইটীর চঞ্চল নেত্রের দিকে চাহিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রাজকুমারের এই সময়ে এই প্রকার অন্যমনস্ক ভাব যেন তাহারা পূর্ব্বে অতি অল্পই দেখিয়াছিল।

এমন সময়ে এক জন প্রতীহারী আসিয়া যথাবিধি অভিবাদন করিল এবং অতি বিনীত ভাবে আরও নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে, পাটলিপুত্র হইতে একজন দূত আসিয়াছে ও বিশেষ কার্য্যের জন্য এখনই রাজকুমারের দর্শনপ্রার্থী হইয়াছে, রাজামাত্য বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বিশেষ অসুবিধা না ঘটিলে, রাজপ্রতিনিধির সহিত এই দূতের অবিলম্বে সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক, কারণ, দূতের বক্তব্য রাজামাত্য শ্রবণে অনধিকারী—এই প্রকার আদেশপত্র পাটলিপুত্র হইতেই ঐ দূতই আনিয়াছে।

প্রতীহারীর কথায় রাজকুমারের চিন্তাস্রোতে অকস্মাৎ বাধা পড়িল, পাটলিপুত্র হইতে নূতন সম্বাদ? প্রধানামাত্যও সে সম্বাদ শ্রবণে অনধিকারী? না জানি ইহার ভিতরে কি গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে! এই ভাবের কতকগুলি ভাবনা রাজকুমারের হৃদয়াকাশে ক্ষণেকের জন্য বিদ্যুতের ন্যায় চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া সেই ভাবে বসিয়াই তিনি আদেশ করিলেন, আচ্ছা আসিতে দাও!

দূত পরক্ষণেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যথাবিধি অভিবাদন করিয়া আসনের দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া দূত রাজকুমারের চরণান্তিকে এক খানি পত্র রাখিয়া দিল, এবং পশ্চাতে হটিয়া আবার যথাস্থানে সরিয়া দাঁড়াইল, তাড়াতাড়ি একজন চামর ধারিণী অগ্রসর হইয়া পত্র খানি কুড়াইয়া লইল এবং বিনীতভাবে কুমারের হস্তে দিল।

ঈষৎ আবেগ-কম্পিত-হস্তে সত্বর পত্র উন্মোচন করিয়া রাজকুমার অশোক, পত্রখানি একবার দুইবার তিনবার পড়িলেন, ভয় ঔৎসুক্য আশা ও ব্যাকুলতার সুস্পষ্ট চিত্রগুলি তাঁহার সমুজ্জ্বল ললাটফলকে প্রতি নিমেষে সেই সমুজ্জ্বল আলোকের ছটায় ফুটিয়া উঠিতে ছিল, প্রবীণ দূত নিবিষ্টচিত্তে সেই চিত্রগুলির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছিল।

পত্র পাঠ করিয়া কুমার একবার চামরধারিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহারা বুঝিয়া নিমেষের মধ্যে গৃহ ত্যাগ করিল, প্রতীহারীও অভিবাদন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তখন কুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন ধীরে দূতের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন ভদ্রসেন! এস বারান্দায় দাড়াইয়া কথা কহি—এই বলিয়া কুমার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পশ্চাতে পশ্চাতে ভদ্রসেনও তথায় উপস্থিত হইল।

কুমার ভদ্রসেনের দিকে ফিরিয়া অতি ধীর স্বরে বলিলেন ভদ্রসেন! পত্র পাঠে জানিলাম আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে—পিতা আমাকে অসময়ে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, অমাত্য রাধগুপ্ত লিখিয়াছেন যে, এইটুকু পত্রে লিখিবার যোগ্য, বাকী যাহা তাহা তোমার মুখে শুনিতে হইবে?—বেশ ভদ্রসেন তোমার বক্তব্য বলিতে পার!—আচ্ছা থাক, আমিই প্রশ্ন করিতেছি, তুমি উত্তর করিতে থাক, তাহা হইলেই ভাল হইবে।

ভদ্রসেন, আমার পরম পূজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয় কি পিতৃদেবের ত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন?

"না কুমার!—মহারাজের মৃত্যুর পর দিনেই মহামাত্য এবং প্রধান সেনাপতি প্রস্তাব করেন যে, রাজসিংহাসন এক দিনের জন্য শূন্য থাকা শুভকর নহে, এরূপ স্থলে ন্যায়তঃ অধিকারী যখন রাজধানীতে রহিয়াছেন, তখন মন্ত্রিসভার কর্ত্তব্য এই যে, যুবরাজকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা—

"ন্যায্য প্রস্তাব" তাহার পর?

"স্বয়ং যুবরাজ এ প্রস্তাবে কিন্তু সম্মতি দিলেন না, তিনি বলিলেন যে, সম্রাটের জীবিতাবস্থায়ই তিনি যখন রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রায় দুই মাস হইতে শাসন মন্ত্রের পরিচালনা করিতেছেন, মন্ত্রিসভাও যখন সর্ব্ব-বিষয়ে একমত—সম্রাজ্যের কোন অংশেই যখন কোন প্রকার বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাই, এরূপ অবস্থায় তাড়াতাড়ি সিংহাসনে আরোহণ করায় লাভ কি?

তাহার পর রাজকুমারগণ যখন সকলেই তাঁহার অনুগত এবং পিতৃসাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত, তখন ত কোনদিকে কোনও প্রকার বিপদের-সম্ভাবনা নাই, অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য এই যে, আমার অনুজ ভ্রাতাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলকে রাজধানীতে আনয়ন করা হউক, ভারতের যাবতীয় সামন্ত-রাজগণকে সমবেত করা হউক, তাহারপর শুভদিনে সকলের সম্মতির সহিত সিংহাসনে আরোহণ করিলে ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব রক্ষিত হইবে, শত্রুগণও ভীত হইবে, সুতরাং ইহাই করিতে হইবে।" যুবরাজের এই প্রস্তাবই মন্ত্রি সভায় সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

ভদ্রসেনের কথাগুলি কুমার প্রণিধান সহকারে শুনিতেছিলেন, এইবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি একটু হাসিলেন এবং বলিলেন,—

"ভদ্রসেন, কোষাধ্যক্ষ অমাত্য রাধগুপ্ত প্রধানামাত্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন!

"অমাত্য রাধগুপ্ত কুমার সমীপে জানাইতে চাহেন যে, প্রধানামাত্য আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন, এইরূপ অবস্থায় আপনি যত শীঘ্র পারেন রাজধানীতে আসেন ততই মঙ্গল, সঙ্গে কিন্তু মালব প্রদেশের তক্ষ-শিলা জয়ি সৈন্যদলকে অবশ্য লইয়া আসিতে হইবে। ইহাই রাধগুপ্তের কুমার সমীপে সবিনয় নিবেদন! কুমারের কার্য্যের জন্য অমাত্য রাধগুপ্ত আত্মসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

'তাহাই হইবে ভদ্রসেন! তুমি অদ্য বিশ্রাম কর, কয়েক দিনের পথ শ্রান্তিতে তুমি মলিন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ দেখিতেছি, আমি আগামী কল্যই উজ্জয়িনী হইতে যাত্রা করিব, তোমার সহিত অনেক কথা আছে, কল্য তাহা কহিব, যাও তুমি বিশ্রাম কর!"

ভদ্রসেন অভিবাদন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন কুমার একবার স্থির দৃষ্টিতে নদীরদিকে ফিরিয়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে সমুজ্জ্বল শিপ্রাবক্ষে প্রতি লহরীতে লহরীতে মুকুটের ন্যায় চন্দ্রবিম্ব বিকাশ পাইতেছিল, মৃদুশারদ সমীরণের শীতল স্পর্শে তাঁহার আবেগ ভারাক্রান্ত হৃদয় যেন একটু লঘুভাব ধারণ করিল, মৃদু হাস্যে অধর পল্লবে চন্দ্রি-কার বিকাশ হইল, তখন একবার আকাশের দিকে চাহিয়া, সেই শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের বিমল চন্দ্রি-ধৌত নীলাকাশের নীহারিকা মণ্ডিত নীলিমার দিকে চাহিয়া রাজকুমার অশোক অধ্যবসায় সমুন্নত হৃদয়ে দুই হস্ত স্থাপন করিয়া—আপনা আপনিই বলিলেন ভগবান্ যদি সত্য হয়েন তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য অবশ্যই স্থাপিত হইবে।

রাজধানী অভিমুখে।

মালবের শাসন কার্য্যের ভার উপযুক্ত মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, কুমার অশোক পরদিনই পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উজ্জয়িনীতে সে সময় পাঁচ হাজারের অধিক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল না, নগর রক্ষার জন্য পাঁচশত মাত্র সৈন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সেনা তিনি সঙ্গে লইলেন। পথিমধ্যে যে কয়স্থানে সেনা-নিবাস ছিল, সকল স্থানেই অগ্রেই লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং আদেশ করিলেন যে, যেখানে যত সেনা সংগ্রহ হইতে পারে, তাহা সংগ্রহ করিয়া যেন সেনা-পতিগণ যথাস্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হন্। প্রতি-দিন অন্ততঃ পঞ্চদশ ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতে করিতে কুমার দ্রুতগতিতে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত

হইলেন। কুমার যতই অগ্রসর হইতেছিলেন তাঁহার সেনা বৃদ্ধি পাইতে ছিল। চুনার গিরিদুর্গের নিম্নে তিনি ভাগীরথী পার হইলেন, অভিপ্রায় যে একটু বক্র-গতি হইলেও একবার বারাণসী হইয়া যান, কুমারের এই সংকল্প দেখিয়া তাঁহার সেনাপতিগণ একটু বিরক্ত হইলেন, তাঁহাদের আশা ছিল, যে শীঘ্র রাজধানীতে পৌছিয়া একটু আরাম করেন, অবিশ্রান্ত পথশ্রান্তিতে প্রকৃত পক্ষে কুমারের সৈনাগণ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কুমার কিন্তু তাহাদের অনুরোধে কর্ণ-পাত করিলেন না তাহার সেনা এক্ষণে প্রায় পঞ্চাশ সহস্রে পরিণত হইয়াছিল, সেই বিশাল বাহিনী সঙ্গে করিয়া অশোক বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন, সেনাগণকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইল, আদেশ হইল যে বারাণসীতে এক সপ্তাহ কাল বিশ্রাম করিতে হইবে।

এক সপ্তাহ বিশ্রামের আদেশ শুনিয়া সেই পথ শ্রান্ত সেনার মধ্যে আনন্দের কলনাদ পড়িয়া গেল! উত্তরবাহিনী ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে বিস্তীর্ণ-সৈকতে অশোকের বিশাল বাহিনী সন্নিবেশিত হইল। অকস্মাৎ এই বিশাল সেনা লইয়া নগরে প্রবেশ করিলে নগর-বাসিগণের নানা প্রকার ক্লেশ হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি বারাণসীর অপর পারেই সেনা সন্নিবেশ করিলেন।

কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা আগতপ্রায়, গঙ্গার জল বড়ই নির্ম্মল, সে বর্ষার ভীষণ স্রোতঃ আর নাই, মৃদুবাহিনী প্রসন্ন পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর সুবিস্তীর্ণ শুভ্র সৈকতে সারি সারি পট মণ্ডপের মধ্যস্থলে, এক সুশোভিত সমুন্নত সুবিশাল বজ্রময় প্রাসাদের উপরে কুমার অশোকের—বিশাল বিজয় বৈজয়ন্তী ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া সেই স্কন্ধাবারের বিচিত্র শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

শরতের বিমল চারুচন্দ্রিকা ধৌত ভাগীরথীতীরে বসিয়া পশ্চিম পারে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারাণসীর সুধাধবল মন্দির ও সৌধশ্রেণীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কুমার অশোক চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। বারা-ণসীর দেবমন্দিরসমূহ হইতে নিশীথ বায়ুসঞ্চারে আনীত সুমধুর সামগানেরসহিত মিশ্রিত হইয়া বৌদ্ধ বিহার-স্থিত ভিক্ষুগণের সুললিত বুদ্ধ-বিজয়গীতি তাঁহার কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছিল, বারাণসী ভারতীয় ধর্ম্ম-ময় সভ্যতার চিরন্তন কেন্দ্র, এই উত্তরবাহিনীর তীরে উপনিষদের অদ্বৈতবাদ প্রথমে উদ্ঘোষিত হইয়াছে কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুদ্ভূত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর্শক্ষেত্র এই বারাণসীতেই গৌতম বুদ্ধ তাঁহার বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্মের প্রথম উপদেশ করেন। যে ধর্ম্মের মূলভিত্তি অহিংসা, মৈত্রীকরুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা যে ধর্ম্মের সাধনার সার, সর্ব্বভূতের সমতা ও সহানুভূতি যে ধর্ম্মের প্রাণ, সেই মহান্ ধর্ম্ম এই বারাণসীতেই প্রথম প্রচারিত হয়, এই বারাণসী হইতেই সর্ব্বপ্রথমে শ্রমণগণ সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব দুঃখ-নিরাকরণ করিবার উদ্দেশে এই প্রেমময় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ পূর্ব্বক দিগ্ দিগন্তে ধাবিত হইয়া ছিলেন। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে কুমার অশোক এক অভূত পূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে ছিলেন।

অকস্মাৎ এক অলৌকিক ঘটনায় তাঁহার এই আনন্দময় গভীর চিন্তা-স্রোতঃ থামিয়া গেল। তিনি বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন—এক

জন মুণ্ডিত মুণ্ড পীতবসনধারী শ্রমণক দুই হাত তুলিয়া "জয় ভারত সম্রাটের জয়" এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বলিলেন মহারাজ! ত্রিরত্নের জয় হউক, আমি ভগবান্ বুদ্ধের আদেশে ভারতের চক্রবর্ত্তী নরপতি অশোকের সমক্ষে ভগবানের অভিপ্রায় জানাইতে প্রার্থনা করিতেছি।

অকস্মাৎ কোন প্রকার সংবাদ না দিয়া, এই ভাবে একজন সামান্য ভিক্ষু তাহার সম্মুখে আসিতে পারিয়াছে তাহার উপর তাঁহাকে এই ভাবে অন্যায় রূপে সম্বোধন করিতে সাহস করিয়াছে। এই জন্য কুমারের হৃদয়ের সহসা ক্রোধের উদয় হইল, বাল্যকাল হইতে তাহার প্রকৃতি বিলক্ষণ ক্রোধপ্রবণ, অন্যায় আচরণ দেখিলে তিনি একবারে ক্রোধে অধীর হইতেন, সুতরাং সহসা এই ব্যবহারে নিতান্ত অধীর হইয়া তিনি প্রতীহারীকে কঠোর আদেশ দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহাকে বিস্ময়সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া, সেই ভিক্ষুমূর্ত্তি যেন বায়ুর সঙ্গে মিশাইয়া গেল, প্রতীহারী দুই জনই এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইল, কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কুমারও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অধিক রাত্রিতে এইরূপ সৈকত ক্ষেত্রে বাহিরে অবস্থিতি শুভকর না হইতে পারে; এই ভাবিয়া তিনি দ্রুতপদে স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন, সেই ভিক্ষুর প্রশান্ত ও উজ্জ্বল দীর্ঘ নয়নদ্বয় আর সেই সমুজ্জ্বল গৌরললাটে চিন্তা রেখাবর্জ্জিত বৈরাগ্যসূচক বিশালতা তাহার হৃদয়ে এমনই দৃঢ় ভাবে সেই ক্ষণকালের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছিল, যে তিনি মানসনেত্রে সেই ভিক্ষুর সেই উজ্জ্বল নয়নদ্বয় ও সেই প্রশান্ত ললাট সর্ব্বদাই যেন নিজের সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন, তখন আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি একাকী সেই সুরম্য বস্ত্র গৃহের মধ্যে নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বিবিধ শিল্প ও শিল্পোপকরণ।*

(ART OF LITHOGRAPHY.)

প্রস্তর-চিত্রণ।

প্রস্তর চিত্রণ—প্রকৃত পক্ষে চিত্রশিল্পের যে একটী অঙ্গ এরূপ বলা যায় না। ইহা চিত্র, শিল্পকে বহুজন সমক্ষে প্রচারিত বা প্রকাশিত করে। বিবিধ প্রকরণ ও উপকরণ দ্বারা প্রস্তরের উপর চিত্র করিয়া ঐ চিত্র মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করণের নামই প্রস্তরচিত্র বা লিথোগ্রাফী।

ইহা দুই বিভিন্ন শিল্পী দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রথম শিল্পী প্রস্তরের উপর চিত্র করেন এবং দ্বিতীয় শিল্পী মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় ইহার মুদ্রাঙ্কন সম্পন্ন করেন।

ইহাকে ব্যবহারিক শিল্প বলিয়াই গণ্য করা হয়। এই শিল্প ভারতবর্ষে পূর্ব্বে ছিল কিনা তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রস্তর—চিত্রের মূল বিজ্ঞান বা তত্ত্ব। ইহার মূল বিজ্ঞান এই যে চূর্ণ বিশিষ্ট প্রস্তরের (Calcareous stones) সহিত তৈল যুক্ত (Oily) রজন, ধুনা বা মোম যুক্ত পদার্থের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় ঐ সকল

* All rights reproduction reserved.

শিল্প ও সাহিত্য।—

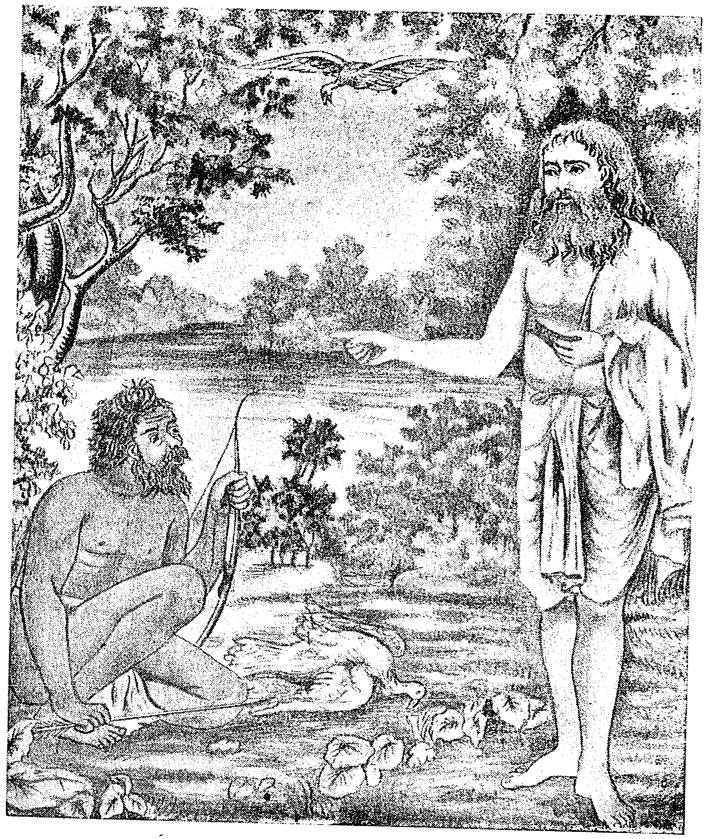

বাল্মীকি ও ব্যাধ।

পদার্থ দ্বারা কালী (Ink) বা পেন্সিল (Chaik) প্রস্তুত করিয়া ঐ কালী বা পেন্সিল দ্বারা উক্ত প্রস্তরে চিত্র করিলে, ইহা অতিশয় দৃঢ়ভাবে প্রস্তরে সংলগ্ন হয়। এই প্রস্তরের জল-শোষণ শক্তিও যথেষ্ট আছে। এই প্রস্তরের উপরে উক্ত তৈল পদার্থ যুক্ত কালী পাতলা করিয়া রোলার (Roller) দ্বারা বিস্তার করিলে উক্ত কালী কেবল মাত্র ঐ চিত্রের উপর আকর্ষিত হইবে। কিন্তু প্রস্তরের যে সকল স্থান জলসিক্ত বা আর্দ্র থাকিবে, তথায় উক্ত মুদ্রাঙ্কনের কালী স্পর্শ করিবে না। এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়াতেই প্রস্তর চিত্রের মূল বিজ্ঞান আবিষ্কার হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কনের সময় যদ্যপি প্রস্তরকে জলসিক্ত করা না হয়, তাহা হইলে সমগ্র প্রস্তরের উপরিভাগ উক্ত কালী দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে। ইহা মুদ্রাকর শিল্পী যেন বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখেন। আর একটী কথা এস্থানে বলা আবশ্যক যে, যদ্যপি জলসিক্ত হইলে কালী প্রস্তরে সংলগ্ন না হয়, তবে চিত্রের উপর কিরূপে কালী আকর্ষিত হয়? ইহার অর্থ এই যে, যে স্থানে তৈলযুক্ত কালী দ্বারা চিত্র প্রস্তরে অঙ্কিত করা যায়, সে সকল স্থান জলসিক্ত হইলেও প্রস্তরমধ্যে চিত্র ভেদ করিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না।

এই প্রস্তর সকল কোথায় পাওয়া যায়।—এই সকল প্রস্তর বাভারিয়া প্রদেশে দানুব নদীর তীরে পাওয়া যায়। এই প্রদেশের প্রস্তরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষে এরূপ প্রস্তর অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

প্রস্তরের উপর চিত্র করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ এই সতর্কতার অভাব হইলে চিত্রের মুদ্রাঙ্কন পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। এ কারণ নিম্নে প্রধান প্রধান সতর্কতার বিষয়গুলি বর্ণিত হইল।

১। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে চিত্রের কালী ছাড়া যেন অপর কোন তৈলযুক্ত পদার্থ প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত না হয়। অর্থাৎ যে সকল পদার্থের দ্বারা কালী প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সকল পদার্থ বা সেই সকল পদার্থের কোন একটী যদ্যপি চিত্র ব্যতীত অপর স্থানে সংলগ্ন হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই স্থানেও যেন কালী মাখান হইয়াছে, ফলতঃ মুদ্রাঙ্কনের সময় সেস্থানেও যে কোন প্রকার দাগ বা চিত্র অঙ্কিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

২। মস্তকের খুস্‌কী। এই সকল পদার্থ প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত হইলে যদ্যপি উহাদের উপর চিত্র করা হয়, তাহা হইলে ঐ চিত্রের মুদ্রাঙ্কণ সময়ে ভালরূপ ছাপা হইবে না। চিত্রের অধিকাংশ স্থলই প্রস্ফুটিত হইবে না।

৩। মুখের নাসিকার ও চর্ম্মের স্রাব।—মুখের লালা, নাসিকার স্রাব, ঘর্ম্ম প্রভৃতির প্রতিও বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। প্রস্তরে চিত্র করিবার সময় উক্ত দ্রব্য সকল প্রস্তরে পড়িলে তাহা গঁদের (Solution of Gum Arabic) জলের ন্যায় কার্য্য করে। অর্থাৎ গঁদের জল প্রস্তরের উপর কোন স্থানে পড়িলে সেইস্থানে কালী বা পেন্সিল দ্বারা চিত্র করিলে তাহার ছাপা উঠে না, অথবা চিত্রের উপর গঁদের জল সংলগ্ন থাকিলে উক্ত চিত্রেরও ছাপা উঠে না। একারণ প্রস্তরে ফুঁদিয়া পেন্সিলের গুড়া উড়াইবেনা। প্রস্তরের উপর হাঁচিবেনা এবং কাশিবেও না। ঘর্ম্ম

যুক্ত হস্ত প্রস্তরে স্থাপন করিবে না। মস্তকের ওঘর্ম্ম যেন প্রস্তরে পতিত না হয়, এই সকল বিষয়ে এ কারণ বিশেষ সতর্ক থাকিবে।

৪। পেন্সিল (Lead Pencil) বিশেষতঃ নরম পেন্সিল দ্বারা প্রস্তরে রেখা অঙ্কিত করিলে উক্ত রেখার উপর প্রায় কালী বা পেন্সিল (Chalk) চিত্র সংলগ্ন হয় না। অর্থাৎ উক্ত চিত্রের ছাপা উঠে না। এ কারণ পেন্সিল (Lead Pencil) রেখা প্রস্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত করিতে হয়।

৫। প্রস্তরের উপর কাগজ বা ঐরূপ অপর কোন দ্রব্য রাখিয়া উহাদের উপর হস্ত স্থাপন করিলেও প্রস্তরে দাগ পড়িতে পারে ও মুদ্রাঙ্কনে দোষ হইতে পারে।

প্রস্তরের উপর পাঁউরুটি বা রবার (India rubber) দ্বারা ঘর্ষণ করিবে না। কারণ ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তরে সংলগ্ন হইলে চিত্রের ছাপা উত্তমরূপে উঠিবে না।

৭। পুনর্ব্বার বলা হইতেছে যে, তৈল, সাবান, চর্ব্বি প্রভৃতি স্নেহময় দ্রব্য সকল যেন কোন মতে প্রস্তরের উপর সংলগ্ন না হয়। ইহারা সংলগ্ন হইয়াই এরূপ অদৃশ্য হইয়া যায় যে, চিত্রকর (Lithographer) জানিতে পারেন না, কিন্তু মুদ্রাঙ্কনের সময় উহা বাহির হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পরশুরাম কাব্য।

সূচনা।

অনন্ত-নীলিমাচ্ছন্ন ক্ষীরোদের নীরে,—
অনন্ত-শয্যায় শুয়ে, নীলকান্ত হরি!—
পদপ্রান্তে সিন্ধুসুতা, সেবায় নিরতা।
একদিন নারায়ণে, চঞ্চল নিরখি,
জিজ্ঞাসে চঞ্চলা তাঁরে কাতর অন্তরে ;—
"কেন নাথ! অকস্মাৎ হেন ভাব হেরি?—
ছিলে অনন্তশয়নে,—কিসের কারণে
জাগরণ অসময়ে,—কহ কৃপা করি?"
শ্রীহরি,—সম্মুখে, কোন ঘোর অমঙ্গল
সমাগত হেরি, ভয়ে, কহিলা প্রিয়ারে,—
"শুন রমা, পদশব্দ পশিছে শ্রবণে!—
পদভরে চরাচর টলমল করে ;"—
তেজস্বী তাপস এক, ঊর্দ্ধশ্বাসে, হের,
ছুটে আসে ক্ষীরোদের তীরে ; হেরি ওঁরে
হিয়া মোর, অনিবার কাঁপে!—এ কি, ! মরি
কলেবর রক্তমাখা, কিকারণে, ওঁর?"'

রক্তমাখাকলেবর, ভীষণ দর্শন,—
বলিতে বলিতে হায়, তপস্বী জনৈক,
উপনীত হইলেন, দম্পতী গোচর।
জিজ্ঞাসে রমেশ, তাঁরে, সভয় অন্তরে!
"কে তুমি হে তপোধন!—কহ, আগমন
কিসের কারণ, তব, ক্ষীরোদ সলিলে?
কোন দুরাচার, হেন করিল দুর্দ্দশা?"
কাঁপিতে কাঁপিতে, ক্রোধে আরক্ত নয়ন,—

কহিলেন বিপ্রবর,—"রে নৃশংসাধম
নির্ম্মম-অন্তর! জানি আমি,—ক্রূরকর্ম্মা
তব সম নাহি কেহ ভুবন ভিতরে।
যে' তোমারে, হরি হরি বলি', সদা ডাকে
ভক্তিভরে, সাধ তার দুর্দ্দশা সর্ব্বাগ্রে।
ভক্তের বচন পাছে, পশে কর্ণপথে।
এই ডরে নিদ্রাছলে থাক শয্যাগত,
অনন্ত শয্যায় তুমি। ভণ্ড! ভক্তে বলে
অন্তর্য্যামী হরি তুমি! চতুর্দ্দশ লোকে
পলকে পলকে ঘটে যাহা,—বিশ্বচক্ষুঃ!
সকলি নিরখ তব মানস নয়নে।
দ্বিজের এদশা তবে স্বচক্ষে নেহারি,—
অগাধ ঘুমের ঘোরে থাক কোন প্রাণে?"

ব্রাহ্মণের ভাষা, কিছু, অন্তরে না বুঝি
কহেন মুরারী,—"প্রভো, ক্ষমুন অধীনে!
ক্রোধ সম্বরিয়া, ত্বরা, বলুন দাসেরে,
কি ঘটেছে কোথা এবে? কৃপাকরি, দেহ
পরিচয় দাসে, কোন মহামতি তুমি?"—
কহিলা ব্রাহ্মণ তাঁরে,—"চেননা আমারে?
কার পদাঘাত, শোভে, হৃদিপরে তব?"

কেশব বিনয় বাক্যে, কহেন ব্রাহ্মণে—
"ভৃগুমুনি পদাঘাত, ভূষণ আমার!—
কৌস্তভ রতন তুল্য মহামূল্যবান!!"—
আবেগে কহিলা বিপ্র, বক্ষে কর হানি'—
"সেই ভৃগুবংশজাত জমদগ্নি আমি!"—
উত্তরিলা শ্রীনিবাস যুড়ি দুই পানি!—
"পুন বুঝি পদাঘাতে পবিত্রিবে দেব!
অপবিত্র বক্ষঃ মোর?—পাতিলাম হিয়া—
দেখো; যেন আঘাতিতে একঠিন অঙ্গে,
বেদনা লাগেনা, আহা, শিরীষ কুসুম-
সম সুকোমল তব চরণরাজীবে!—
বিষ্ণু, যত নত হন, দ্বিজ তত উগ্র,—
কহিলা সগর্ব্বে নিজ বাহু আস্ফালিয়া
"না-না-শুদ্ধ পদাঘাত মাত্রে, এবে, আমি
ক্ষান্ত নাহি হ'ব জেনো ;—ছার পদাঘাতে
মর্ম্মজ্বালা—পদাঘাতে মহা-অপমানে—
প্রতিশোধ নাহি ;—দেখ তবে, দেখ হরি,
শাপানলে ভস্মকরি, এ তব সুজন।
সবিনয়ে ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া
কাতরে কহিলা হরি,—"প্রভো! পায়ে ধরি,
ক্ষান্ত হোন ; তব ক্রোধে, সুনিশ্চয়, সৃষ্টি
হবে ধ্বংশ। মতিমান! ক্ষমুন অজ্ঞানে—
লভুন বিশ্রাম!—লক্ষ্মী! শীঘ্র আন বারি,
শ্রমাতুর ব্রাহ্মণের শ্রীচরণ, সাধ্বি,
স্বকরে প্রক্ষালি নিজ অঞ্চলে মুছাও।"

আজ্ঞাপ্রাপ্তে লক্ষ্মীদেবী, পতির আদেশে,
আপনারে ভাগ্যবতী মানি, ব্রাহ্মণের
পদ ধৌত করিবারে যান সযতনে।
পশ্চাতে সরিয়া দ্বিজ, আর' রুক্ষস্বরে
কহিলেন,—"এবে নহে পদ প্রক্ষালন-
কাল ;—দেখ সদুপায়! নিকট প্রলয়!"—
নিরঞ্জন জিজ্ঞাসিলা অতীব বিনয়ে,
অজ্ঞমতি দাসে, দেব, কহ কৃপা করি'
কি কার্য্য করিতে হবে তুষিতে তোমারে?"—
প্রস্তর ফাটিয়া নীর বাহির হইল ;
সমুদ্রের জলোচ্ছাস, অথবা সহসা

পূর্ণিমা নিশিথে যথা উচ্ছসিতহয়,—
ব্রাহ্মণের অশ্রুজল, বক্ষস্থল তাঁর
প্লাবিত করিল তথা। কহিলা সখেদে;
"নারায়ণ! অন্তর্য্যামী হয়ে, কি কারণ
হেন বাক্যবাণে হায়! ছলিছ ব্রাহ্মণে?
জাননা কি জনার্দ্দন! দুর্ম্মতি দুর্জ্জন
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, লয়ে খরধার অসি
নির্ব্বংশ করিছে এবে ব্রাহ্মণের কুল?
যবে ঝটিকার কালে, বন সুশোভন
মহা মহীরুহগণে, ভূমিশায়ী করে,
অকারণে প্রভঞ্জন দেখাতে বিক্রম,
মেদিনীর সুশোভন দ্বিজসুতে সবে,—
সেইরূপ বিনাদোষে সবংশে বধেছে,
ক্রুরমতি কার্ত্তবীর্য্য নৃশংস পামর!
অণুমাত্র নাহি দয়া রাক্ষসের চিতে।
প্রধান যুবার কথা, কি কব অধিক,—
জননী জঠোর ছেদি, শিশুরে নিঃসারি
কেটেছে দ্বিখণ্ডে হায়! সে নরশার্দ্দুল!
নাহিকো ব্রাহ্মণ আর মেদিনীমণ্ডলে।
ভাসিছে সমগ্র ধরা ব্রাহ্মণ শোণিতে!
স্তূপাকার শৈলপ্রায় যত মৃতকায়!—
লক্ষ লক্ষ ছিন্ন শিরঃ লুঠে ভূমিতলে!
লক্ষ লক্ষ হস্ত পদ টানিছে শৃগালে!
গৃধিণী শকুনী কত ভক্ষে পালে পালে
ব্রাহ্মণের মেদমাংস ভীষণ আরাবে।
নারায়ণ! সদুপায় কর, ভৃগুকুল
ধ্বংস হায় পামরের করে সুনিশ্চয়।
জনকে বধেছে মোর, বধেছে জননী
বধিয়াছে ভ্রাতৃগণে, বধেছে ভগিনী,
ঐ দেখ বিশ্ব চক্ষু দেব বনমালী!
নিরাশ্রয়া ভার্য্যা মোর অতি অভাগিনী,
চারিটী তনয়ে রাখি তরুর কোটরে,
চিতানলে ঝাপ দেয় নৃশংসের ডরে।
দুর্জ্জন পালন দেব বিপত্তি ভঞ্জন!
দুর্জ্জন পীড়ন হতে রক্ষিতে সংসার,
বারে বারে অবতার হও, রক্ষঃ রক্ষঃ
বসুধারে; অব্রাহ্মণ হইল ধরণী!"—
উপেন্দ্র আশ্বাসি দ্বিজে, কহিলা গম্ভীরে,
"দ্বিজবর! নাহি শঙ্কা, ধৈর্য্য ধর চিতে,
ব্রহ্মার নন্দন ভৃগু!—তাঁর বংশধর
তেজস্বী তাপস তুমি। প্রতিজ্ঞা করিনু
চরণ পরশি তব,—যেই ভৃগুকুল,
ধ্বংস কার্ত্তবীর্য্য করে,—জনমি সে কুলে—
শান্তির পিশাচে-যত, ক্ষত্র পাপী সহ।
লভুন বিশ্রাম দেব, ঐ শয্যা পরে,
সেবিবে কমলা সতী, চরণ-কমল।
যাই ত্বরা আমি, রক্ষি অগ্রে চিতানলে,
পত্নীরে তোমার;—পরে, কহিব বিশেষ
কি উপায়ে তবে, হবে বসুধা নিঃক্ষত্র।"

প্রথম সর্গ।

বিশাল নৈমিষ বন, ভীষণ দর্শন!—
দীর্ঘে প্রস্থে আয়তন দ্বাদশ যোজন।
ফলে ফুলে সুশোভন তরু লতা, তাহে,
কত আছে অগণন; দীর্ঘ মহীরুহ
উঠেছে সদর্পে কত স্পর্শিতে গগন।

মাঝে মাঝে সে কাননে, ক্ষুদ্র নদীগণ
আসি কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হতে, সবে
এক যোগে ছুটিতেছে সাগর সন্ধানে,—
কুল কুল ধ্বনি তার শ্রবণরঞ্জন।
নানা জাতি নানা বর্ণ বিহগনিকর,
দলে দলে বসিয়াছে উচ্চ শাখীশাখে,
কেহ নিম্নগুল্মে, কেহ নদীর সৈকতে,
কেহ উড়ে, কেহ বসে, কেহ ব্যস্ত অতি
আহারসঞ্চয় হেতু শাবকের তরে,—
নগরের নর যথা ব্যস্ত নানা কাজে;
কেহ ঝোপে ঝাপে বসি' একমনে, গান
করে বিভু-গুণগান। প্রাণ মাতোয়ারা
সে সঙ্গীত শুনি' কার না জুড়ায় প্রাণ?
আহা, সে আনন্দপূর্ণ বিহগ-নগর
হেরি' কার না অন্তর নিরন্তর মত্ত
হয়, সেই প্রাণারাম পরমেশ প্রেমে?
হিংস্রক শ্বাপদ কত, দিবা দ্বিপ্রহরে
ভ্রমিছে নির্ভয়ে এই জনহীন দেশে?
নাহি হেথা মানবের চিহ্নমাত্র কিছু।
এ হেন ভীষণ স্থান নৈমিষ অরণ্যে
জমদগ্নি তপোধন,—শার্দ্দুল হইতে
হেয়, মানব-শার্দ্দুল কার্ত্তবীর্য্য ডরে,
গোপনে করেন বাস ধর্ম্মপত্নী সনে।
ফলে ফুলে সুশোভিত, উপবন সম
মনোরম স্থান এক সযত্নে অন্বেষি'
কুটীর রচিয়া কাল সভয়ে কাটান।
সঙ্গে মাত্র দম্পতীর চারিটী কুমার।
কনিষ্ঠ তনয় রাম, গেছে হিমালয়ে,
তপস্যা কারণ; তুষ্ট করি বামদেবে
ক্ষত্রকুলান্তক বর লভিবেক বলি।
সদা ঋষি চিন্তান্বিত তাহার কারণ।
কুটীরের কিছু দূরে, আছে বিরাজিত
প্রাচীন মন্দির এক প্রস্তর নির্ম্মিত।
ভীষণা চামুণ্ডা মূর্ত্তি স্থাপিতা তাহাতে।
কেহ নাহি জানে, কোন্ যুগে কার কৃত
এ মন্দির? ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বিনী বহে
অবিরাম, ধৌত করি মন্দির সোপান।
নাহি জানি কে করিত ভীষণার পূজা
এতকাল? যদবধি, ঋষি আসি' হেথা,
করেন নিবাস, নিত্য ভক্তিযুত মনে
রক্তজবা দানে, পূজে চামুণ্ডা-চরণ;
আশা মনে ব্রহ্মময়ী পুরাবে কামনা। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।

সাহিত্য।

অতীতের চিত্রখানি জাগে যবে নয়নের'পরে,
কি বিস্ময়, কি পুলক ফুটে উঠে সমগ্র-অন্তরে।
অনন্ত-দৈন্যের সীমা অতিক্রমি' ল'য়ে উন্মাদনা,
তুমি এই নবযুগে কি ঐশ্বর্য্য করেছ রচনা!
অর্চ্চনার পুণ্য-ক্ষেত্র তোমারই সাধনা-মন্দিরে,
বৈতালিক—সাম-গান উঠিয়াছে উচ্ছ্বসি' ক্ষিতিরে!
ক্ষীণ কণ্ঠ-ধ্বনিময় অস্ফুট কিবা মর্ম্ম-গীতি,
বিশ্বময় ঢালিয়াছে কি মহান্ পূর্ণতার প্রীতি!
সঙ্গীতের ছায়া তব বিশ্ব-প্রান্তে লুকি' লুকি' হাসি',
আজিকে পূরবী মন্দ্রে পৃথিবীরে দিয়াছে উদ্ভাসি'!
তোমারি মলিন-রুক্ষ অতীতের দীন অলঙ্কার,
আজিকার সুবর্ণ আলোকে কি লাবণ্য করেছে বিস্তার!
লজ্জা-নম্র কাতরোক্তি অকস্মাৎ, তব, লভি' প্রাণ,
ধ্বনি, ব্যোম করিছে ঘোষণা তব বিজয়ের গান!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

তন্ত্র কি?

(গত বর্ষের ২১১ পৃষ্ঠার পর)

আগমে পূজাতত্ত্ব।

ঊর্দ্ধাম্না বা তন্ত্রশাস্ত্রে পূজার ত্রিবিধ উপায় নির্দ্দেশ আছে। তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভেদে সাধকের অবস্থা বা অধিকার অনুসারে ক্রমোন্নত ভাবে পূজার ব্যবস্থা আছে। জীব যেমন স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ করিবে, তাহাদের অনুকূল পূজা বা সাধনার ব্যবস্থাও ঠিক সেইরূপ ভাবেই স্তরে স্তরে গঠিত রহিয়াছে। সাধনাকাঙ্ক্ষী যে কেহ যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইলে পূজা করিবার অধিকারী হন। সাধারণ মানব বৎসরান্তে বাহ্য শৌচাদি সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে নৈমিত্তিক মহাপূজাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু উচ্চ-সোপানে অধিষ্ঠিত সাধক মাত্রেই নিত্য সেই অনির্ব্বচনীয়া মহাশক্তিময়ীর পূজা করিয়া থাকেন। তখন পুষ্প-চন্দনাদি অনুষ্ঠানেরও আবশ্যক হয় না—মানসপূজাই তখন তাঁহাদের প্রশস্ত ব্যবস্থা।

পূজাত্রয়।

নিম্নস্তর-নির্দ্দিষ্ট যে সকল পূজা তাহাই তামসিক পূজা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। রাজসিক পূজা ইহার পরবর্ত্তী মধ্যস্তর-নির্দ্দিষ্ট, মধ্যম পূজা এবং সাত্ত্বিক পূজা উচ্চস্তর-নির্দ্দিষ্ট উত্তম পূজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে একটী অপূর্ব্ব কথা বলিবার আছে অর্থাৎ এই উত্তম এবং অধম ইহাদের প্রান্ত গুণদ্বয়ের সমন্বয় বা সংযোগ-সাধনাই সাধকের উচ্চতম অবস্থা। সাত্ত্বিক ও তামসিক সাধারণের চক্ষে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ বোধ হইলেও সাধকের নিকট তাহা একই প্রকার বলিয়া উপলব্ধ হয়। যেমন বালক ও বৃদ্ধ, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল, সময়ের বিভিন্ন অবস্থা বা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপক হইলেও দেখিতে অনেকাংশ প্রায় এক রূপ, উভয়ের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে। সেইরূপ সাত্ত্বিক ও তামসিক, সাধনার সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী অবস্থা হইলেও বৃত্তাকার ভাবে দেখিলে এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের ঠিক সম্মুখিন হইয়া থাকে। বাহ্যিক চক্ষে দেখিতে একপ্রকার হইলেও গুণে বিষম পার্থক্য আছে, অথবা সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ বিশিষ্ট হইলেই, যে কোন শক্তিদ্বয়ের সহসা সংযোগ বা মিলনদ্বারা কোন এক অভিনব ক্রিয়ার উন্মেষ হইয়া থাকে। গুরু-শিষ্য, বক্তা-শ্রোতা, ঘাত-প্রতিঘাত, খাদ্য-খাদক, শত্রু-মিত্র, তাড়িত শক্তিতে নেগেটিভ্-পজেটিভ্, যোগ সাধনায় নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি পরস্পর বিপরীত শক্তির মিলন না হইলে যেমন তাহাদের ক্রিয়া হয় না, সেইরূপ সাত্ত্বিক ও তামসিক অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে সাধনমার্গের ক্রিয়া আরম্ভই হয় না। এই হেতু মহাশক্তির রূপ-কল্পনায় সাধক সিদ্ধকাম! তিনি কেবলই দয়াময়, মায়াময়, কৃপাময়, প্রেমময়, স্নেহ বা করুণাময়, একথা বলিলে তাঁহার রূপ-কল্পনায় যেন সঙ্কোচ বা খণ্ডিত ভাব আসিয়া পড়ে। এক দিকে যেমন দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, প্রেম ও আনন্দের মনোহারিণী পূর্ণ প্রতিকৃতি চিত্র, অন্য দিকে তেমনই ভীম, উগ্র, প্রচণ্ড ও কঠোর, শাসন এবং শিক্ষার অত্যুজ্জ্বল জলন্ত আদর্শ। একাধারে অপূর্ব্ব সম্মিলন। মুখে করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতি, কিন্তু চক্ষে তাড়ণার তীব্র স্ফুলিঙ্গ—অথচ মা আমার সাক্ষাৎ

আনন্দময়ী। তাই সাধনাপথেও কেবল সাত্ত্বিকাচারী হইলেও মুক্তি নাই—সাত্ত্বিকের পরপারে তামসিকের অন্তরমধ্যে কি শক্তি আছে তাহাও সাধকের সাধনার বিষয়! পবিত্র চন্দনসংপৃক্ত-তুলসীপত্রে, মনোরম সৌরভ বিশিষ্ট পুষ্পস্তবকে তাঁহার যে ভাব যে প্রীতি, নরকসদৃশ পুতিগন্ধময় বিষ্ঠাজাত ক্রিমি সকলের সহিতও তাঁহার সেই ভাব সেই প্রীতি। উচ্চ সাধনায় এই রূপ অপূর্ব্ব মিলন সিদ্ধিই সাধকের প্রধানতম লক্ষ্য। সেই কারণ 'আচারতত্ত্বে' দক্ষিণাচারের পর হইতেই বামাচারের বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাধকের হৃদয়-সুলভ বিভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি বা তাহার একীকরণ সম্পাদনই পূজাতত্ত্বের সর্ব্বপ্রধান রহস্য।

এক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত পূজাত্রয়ের মূলীভূত উদ্দেশ্য ও প্রণালী কি? মনের একাগ্রতা আনয়ন করাই এইরূপ পূজা বা সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যতক্ষণ চিত্তবৃত্তি সকল বর্ত্তমান থাকিবে ততক্ষণ কিছুতেই কিছু হইবে না ইহা অবধারিত সত্য। পূজা সাধনায় চিত্তের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিতে হইবে।

বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মি সমূহ সাধারণতঃ যে পরিমাণ উত্তাপপ্রদায়ক, কোন দ্বিমুজাকার বা আতসী কাচের সাহায্যে সেই বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিলে তাহাপেক্ষা যথেষ্ট উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এমন কি অনতিবিলম্বে অগ্ন্যুৎপন্ন হয় এবং সেই অগ্নি-দ্বারা অনায়াসে বহুবিধ দ্রব্য দগ্ধ করাও তখন অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। সাধুমুখে কথিত আছে—"ভগবান পতঞ্জলি সূর্য্যকিরণ ও মুজাকর স্ফটিক-খণ্ডের এবম্বিধ ধর্ম্ম দেখিয়াই যোগসূত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।" সূর্য্যরশ্মির অন্তর্নিহিত ঐ দাহিকাশক্তি সতত বর্ত্তমান থাকিলেও বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকিবার কারণ যে কোন দ্রব্য কেবলমাত্র সামান্য, উষ্ণ হয় এতদ্ব্যতীত কোন দ্রব্যই যেমন কখনও দগ্ধ হয় না। আমাদিগের মানসিক বৃত্তিগুলিও কামাদি বহুবিধ বিষয়ের সহিত বিক্ষিপ্তভাবে থাকিবার কারণ মনচ্ছক্তিরও সেইরূপ সম্যক বিকাশ হইতে পারে না। বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মির একত্রীভূত বা কেন্দ্রীভূত করণোপযোগী মুজাকার আতসী কাচের ন্যায় মনচ্ছক্তির উক্ত বিক্ষিপ্তভাব নিরোধ বা একীভূত করিবার পক্ষে যোগসাধনাই একমাত্র অবলম্বনীয়। তাই মহামতি পতঞ্জল "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধম্" এই মহাবাক্য প্রথমেই মূল সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিলেন। অনন্তর ক্রমে 'চিত্ত কি', 'তন্নিরোধ করিবার উপায় কি', সেই সকল বিষয় আলোচনা ও আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। আবিষ্কার-সিদ্ধ সেই সকল অনুষ্ঠানই ঋষিগণ কর্ত্তৃক আমাদের পূজা ও অর্চ্চনার মধ্যে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে অতি সুন্দরভাবে কেমন সন্নিবেশিত হইয়াছে, পূজাতত্ত্বে সেই সকল কথাই বলিব।

যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে :—

অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণো হি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে॥

ক-কারাদি বর্ণমালা অভ্যাস দ্বারা যেরূপ সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যায়, সেইরূপ ঐ পূজা বা যোগা-ভ্যাস দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়।

প্রকৃত পূজার সিদ্ধাবস্থাই যোগ। যোগ আর কিছুই নয়—একের সহিত অন্যের মিলনই যোগ। তাই 'দেবী-ভাগবতে' দেবী হিমালয়কে বলিতেছেন :—

ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে নভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ॥

স্বর্গে, পৃথিবীতে বা রসাতলের কোন স্থানেই যোগ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, যোগবিশারদ যোগীগণের জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন সাধনাই যোগ বলিয়া জানিবে। হটযোগ-প্রদীপিকা ঘেরণ্ড-সংহিতা, যোগবীজ ও বিষ্ণুপুরাণ আদি সমস্ত যোগশাস্ত্রেই এই কথা একবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, লয়যোগ, ধ্যানযোগ, ব্রহ্মযোগ, বিবেকযোগ, বিভূতিযোগ, প্রকৃতিপুরুষযোগ, মন্ত্রযোগ, মোক্ষযোগ, ক্রিয়াযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি অসংখ্য যোগের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এই সকলের প্রত্যেকটীই ঐ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। বাস্তবিক যোগ বহুবিধ নহে—যোগের মূলীভূত উদ্দেশ্যগুলি সমস্তই এক। যোগসাধনার জন্য ক্রমে ক্রমে যে সমুদায় প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, স্থান বিশেষে তাহারই উপদেশ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ামাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে সাধনোদ্দেশ্যে যোগের যে ত্রিবিধ প্রধান উপায় সাধক সাধারণে প্রচলিত আছে, সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। গুণ নির্ব্বিশেষে পূজার্চ্চনায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে যেমন ত্রিবিধ পূজার ব্যবস্থা আছে, যোগসাধনায় ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান নির্ব্বিশেষে সেইরূপ ত্রিবিধ যোগের বিধি নিয়মিত আছে।

যোগাস্ত্রয়ো ময়াপ্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
ভাগবত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসচ্চীদানন্দ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শুনিতেছি, আগামী জানুয়ারী মাসে (১৯০৯) লর্ড ল্যান্সডাউনের বংশধরের সহিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর কন্যা লেডী ভায়লেটের বিবাহোপলক্ষে যে সভা হইবে, তাহার সম্পাদন ভার পড়িবে নানা দিগদেশাগত শিল্পিগণের হস্তে, এদেশীয় শিল্পীর ইহাতে হাত থাকিবে কি না—তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে বিবাহটা যখন এ দেশেই সম্পন্ন হইতেছে, তখন আমরা অনুরোধ করিতে পারি, যে, সেই বিবাহ-সভায় দেশীয় শিল্পিগণকেও যেন ভারতীয় শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করিবার অবসর দেওয়া হয়। কন্যাকর্ত্তা ইহা কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলে আমরা সুখী হইব।

জাপান প্রত্যাগত—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে কলিকাতা, ১৩০ নং বাগমারী রোডে একটী বোতামের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তথায় হাড়, সিং, ঝিনুক ও অন্যান্য ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য সম্ভার নির্ম্মিত হইয়া যে, দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে, সে বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ ইতিমধ্যেই Bengal Button Factory কৃতিত্ব দেখাইয়া দেশের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রায় চল্লিশ জন শ্রমজীবী উক্ত ফ্যাক্টরি হইতে আপাততঃ প্রতিপালিত হইতেছে। আশা করি শত সহস্র দরিদ্র শ্রমজীবীর গ্রাসাচ্ছাদনের ভার Bengal Button Factory অচিরেই বহন করিতে সমর্থ হইবে। ফ্যাক্টরির কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ উৎসাহে ত্যাগস্বীকার করিয়া ফ্যাক্টরীর উন্নতিসাধন কল্পে মনোযোগ দিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে যে দেশের একটী বিশেষ অভাব মোচন হইবে, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

সাহিত্য-সম্মিলন।

[বিশেষ অধিবেশন]

৮ই আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।

গত ৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ খৃঃ) 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল' ভবনে 'সাহিত্য-সম্মিলনের' একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ—

১। রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর (সভাপতি)
২। পণ্ডিত হৃষিকেশ শাস্ত্রী।
৩। ,, প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
৪। ,, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
৫। ,, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
৬। ,, ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ।
৭। ,, নৃত্যবোধ বিদ্যাভূষণ।
৮। শ্রীযুক্ত বঙ্কেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। ,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
১০। ,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১১। ,, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।
১২। ,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।
১৩। ,, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৪। ,, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।
১৫। ,, বিহারিলাল সরকার।
১৬। ,, ডাক্তার গফুর।
১৭। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
১৮। ,, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
১৯। ,, হরিনাথ ভট্টাচার্য্য।
২০। ,, মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। ,, দুর্গাপদ মিত্র।
২২। ,, শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।
২৩। ,, যতীন্দ্রনাথ রায়।
২৪। ,, ভবানীচরণ ঘোষ।
২৫। ,, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
২৬। ,, বাণীনাথ নন্দী।
২৭। ,, সুরেন্দ্রনাথ বাকৃচি।
২৮। ,, বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৯। ,, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩০। কবিরাজ কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ।

সভাপতি মহাশয়ের আসন গ্রহণের পর 'সাহিত্য-সম্মিলনের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানাইলেন,—এই এক মাসের মধ্যে আমরা সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহানুভূতি দেখিতেছি। এই মাসে প্রায় তিন শত নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মিলনের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং নিত্য নিত্য মফঃস্বল হইতেও বহু সাহিত্যসেবী সম্মিলনে যোগদান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় শ্রীযুক্ত জয়কুমার বর্দ্ধন রায় প্রভৃতির নাম এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।*

এতদ্ব্যতীত দর্শক-রূপেও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

* সকলের নামই শীঘ্রই "রিপোর্টে" প্রকাশ হইবে।

সম্পাদক মহাশয়ের আসন গ্রহণের পর, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় 'সাহিত্য সম্মিলনের' একটী সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণী ও নিয়মাবলী পাঠ করেন। এ পর্য্যন্ত 'সাহিত্য-সম্মিলন' কি কি কার্য্য করিয়াছেন, এবং কি কি কার্য্য 'সাহিত্য-সম্মিলনের' অনুষ্ঠেয়, কার্য্য-বিবরণীতে * তাহাই বিবৃত ছিল; অধিকন্তু যিনি যিনি যে যে প্রকারে 'সাহিত্য-সম্মিলনের' শুভ উদ্দেশ্য-সাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাও ঐ বিবরণী-মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছিল। ফলতঃ সাহিত্য-সেবিগণের সাহিত্য-সেবাব্রতে সহায়তাপক্ষে —তাঁহাদের সাহায্যের জন্য ধনভাণ্ডার স্থাপনে—সদস্য-গণকে উদ্বোধিত করাও ঐ কার্য্য-বিবরণীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কার্য্য-বিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরি-গৃহীত হইলে, নিয়মাবলীর বিষয় আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বি, এ, মহাশয় বলেন,—"নিয়মাবলী একবার ধীরে সুস্থে আলোচনা করা আবশ্যক।" তদনুসারে তিনি প্রস্তাব করেন,—"নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি আলোচনার জন্য একটী শাখা-সমিতি গঠিত হউক। সেই শাখা-সমিতির সদস্যগণের প্রত্যেকের নিকট নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া, পরে তাঁহাদের মতামত অনুসারে নিয়মাবলী পরিগ্রহণের ব্যবস্থা হউক।" অতঃপর সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে, নিম্নলিখিত সদস্যগণে একটী শাখা-সমিতি গঠিত হয়ঃ—

১। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বি-এ।
২। ,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
৩। ,, বরদা প্রসাদ বসু।
৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
৫। ,, ,, প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
৬। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার।
৭। ,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৮। ,, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।
৯। ,, কিশোরীমোহন রায়।
১০। ,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।
১১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর।

ইহার পর সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলেন,—'সাহিত্য-সম্মিলনের' শুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণ অনেকেই সময় সময় বিশেষরূপ কষ্ট পাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে—মহারাণী স্বর্ণময়ী জীবিত থাকিতেও—বাঙ্গালার গ্রন্থ-কারগণের একটা আশা-ভরসা ছিল। যে গ্রন্থকারই তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহাকেই কিছু না কিছু সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু এখন আর তেমন কেহই নাই। সুতরাং 'সাহিত্য-সম্মিলন' হইতে দুস্থ সাহিত্য-সেবীদের সাহায্যের জন্য ভাণ্ডার স্থাপন বড়ই প্রয়োজন হই-য়াছে। সকলেরই এ পক্ষে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কোনক্রমেই বিলম্ব করা উচিত নহে।" শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই বিশেষ উৎসাহ-ব্যঞ্জক কথায় সম্মিলনের কার্য্য সৌকর্য্যের জন্য সকলকেই উৎসাহিত করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

* সেই কার্য্যবিবরণী শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে; সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

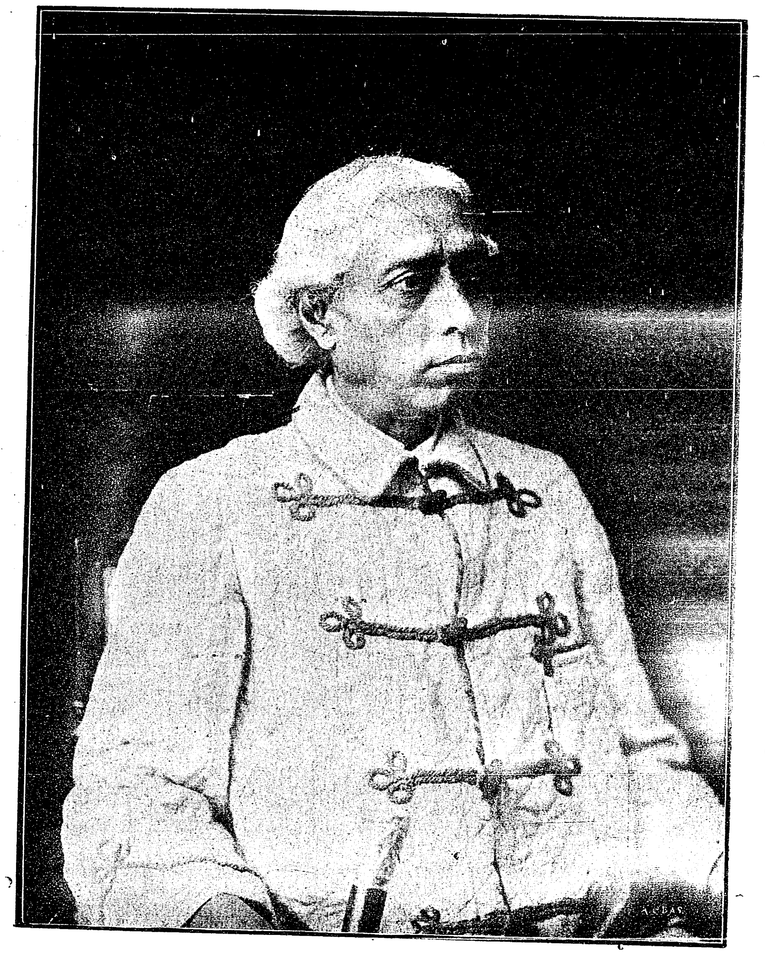

নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

The Indian Art School, Bowbazar, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড। | সন ১৩১৫—কার্ত্তিক। | ২য় সংখ্যা।

তন্ত্র কি ?

(২২ পৃষ্ঠার পর)।

ভগবান কহিতেছেন :—আমি মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের কথা বলিতেছি, সাধকগণের মধ্যে যাঁহার যেমন অধিকার প্রথমে তিনি সেইরূপই পূজার বা যোগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর সাধক বলেন, 'ভক্তিযোগই যোগত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' বাস্তবিক ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই বলিলেই হয়, কিন্তু তাহা হইলে কি অন্য দ্বিবিধ যোগ কেবল কর্ম্মভোগ মাত্র! এইরূপ ক্রিয়াযোগী ও জ্ঞানযোগীও স্ব স্ব অবলম্বিত যোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। এ প্রশ্নের উত্তরে উচ্চ-সাধকমণ্ডলী বলিয়া থাকেন, ভক্তিই সাধনার প্রধান ও প্রথম অবলম্বন বটে, কিন্তু অন্য সাধনদ্বয়ও তাহা হইতে বিভিন্ন নহে। ভক্তির মূলে অন্য আর একটী অমূল্য সামগ্রী আছে, তাহার নাম বিশ্বাস। সর্ব্ব প্রথম সেই সন্দেহ-বিমুক্ত বিশ্বাসই ভক্তির আধার স্বরূপ হয়। সেই বিশ্বাস দ্বারা পুষ্ট হইলে সাধক তর্কশূন্য ভক্তি লাভ করিতে পারে। তৎপরে কোন বস্তুতে বা তাহার শক্তি বিশেষে ভক্তিমান হইলে ক্রমে তাহার ক্রিয়া করিবার অভিলাষ আইসে, অনন্তর ক্রিয়াবান সাধক সাধনার উচ্চ অবস্থায় জ্ঞানের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাই যথাক্রমে ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান যোগ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সাধকের অধিকার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোগের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যখন পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন যোগাবলম্বন করিয়া সাধক সাধন-কার্য্যে নিয়োজিত থাকেন, তখন তিনি ভক্তিযোগীই

হউন বা ক্রিয়াযোগী হউন অথবা জ্ঞানযোগীই হউন, সেই সাধক নিম্নস্তরের সাধক বলিয়া বিবেচিত হন। যাঁহাদের ভগবদ্‌তত্ত্বানুসন্ধানজন্য ষড়দর্শনের গভীরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি নাই এবং শারীরিক ক্রিয়া-বলীর অনুষ্ঠান করিবারও সেরূপ সামর্থ্য নাই, কিন্তু চিত্ত-সংযম করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে, তাঁহারাই ভক্তিযোগের পক্ষপাতি। আবার যাঁহাদের চিত্ত-সংযমের শক্তি অল্প এবং দার্শনিক তত্ত্বাবলিরও মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা সহজসাধ্য নহে অথচ দৈহিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে অত্যন্ত সুপারগ্, তাঁহারাই ক্রিয়া যোগের বিশেষ পক্ষপাতি। সেইরূপ যে সকল সাধক শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সংযম করিতে সে প্রকার সুপটু নহেন কিন্তু ষড়দর্শনের অতি গভীর তত্ত্ব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সুনিপুন তাঁহারাই জ্ঞানযোগের পক্ষপাতি। এইরূপ ত্রিবিধ যোগীই যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু নিম্নস্তরের। পূর্ব্বোক্ত সাধনার আচার অবলম্বনের ন্যায় যোগাব-লম্বনও যেন সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট হইয়াছে। বিরাট সনাতন সাধনতত্ত্বে তাহাই একাঙ্গিভূত বলিয়া বর্ণিত ও উপদিষ্ট আছে। অর্থাৎ সাধনার ক্রম-বিধানে ভক্তি ক্রিয়া ও জ্ঞান এই যোগত্রয়ের একত্র সমাহারেই পূর্ণ যোগী বলিয়া উক্ত আছে। সুতরাং পূজার্চ্চনার সহিত চিত্তাদি সংযম আত্মোন্নতি ও ভগবৎ জ্ঞানলাভের জন্য ঐ ত্রিবিধ যোগই অবলম্বন করা সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক ভেদে জ্ঞান লাভের দ্বিবিধ উপায়ে পূজা করিবার বিধি শাস্ত্রে লিখিত আছে। বাসনা ও সংকল্প পূর্ব্বক গৃহীগণ যে সমুদায় পূজা করিয়া থাকেন তাহার নাম প্রবর্ত্তক, তাহা দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় ও পুনর্জ্জন্ম সহ ফললাভ হইয়া থাকে। এবং বাসনা ও সংকল্প বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র আমায় করিতে হইবে—ইহাই আমার কর্ত্তব্য— এইরূপ 'জ্ঞানে যাহা কিছু করা যায়—যাহার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না— নিস্কাম বা এক মাত্র ভগবদ্ কামনা ব্যতীত সাংসা-রিক অন্য সকল বা কোনও কামনা পরিশূন্য হইয়া যোগীগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাই নিবর্ত্তক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইহাদ্বারা জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। এই কারণ ভবভিরু ব্যক্তিগণ নিস্কাম বা নিবর্ত্তক পূজার আয়োজন করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভক্তি, ক্রিয়া এবং জ্ঞান-যোগ সমন্বিত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজার দুইটী প্রধান বিভাগ রহিয়াছে সাধক অভিলাষানু-সারে সেই প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

যাহাই হউক সকল প্রকার পূজাতেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই প্রধানতম লক্ষ্য। পূজাকালে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যে সকল নিয়ম আছে সে সমস্তই চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে সম্পূর্ণ অনুকূল। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই আটটী পূজা বা যোগের অঙ্গ স্বরূপ। এই কারণ অষ্টাঙ্গযোগ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈবচ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ॥
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে ॥

যোগি যাজ্ঞবল্ক।

ইহা ব্যতীত গোরক্ষ সংহিতা দত্তাত্রেয় সংহিতা ও

আদি নানাবিধ যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিধ, ষড়বিধ, অষ্টবিধ দশবিধ যোগাঙ্গ বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু সেগুলি মোটের উপর ঐ অষ্টাঙ্গ যোগেরই অন্তর্গত। যাহা হউক এইগুলি যথাবিধি অবলম্বন করিতে পারিলেই চিত্ত আপনাপনি সংযত হইয়া থাকে।

যোগের প্রথমাঙ্গ 'যম'।

অষ্টাঙ্গ যোগের ন্যায় যমের ও দশটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। তাহা এই—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচঞ্চেতে যমাদশ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য দয়া, আর্জ্জব ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ এই দশটিই যম্ বলিয়া কীর্ত্তিত। (১) অহিংসা—কোন জীবকে কেবল মাত্র বধ করাকেই হিংসা বলে না, পরন্তু কায়দ্বারা হউক, মনদ্বারা হউক অথবা বাক্যদ্বারা হউক কোন জীবকে কোন প্রকারে ক্লেশ না দেওয়াকেই অহিংসা বলা যায়। আবার শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইলে কোন জীবের ক্লেশদায়ক কর্ম্ম বা হিংসাকেও অহিংসা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। (২) সত্য সাধারণের হিতকর উক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবে। (৩) কায়-মনোবাক্যে অন্যের দ্রব্যে স্পৃহাশূন্য হওয়াকে শাস্ত্রে অস্তেয় বলে। (৪) দেহপাত ও স্মৃতিধ্বংশকর মৈথুন ত্যাগকে যোগীগণ ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু যথা বিধানে কেবল ঋতুরক্ষার্থ নিজ ভার্য্যা-গমনকেও গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া শাস্ত্রের বিধি আছে। গুরু-জনের সেবাও ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত। (৫) সর্ব্বজীবের প্রতি সমুচিত অনুগ্রহাকাঙ্খাকে দয়া বলা যায়। (৬) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমতার ভাবকে আর্জ্জব বলে। (৭) প্রিয় অপ্রিয় সকল বিষয়ে তুল্য ভাবকে ক্ষমা বলিয়া থাকে। (৮) শোক তাপ কষ্ট হইলে মনের ধৈর্য্য অবলম্বন করাই ধৃতি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। (৯) মিতাহার—অধিক নহে অথবা অল্পও নহে এরূপ পরিমিত আহা-রকে মিতাহার বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ঋষিগণ অষ্ট গ্রাস, বনবাসী ষোড়শ গ্রাস, গৃহীরা দ্বাত্রিংশৎ গ্রাশ এবং ব্রহ্মচারীরা ইচ্ছানুরূপ যাহা ভোজন করেন তাহাকেই মিতাহার বলে। (১০) শৌচ—ইহা দুই প্রকার, বাহ্য শৌচ ও অন্তর শৌচ, স্নানাদি দ্বারা দেহ পরিষ্কৃত হইলে বাহ্য শৌচ এবং ভগবদ্ চিন্তাদি দ্বারা মন শুদ্ধিকে অন্তর শৌচ বলে। পূজা করিবার পূর্ব্বে সাধক এই সকল চিত্তস্থিরতা সম্পাদক বিষয়ে সততঃ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবে।

যোগের দ্বিতীয়াঙ্গ ('নিয়ম')।

ইহার পর নিয়মের কথা বলা হইয়াছে। যমের ন্যায় নিয়মও দশবিধ।

তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনং।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপোহুতং।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্র বিশারদৈঃ ॥

তন্ত্রসার।

অর্থাৎ তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ এবং হোম বা যজ্ঞ এই সমস্তকে নিয়ম কহে। (১) চান্দ্রায়নাদি ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা দেহ শোষণের নাম তপঃ। (২) যদৃচ্ছা লাভের দ্বারা লোকের মন অবিচলিত থাকিলে সন্তোষ বলা যায়। (৩) ধর্ম্মাধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসকে আস্তিক্য বলা যায়। (৪) ন্যায়ার্জ্জিত ধন যাহা শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তরে স্বেচ্ছায়

প্রার্থীকে প্রদান করা হয় তাহাই দান বলিয়া কথিত আছে। (৫) প্রসন্ন চিত্তে বিষয়াশক্তি রহিত হইয়া মিথ্যা ভাষণাদি বর্জ্জিত হইয়া এবং হিংসাদি কার্য্য-বিরত হইয়া হরি-হরাদির পূজাকে ঈশ্বর-পূজা বলা যায়। (৬) বেদ, বেদান্ত, দর্শন, তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র শ্রবণকে সিদ্ধান্ত-শ্রবণ বলিয়া থাকে। (৭) সনাতন শাস্ত্রোক্ত যে সকল গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠানে লজ্জার উদয় হয়, তাহাই হ্রী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। (৮) বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের নাম মতি। (৯) বিধিপূর্ব্বক গুরু প্রদত্ত মন্ত্রাদি অভ্যাসের নাম জপ্। (১০) গুরূপদিষ্ট ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষলাভের অনুষ্ঠানে আহুতি প্রদানকে হোম কহে। এগুলিও মনের স্থিরতা ও একাগ্রতা সাধনে বিশেষ অনুকূল। প্রথমতঃ সাধক এই ভাবে কতকটা স্থির ও দৃঢ়-চিত্ত হইলে বা তৎসঙ্গে সঙ্গেই আসনের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

যোগের তৃতীয়াঙ্গ 'আসন'।

শাস্ত্রে উক্ত আছে, নিরাসন পূজা করিতে নাই—করিলে পূজা নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা হয় না। সুতরাং পূজাকালে আসনের সহিত চিত্তের সর্ব্ব প্রধান সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রকারগণ বিজ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতদ্বারা যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহারই কতক কতক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-গণ প্রমাণ করিয়া জগতের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিতেছেন। অনেকের ধারণা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতিতে সনাতন ধর্ম্ম নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে জীব নাস্তিক হইয়া উঠিবে কিন্তু বাস্তবিক তাহা মনে হয় না। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞানের যে সমুন্নত শিখরে সংস্থাপিত, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা পুনরায় নবজ্যোতিতে উদ্ভাষিত হইয়া জগতে পুনরায় সত্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সনাতনত্ব প্রমাণিত হইবে। যে বিজ্ঞানের চরমোন্নতি করিয়া আর্য্যগণ তাহা ভগবদ্ সাধনার অন্তর্লক্ষে নিয়োজিত করিয়া ছিলেন, পাশ্চাত্যগণ তাহারই কতক অংশ পরীক্ষায় সিদ্ধ হইয়া বহির্জগতের শোভা সম্পাদনার্থে সংযোজিত করিয়াছে। দেবাদিদেব শিব বলিয়াছেন সময়ে বিজ্ঞান সাহায্যেই অন্তর্লক্ষে চিত্তনিয়োজিত হইয়া থাকে।

চিত্তের সহিত যে, আসনের অতি নিকট সম্বন্ধ তাহা বিজ্ঞান সাহায্যেই সহজে উপলব্ধ হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই পূজাকালে কুশাসন বা তদনুরূপ কোন আসন বসিবার আধার রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাটি, মাদুর, মসলন্দ, সতরঞ্জি, সূক্ষ্মবস্ত্র, মৃত্তিকা, পাষাণ, কাষ্ঠ, তৃণ ও পত্রাদিরচিত বহুবিধ আসন সত্ত্বেও কুশাসন প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র আধারে পূজাসনের ব্যবস্থা কেন? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যোগাবিষ্কারক ভগবান পতঞ্জলী যখন দেখিলেন চিত্তের নিবৃত্তিই যোগ সাধনার প্রধান অবলম্বন, তখন কোন্ কোন্ উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে সে সকলের বিশেষভাবে তত্ত্বানুসন্ধান অথবা মহাযোগী শঙ্করের উপদেশানুসারে তাহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যম ও নিয়মাদি দ্বারা মনের স্থিরতা কিয়ৎপরিমাণে সংগঠিত হইলেও পূজাসনে বসিয়াই সাধকের ধ্যেয় বস্তুতে সহসা চিত্ত নিয়োজিত হয় না। মন তথাপি চঞ্চল, চিত্তবিক্ষেপক নানাবিধ চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্য স্থিরতা সম্বন্ধে বাধা উৎপাদন

করে। হেতু অনুসন্ধানে আধাররূপী আসনই প্রকৃত প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল। তখনই আসনের সংস্কারার্থে তিনি যত্নবান হইলেন। অনন্তর তদ্বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া পঞ্চবিধ সিদ্ধাসনের বিধি নির্দ্দেশ করিলেন। তাহা এই :—১ম, কাশ-কুশোত্তর; ২য়, কম্বলাজিন-কুশোত্তর; ৩য়, রাঙ্কবাজীন-কুশোত্তর; ৪র্থ, কৃষ্ণাজিন-কুশোত্তর; ৫ম, ব্যাঘ্রাজিন-কুশোত্তর। এই পাঁচ প্রকার আসনই সিদ্ধাসন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে মানসিক বৃত্তিগুলির স্থিরতা সম্বন্ধে বস্ত্রাদি নির্ম্মিত বা সাধারণ যে কোন আসন কোন প্রকারেই অনুকূল নহে। তাড়িতাধার পৃথিতত্ত্বের সহিত আমাদিগের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা দেহপিণ্ডস্থ তাড়িচ্ছক্তির বা ঐরূপ কোন অব্যক্ত শক্তির সততঃ আদান প্রদান চলিতেছে। সে শক্তি যাহাই হউক বর্ত্তমান ভাষায় তাড়িৎ বলিয়াই উল্লেখ করিলাম। যতক্ষণ সেই শক্তি পরস্পরের সহিত পরিচালিত থাকে ততক্ষণ পার্থিব ভাবসমূহ হৃদয় হইতে উন্মোচিত করা কিছুতেই সাধ্যায়ত্ব নহে। আর্য্য-ঋষিগণ গভীর গবেষণা ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই কারণ সেই শক্তির গতি নিরোধক পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন আসন গুলির ব্যবস্থা দিয়াছেন। পক্ষান্তরে সর্ব্ব স্থানের তাড়িৎ রাশি কিছু বিশুদ্ধ নহে—সেই বিমিশ্র তাড়িতের শোধনার্থেও পূর্ব্বোক্ত আসনগুলি সম্পূর্ণ উপযোগী। এই সকল এবং গুপ্ত আরও কয়েকটি কারণে ঐগুলি সিদ্ধাসন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। সকল স্থানের তাড়িৎ যে বিশুদ্ধ নহে তাহা সাধকগণ স্থান মাহাত্ম্য বলিয়া সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে স্থানে সদাসর্ব্বদা মহাত্মগণের গতিবিধি থাকে অথবা কোন সাধকের আশ্রম ছিল বা আছে সেই সকল স্থানের তাড়িত যে স্বাভাবিক ভাবে বিশুদ্ধ তাহা সাধকগণ উপলব্ধি করেন। এই কারণ তীর্থ-স্থানাদি সাধকের পক্ষে নিতান্ত আকাঙ্খার বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে বহুতর কলুষিত ব্যক্তির গমনা-গমন সহযোগে তীর্থের পবিত্রতা যে ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হইতেছে তাহা তাঁহারাও স্বীকার করেন। তথাপি কঠোর সাধকদিগের সাধনা বলে অনেক স্থানে এখনও সে শক্তির উগ্রতা বেশ উপলব্ধি হয়। অনেক কলুষিতাত্মা অধম ব্যক্তিও তথায় যাইয়া সাময়িক ভাবে পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। শিবোক্ত উর্দ্ধাম্নায়শাস্ত্রে এই সকল কারণে স্থান ও আসন বিধির উল্লেখ রহিয়াছে। অপবিত্র স্থানে অর্থাৎ বিমিশ্র তাড়িত-প্রবাহিত স্থানে সাধনা ফলবতী হয় না, ইহা সতঃসিদ্ধ কথা। এই হেতু তীর্থাদি পুণ্যক্ষেত্রে, নদীতীরে, পর্ব্বত শিখরে, দেবালয়ে, নির্জ্জন উদ্যানে, গুরু সন্নিধানে, নিজগৃহে, গোশালায়, তুলসি, বিল্ব, অশ্বত্থ, বট, আমলকী, অথবা পঞ্চবটীমূলে এবং শ্মশানেই সাধনার প্রশস্ত স্থান বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে। এই রূপ কোন স্থানে পূর্ব্বোক্ত আসন স্থাপনপূর্ব্বক পূজা বা সাধনার বিধি প্রশস্ত। এই আসনগুলির উপাদান সমষ্টির এমন সুন্দর সমাবেশ আছে যে, তাহা দেখিলেই শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রথমে কুশাসন পাতিয়া তাহার উপর বস্ত্র তৎপরে কাশ রচিত আসন পাতিয়া পূজাসন প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকেই কাশ কুশোত্তর আসন বলে। এইরূপে প্রথমে কুশাসন

পাতিয়া তাহার উপর কার্পাস বস্ত্র, অনন্তর মেষ-লোমজাত কম্বল বা রঙ্কু-লোমজাত বস্ত্র অথবা কৃষ্ণশারের চর্ম্ম কিম্বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাই যথাক্রমে কম্বলাজিন-কুশোত্তর, রাঙ্কবাজিন-কুশোত্তর, কৃষ্ণাজিন-কুশোত্তর ও ব্যাঘ্রাজিন-কুশোত্তর আসন বলিয়া শাস্ত্রে বিখ্যাত। এই সকল আসন দৈর্ঘ্যে দুই হস্তের অধিক হইবে না প্রস্থে ১॥ দেড় হস্তের অনধিক হইবে না এবং ঐরূপ তিন অঙ্গুলি হইতে অধিক বা দুই অঙ্গুলি অপেক্ষা অল্প স্থূল হইবে না। ঊর্দ্ধাম্নাদি যোগশাস্ত্রে আসন প্রস্তুতের এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা-দ্বারাও জ্ঞানী ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আসনের এইরূপ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ও উপর্য্যু-পরি কুশাদি ত্রিবিধ দ্রব্যের সমাহারে পূজাসনের কি অদ্ভুত শক্তি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে কোন পূজকই আসনের এইরূপ ব্যবস্থা করেন না অথবা আদৌ জানেনই না। সেই কারণেও তাঁহাদের পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। অনেকে নিরা-সনে বসিতে নাই' বলিয়া হয়ত একটী মাত্র তৃণ গ্রহণ করিয়া, উপবেশন করে, সে মূর্খ পূজক আসনের আবশ্যকতা বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত নহে। কাশ কুশোত্তরাসন সাধারণ পূজকদিগের পক্ষে প্রশস্ত। সাধক তৎপর দীক্ষিত পূজক হইলে কাম্যপূজায় গুরূপ-দেশ মত কম্বলাজিন ও রাঙ্কবাজিন আসনদ্বয় ব্যবহার করিবেন। অভিষেক ক্রিয়ারপর গুরুপ্রদত্ত ঐশীশক্তি অথবা আধুনিক ভাষায় বিশুদ্ধ তাড়িচ্ছক্তি লাভ হইলে উচ্চ সাধনাভিলাষী পূজক জ্ঞানসিদ্ধি কার্য্যে ও মোক্ষ সিদ্ধকার্য্যে যথাক্রমে কৃষ্ণাজিন ও ব্যাঘ্রাজিন কুশোত্তর নামক আসনদ্বয়ে উপবিষ্ট হইয়া পূজার্চ্চনা করিবেন। এই আসনগুলি যথাক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর শক্তি সম্পন্ন। সাধারণ ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাক্রমে যে কোনও আসনে বসিয়া উহাদের তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। ফলে কোনও না কোন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িবে। সেই কারণ সাধনার উন্নতির সহিত গুরু উপদেশমত যথাবিধি আসনে উপবেশন করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিবে।

আজ কাল অনেকে নামে সনাতন শাস্ত্রানুমোদিত সাধক বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বেচ্ছা-সাধনই তাঁহাদের কার্য্য এবং নিজ শিষ্যমণ্ডলিকেও সেইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—"আসনের কোন আড়ম্বর বা আবশ্যকতা নাই, কেবল ভক্তি-পূর্ণ ও একাগ্র হৃদয়ে তাঁহার চিন্তা করিলেই হইল।" জিজ্ঞাসা করি—পতঞ্জলাদি ঋষিগণ আপনা-দের অপেক্ষা এতই কি মূর্খ ছিলেন, তাঁহারা এ মোটা কথাটা কি একবারও ভাবিবার অবসর পান নাই। যদি ইচ্ছা করিলেই একাগ্র চিত্ত হওয়া যাইত, তবে বাস্তবিক এত আড়ম্বরের কোন প্রকারই উদ্দেশ্য ছিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানব বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের এতই অনুবর্ত্তী যে, সহজে কোনরূপে তাহাকে ইচ্ছাধীন করা দুঃসাধ্য। যিনি আসনের বিরোধী, তিনি হয় মহাপুরুষ, তাঁহার সাধনা-পথের উচ্চাবস্থায় সততঃ সমাধিস্থ, অথবা তিনি সাধনার কোন কথাই সম্যক অবগত নহেন। সাধনাকাঙ্ক্ষিগণের পক্ষে আসনের ক্রমোন্নতি ব্যবস্থা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা শিবের আদেশ। শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত যে কোন খেয়াল-সিদ্ধ উপদেশ শিষ্যগণের মধ্যে প্রচার করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ইহাতে সাধনা যত হউক

আর না হউক ব্যক্তিগণ বৃথা তার্কিক ও ঋষিভ্রম-পরি-দর্শক হইয়া পড়িতেছে, আর্থাৎ সাধারণ ভাষায় "এঁচোড়ে পাকিয়া যাইতেছে"। সুতরাং সাধনা-কাঙ্ক্ষিগণের প্রতি বার বার অনুরোধ সন্দেহ শূন্য ও ভক্তি পুষ্ট হৃদয়ে গুরুমুখোক্ত শাস্ত্রোপদেশমত কার্য্য করিবেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীমৎসচ্চিদানন্দ স্বামী।

বর্ণ-চিত্রণ।

(গত বর্ষের ২২৮ পৃষ্ঠার পর)।

চতুর্থ অধ্যায়।

চিত্র-শিল্পের সূত্র-পঞ্চক।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে ভারতই চিত্রশিল্পের আদি প্রসূ। বর্ণ চিত্রণ, বিশেষ তৈল-চিত্রণ যাহা পাশ্চাত্য প্রদেশে অএল পেণ্টিং (Oil painting) বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই বিশিষ্ট শিল্প-কৌশলও যে, আর্য্য শিল্পীরই গভীর জ্ঞান ও গবেষণার ফল তাহাও ইতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্য ও বর্ত্তমান প্রচলিত প্রতীচ্য চিত্রশিল্প-প্রণালীর সমন্বয় সহযোগে ইহার মূল সূত্র নিরূপন করিতে হইবে।

চিত্র-কলার ভিত্তি বা মূল সূত্র নির্দ্দেশ করিতে হইলে স্থূলতঃ এই বলিতে পারা যায় যে, 'প্রকৃতির দৃশ্যমান ভাব রাশীর সহিত চিত্তের যে ঘনিষ্ট ও অস্ফুট আলাপন প্রথা তাহাই ইহার প্রকৃত মূল সূত্র বা ইহার শ্রেষ্ঠ উপলক্ষ্য। দৃশ্যজগতের যাহা কিছু অদ্ভুত, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর, শিল্পী তাহাই চিত্র-ফলকে অতি সাবধানে প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস পায়—তাহাই আবাল বৃদ্ধের নয়ন-পটে প্রতিভাত হইয়া মানব-চিত্ত আলোড়িত করে, হর্ষ ও করুণাদি নানা রসে দর্শকের হৃদয় অভিসিক্ত করে, তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। কাব্য-শিল্পীর লিখন-ভঙ্গিতে, শব্দ-কৌশলে যে ভাব পাঠক বা শ্রোতার চিত্তে উন্মাদনা আনাইয়া দেয়, চিত্রশিল্পীরও সেইরূপ কলা-মাহাত্ম্যে দর্শককে বিমোহিত করে। কোনও অত্যদ্ভুত শৌধ অট্টালিকা, তাহার নয়ন-মন-তৃপ্তিকর গঠন-পারিপাট্য; অথবা কোনও ক্ষুদ্র শ্রোতস্বিনী, বিবিধ বিহঙ্গসেবিত বিভিন্ন ফুল-ফলাবনত তরু গুল্মাদি পরিশোভিত গিরিগাত্র হইতে বহির্গত হইয়া কেমন বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গিতে অবতরণ করিতেছে, আবার তাহা শৈলপাদে পতিত হইয়াই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডে কেমন অপূর্ব্ব ভাবে প্রতিহত হইতেছে, তাহাতে ফেনোত্থিত হইয়া আরও কত সুন্দর, কত মনোহর, মুক্তা-ফলকের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে,—পশ্চাতে দিগন্ত প্রসারিত নীল গগনমার্গ মেঘমালার রাগরঙ্গে যেন চিত্রিত, কিম্বা অভিমানক্ষিপ্ত প্রেমিকার ম্লান-কম্পিত কপোল প্রদেশে অতর্কিত-ভাবে স্বামী অভিচুম্বন করিয়াছেন, তাহাতে প্রেমিক প্রেমিকার তাৎকালিক মনোভাব উভয় মুখমণ্ডলে কিরূপ উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হই-য়াছে কবি এই সকল বিষয় তাঁহার ঐন্দ্রজালিক ভাষায় সন্নিবিষ্ট করিয়া শ্রোতার শ্রবণবিবর পরিতৃপ্ত

করেন, তাহা তখন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য শ্রোতার চিত্তে উৎকট উন্মাদনা আনয়ন করে, হৃদয় মনশ্চক্ষুকে ঘন ঘন তাহার ভাব অনুভব করিবার জন্য বিচলিত করে, কিন্তু প্রকৃত অনুভব হয় কি? হৃদয়ের আকাঙ্খা হৃদয়েই রহিয়া যায়। কিন্তু চিত্রের কলাচাতুরি বোধ হয়, এভাব অপেক্ষাকৃত ফুটাইতে পারে, দর্শকের চিত্তে তাহা প্রত্যক্ষাবৎ উপলব্ধি করাইতে পারে, সে উৎকট আকাঙ্ক্ষাবেগ কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত করিতে সমর্থ হয়। আবার কবির গতিশীল ধারাবাহিক ভাবসমূহ, তরঙ্গিনীর সেই কুল কুল নিনাদধ্বনি, পক্ষীর সেই মনমুগ্ধকর কল কুজন চিত্রে প্রতিফলিত হইবার নহে, তাহা কাব্যেরই সাম্রাজ্যাধীন। সুতরাং কাব্য অন্ধ এবং চিত্র মূক বা বাক্‌শক্তি রহিত বলিতে হইবে। চিত্র চিরদিনই কোন এক মুহূর্ত্তমাত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখে—কোনও কাব্য বা উপন্যাসের যে কোন নির্দ্দিষ্ট কাল বা ঘটনাকে আয়ত্ব করিয়া রাখে কিন্তু কাব্য তাহাকে বহু দূর বিস্তৃত করিয়া লয়। কাব্যের পর পর বহু পৃষ্ঠায় তাহা যেরূপে বর্ণিত বা প্রকাশিত হয় চিত্রেও ধারা বাহিক বহু চিত্রে তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু চিত্রে যে নির্দ্দিষ্ট কাল নিবদ্ধ থাকে তাহাতে তাহার পূর্ব্ব এবং পর অবস্থার কি কোন ভাব প্রকাশিত হয় না? শিল্পী বলেন, অবশ্যই হয়। চিত্রঙ্কিত এক ব্যক্তি ভ্রমণ করিতেছে কি দৌড়াইতেছে অথবা একব্যক্তি বজ্রকঠোর হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতেছে, ইহাতে তাহাদের ভূত এবং ভবিষ্যত কালের কার্য্য পরম্পরার সুস্পষ্ট আভাস উপলব্ধ হয়। কোন দৃশ্য-কাব্য বা নাটকের প্রথম, মধ্য ও অন্ত্য দৃশ্য দেখিয়া বিচক্ষণ কাব্যামোদী সমগ্র কাব্যের ভাব অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু কোন্ কোন্ দৃশ্যত্রয় সেই গ্রন্থান্তর্গত প্রায় সকল ভাবেরই পরিচায়ক, তাহা চিত্রশিল্পী যেমন সূক্ষ্মভাবে নিশ্চয় করিতে পারেন তেমন অন্যের সাধ্য নাই। চিত্রের যে, এইরূপ ভাব-নিরূপন ও তাহা যথাযথ রূপে চিত্র-ফলকে প্রতিফলিত করিবার যে প্রথা শিল্পশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই ইহার পূর্ব্বোক্ত প্রধান বা প্রকৃত সূত্র। এই মূল সূত্র আবার পঞ্চবিধ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত; প্রথম, আবিষ্করণ (Invention); দ্বিতীয়; পাত্র সমবেশ (Composition); বা তৃতীয়, উদ্ভাবনা (Design); চতুর্থ, ছায়ালোক সমাবেশ (Chiaro-scuro); পঞ্চম বর্ণবিলেপন (Colouring)। ধরিতে হইলে এই পাঁচটীই চিত্রশিল্পের সূত্র-পঞ্চক।

১। আবিষ্করণ (Invention)।

আবিষ্করণ বা ইনভেনসন্ আবার তিনটী বিষয় লইয়া গঠিত। প্রথম—চিত্র-শিল্পের উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচন; দ্বিতীয়—সেই বিষয়ের এমন একটী কাল নির্ণয় করা আবশ্যক যাহা সম্পূর্ণ আবেগপূর্ণ ও দর্শকের চিত্তাকর্ষক হয়; তৃতীয়—সেই বিষয়ের এরূপ অবস্থা ও ভাব নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যাহাতে তাহা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। কোন চিত্র আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক শিল্পীকেই এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিৎ। প্রতিচ্যখণ্ডে র‍্যাফেলের ন্যায় বহু শিল্পী যাঁহারা ইহাতে সুবিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারাই চিত্রশিল্পে সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচীন কালে প্রাচ্য খণ্ডেও চিত্রকার্যে এরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের

ভারতীয় শিল্পিসমাজ তাহা একেবারে যেন ভুলিয়া গিয়াছেন! বিশেষ নব্য শিক্ষিতগণ এ বিষয়ে আদৌ লক্ষ্যই করেন না। যাঁহারা সুশিল্পী হইতে অভিলাষ রাখেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

২। পাত্রসমাবেশ (Composition)।

নাট্য-কাব্যে যে ধরণে পাত্র পাত্রীর সমাবেশ আবশ্যক, চিত্রের আবিষ্করণ কার্য্য স্থির হইলে, তাহাতে কোন স্থানে কিরূপে কাহাকে দাঁড় করাইতে হইবে, তাহার সম্মুখে বা পিছনে কোন দ্রব্য কিরূপে কোথায় রক্ষা করিলে বা সাজাইলে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে, সমগ্র চিত্রের সর্ব্বাবয়বে কি কি ভাব প্রদান করিলে স্বাভাবিক হইবে, সেই সকল স্থির করিবার নাম পাত্রসমাবেশ বা Composition। চিত্রারম্ভের ইহাই দ্বিতীয় সূত্র বা দ্বিতীয় কার্য্য। এ বিষয়েও র‍্যাফেলকে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে। যে স্থানে যেমনটী দরকার, তিনি ঠিক তেমনই করিতেন। যে অংশ চিত্রের প্রাণ বা যাহা মূর্ত্তিসকলের মধ্যে নায়ক পদবাচ্য, তাহাকে এরূপ ভাবে চিত্রে সমাবেশ করিতে হইবে, যাহাতে অন্য অনাবশ্যক অংশ বা উপনায়ক মূর্ত্তিসকল তাহাকে বা সেই অংশকে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলে; অর্থাৎ যাহাতে চিত্রের ঐ প্রধান অংশটী সর্ব্বাগ্রে দর্শকের নয়ন আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। নতুবা চিত্রের সকল স্থানই সুন্দর, সকল মূর্ত্তিই যেন 'এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ্' এরূপ ধরণের সমাবেশ কখনই উৎকৃষ্ট রুচির অনুমোদিত বলিতে পারা যায় না। দৃশ্যকাব্যের মধ্যেও আজকাল অনেকেই এইরূপ ভাবে পাত্র সমাবেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে নাটকের অভিনয় কালে মনে হয় পাত্র পাত্রী মধ্যে সকলেই যেন স্ব স্ব প্রধানরূপে অভিনয় করিতেছে, সুতরাং প্রধান নায়ক বা নায়িকা বলিয়া কাহাকেও চিনিতে পারা যায় না, কিম্বা তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন বিশেষত্বও থাকে না। কাব্যনীতির মধ্যে ইহা যেমন দুষণীয়, চিত্রনীতির মধ্যেও ইহা তদ্রূপ। সুতরাং চিত্রশিল্পীকে এ সকল বিষয়ে অমনোযোগী বা অন্যায় অবহেলা করিতে দেখিলে উচ্চ শিক্ষিতসমাজ কখনই তাহার যথেষ্ট সম্মান করিতে পারিবে না। এই অভাবেই আমাদের দেশীয় চিত্রশিল্পী-জাতিরা বা পটুয়াগণ অতি হেয় ও অতি ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

উদ্ভাবনা (Design.)।

চিত্র-শিল্পে পাত্রনির্ব্বাচন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই উদ্ভাবনা বা ডিজাইন কার্য্যের আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই কার্য্যটীই ইহার তৃতীয় বা মধ্য সূত্র, সুতরাং প্রাণ স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডিজাইন, উদ্ভাবনা বা কল্পনা বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায়, এক্ষেত্রে উহা ঠিক সেরূপ নহে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে চিত্রের আবিষ্করণ ও পাত্রনির্ব্বাচন ক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হইতে পারে বলা হইয়াছে, শিল্পী সেই ভাবেই যে কোন আদর্শ অবলম্বনে তাহার লাঞ্ছন বা (Sketch) স্থূল স্থূল সীমারেখায় অঙ্কিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহার পরিসমাপ্তি ঐ উদ্ভাবনার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ যেমন কোনও শিল্পী মহাভারত, রামায়ণ বা কোনও ইতিহাস পাঠ করিয়া অথবা কোনও নাট্যাভিনয় দেখিয়া, কোনও চিত্র অঙ্কিত

করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব প্রথম সেই বর্ণনার অনুরূপ ভাব হৃদয়ে অনুভব করতঃ প্রাকৃতিক আদর্শ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই আদর্শ দেখিয়া যখন সেই চিত্রের প্রধান নায়কের স্থান ও অবস্থা নির্ব্বাচন করতঃ চিত্রমধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন কেবলমাত্র সীমারেখা দ্বারা তাহার অনুরূপ একটী অস্পষ্ট ছায়া বা দৃক করিয়া লয়েন। তাহার পর সেই দৃক বা সীমারেখাগুলি ক্রমে সেই বর্ণনাবোধক উচ্চ ভাবানুমোদিত করিবার জন্য উদ্ভাবনার সাহায্য লইয়া থাকেন; তাহা আর তখন সেই নিত্য পরিদৃশ্যমান অসম্পূর্ণ আদর্শের অনুকরণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তখন সেই চিত্রান্তর্গত পাত্রের অবস্থানুরূপ সৌন্দর্য্য বোধক প্রকৃত পরিমাণ ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে মনোনিবেশ করেন। ইহাই চিত্রকলায় ডিজাইন বা উদ্ভাবনা নামক তৃতীয় সূত্র।

কতকগুলি রুক্ষ ও অযত্নকল্পিত সীমারেখা দ্বারা চিত্র শিল্পের প্রথম দুইটী সূত্রানুগত যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাতে অনন্য সাধারণের বুঝিবার বিশেষ কিছুই থাকে না। তাহা কেবল সেই চিত্রকরেরই হৃদয়-নিহিত উদ্ভাবনার একটী ক্ষীণ অভাস মাত্র। অর্থাৎ তখন চিত্রের মধ্যে কোন্ স্থানে কোন্ জিনিসটী থাকিবে, কোন্‌টী কোথায় থাকিলে মানাইবে, চিত্রক্ষেত্র মধ্যে তাহারই অস্পষ্ট রেখা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে মাত্র। গ্রাম্য ভাষায় ইহা চিত্র-প্রতিমার 'কাঠাম' স্বরূপ বলিতে পারা যায়। এইবার সেই উদ্ভাবনার উদার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া শিল্পী তাহার প্রিয়সখী কল্পনা সুন্দরীকে একমাত্র হৃদয়েশ্বরী করিয়া তাহারই সেবা করিতে লাগিলেন। সেই পূর্ব্বাঙ্কিত রেখাগুলির ক্রমে অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া এক্ষণে সেই কল্পনা-প্রদর্শিত আদর্শের অনুরূপ ভাব চিত্রে প্রতিভাত করিবার জন্য প্রয়াস করিতে লাগিলেন। সুশিল্পীর পক্ষে এই অবস্থা অতীব আনন্দপ্রদ। অধুনা বহু শিল্পীই—বিশেষ যাঁহারা মাত্র প্রতিমূর্ত্তি চিত্রকর (Portrait painter) যাঁহারা ইংলিস শিল্পীর অন্ধ-অনুকরণ-প্রিয়—তাঁহারা ইহার মর্ম্ম আদৌ অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা সততই প্রাকৃতিক আদর্শের যথাযথ অনুকরণ করিতে প্রয়াস করেন এবং এইরূপ করিতে পারিলেই স্বকার্য্যে সিদ্ধকাম হইয়াছেন ভাবিয়া প্রভূত আনন্দ অনুভব, করেন, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণ কালে অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেও ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক (History-painting) চিত্রাবলী, যাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সুধীসমাজে চিত্রশিল্পের চরম ঔৎকর্ষ বলিয়া উচ্চ-সম্মানপ্রাপ্ত, তৎপক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ কবি-হৃদয়ের উচ্চভাবরাশি নিতান্ত সাধারণ বস্তু নহে। তাহা নিত্য সকলের প্রত্যক্ষীভূত হয় না, হইতেও পারে না। সে উদার অনন্ত উন্নত ভাব ভগবৎকৃপায় ভগবানের সমীপস্থ হইবার বিচিত্র সোপানপথ। তাহা ভক্ত, কবি বা শিল্পীর সাধনা-সিদ্ধ অভিনব সামগ্রী। সে উপাদেয় সামগ্রীনিচয় অক্ষয় ও অপার্থিব। সেই কারণ তাহার উদ্ভাবক কবি বা কলাবিদ্‌ও সর্ব্ব সাধারণের বরেণ্য ও অমর পদবীবাচ্য। অবশ্য প্রাকৃতিক আদর্শ হইতে সকলকেই যথা সম্ভব উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় এবং প্রথমে তদনুরূপেই চিত্রে যথা সাধ্য বিন্যস্ত করিতে

হয়; কিন্তু পরে তাহা হইতে ধীরে ধীরে উন্নত পথাভিমুখী হইতে হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সামান্য ও অসামান্য সকল স্থলেই এই বিধি প্রযোজ্য। হয়ত কোন চিত্রে একটী অতি সুন্দরী রমণীমূর্ত্তিই প্রধান নায়িকা, এস্থলে সচারচর যে সকল রমণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শিল্পীর সৌন্দর্য্যানুকরণ বিষয়ে সেরূপ উপযুক্ত নহে, তেমন চিত্ত তৃপ্তিকর নহে। অথবা সেরূপ ক্ষণজন্মা সীতা' শকুন্তলা, রম্ভা বা উর্ব্বশী সম অপার্থিব রমণী-সৌন্দর্য্য সহসা কোথায় বা সাক্ষাৎ হয়? তাহা ত সম্ভব পর নহে! কিন্তু ঐ নিত্য পরিদৃশ্যমান ঐ সকল স্ত্রী-মূর্ত্তির যথাযথ অনুকরণ করিয়া কি সেই ললনা-ললামভূতা রমণীয় রমণী-মূর্ত্তি অঙ্কিত করা যাইতে পারে? তাহার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সেই অনিন্দিত পরিমাণ সকল, মুখমণ্ডলের সেই অপূর্ব্বভাব, নয়নের সেই কি এক স্বর্গীয় পবিত্র অনুভাব, সেই সুবঙ্কিম ভ্রুযুগল, অর্দ্ধেন্দুসদৃশ ললাট, সেই আগুল্‌ফচুম্বিত কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম, সেই সুগোল অতি কমনীয় হস্ত পদাদি, যাহা মানব জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য ফলে কদাচ নয়ন গোচর করিতে পারে, তাহা এই রমণী-সমাজে অসম্ভব। সুতরাং এই সমস্যার সময়ে শিল্পীও কবির ন্যায় একমাত্র কল্পনায় সেবা করিয়া থাকেন। কেবল এই এক রমণী-মূর্ত্তি নহে, অনন্ত পথে অগণ্য বিষয়ে ঐ এক মাত্র অবলম্বনীয় পথ উদ্ভাবনা। মানব যাহা কল্পনায় আনিতে পারে না, তাহা বুঝি বিধাতারও অসাধ্য। সহসা বড় কঠিন, বড় স্পর্দ্ধার কথা বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু এ স্পর্দ্ধা যে তাঁহারই প্রদত্ত এ তো আমার উক্তি, নহে। জগৎ যুগ যুগান্তর ধরিয়া যাহা দেখিয়া আসিতেছে, তাহাতে ভ্রান্তির আরোপ করিবে কি বলিয়া? মানব তাঁহার সৃজিত হইলেও তাহাদের উন্নতির ইচ্ছা দিয়াছেন, প্রবল আবেগ দিয়াছেন এবং তাহার সাফল্যার্থে স্বয়ং চির-নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহাদের শক্তি সামর্থ্য দিয়া, ভক্ত করিয়া, নিজ সমীপবর্ত্তী করিতেছেন, তাহাকে তন্ময় করিয়া, আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া, ক্রমে সেই মানবাত্মা পরমাত্মায় লয় করিয়া লইতেছেন। যখন তাঁহার এত দয়া, এত অনুগ্রহ, তখন তাহার সাধনা পথে সেই বিধাতৃশক্তির পরিচয় দিতে দেখিলে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? বরং কবির পক্ষে শিল্পীর পক্ষে, তাহাই চরম লক্ষ্য স্থল। কবি সাধনা-সিদ্ধ হইয়া ক্রমে ঋষিত্বে, পরে দেবত্বে উন্নীত হইয়া থাকে, অনন্তর বেদ বেদান্তের প্রণয়নকার রূপে জগতের পূজা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। শিল্পীও সেই ভাবে একদিন বিশ্বশিল্পী হইয়া বিশ্বকর্ম্মা রূপে যেমন সমগ্র আর্য্য শিল্পীর পূজা লাভ করিতেছেন, সাধনায় উন্নতিলাভ করিতে পারিলে, যে কোন শিল্পীই পুনরায় সেই সম্মান সেই পূজা, জগতবাসী সকলের নিকট হইতেই পাইতে পারেন। প্রতীচ্যখণ্ডে র‍্যাফেল, করিজিও, রুবেন্স আদি চিত্রশিল্পিগণ আজ সেইরূপে জগৎপূজ্য বা বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু প্রাচ্য-শিল্পি-সমাজের মধ্যে সে সমুচ্চ সম্মানলাভের উপযুক্ত অধিকারী বর্ত্তমানে আদৌ নাই। তাহার একমাত্র কারণ এবিষয়ে সম্পূর্ণ যত্নের অভাব। প্রথমতঃ মোসলমান আধিপত্য সময়ে তাঁহাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ চিত্রশিল্প উৎসাহ অভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তাহার পর ইহা কতকগুলি হীন ও অশিক্ষিত শিল্পীর জাতিগত হওয়ায় ক্রমে উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির

পথে এত চলিয়া গিয়াছে। সেই সুদীর্ঘ-কালব্যাপী রাজার সহানুভূতি ও উৎসাহের অভাবে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই ইহাকে সম্মানের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন না বা শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী সন্তান বা কোন আত্মীয়কেও এ বিষয়ে শিক্ষিত করিতে মনোযোগী হইলেন না। সুতরাং ভারতের চিত্রবিদ্যা আর্য্যের চতুঃষষ্ঠী কলায় অঙ্ক চ্যুত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ আধিপত্যে আর কিছু না হইলেও সমদর্শিতা এবং এবং শিল্প-বিজ্ঞানাদির শিক্ষার দ্বার পুনরায় যেন উন্মুক্ত হইয়াছে, পুনরায় আর্য্য-প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরাজের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রথা যেমনই হউক না কেন, আমরা আমাদিগের শিক্ষার ভার ক্রমে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারিলে কোন গোল যোগই থাকিবে না। বহু ভদ্র সন্তান এক্ষণে এ বিষয়টী শিক্ষা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, অনেকে তাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজনকে এবিষয়ে শিক্ষার সহানুভূতি দেখাইতেছেন; কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, অধুনা পুরোহিত-ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর ন্যায় কোন মেধাবী ছাত্র ইহাতে প্রবেশ করেন না। যাঁহারা সাধারণ শিক্ষায় কিঞ্চিন্মাত্রও উপযুক্ততা লাভ করেন, তাঁহারা হয় চিকিৎসা না হয় ব্যবহারজীবীর ব্যবসায়, তাহা না হইলে অন্ততঃ কেরাণগিরিতে মনোনিবেশ করেন। আর যে ছেলেগুলি নিতান্ত মূর্খ, মেধাশূন্য, চিরদিন দুষ্ট-প্রবৃত্তি-পরায়ণ, তাহারাই তাহাদের অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক চিত্রবিদ্যা শিক্ষার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় ও আর্টস্কুলে প্রবেশ করিয়া স্কুলের সম্মানহানি করিতে থাকে। সুতরাং বিজ্ঞব্যক্তিগণ বোধ হয় এক্ষণে সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন যে, যাহাদের আদৌ মেধা নাই, তাহাদের দ্বারা এই উদ্ভাবনা বা কল্পনার উচ্চতর ভাবের উপলব্ধি ও বিকাশ হইবে কি করিয়া? দুই একজন চিত্র-শিল্পী যাঁহারা উচ্চ-বংশ সম্ভূত ও শিক্ষিত, যাঁহারা আর্য্যশিল্পের এই ধ্বংসের যুগে যেন যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদর্শে আজকাল দুই একটী ছাত্রের হৃদয়ে আশা ও আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হইয়াছে। কালে সেই সকল শিল্পীই যে, ভারতে উদ্ভাবনা-সূত্র জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই উদ্ভাবনা বা কল্পনা পথে পরিচালিত হইয়া কেহ উৎকৃষ্ট অঙ্গসৌষ্ঠব বা পরিমাণ বিষয়ে কেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব পরিস্ফুরণে, কেহবা বর্ণ বিন্যাসে, কেহ ছায়ালোকের ক্রমমিল-কল্পে, কেহ নির্ভুল আলিম্পন বা সীমারেখা অঙ্কনে, আবার কেহ বা অনুপম সৌন্দর্য্য বিকাশে মনোযোগী হইয়াছেন পাশ্চাত্য শিল্পীর ইতিহাসে আলোচনায় তাহাই বুঝিতে পারা যায়। যাঁহার যে বিষয়টী ভাল লাগিয়াছে তিনি সেইটীই আরাধ্য বস্তু জ্ঞানে তাহারই উৎকর্ষ সাধনায় ধ্যান মগ্ন বা তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকল বিষয় সমান ভাবে আয়ত্ত করিয়া তাহার যথাযথ প্রয়োগ করিতে লক্ষ লক্ষ শিল্পীর মধ্যে কেবল মহাত্মা র‍্যাফেল প্রভৃতি কয়েকজন মাত্রই সমর্থ হইয়াছেন। বাস্তবিক সকলের নিকট সেরূপ আশা করাও অসম্ভব। সকলেই যদি ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতি বা জয়দেব হইবেন অথবা মধু বঙ্কিম হেম বা নবীন হইবেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিশেষত্ব থাকে কৈ? বোধ হয়, ভগবানেরও তাহা অভিপ্রেত নহে। কিন্বা সে জন্ম জন্মান্তরের উৎকট সাধনায় সকলেই সিদ্ধ হইতে

পারেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, দুঃসাধ্য বলিয়া এ সাধনায় শিথিল-প্রযত্ন হইলে চলিবে না। সকলকেই সাধনা করিতে হইবে, যন্ত্র কার্য্যোপযোগী করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে, কখন কি ভাবে তিনি কাহাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কি কার্য্য করাইয়া লন তাহার স্থিরতা নাই! আমি ক্ষুদ্র, সামান্য, এভাব মনের কোণেও যেন স্থান না পায়। বট-বীজ অতি ক্ষুদ্র, বালুকণাবৎ, বায়স চঞ্চুতেও অতি হেয় অকিঞ্চিৎকর বোধে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, কিন্তু সময়ে বরষা-সলিল-সিক্ত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হয়, ক্রমে পত্র পল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়। তখন সেই অতিক্ষুদ্র বীজই রূপান্তরিত হইয়া বিরাটদেহে সেই বায়সসম বিবিধ বিহঙ্গের আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে। সুতরাং নব্য শিক্ষার্থিগণের অযথা হতাশ হইবার কোনও হেতু নাই। চিত্তে সাধনার দৃঢ় সংকল্প বদ্ধমূল হইলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ইহা মহাজন-বাক্য, সুতরাং ইহাতে সন্দেহ নাই। কল্পনার সাধনায় শিল্পীকে অতিধীর, স্থির ও গম্ভীর ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্য কবি ও শিল্পিগণের কাব্য ও চিত্রাবলী প্রাণ ভরিয়া আলোচনা করিতে হইবে, তাঁহাদের কল্পনা-সিদ্ধ ফলের আস্বাদন ও অনুভব করিতে হইবে; নতুবা কেবল অন্ধ-অনুকরণদ্বারা তাহা উপলব্ধ হইবে না। তাঁহাদের সেই রেখাপাত হইতে প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে; সেই অঙ্গ ভঙ্গি, সেই পরিচ্ছদ পারিপাট্য, সেই শোভা সৌন্দর্য্য, কি ভাবে কেমন করিয়া তাহার সম্পাদন করিয়াছেন, সে সমস্তই শিক্ষার্থীর আলোচনার অন্তর্গত। কেবল মোটামুটি দেখিয়া যা' তা' একটী সমালোচনা করিয়া সাধারণের ন্যায় তাহার স্থূল মর্ম্ম বুঝিলে চলিবে না। সাধারণে এবং শিল্পীতে ইহাই প্রভেদ। সুশিল্পী হইতে হইলে অতি সূক্ষ্মভাবে তাহার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, বিজ্ঞান ও কাব্যাদিরও সেইরূপ আলোচনা করিতে হইবে, ভারতের ভাস্কর্য্যসম অতি জীর্ণ পুরাতত্ত্বেরও আস্বাদ অনুভব করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বা যে শিক্ষার্থী এই সকল বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে মনোনিবেশ করিবেন তিনিই যে এক সময়ে চিত্রশিল্পে উদ্ভাবনা সিদ্ধ হইয়া অমর-কীর্ত্তি লাভ করিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্রিরত্ন বিজয়।

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিপ্লবের সূচনা।

অশোক এখনও বারাণসীতে—রাজধানী হইতে—অমাত্য রাধগুপ্তের নিকট হইতে—প্রায় প্রত্যহই লোক আসিতেছে, তাহাদের মুখে রাজধানীর ব্যাপার যাহা শুনা গিয়াছে, তাহা বড়ই আশঙ্কাজনক।

বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী হইতে অশোকের রাজধানী-অভিমুখে যাত্রার কথা শুনিয়া যুবরাজ সুষীম নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তক্ষশিলা হইতেও বহু সেনা লইয়া কুমার মহেন্দ্রও ত্বরিতগতিতে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন, এসংবাদও পাটলিপুত্রে পৌঁছিয়াছে। পাটলিপুত্রে সেনা অতি অল্পই

আছে। নেপাল এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বিদ্রোহ দমনের জন্য অল্পকাল পূর্ব্বেই বহুসৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের সত্বর রাজধানীতে ফিরাইয়া আনা সহজ ব্যাপার নহে, এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজকুমার অশোক এবং মহেন্দ্রের যুগপৎ বহু সুশিক্ষিত সেনা লইয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়া বড় শুভলক্ষণ নহে—এই ভাবিয়া মন্ত্রিসভা আর কালপ্রতীক্ষা না করিয়া অবিলম্বে যুবরাজকে অভিষিক্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অমাত্য রাধগুপ্ত এরূপ কার্য্যে দোষ দেখাইয়া—কুমার দ্বয়ের রাজধানীতে আগমনের পরই যুবরাজের সিংহাসনারোহণ সঙ্গত বলিয়া বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রথমে কুমারদ্বয়কে রাজধানীতে অভিষেকের উৎসবে মিলিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাঁহারা সেই উৎসবে যোগ দিবার জন্য খুব সমারোহের সহিত আসিতেছেন এরূপ অবস্থায় তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই যুবরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলে কুমারদ্বয় ভাবিবেন যে, তাঁহাদের উপর অবিশ্বাস বশতঃই এই প্রকারে তাড়াতাড়ি কার্য্য করা হইয়াছে, এই অবিশ্বাস ভ্রাতৃবিরোধ ঘটাইতে পারে। যুবরাজের সিংহাসনারোহণের পরই যদি ভ্রাতৃবিরোধ হয়, তাহা হইলে সাম্রাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অমাত্যের এই প্রকার পরামর্শে যুবরাজ অমাত্যের প্রতিও সন্দিহান হইয়াছেন। মন্ত্রিসভার জনকয়েক প্রতাপশালী সভ্যও অমাত্যের প্রতি যুবরাজের সন্দেহ যাহাতে আরও দৃঢ় হয় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিয়া যুবরাজ সুষীম আগামী কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিনে সিংহাসনারোহণ করিবেন ইহা স্থির করিয়াছেন, কল্য কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, সুতরাং অশোক চেষ্টা করিয়াও কোন মতে সিংহাসনারোহণের উৎসবে যোগদিতে পারিতেছেন না—এই সকল বৃত্তান্ত দূত মুখে অবগত হইয়া, কুমার অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এক্ষণে এত সৈন্য লইয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হওয়া উচিত বা ইহাদিগকে উজ্জয়িনীতে যাইতে আদেশ করিয়া, স্বয়ং অল্পলোকের সহিত পাটলিপুত্রে যাওয়া এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়ের আশঙ্কা দূর করা উচিত ইহা ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, এই ভাবেই তিন চারিদিন কাটিয়া গেল। একদিন হঠাৎ পাটলিপুত্র হইতে রাজদূত উপস্থিত হইল এবার রাধগুপ্তের কোন লোক আসে নাই, সুষীম পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া আপনাকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, দূত তাঁহারই মুদ্রাঙ্কিত পত্র লইয়া আসিয়াছে পত্রে লিখিত আদেশ এই যে কুমার অশোককে উজ্জয়িনীর রাজপ্রতিনিধি পদেই বাহাল রাখা হইল তাঁহার আর রাজধানীতে আপাততঃ আসিবার আবশ্যকতা নাই, তিনি যত শীঘ্র পারেন সেনাগণের সহিত উজ্জয়িনী অভিমুখে প্রস্থান করুন।

পত্রার্থ অবগত হইয়া ঘৃণায়, ক্ষোভে, ক্রোধে ও বিষাদে অশোকের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল, অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া, তিনি যথেষ্ট সমাদরের সহিত রাজ দূতকে বিদায় দিলেন। দূতের হস্তে ভারতের নূতন সম্রাট্‌কে যে পত্র প্রেরণ করিলেন তাহার কি প্রতিপাদ্য তাহা তিনি কাহাকেও জানাইলেন না। অশোকের বিশাল সেনা নিবেশ এখনও উত্তরবাহিনী গঙ্গার তীরে সেই ভাবেই সন্নিবেশিত রহিয়াছে,

রাজধানীতে কি হইতেছে তাহা এখনও সেনা দলের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। রাজকুমার ইচ্ছা করিয়াই তাহা প্রকাশ করেন নাই।

তিনি প্রত্যহই গঙ্গার পশ্চিম পারে পুণ্য বারাণসীর প্রথিত মন্দির এবং বিহার গুলিকে দেখিতে যাইতেছেন। এই সময়ে বারাণসীতে নবোদিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার দিন দিন বাড়িতেছে পুরাতন বিশাল জীর্ণ-দেব মন্দিরের পার্শ্বেই অনেক স্থানে বৃহৎ নূতন নূতন বিহার ও সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে নগরে হিন্দু অধিবাসিগণের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ত্রিরত্ন (ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ) উপাসকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, একদিকে হর হর শঙ্কর কাশী-বিশ্বেশ্বর ধ্বনি শত শত কণ্ঠে নিনাদিত হইয়া হিন্দু হৃদয়ে উল্লাস সঞ্চার করিতেছে, অপরদিকে ধর্ম্ম-বুদ্ধ ও সঙ্ঘের কীর্ত্তিগানে বুদ্ধোপাসকগণের হৃদয়ে নূতন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা জাগাইয়া দিতেছে. একদিকে অগ্নিহোত্র জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্র প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্মকলাপ, অপরদিকে সর্ব্ব-কর্ম্ম সন্ন্যাস, একদিকে গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণ অগ্নিতে আহুতির আজ্যগন্ধামোদিত ধূমরাশির মেঘ বিনিন্দি সমুদ্গমে দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারিত, অন্যদিকে বিহারে বিহারে সমবেত স্থবিরগণের নিঃশব্দ ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, একদিকে ধর্ম্মের জন্য পশু হিংসা, অন্য দিকে নির্ব্বাণের জন্য আত্মত্যাগ, একদিকে কর্ম্ম ও ভক্তি, অপরদিকে জ্ঞান বৈরাগ্যের সমুজ্জ্বল চিত্র, একদিকে পতন অন্যদিকে উদয়—এই ক্ষয়োদয়ের সন্ধিক্ষেত্রে—হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মিলন স্থলে—বিনীতভাবে মন্দিরে মন্দিরে বিহারে বিহারে পূজা ও উপহার প্রদান করা এক্ষণে রাজকুমার অশোকের নিত্যকর্ম্ম। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বিরাগ নাই—ভগবান বিশ্বেশ্বরের সুবিশাল রজত নির্ম্মিত পঞ্চমুখ মূর্ত্তি দেখিয়া ভূমিতে আজানু লম্বিত হইয়া নমস্কার করিতেও তাঁহার যেমন আগ্রহ, সেইরূপ মৃগদাবের ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন ক্ষেত্রে বৌদ্ধস্তূপের সম্মুখে দাড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক পবিত্র কাহিনী শুনিতে করজোড়ে মস্তক অবনত করিতে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রীতির অনুভব, স্নাতক ত্রিবেদবিদ্ আচার পূত ব্রাহ্মণগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ধন বর্ষণ করিতে তিনি যেমন ব্যগ্র, সমাধিপ্রিয় সর্ব্বভূত হিতৈষী শ্রমণক বৃদ্ধের সেবার জন্য বিহার নির্ম্মাণ—সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা এবং স্তূপ সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে ধন বিতরণেও তিনি সেইরূপ মুক্তহস্ত, তাঁহার এই প্রকার বিনয়নম্র মধুর ব্যবহারে বারাণসীর সকল ব্যক্তিই প্রীতিলাভ করে। দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য—তাঁহার নিকটে আত্মবিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত, বৌদ্ধ বিহারের স্থবিরগণ তাঁহার সভায় ত্রিরত্নের গৌরব কীর্ত্তির প্রচারের জন্য সতত উৎসুক, রাজকুমারের বিনয়ে সকলে মুগ্ধ—সকলে বিস্মিত এবং সকলেই তাঁহার অভ্যুদয় দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত।

বারাণসীর সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন—সকল বিহারের অধ্যক্ষ স্থবিরগণের প্রত্যেকের সহিতই তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, নগরের কুবেরকল্প শ্রেষ্ঠিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার অনুগ্রহপূর্ণ দর্শন লাভের জন্য উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন।

এই ভাবে তীর্থসেবায় সজ্জন সমাগমে এবং ধর্ম্মালোচনায় কুমার অশোক বারাণসীতে প্রায় এক পক্ষ কাল অতিবাহিত করিলেন।

আবার সেই মূর্ত্তি।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইবার উপক্রম হইল। এত দীর্ঘকাল রাজধানীর এত নিকটে কুমার অশোক এত সেনা লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তক্ষশিলা হইতে কুমার মহেন্দ্রও বহু সেনা লইয়া রাজধানী অভিমুখে ছুটিয়াছেন। তাঁহার সেনাদল দুই তিন দিনের মধ্যেই বারাণসীতে কুমার অশোকের বাহিনীর সহিত মিলিত হইবে, সেই মিলিত সেনার গতি কোন দিকে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। নূতন অভিষিক্ত সম্রাট্ মন্ত্রি সভার সহিত পরামর্শই করিতেছেন, তাড়াতাড়ি একটা কিছু স্থির করিয়া কর্ত্তব্যের দিকে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, রাজধানীতে প্রতিদিন নূতন নূতন জনরব উঠিতেছে, নূতন সম্রাটের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি ও বিশ্বাস থাকায় নগরবাসী বৌদ্ধ বণিক্‌কুল নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে—অশোকের আবাল্য বীরত্ব ও সমদর্শিতার জন্য তাহার প্রতি অনেক লোকের অনুরাগ পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত ছিল এক্ষণে তাঁহার রাজধানীর এত নিকটে বিপুল বাহিনীর সহিত তাঁহাকে অবস্থান করিতে দেখিয়া—সকলেরই হৃদয়ে নানা প্রকারের সন্দেহ হইতে লাগিল।

রাজধানী হইতে সকল সংবাদই অশোকের নিকট যথাসময়ে পৌঁছিতেছে, মধ্যে মধ্যে কোষাধ্যক্ষ, অমাত্য রাধগুপ্তের প্রেরিত দূতগণের সহিত তাঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপী গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছে, এই সকল দেখিয়া সেনা নিবেশের মধ্যেও কেমন একটা ভয়, সংশয় ও উদ্বেগের ছায়া সকলেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

অশোকেরও হৃদয় উদ্বেগ পূর্ণ। ক্রমেই তাঁহার সেই সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া ঘন ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। রাজধানী হইতে অদ্য আবার আদেশ আসিয়াছে যে,—তিনি অবিলম্বেই যেন বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করেন, কুমার মহেন্দ্রের বারাণসীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বারাণসী পরিত্যাগ করিতেই হইবে নচেৎ তাঁহার আচরণ সম্রাটের অত্যন্ত অপ্রীতির কারণ হইবে। দূত মুখে এই সংবাদ শুনিয়া, অশোক নিতান্ত চিন্তিত হইলেন, কি করিবেন তাহা তিনি এখনও ঠিক করিতে পারেন নাই, কুমার মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে স্থির করিবেনই বা কিরূপে? অথচ মহেন্দ্রের সহিত বারাণসীতে মিলিত হইলে স্পষ্টতঃ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয়, এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিদ্রার জন্য শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন কিন্তু শয়ন করা ত দূরের কথা—শয্যার উপর বসিয়া তিনি এরূপ ভাবনা সমুদ্রে ডুবিয়া পড়িলেন যে তাহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে যেন লুপ্ত হইল! বিশাল তাকিয়ার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঈষৎ বক্রভাবে হস্তে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক—একই ভাবে কতক্ষণ যে তিনি অতিবাহিত করিলেন তাহা বুঝিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। এই ভাবে প্রায় তৃতীয় প্রহর রাত্রি কাটিয়া গেল—চিন্তাময়, উদ্বেগময় ও আবেগময় ভাবে তিনি বিভোর, ইহা জাগরণ বা নিদ্রা, মোহ বা বিবোধ তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার সেই নিভৃত কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া—তাঁহার হৃদয়ের সেই প্রশান্ত গম্ভীর চিন্তা-সাগরকে উদ্বেলিত করিয়া এক উচ্চ অথচ প্রশান্ত—

মধুর অথচ গম্ভীর স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—"ভারত সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করুন ভগবান শাক্যসিংহের বাঞ্ছা পূর্ণ হউক।" আবার সেই স্বর! সেই প্রায় এক মাস পূর্ব্বে শরচ্চন্দ্র চন্দ্রিকা ধৌত ভাগীরথী সৈকতে শান্ত মূর্ত্তি পলিতকেশ ক্ষণ-কালের দৃষ্ট সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বর যাহা একবার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে নূতন আশাকে অঙ্কুরিত করিয়াছিল, যে স্বর আর একবার শুনিবার জন্য তিনি এই দীর্ঘকালের মধ্যে কতবারই না আকাঙ্ক্ষা করিয়া-ছেন—অকস্মাৎ সেই স্বর আবার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল তাঁহার আবেশময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সম্মুখে চাহিয়া রাজকুমার অশোক আরও বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন—সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্তগম্ভীর মূর্ত্তি বৃদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। হর্ষে বিস্ময়ে ও উৎকণ্ঠায় তখন তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দু।

গত ৩১শে ভাদ্র বুধবার রাত্রি ১৷৷০টার সময় বাঙ্গালাদেশের আর একটী সমুজ্জ্বল রত্ন খসিয়া গিয়াছে, নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর আসমুদ্র হিমালয়ের অধিকাংশ স্থানেই পরিচিত ছিলেন, আদৃত ছিলেন এবং অনেক স্থানে নিজের কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। একটি কবিতা আছে,—

বাল্মিকী গিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধি সঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতু ভুবন ত্রয়ম্॥

অর্দ্ধেন্দুবাবু সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে, কাশ্মীরের অত্যুচ্চ হিমাচলগর্ভ হইতে, শ্রীহট্টের কমলা-পুষ্পবাসিত সমতল প্রদেশ পর্য্যন্ত যেখানে অর্দ্ধেন্দু-শেখর পদার্পণ করিয়াছেন, সেইখানেই নাট্যামোদের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু বাবুর এই দেশ-ব্যাপী কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার শিষ্য ও সুহৃৎ নটবর অমৃতলাল বসু একবার বলিয়াছিলেন—"অর্দ্ধেন্দুর জীবন—থিয়েটার-মিশনরীর জীবন—পশ্চিমে পূবে যেখানে পা দিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু সেইখানেই নাট্যসম্প্রদায় গঠন ও অভিনয় বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছে।" অর্দ্ধেন্দুশেখর সর্ব্বদা বলিতেন,—যে সকল কলাবিদ্যার অনুশীলনে দেশ সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহার মধ্যে সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প সর্ব্ব প্রধান। নাট্যকলার অনুশীলনে এই তিনটিরই যুগপৎ আলোচনা ও উন্নতি করিতে হয়। যে দেশ নাট্যবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ সে দেশ দুনিয়ার মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অর্দ্ধেন্দুশেখর সেই নাট্যবিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎপ্রতি দেশের লোকের আকর্ষণ জন্মাইয়া এবং নাট্যামোদের জন্য আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া গিয়াছেন। তিনিই সাধারণ ভাবে লোকশিক্ষার উপযুক্ত প্রণালীতে, নাট্য কলা শিক্ষাদানের আদি একমাত্র সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ শিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজে নাট্যশাস্ত্রভেদজ্ঞ, নাট্যকলারহস্যজ্ঞ, গীতজ্ঞ, সুরজ্ঞ, নৃত্যবিৎ, হাস্যরসরহস্যরসাবতার, বহুবিধ রসাবির্ভাবপটু ও বাকপটু অভিনেতা ছিলেন। তিনি ভিন্ন বাঙালী নাট্যশিক্ষকের একাধারে এতগুণ আমরা

আর কাহারও দেখি নাই। তিনি শিষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ও ধারণাশক্তির পরিমাণ বুঝিয়া অতি সহজে সুগম উপায়ে অতি দুরূহ বিষয়ও শিক্ষা দিতে পারিতেন। তিনি নিজেও নাট্যৈকব্রত স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহাকে জানিত না, চিনিত না, এমন লোক ছিল না বলিলেই হয়। দেশের অনেক সুসন্তান আছেন বা গিয়াছেন, যাঁহাদের কীর্ত্তি গৌরবে সমস্ত লোকের তাঁহারা নমস্য, কিন্তু তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত হিসাবে দেশের এক আনা লোকেও চেনে কি না সন্দেহ কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজের কীর্ত্তি কলাপে যেমন দেশের সর্ব্বজন-বিদিত, তেমনি সর্ব্বজন পরিচিত। দেশের অনেক পণ্ডিত, অনেক সুবক্তা, অনেক নেতাকে দেশের আবাল বৃদ্ধ যুবা হয়তো চেনেন কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর দেশের আবাল যুবার পরিচিততো ছিলেনই, অধিকও অনেক কুলমহিলারও সুপরিচিত ছিলেন। এ-সৌভাগ্য এদেশে নাট্যকলাকুশল ব্যক্তিগণ ভিন্ন আর কাহারও হইবার সুযোগ নাই। নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দু সাহেব সাজিতে অদ্বিতীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেন বলিয়া সাধারণতঃ তিনি 'সাহেব,'' "মুস্তফী-সাহেব" ইত্যাদি নামে অভিহিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিলাত প্রত্যাগত ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণকারী সুকবি হাস্যরসরসিক, নাটককার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেদিন অর্দ্ধেন্দেুশখরের স্মৃতি সভায় (১২ই আশ্বিন ১৩১৫ সোমবারে এই সভা মিনার্ভাথিয়েটারে হয়) বলিয়াছিলেন,—"অর্দ্ধেন্দু বাবু কেবল এদেশে কেন, ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন"। সুতরাং যে দেশে অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় অভিনেতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশ শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত দেশমালার মধ্যে যে, গণনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সন ১২৫৮ সালের ১০ই মাঘ বুধবারে অর্দ্ধেন্দু শেখরের জন্ম হয়। কলিকাতাই ইঁহার জন্মস্থান, কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস জেলা যশোহরের অন্তর্গত চিঙ্গটিয়া গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম ৺শ্যামাচরণ মুস্তফী ও মাতার নাম ৺মুক্তকেশী দেবী। ১২৮৩ সালে ২৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মাতৃবিয়োগ এবং ১২৯০ সালে ৩২ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ৺মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর ও রাজা সার্ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট অর্দ্ধেন্দুশেখরের আপন পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা। অর্দ্ধেন্দু শেখরের এক ভগ্নী ও এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উদিতেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় বর্ত্তমান আছেন। সুপ্রসিদ্ধ 'মহিলা' কাব্য প্রণেতা ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারই অর্দ্ধেন্দুশেখরের ভগিনীপতি ছিলেন। অর্দ্ধেন্দু শেখর দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল, সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের জামাতা ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীই অর্দ্ধেন্দু বাবুর জেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুস্তফী। একমাত্র বিধবা ভগিনী ও বিধবা কন্যা ব্যতীত অর্দ্ধেন্দুশেখর পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রী, পৌত্রীজামাতা, দৌহিত্রীজামাতা;প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ সুখের সংসার—'চাঁদের হাট' রাখিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন,—আর রাখিয়া গিয়াছেন—অভাগিনী সুশীলা ধর্ম্মপত্নী।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষা ডফ্ সাহেবের স্কুলে হয়। স্কুলে ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাতে নাট্যকলার বিকাশ হইয়াছিল। শেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আর এক পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা ৺অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুরের যত্নে তিনি অভিনেতা রূপে মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম কালে সাধারণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। 'আপনার মুখ আপনি দেখ'—গ্রন্থ প্রণেতা ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত "কিছু কিছু বুঝি" নামক প্রহসনে তিনি যুগপৎ 'চন্দনবিলাস,' 'ঝি,' ও 'কোচম্যান' সাজিয়াছিলেন। এই দলে তিনিই শিক্ষক, তিনিই ডাইরেক্টর, তিনিই সব। সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেজম্যানেজার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর এই সময় হইতেই ইঁহার সঙ্গী এবং ষ্টেজম্যানেজার। তিনিও এই প্রহসনের নায়িকা অর্থাৎ চন্দনবিলাসী সাজিয়া ছিলেন। তাহার পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাগবাজার অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয়। এই দল গঠনকর্ত্তাদিগের মধ্যেই এখনকার নটকুলভূষণ সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি অর্দ্ধেন্দু বাবুর সহকারী ছিলেন। তৎপরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ঐ দলে 'লীলাবতী' অভিনয় হয়। এই সময়ে ৺মতিলাল সুর ও ৺মহেন্দ্রলাল বসু অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিষ্যত্বে গৃহীত হন। তৎপরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে যে ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখরই সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং একমাত্র শিক্ষক ছিলেন। এই থিয়েটার দীনবন্ধুর দীনার্ত্তপরিত্রাণহেতু অপূর্ব্ব নাটক 'নীলদর্পণের' অভিনয় করেন। এই দলে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাটককার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু অর্দ্ধেন্দু বাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। (যাঁহারা এবিষয়ে অন্যান্য কথা বিশেষরূপে জানিতে চাহেন, তাঁহারা বিশ্বকোষে 'রঙ্গালয়' শব্দ দেখিবেন)।

এইরূপে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গিয়াছে।—অর্দ্ধেন্দুশেখর অনন্যকর্ম্মা, অনন্যব্রত হইয়া, একমাত্র নাট্যব্রত লইয়াই জীবনের অন্য সকল সাধ, অন্য সকল কর্ত্তব্য ভুলিয়া, জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। নানা ঘটনার তাড়নায় মধ্যে মধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আসমুদ্র হিমালয় নানা স্থানে ঘুরিতে হইয়াছে, কিন্তু যেখানে তিনি গিয়াছেন, সেইখানেই নাট্যামোদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—কাশ্মীর, লাহোর, মুলতান, রাওলপীণ্ডী, মিঞামীর, অমৃতসর, দিল্লী, আগরা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী, বেথিয়া, দীঘাপতিয়া, তমলুক, বালেশ্বর, শ্রীহট্ট, বরিশাল, রঙ্গপুর প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি থিয়েটার লইয়া ঘুরিয়াছেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটার গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার, এমারল্ড্ থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার অরোরা, ইউনিক, কোহিনুর থিয়েটার, প্রভৃতি সকল সাধারণ নাট্য সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। থিয়েটার ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা, নাট্যকলার উন্নতি এবং অভিনয়ের উপযোগীতা ও উপকারিতা প্রতিপাদন জন্য এই স্বার্থত্যাগী মহাত্মা যে কি অদ্ভুত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক্ উল্লেখ বা আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অপূর্ব্ব ঘটনা একদিন লিখিত হইবে, আশা করি, তাহাতে ঐ সকল বিষয় বিশেষ রূপে বিবৃত হইবে।

গত ১২ই আশ্বিন মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁহার স্মৃতি সভায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলিয়াছিলেন,—অর্দ্ধেন্দুবাবু কেবল অভিনেতা ছিলেন না, তিনি এক জন ব্যাখ্যাকার ও ভাষ্যকার ছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার অভিনয়ের নিপুণতায় নাটকীয় চরিত্রের ব্যাখ্যা হইত এবং মানবীয় চরিত্রের জটীলাংশ গুলির বিশদ ভাষ্য পাওয়া যাইত। অর্দ্ধেন্দু বাবুর ন্যায় সদানন্দ, দুঃখ কর্ত্তৃক অজিত, আলাপ রসিক, সভাপ্রিয়, বাক্-পটু ব্যক্তি এখনকার দিনে আর নাই। চটুল রসিকতায় এবং সরস ঠাট্টাবিদ্রূপ বা রসিকতায় উপস্থিত জবাব দিতে তাঁহার ন্যায় নিপুণ ব্যক্তি আমরা দেখি নাই। শিষ্যবৎসলতা, বন্ধুবৎসলতা, সাধুতা অর্দ্ধেন্দু বাবুর চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান ও পরিস্ফুট গুণ ছিল।

তাঁহার বিয়োগে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর সকল প্রকার লোক শোকানুভব করিয়াছে। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যের প্রধান লক্ষণ এই দেখা যাইতেছে যে, ইহার সুসন্তান গণের যিনি যাইতেছেন, তাঁহার স্থানে আর তেমন কেহ জন্মিতেছেন না। অর্দ্ধেন্দু বাবু গিয়াছেন—হায়! তাঁহার স্থানও কি আর পূর্ণ হইবে! মিনার্ভার সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় সেদিন অর্দ্ধেন্দু বাবুর চিতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"মহাশয়, থিয়েটারের ইতি হইয়া গেল,—এখন হইতে আমরা ভাঁড়ের নাচ নাচিব, ঝুমুর গাহিব, 'ইহা হইতেছে না'—বলিবার কেহ রহিল না বা 'ও রকম নয়, এমনি হবে"—বলিয়া দেখাইয়া দিবারও কেহ রহিল না। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন,—'যাহার শিক্ষায় আমি এক্ষেত্রে যশোলাভ করিয়াছি, যাহার জন্য আমি করিয়া খাইতেছি, যাহার জন্য আমি তোমাদের কাছে আজ অমৃতলাল বসু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি—আমার সেই গুরু আজ চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।"

আমরা অর্দ্ধেন্দু বাবুর উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্নের প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীরের জীবন-চরিত প্রকাশ শীঘ্র দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

চতুঃষষ্ঠী কলা বিদ্যার মধ্যে নাট্যকলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কলাবিদ্যার সাধনায় যতটা শিল্প-চাতুর্য্য আবশ্যক এত আর কোন কলায় নহে। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলা বিদ্যায় বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ও শিক্ষক ছিলেন, 'শিল্প ও সাহিত্যের' পাঠকগণকে আজ তাঁহার চিত্র আমরা উপহার দিলাম।

ঠাকুরমা।

পঞ্চম সোপান।

(গত বর্ষের ২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

এবার বিমলা অনেক দিন শ্বশুরবাড়ী যায় নাই, বাপের বাড়ীতেই আছে। চারু কার্য্যোপলক্ষে বর্ম্মা গিয়াছে, বর্ম্মা হইতে বিমলাকে প্রায় পত্র লিখে, বিমলাও রীতিমত পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করে। একদিন দুপুর বেলা বিমলা নিজের তোরঙ্গ খুলিয়া কি করিতেছিল সহসা একটা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তোরঙ্গ সেই অবস্থায় রাখিয়াই বাহিরে চলিয়া

গেল। তোরঙ্গের মধ্যে কতকগুলি কাগজ পত্রের উপর একখানি খোলা পত্র পড়িয়াছিল। পত্র খানি চারু, বর্ম্মা হইতে তাহাকে লিখিয়াছে। পত্র খানিতে লেখা ছিল :—

বর্ম্মা—
সন ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, ৮ই শ্রাবণ।

বিমল,

তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়া উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইল, সে জন্য কিছু মনে করিও না। আমি কাজকর্ম্মে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আজ কাল স্নান আহারেরও যথেষ্ট সময় পাই না। বাড়ী হইতেও পত্র পাইয়াছি। মা'র শরীর যে বড় খারাপ, তাহা তুমি আগেইত শুনিয়াছ; তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। এ অবস্থায় মা'র নিকটে আমার থাকা বিশেষ আবশ্যক; কিন্তু কি করিব, বড় গোলযোগে পড়িয়াছি; একটু অবসর পাইলেই যাইতে চেষ্টা করিব। তুমি যাইয়া তাঁহার প্রকৃত অবস্থা সমস্ত খুলিয়া লিখিবে। এখন তুমি মার কাছে থাকিলে তিনি যে বিশেষ শুশ্রূষা লাভ করিবেন ও সুখী হইবেন, সে বিষয়ে আমার খুব ভরসা আছে। তুমি তাঁকে যেরূপ সেবা, যত্ন ও ভক্তি কর, তা'তে আমি কাছে না থাকিলেও মা কোনরূপ কষ্ট বা অভাব বোধ করিবেন না। যাহা হউক যদি অবস্থা খারাপ বোধ কর, তবে অবিলম্বে টেলিগ্রাফ করিবে।

আর দেখ বিমল, আমি তোমায় কেবল 'বিমল' বলিয়াই সম্বোধন করি, তাহাতে কি তুমি দুঃখিত হও? আমার ও উপন্যাসের মত ভালবাসার ছেঁদো বুকনিগুলো লিখতে আদৌ ইচ্ছে যায় না। কেন জানি না, ওসব কথাগুলো মনে হলেও যেন গা কেমন করে! ভালবাসা, প্রেম, আনন্দ একি কেবল কথার জিনিস? আমি এই রকম শাদা কথা লিখেই খুব সুখী হই। ভগবানের ও গুরুজনের আশীর্ব্বাদে আমরা যেমন সুখী, তেমন সুখ কি সকলের ভাগ্যে হয়? ভগবান্ করুন, আমরা এই রকম ভাবেই যেন জীবন কাটিয়ে যেতে পারি। আমি তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ভাল কথা; গেল সপ্তাহে তোমার হাতের তৈয়ারি চন্দ্রপুলি ও ক্ষীরের ছাঁচ পাইয়াছি, বেশ হইয়াছে—কয়দিনে আসিতে একটু সামান্য গন্ধ হইয়া গিয়াছে মাত্র। ক্ষিরের ছাঁচের ছাঁচও তুমি নিজে হাতে তৈয়ার করিয়াছ, শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। এরূপ ছাঁচ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ইহার ভিতর তুমি যেরূপ কৌশলে ঠাকুরদের নামের অক্ষরগুলি সূক্ষ্মভাবে খুদিয়াছ, তাহা দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতেছে। অধিক আর কি লিখিব, ভগবানের নিকট আমি তোমার সৎ ইচ্ছা ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

আঃ—
তোমার চারু

বিমলা তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া ঘরে ফিরিল। আসিয়া পত্র খানি লইয়া পুনরায় পাঠ করিতে লাগিল। তাহার পর কাগজ কলম লইয়া পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল।

কলিকাতা
১৩০৫— ১৫ই শ্রাবণ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেব,

আপনার কৃপাপত্র পাইয়া পরম কৃতার্থ হইলাম। মার অসুখের বিষয় আজ শুনিলাম, তিনি সেইরূপই

আছেন। কাল, ঠাকুরপো খ্যান্তর সহিত লইতে আসিবেন। সেখানে যাইয়া মার অসুখের কথা বিস্তৃত করিয়া লিখিব; তবে যত দূর শুনিয়াছি, তাহাতে তিনি একটু ভাল আছেন বলিয়া বোধ হয়। কার্য্যের ভিড়ে আপনার সময়ে স্নান আহার হয় না শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। এরূপ করিলে বিদেশে শরীর খারাপ হইতে পারে। আমি অনুরোধ করি, নিজের শরীরের প্রতি একটু মনযোগী হইবেন। আপনি সম্বোধনের কথা লইয়া কত কি লিখিয়াছেন; আমি আপনার একটু মাত্র স্নেহের আশা করি, আপনার কত কাজ—কত দিকে আপনার কত চিন্তা করিতে হয়—দিন রাত খাটিতে হয়—তাহার ভিতরেও আপনার দাসীর প্রতি এতটুকু কৃপা আছে, উহাই আমার যথেষ্ট, দাসী অধিক আর কিছুই আশা করে না। আপনি বিদেশে একাকী, চাকর বাকরের উপর সব নির্ভর করিতে হয়, দাসী নিকটে থাকিয়া সেবা করিয়া সুখী হইতে পারিতেছেনা, ইহাই দুঃখ। যাহা হউক, আপনি একটু সাবধানে থাকিবেন। মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে দিন রাত প্রার্থনা করিতেছি, নির্ব্বিঘ্নে আপনার সকল কার্য্য সমাধা হউক। ছাঁচের কথা আপনি লিখিয়াছেন, সে ঠাকুরমার অনুগ্রহ, তিনি দয়া করিয়া সে সব আমায় কিছু কিছু শিখাইয়াছেন। অধিক কি লিখিব।

আপনার একান্ত অনুগতা দাসী,
শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী দেবী।

বিমল চিঠি মোড়ক করিয়া পাঠাইয়া দিল ও বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরমার নিকট গিয়া হাজির হইল। ঠাকুরমা বিমলার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "কিরে, কোথা গেছলি? এই পিঁড়িখানার আলপনাটা একটু বাকি আছে; এইটে সেরে দেনা, এখনই রায়েদের চাকরানী আসবে অখন, ওটা সারা হলে আবার ছিরির মাতার ফুলটা দিতে হবে, গোড়ায় ঘের, ঘাগ্‌রা দিতে হবে, আল্‌তি সান্তি গড়্‌তে হবে, এখনও কত কাজ বাকি রয়েছে! নে, নে সিগ্‌গির করে সেরে নে।"

"ও আর কতক্ষণ যাবে ঠাকুরমা, সন্ধ্যার মধ্যেই সব সেরে দেব। আগে পিঁড়েখানাই করি। দেখ ঠাকুরমা, ওখানার চেয়ে এটার লতাটা বেশ হয়েছে, না? খেজুর ছড়িটাও বেশ সোজা হয়েছে—না ঠাকুরমা! এর মাঝের পদ্মটা কিন্তু একটু নতুন রকম করে দিতে হবে, কি রকম করবো ঠাকুরমা?"

"আর এখন তাড়াতাড়িতে নতুন কি করবি! এক কাজ কর, মাঝে একটা শতদল পদ্ম দে, চারিদিকে লতা পাতা, আর চা'র কোণে চারটে পদ্মের কুঁড়ি, আর মাঝে মাঝে দুই একটা ভোমরা বসিয়ে দে।"

'হ্যাঁ ঠাকুরমা, এটায় কতকগুলো ফুলের বেশ একটা তোড়ার মত করে দিলে হয় না?' ঐ ছিরির রংকরা পিটুলি আছে, একটু একটু গুলে পাঁচ রংয়ে পাঁচ রকমের ফুল করে দিই না!"

"তা পারিস কর, তবে এখনই হয় ত ওরা নিতে আসবে।"

"দেখিনা কেমন হয়, একটু তাড়াতাড়ি করি, হয়ে যাবে অখন!"

এ পীড়াখানির আলপনা মন্দ হইল না—ঠাকুরমা দেখিয়া সুখ্যাতি করিলেন। শ্রীর মাথার ফুল, কোমর-

দণ্ড সুন্দর হইয়াছে। মাথার ফুলটী ঠিক সোনার াপার মত হইয়াছে। যেমন রং, তেমনি গড়ন, খিলে বোধ হয় যেন গাছ থেকে ফুলটী তুলে এনে সিয়ে দিয়েছে। গায়ের ফুলগুলোও বেশ, কোনটী খল, কোনটী জুঁই, কোনটী করবী, কোনটী আবার ক অপরাজিতার ফুলের অনুরূপ। বিমলার শ্রী খিয়া সকলেই সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কেনই া না করিবে? ঠাকুরমার নিকট সে এসব কাজ যে ব মন দিয়া শিখিয়াছে!

আজ বিমলা শ্বশুর বাড়ী যাইবে, বাড়ীতে তাহার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। ঠাকুরমা একটী াটীতে খানিকটা দুধের সর, একটু কাঁচা দুধ, গোটাকতক ময়দা লইয়া বিমলার গাত্রে মাখাইয়া দিতেছেন আর বলিতেছেন "আজ কাল মেয়ে মদ্দের কি যে সাবান ফাবান মাখা রোগ হয়েছে, তা' আর বলবার নয়, ওতে চর্ব্বি-ফর্ব্বি কত কি যে আছে, তার ঠিকেনা নেই। মহাপাতক আর কি, ওগুলো না মাখলেই নয়,—আমাদের ত ছুতে ঘেন্না করে। আর ওসব গায়ে মেখে হয়ই বা কি? আমাদের গায়ে মাখবার যে সব মস্‌লা চিরকাল চলে আসছে, তার কাছে কি আর ও সব? যারা সাবান মাখে, প্রায়ই দেখা যায় তাদের গা কি এক রকম খস্‌খসে হয়ে যায়—তা ছাড়া ওতে চুণ, চর্ব্বি, সাজিমাটী, সোডা যে সব জিনিস আছে, শুনতে পাই তাতে গায়ের চামড়া মোলায়েম হওয়া দূরে থাকুক, আরও নানা রকম ব্যায়রাম হয়। আগে আমাদের এত নতুন নতুন সাবান ফাবানও ছেল না, এত নানা চঙের ব্যায়রামও ছেল না। আমাদের দেশে 'তেলে জলে দেহ' এই চিরকালই শুনে আসছি, তাই ক'রে মানুষ সুস্থ, সবল, দীর্ঘজীবি হতো। বিলিতি ঢং যা দেখবে তাই করতে হবে, এই করেই আমাদের দেশটা উচ্ছোন্নোয় গেল। আমাদের গায়ে মাখবার যত রকম ব্যবস্থা আছে, তা যদি বিলেতের লোক জানতে পারে, তাহলে বোধ করি তারাও সাবান মাখা ছেড়ে দেয়। দিন কয়েক উপরোউপরি এই কাঁচা দুধ, ময়দায় আর একটু সর মিশিয়ে, গায়ে বেশ করে মেখে, একটু শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেললে গা যেমন কোমল হয় আর কান্তিও যেমন বাড়ে, তেমন হাজার সাবানই ঘস আর পমেটমই মাখ, কিছুতেই হবে না। এ সব আমাদের খুব দেখা আছে: এ ছাড়া আরও কত কি আছে, দু পাঁচটা শিখে রাখ্ বিমল! (২) ফদম্‌পাতা, লোধ আর অর্জ্জুনফুল এক সঙ্গে বেটে গায়ে মাখলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়।"

ক্রমশঃ
শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

ভক্তের ভক্তি।

নীল চন্দ্রাতপতলে প্রশান্ত জাহ্নবী
রয়েছে পড়িয়া স্বচ্ছ কাচ-খণ্ড মত—
বেলা-ভূমে বিরাজিত অসংখ্য পাদপ,
ঊর্দ্ধ মুখে চেয়ে আছে যেন ভাবাবেশে।
গগনে উড্ডীয়মান বিহঙ্গম ছায়া
ভাসিতেছে শান্ত নীরে, ক্বচিৎ বা যূথ-
ভ্রষ্ট করীমত-খণ্ড-মেঘ-প্রতিবিম্ব
পড়িয়াছে জলে—গৈরিক-রক্তিম আভা!
স্থানে স্থানে মন্দ জলে জাগিয়াছে চর,
তৃণহীন, বৃক্ষহীন মরু-ভূমি মত:—
হইয়াছে সেই স্থান পক্ষী সমাকুল।
মধ্যে মধ্যে মৃদু মন্দ দক্ষিণ অনিল
কাঁপাইয়া নদীবক্ষ খেলি'ছে কৌতুকে,
ক্ষুদ্র বীচিমালা সৃষ্টি হইতেছে তাহে।
অস্তগামী রবি করে সোণার বরণ
মাখিয়াছে তৃণ, বৃক্ষ, তটভূমি, আর
দিকচয়—সোণার বরণ ঊর্ম্মি-মালা!
প্রকৃতির এ অনন্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে
চলিয়াছে তরী এক মন্থর গতিতে,
নাচিয়া নাচিয়া মরি তরঙ্গ হিল্লোলে।
আরোহীর সংখ্যা নহে অধিক তেমন—
এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ আর ছয়—
কই! আর নাই,—স্তব্ধ-নেত্রে আছে চেয়ে
হাস্যময়ী প্রকৃতির মুহাপট পানে।

সৌন্দর্য্য-মদিরামত্ত আরোহী জনৈক—
একবার চাহিল সে ঊর্দ্ধে নীলাকাশে;
আরবার দেখিল সে উদার তটিনী—
মুদিল নয়ন পরে ধীরে ধীরে ধীরে;
অব্যক্ত আনন্দে তার ভরিল হৃদয়।
ধীর কণ্ঠে ব্রীড়াশীল বালকের মত—
করিতে লাগিল সুরা পূরবী আলাপ;
কি আরোহী, অবরোহী, মূর্চ্ছনা, গমক,
ক্রমে ক্রমে কত উচ্চে উঠিল সে তান!
তট হ'তে তটান্তরে মাত্র প্রতিধ্বনি
সে ভক্তের পুরস্কার করিল ঘোষণা।

অবিরাম চলিয়াছে সে ক্ষুদ্র তরণী,
গ্রাম উপগ্রাম ত্যজি' মথিয়া জাহ্নবী—
দক্ষিণেশ্বরেতে শেষে এসে উপস্থিত।
অভ্রভেদি মন্দিরের উচ্চ চূড়া চাহি',
ভক্তগণ, উদ্দেশেতে করিল প্রণাম
কালভয়নিবারিণী মহাকালী পদে।
চলিল না তরী আর!—গঙ্গাবক্ষে বালু-
চর উঠেছে জাগিয়া; নগ্নপদে জল
ভাঙ্গি চলিল ভকত-বৃন্দ তীরভূমে—
পুষ্প-শয্যা পাতি' যেন আহ্বানিছে সবে।
ভক্তকুল প্রদক্ষিণ করি' শ্রীমন্দির
পঞ্চবটী তলে গেল নমস্যে নমিতে,
কি মহত্ত্ব রহিয়াছে মাখান চৌদিকে!

জবাকুসুমের মত স্নিগ্ধ শান্ত-রবি
চলিয়া পড়িল দূরে বিটপী আড়ালে—
ছড়াইয়া রক্তিমাভা দূর দূরান্তরে।
শোকাশ্রু পূরিত নেত্রে দানিল বিদায়
বিহগ—কাকলীচ্ছলে—শ্রান্ত দীননাথে।
সন্ধ্যার তিমির-ঘটা ছাইল অম্বর,
জগত হইল স্তব্ধ নিশা সমাগমে।
ভক্তজন ভক্তিভরে জগন্মাতা নাম
গাহিল ইমন সুরে মাতাইয়া প্রাণ:
সান্ধ্য-বায়ু রঙ্গে-ভঙ্গে কাঁপাইয়া তা'য়
তুলিল বিমান মার্গে বৈদ্যুতিক তেজে।
চেয়ে দেখি চারিধার ঘেরেছে আঁধার
ভক্ত সেথা নাই,—কিন্তু, ভক্তি আছে তাঁর!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

অন্তরাল।

তোমারে আড়াল করি বিশ্ব বসুন্ধরা
কেন দাঁড়াইয়ে আছে দিবস-শর্ব্বরী;—
মোর প্রিয় আত্মা-বধূ বিচ্ছেদ-কাতরা
উঠে তীব্র হাহাকার সারা মর্ম্ম ভরি'!
হে দেবি উপাস্যা মোর! নিষ্ঠুর সংসার
তোমারি কি যোগ্য-স্থান, না পারি বুঝিতে;
দূরে রহি' দীন ভক্ত কাঁদে অনিবার,
আকাঙ্ক্ষা মিটায়ে তোমা না পারি পূজিতে।
এস আজি হে কল্যাণি, হেমন্তের নব
সুশীতল শান্তি-স্নিগ্ধ প্রভাতের মত;
তোমারি মন্দির-দ্বারে অর্চ্চনার্থী সব
এনেছে হৃদয়-অর্ঘ্য তপস্যায় শত!
অন্তরাল অন্ত করি' বাঞ্ছিতা আমার,
দেখা দাও পরিপূর্ণ গৌরবে তোমার!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

অহল্যাবাই।

The Indian Art School, Bowbazar, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড। | সন ১৩১৫—অগ্রহায়ণ। | ৩য় সংখ্যা।

তন্ত্র কি ?

(২২ পৃষ্ঠার পর)

ইহার পর আসনে বসিবার প্রণালী শাস্ত্রে যাহা ব্যক্ত আছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। যেরূপ ভাবে বসিলে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির ও মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, অথচ হৃদয়ে পবিত্রভাব অনুভূত হইতে থাকে সেইরূপ ভাবে উপবেশন করাকেই বসিবার প্রণালী বা আসন-বিধি কহে। শাস্ত্রে আসনের বহুবিধ প্রণালীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পাঁচটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১ম, সিদ্ধাসন; ২য়, পদ্মাসন; ৩য়, বীরাসন; ৪র্থ, ভদ্রাসন; ৫ম স্বস্তিকাসন। এই আসন প্রণালীগুলিও শাস্ত্রে সাধকের অবস্থানুসারে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। উপযুক্ত গুরু শিষ্যের সাধনাবস্থা দেখিয়া যথাবিধি উপদেশ প্রদান করিবেন।

মানবের মনোবৃত্তি অনুসারে বাহ্যিক ভাবের যে, স্বাভাবিক বিকাশ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভয়, ক্রোধ, ভক্তি, দুঃখ, চিন্তা, আনন্দ ইত্যাদি অবস্থায় প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই তাহার ভাব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সে সময় দেখিলেই অন্য ব্যক্তি সহজে বুঝিতে পারে যে, এ ব্যক্তির মনের ভাব এখন এই রূপ; অর্থাৎ এ ব্যক্তি হয় উত্তেজিত, ভীত বা রাগান্বিত হইয়াছে, না হয় দুঃখ, চিন্তা ও মর্ম্ম পীড়ায় পীড়িত হইয়াছে, অথবা আনন্দ উৎফুল্ল হৃদয়ে ভগবদ্‌ভাবে গদ গদ হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল ভাব মানবের স্বাভাবিক। ইচ্ছা করিয়া সহজে গোপন করিতেও পারা যায় না, আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। মানব যখন নানাবিধ সুন্দর মূল্যবান পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া সম্মানার্হ আসনে উপবিষ্ট থাকেন, অথবা তদবস্থায় অনাবশ্যক অধিক ধন সঙ্গে লইয়া

পদব্রজে স্থানান্তরে গমন করেন, সে সময় পথিমধ্যে ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত কোন দরিদ্র ব্যক্তি সম্মুখে পড়িলে যেন সহজেই গর্ব্বের সহিত তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় "এই হট্ যাও"। আবার সেই ব্যক্তিই সময়ান্তরে সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া কোন কারণে আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া চিন্তিত মনে যাইতে যাইতে সম্মুখে সেইরূপ ব্যক্তি দেখিলে তাহাকে কোন কথা না বলিয়া নিজেই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবেন অথবা বলিবেন "বাপু একটু রাস্তা দাও ত"। আবার যখন সেই ব্যক্তি প্রাতঃকালে পবিত্র হৃদয়ে গঙ্গার স্নিগ্ধ সলিলে স্নান করিয়া, সুপবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করতঃ পুষ্পচন্দনাদি পরিশোভিত মন্দিরমধ্যে দেব দেবী সন্নিধানে পূজাসনে উপবিষ্ট হন তখনই বা তাঁহার চিত্তের কি ভাব, প্রত্যেক মানব তাহা নিজে নিজেই বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অবস্থা বিশেষে মনের ভাব বিভিন্ন প্রকার ধারণ করে। যাহা স্বাভাবিক তাহাই ক্রিয়ার অনুকূল। মনে রাগ হইয়াছে, এক ব্যক্তিকে তখনই শাসন করিতে হইবে, সে সময়ে গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অবিলম্বে জামার 'আস্তিন' গুটাইয়া বা 'মালকোঁচা' বাঁধিয়া অথবা বাহুস্ফোট্ করিতে করিতে অন্য ব্যক্তির গর্দ্দান আক্রমণ করিবে, ইহাই তখন স্বাভাবিক, আবার এক সময় পুত্র-শোক উপস্থিত হইয়াছে, সে সময় বীরোচিত আচরণ কখনই আসিবে না, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিন্তা-নিমগ্ন চিত্তে মস্তক অবনত হইবে, নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকিবে, হস্ত কপোলসংযুক্ত হইবে, ইহাই তখন স্বাভাবিক। এইরূপ ভগবদ্ভক্তি ও আরাধনা উদ্দেশ্যে মানবের যে ভাবগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক তাঁহারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া আর্য্য ঋষিগণ উপবেশন প্রণালী বা আসনপ্রকরণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ আসনের মধ্যে পদ্মাসন, বীরাসন ও স্বস্তিকাসন সরল ও সুবিধা জনক।

পদ্মাসন :—বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর পর বাম পদ সংস্থাপন করিয়া উন্নতভাবে স্থির নেত্রে বসিবার নাম পদ্মাসন এবং উভয় হস্ত পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি এবং বাম হস্তের দ্বারা বাম পদের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দৃঢ় রূপে ধারণ করিলে বদ্ধ পদ্মাসন বলা যায়।

বীরাসন :—এক পদ ভিন্ন উরুর উপর এবং অন্য পদ ভিন্ন উরুর নিম্নে স্থাপন করিয়া বসিবার নাম বীরাসন।

স্বস্তিকাসন :—জানু দ্বয় ও উরু দ্বয়ের সন্ধিদেশে পদতলদ্বয় সংস্থাপন করিয়া লম্বভাবে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

এই তিন প্রকার আসনের মধ্যে যাহার যেটী ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, তবে বীরাসন রাজসিক পূজায় প্রশস্ত, স্বস্তিকাসন সাত্ত্বিক পূজায় এবং পদ্মাসন বা বদ্ধ পদ্মাসন স্বাত্ত্বিক ও রাজসিক উভয় পূজাতেই বিশেষ উপযোগী কারণ উচ্চাবস্থায় সাত্ত্বিক ও তামসিক উভয়ই সমান। এই সকল উপদেশ গুরু পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্রে প্রকট নাই। কোন গ্রন্থ পড়িয়া সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই সকল আসনের যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র আসন সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন যে :—

"আত্মসিদ্ধি প্রদানাঞ্চ সর্ব্বরোগনিবারণাৎ।
নবসিদ্ধি প্রদানাচ্চ আসনং পরিকীর্ত্তিতং॥"

অর্থাৎ 'আত্মসিদ্ধি প্রদান হেতু' এই বাক্যের আদ্যক্ষর (আ), 'সর্ব্বরোগ নিবারণ হেতু' এই বাক্যের আদ্যক্ষর (স), এবং 'নবসিদ্ধি প্রদানহেতু' এই বাক্যের আদ্যক্ষর (ন) যথাক্রমে আ+স+ন মিলিত হইয়া 'আসন' হইয়াছে।

সাধনার্থির হৃদয়ক্ষেত্র সাধনোপযোগী হইবার পর বা সঙ্গে সঙ্গেই আসনানুষ্ঠানের আবশ্যক। যতক্ষণ জীবের হৃদয় ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা সুবিমল না হয়, ততক্ষণ কেবল আসনের অনুষ্ঠানেও সাধনার কোন ফল পরিলক্ষিত হইবে না। অর্থাৎ সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত যম ও নিয়মনির্দ্দিষ্ট অহিংসা, অলোভ, সত্যানুষ্ঠান, ভগবদ্ বিশ্বাস ও ভক্তিদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেই যথাশাস্ত্র আসনের ব্যবস্থা করা বিধেয়। শ্মশান বা সব-সাধনা প্রভৃতি সময়ে আসনের আরও কঠিনতর বিধি আছে।

ভূমিতে ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া "আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে আসনের আধার শক্তিসমূহের পূজা করিতে হয়। অনন্তর তদুপরি পূর্ব্বোল্লিখিত যে কোন আসন বিস্তৃত করিয়া "ওঁ মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলংছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ" এই মন্ত্রে ঋষ্যাদির স্মরণ পূর্ব্বক

"পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনাধৃতা।
তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনং॥"

এই মন্ত্রে আধার শক্তি দেবীর আরাধনা করিতে হয়, পরে "হ্রীঁ আধার শক্তি কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিবার বিধি আছে। এই সময় আসনোপবিষ্ট হইয়া আসনপূজা করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, সে সমস্তই আসনস্থিত শক্তিসমূহের স্থিরীকরণ জন্য জানিতে হইবে।

যোগের চতুর্থাঙ্গ—'প্রাণায়াম'।

যখন যম, নিময় ও আসনসহযোগে যোগের তিনটী অবস্থায় পূজক বা যোগীর চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে পুষ্ট হইবে, তখনই তাহার প্রাণায়াম অভ্যাস করা বিধেয়, নতুবা নানাবিধ ব্যাধির সূচনা হইতে পারে। অনেকেই পুঁথি পড়িয়া বা প্রাণায়াম বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির হ্রাস বৃদ্ধি ও নিরোধ বা পূরক, কুম্ভক ও রেচক রূপ প্রাণায়াম করিয়া পরিশেষে শ্বাসকাশ ভোগ করতঃ দেহপাত করেন। সুতরাং এ বিষয়ে সিদ্ধ-গুরূপদেশ ব্যতীত অগ্রসর হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে। যোগাঙ্গ মধ্যে প্রাণায়াম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহার সংক্ষিপ্তবিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সাধনপাদ পাতঞ্জলে লিখিত আছে যে,—

"তস্মিন সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।"

নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুর সাধারণ গতির যোগবিধি অনুসারে বিচ্ছেদ সাধনই প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত আছে। এই প্রাণায়াম সাধারণতঃ বৃত্তি ভেদে ত্রিবিধ। বাহ্য, অভ্যন্তর ও স্তম্ভবৃত্তি। বাহ্য অর্থাৎ রেচক বা প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা। অভ্যন্তর অর্থাৎ পূরক বা নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা এবং স্তম্ভ অর্থাৎ কুম্ভক বা নিশ্বাস বায়ুতে দেহ পূর্ণ করিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখা। এই তিনের সমষ্টিকে প্রাণায়াম বলে। দীর্ঘ ও সূক্ষ্মভেদে এই

প্রাণায়াম আবার দ্বিবিধ। তাহা সংখ্যা ও শরীরের অবস্থা অনুসারে অবগত হওয়া যায়। ১৬ মাত্রায় পূরক, ৬৪ মাত্রায় কুম্ভক এবং ৩২ মাত্রায় রেচক দ্বারা যে প্রাণায়াম হয় তাহাই সূক্ষ্ম। ইহা হইতে দীর্ঘ কাল অর্থাৎ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ এইরূপ অধিক-ক্ষণ করিতে পারিলে দীর্ঘ প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হয়, চক্ষের পলকের নাম মাত্রা। মাত্রার সংখ্যা মূল মন্ত্র দ্বারা গণনা করিতে হয়। প্রাণায়ামে বায়ু পুরণকালে সর্ব্ব শরীর যদ্যপি চিন্ চিন্ করিতে থাকে তবে জানিবে উহা দীর্ঘ এবং ঐরূপ চিন্ চিন্ না করিলেই সূক্ষ্ম বলিয়া জানিবে।

—পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিবিধ কার্য্যকে প্রাণায়াম বলে, আবার প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর সংযোগকেও প্রাণায়াম বলা যায়।

যম, নিয়ম ও আসন ভেদের ন্যায় প্রাণায়ামও অষ্টবিধ।

সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভিকাঃ॥

১ সহিত, ২ সূর্য্যভেদ, ৩ উজ্জায়ী, ৪ শীতলী, ৫ ভস্ত্রিকা, ৬ ভ্রামরী, ৭ মূর্চ্ছা, ৮ কেবলী।

১। সহিতঃ—সাধারণভাবে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুর যথাক্রম পুরণ ও রেচণাদি দ্বারা যে প্রাণায়াম হয় তাহারই নাম সহিত। ইহা আবার দ্বিবিধ, সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজমন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে যে প্রাণায়াম, তাহার নাম সগর্ভ এবং বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কুম্ভকাদি করণের নাম নির্গর্ভ।

২। সূর্য্যভেদঃ—প্রথমে সূর্য্যনাড়ী বা পিঙ্গলা-নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয় যে পর্য্যন্ত কেশের অগ্রভাগ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত কুম্ভক করিবে ও সমান বায়ুকে 'নাভিমূল হইতে সুষম্নায় উদ্ধৃত করিতে যত্নবান হইবে, পরে ইড়া অর্থাৎ বাম নাসাপথে ক্রমশঃ ধৈর্য্যের সহিত সম্পূর্ণ বেগ না দিয়া রেচন করিবে। পুনরায় বার-বার ঐরূপ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। ইহা দ্বারা জরা মৃত্যু বিনষ্ট, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বোধিত ও দৈহিক অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

৩। উজ্জায়ীঃ—উভয় নাসিকা-পথদ্বারা বহি-র্ব্বায়ু এবং হৃদয় ও গলদেশদ্বারা অন্তর্ব্বায়ু আকর্ষণ-পূর্ব্বক মুখের মধ্যে কুম্ভক করিয়া ধারণা করিবে। পরে মুখ প্রক্ষালনের ন্যায় করিয়া জালন্ধর নামক মুদ্রা করিবে এইরূপে যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া অবিরোধে বায়ু ধারণা করিবে। ইহাতে আমবাত, ক্ষয়, কাশ, জ্বর ও প্লীহাদি রোগ জন্মিতে পারে না ও জরা মৃত্যু বিনষ্ট হয়। সাধারণ প্রাণায়ামে কোন ব্যাধি উপ-স্থিত হইলে, ইহাই তাহার প্রতিশেধক বিধি।

৪। শীতলীঃ—জীহ্বাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া উদরপূর্ণ করতঃ কুম্ভক করিবে, পরে উভয় নাসাদ্বারা রেচন করিবে। ইহা দ্বারা অজীর্ণ ও কফ-পিত্তাদি রোগ জন্মিবে না। ইহাও প্রাণায়াম-ব্যাধি বিনাশক।

৫। ভস্ত্রিকা ঃ—কর্ম্মকারগণ ভস্ত্রিকা বা জাঁতা-দ্বারা যেমন করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, সেইরূপে উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ উদরে চালিত করিবে। এইরূপে বিংশতিবার বায়ু চালনা করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ু ধারণ করিবে, পরে উভয় নাসাপুট দ্বারা জাঁতাকলের ন্যায় বায়ু রেচন করিবে। সাধক তিনবার এই কুম্ভক বা

প্রাণায়াম করিবে, ইহাতে কোন রোগ বা ক্লেশ থাকে না, থাকিলে ক্রমে আরোগ্য হইয়া যায়।

৬। ভ্রামরীঃ—গভীর নিশাকালে জন-মানব-পরিবর্জ্জিত যোগ-সাধনোপযোগী স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উভয় কর্ণ হস্ত দ্বারা বন্ধ করিয়া পূরক ও কুম্ভকাদি করিবে। এইরূপ করিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ নাদ শব্দ শ্রুত হইবে। প্রথমে ঝিঁঝিঁ পোকার মত শব্দ, পরে বংশীধ্বনি শুনিতে পাইবে, তৎপরে মেঘগর্জ্জন, ক্রমে ঝর্ঝরী, ভ্রমরী, ঘণ্টা, কাংশ, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ ও একত্রে অনেক দুন্দুভিঃ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের নিনাদ শুনিতে পাইবে। ক্রমে নিত্য অভ্যাসসহযোগে যোগীগণ হৃদয়পদ্মস্থিত অনাহত-ধ্বনি শুনিতে পাইবে, অনন্তর সেই ধ্বনি-মধ্যস্থিত জ্যোতিঃ যোগীর দর্শন লাভ হয়। সেই কলিকাকার দীপজ্যোতিঃ ব্রহ্ম-স্বরূপ, যোগীর চিত্ত তাহাতে সম্মিলিত হইলেই সমাধি সিদ্ধির পথ সুগম হইয়া থাকে।

৭। মূর্চ্ছা ঃ—সাধারণ ভাবে প্রাণায়াম করিয়া চিত্তবৃত্তিকে জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্তি করতঃ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি আজ্ঞাচক্রে মনঃসংযোগদ্বারা পরমাত্মাতে লীন হইবার নাম মূর্চ্ছা প্রাণায়াম। ইহা দ্বারা পরমানন্দ সমুদ্ভূত হয়।

৮। কেবলী।—উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আক-র্ষণ করিয়া কেবল কুম্ভক করিলে, কেবলী প্রাণায়াম বলা যায়। এক হইতে ক্রমে চতুষষ্ঠিবার পর্য্যন্ত মূল-মন্ত্রের দ্বারা জপসংখ্যা রাখিয়া বায়ু ধারণ করিবে। এই কুম্ভক প্রতি প্রহরে প্রহরে করা আবশ্যক। তাহাতে অসমর্থ হইলে সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচবার, তাহা-তেও অসমর্থ হইলে চতুর্সন্ধ্যায় বা ত্রিসন্ধ্যায় কুম্ভক করিবে। যে পর্য্যন্ত 'অজপা' পরিমাণ বা একুশ হাজার ছয় শত বার কুম্ভক পরিসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে কুম্ভক করিবে এবং প্রত্যহ কুম্ভকের সংখ্যা পাঁচবার করিয়া বৃদ্ধি করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে অন্তত একবারও বৃদ্ধি করা বিধেয়। কেবলী প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে যোগী-গণের ভূতলে কিছুই অসিদ্ধ থাকে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ।

ত্রিরত্ন-বিজয়।

(৩৯ পৃষ্ঠার পর)

সেই বৃদ্ধ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর পাদপ্রান্তে বসিয়া রাজ-কুমার অশোক বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ, বিশ্বাস ও ভক্তির শান্তজ্যোৎস্নায় রাজকুমার অশোকের উদার বদনমণ্ডল সমুদ্ভাসিত।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন "শুন বৎস! আজ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপনের দিন আসিয়াছে, ভগবান্ বুদ্ধদেবের ইহাই অভিপ্রায় যে, তুমিই সেই ধর্ম্ম স্থাপন করিবে।"

"ভগবন্ আপনার কথা ঠিক্ বুঝিতে পারিতে-ছিনা, শুনিয়াছি দুইশতবৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ শাক্য সিংহই ত ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের ভার ত সন্ন্যাসীর উপর, আপনি কি আদেশ করিতেছেন যে, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব?"

এই বলিয়া উৎসুক-নেত্রে—আরও অবধানের সহিত—কুমার অশোক সেই দিব্য পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া, মস্তক অবনত করিলেন।

"না বৎস!—তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ভগবান্ আদেশ করিতেছেন না, সন্ন্যাসীর কার্য্য ধর্ম্ম-চক্রের উদ্ভাবন, ভগবান শাক্যসিংহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্ম-চক্রের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই নবোদ্ভাবিত ধর্ম্মের বিস্তার ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য, এক্ষণে রাজ-শক্তির প্রয়োজন, সেই রাজশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে, ধর্ম্ম-চক্র স্থাপন নিষ্ফল হইবার উপক্রম হইয়াছে, জীব-গণের দুঃখ মোচনের জন্য ভগবানের আজীবন প্রয়াস ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, বহুদিনের সঞ্চিত কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকস্বার্থ, জাত্যভিমানের তীব্রতা এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা মিলিত হইয়া, নবোদিত ধর্ম্মের প্রতিকূলে এইরূপ শক্তিসঞ্চয় করিতেছে যে, এক্ষণে সাম্রাজ্য শক্তির সাহায্য না পাইলে, এই দয়ার—শান্তির—জ্ঞানের—ও অহিংসার ধর্ম্ম এ জগতে আর অবস্থান করিতে পারিতেছে না, এই রূপ অবস্থায়—এই ভীষণ বিপদ হইতে এই সত্য ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ শাক্যসিংহ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তুমিই এক মাত্র এই কার্য্য করিতে সমর্থ, বৎস ভীত হইও না, বিশ্বাসকে দৃঢ়তর কর, কল্য কুমার মহেন্দ্র তোমার সহিত মিলিত হইবেন, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সসৈন্যে পাটলী-পুত্রের দিকে অগ্রসর হও, যাও পূর্ব্ব পুরুষগণের ভুজবলার্জ্জিত সিংহাসনে উপবেশন কর, ধর্ম্ম ও শান্তির রাজ্য ব্যবস্থাপিত কর, তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিষয়াসক্ত ও অন্ধবিশ্বাসী, প্রজাপালন করিবার অধিকার তাহার নাই, সে ভীরু—সে কাপুরুষ—তাহার ক্রোড় সাম্রাজ্য লক্ষ্মীর বাসযোগ্য নহে। এই কার্য্যে শঙ্কিত হইও না, আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি যে, তোমাকে দ্বার করিয়া ভগবান্ ভারতে তাঁহার পবিত্রকে ধর্ম্মকে অচিরেই সুদৃঢ় করিবেন।" নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে—এক দৃষ্টিতে—সেই স্থবির শ্রমণকের গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তাঁহার সেই সেই প্রশান্ত গম্ভীর স্বর-লহরী শুনিতে শুনিতে—কুমার অশোকের হৃদয়ে যেন এক নূতন আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল, অজ্ঞান ও সন্দেহের অন্ধকার যেন আপনা হইতেই অপসৃত হইতে লাগিল, তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সেই বৃদ্ধ শ্রমণক আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বৎস!—চারিদিকের অবস্থা একবার পর্য্যবেক্ষণ কর! কি দেখিবে? চারিদিকে অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে, ব্রাহ্মণগণ আত্ম সম্প্রদায়ের প্রাধান্য চিরস্থায়ি করিবার জন্য—বিদ্যার প্রচার যাহাতে আরও সীমাবদ্ধ হয়, তাহারই জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই শাস্ত্রপাঠে অধিকার ছিল, এখনও নাম মাত্র তাহাই আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, এখন জ্ঞান-ধনে একমাত্র ব্রাহ্মণই অধিকারী, সামান্য মাত্র বর্ণপরিচয় এবং শুক্রনীতির মোটামুটী কয়েকটী কথা কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের পাঠ সমাপ্তি হয়, সামান্য গণিত এবং বার্ত্তা-শাস্ত্রের সামান্য সামান্য বিষয় জানিতে পারিলেই বৈশ্যের বিদ্যা শিক্ষা শেষ হয়, কিসে মূলধনের বৃদ্ধি হয় তাহা জানিতে পারিলেই এখন বৈশ্যের পক্ষে যথেষ্ট—লেখা পড়া না শিখিয়া—

অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্য, অশ্বারোহণে পটুতা এবং সেনা-সন্নিবেশে দক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই এখন ক্ষত্রিয়ের ঐহিক শিক্ষায় চূড়ান্ত হইল; তাহার পর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অধম বর্ণ—ব্রাহ্মণের দাসত্বই যাহাদের জীবিকার উপায় ও স্বর্গে যাইবার একমাত্র সাধন, সেই শূদ্রজাতির অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ, সে যদি তোমাদের পবিত্র শ্রুতি শুনিতে সাহস করে, দেও তাহার কর্ণে—অগ্নিবর্ণতরল লৌহ ঢালিয়া! প্রাণবিয়োগই তাহার এই দুরন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত! কোটি কোটি লোক—ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিবেনা, আত্মার কর্ত্তব্য কি তাহা স্বাধীনভাবে ভাবিতে পারিবে না—দর্শন, জ্যোতিষ শ্রুতি ও বিজ্ঞানের আলোক তাহার চির অজ্ঞানান্ধকারাবৃত উপেক্ষিত হৃদয়ে একবারও প্রবেশ করিবেনা, কেবল মর্ত্ত্যের একমাত্র দেবতা—ব্রাহ্মণের পূজা করাই তাহার জীবনের সার ব্রত! ব্রাহ্মণের কাম, ক্রোধ ও মোহের চরিতার্থতার জন্য তাহার স্ত্রী-পুত্র ধন এমন কি শরীর পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে হইবে, না করিলে ইহলোকে তাহার সর্ব্বনাশ—আর পরলোকে অনন্ত নরক! বৈশ্য ধন অর্জ্জন করে, কাহার জন্য? ব্রাহ্মণের জন্য। ক্ষত্রিয় নররক্তস্রোতে পৃথিবী ভাসাইয়া, সাম্রাজ্য অর্জ্জন করে, কাহার জন্য? ব্রাহ্মণের জন্য—ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষা করুক বা না করুক, সে পৃথিবীর জীবন্ত দেবতা—তাহার চরিত্র পশুর চরিত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট হউক না কেন, তথাপিও সে ব্রাহ্মণ, তাহার অসম্মান করিলে অনন্ত নরক—সবংশে উচ্ছেদ! বৎস ব্রাহ্মণের এই দুরন্ত অত্যাচারে মানবের আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইতে চলিয়াছে, জ্ঞানের আলোক ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, চারিদিকে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের বিষময় ফল ছড়াইয়া পড়িতেছে—ইহার প্রতীকার না করিলে মানব জাতির সর্ব্বনাশ হইবে, এই দুর্ব্বিষহ অধীনতা অজ্ঞতা—অজ্ঞের উপর জ্ঞানাভিমানীর এই ধর্ম্মচ্ছলে অত্যাচার, মানবের জ্ঞান ও সভ্যতার বিনাশের পথকে ক্রমশই প্রশস্ত করিতেছে, ইহারই প্রতীকারের জন্য ভগবান্ শাক্যসিংহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সূর্য্যালোক যেমন ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলোকিত করে, বিদ্যার আলোকও সেইরূপ মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুক, জ্ঞান ছাড়া দুঃখ বিমোচনের অন্য কোন পথ নাই, সেই দুঃখ মোচনের একমাত্র পথ জ্ঞানকে যাঁহারা নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বিবেচনা করে, অপরকে সেই পথে চলিতে যাহারা বাধা দেয়, সে জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য! তাহাদের—সেই ব্রাহ্মণ জাতির আত্মম্ভরিতা হইতে ধর্ম্ম এবং সভ্যতার পরিত্রাণ করিবার চেষ্টায় যদি প্রাণও যায়, বৎস! তাহার জন্য শঙ্কিত হইওনা, ভগবান তোমার আত্মার উদ্ধার করিবেন," এই কথা বলিতে বলিতে সেই প্রবীণ সন্ন্যাসী আসন ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর একবার সেই প্রশান্ত স্থির দৃষ্টি অশোকের মুখের উপর সন্নিবেশিত করিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বৎস! ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইলে, এক্ষণে অঙ্গীকার কর, তুমি তাঁহার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছ!"

"ভগবন্! তাহাই হইবে, ভগবানের অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হইবে, আমি কল্যই পাটলীপুত্র অভিমুখে যাত্রা

করিব, আমার হৃদয়ের অন্ধকার মিটিয়াছে, মনুষ্য সমাজে ধর্ম্ম জ্ঞান ও শান্তি স্থাপনের জন্য যদি আমার প্রাণও যায়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র শঙ্কিত হইব না আপনার আদেশই আমার শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া, কুমার সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চরণে মস্তক লুটাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সন্ন্যাসী আর অপেক্ষা না করিয়া অশোকের প্রণাম শেষ হইবার অগ্রেই সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমশঃ

ব্র.ক্ষণ পণ্ডিত।

ভাস্কর্য্য।

(১১ পৃষ্ঠার পর)

ছত্রের ন্যায় চামরও নৃপতিবৃন্দের নিতান্ত সম্মান-সূচক আদরের বস্তু ও রাজ-চিহ্ন-বলীর অন্তর্ভুক্ত। ভাস্কর্য্যমধ্যে ইহার বহু আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। নানা স্থানে ব্যজনার্থেও চামর ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে। এই চামরের বর্ণাদি ভেদে যে সকল লক্ষণ আর্য্য-শাস্ত্রমধ্যে লিখিত আছে এক্ষণে সেই সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। "বৃহৎ সংহিতা" ও "যুক্তিকল্পতরুর" বর্ণনানুসারে স্থলজ ও জলজ ভেদে ইহা দ্বিবিধ। স্থলজ চামর পার্ব্বতীয় চমরী গো'র পুচ্ছ। পাহাড়ীরা নানা কৌশলে সেই গো-পুচ্ছ কাটিয়া আনে, তাহাই কাষ্ঠের দণ্ডে আবদ্ধ করতঃ দণ্ডটী স্বর্ণাদি ধাতু ও মণিমণ্ডিত করিলে ব্যবহারোপযোগী হয়। এই চামর সাধারণতঃ মেরু, হিমালয়, বিন্ধ, কৈলাস, মলয়, গন্ধমাদন এবং উদয় ও অস্তগিরি নামক পর্ব্বত সমূহ হইতে প্রাচীন কালে সংগৃহীত হইত। বর্ত্তমান সময়েও ঐ সকলের প্রত্যেক পর্ব্বতে চমরী বিচরণ করে, কি না তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। সংস্কৃত শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট উক্ত পর্ব্বতের কোনও কোনও-টীর স্থান নির্ণয় সম্বন্ধেও বহু মত বিরোধ আছে। সে যাহা হউক ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে যে, অনেক স্থলে এখনও চমরী দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদেরই পুচ্ছ সংগৃহীত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। পূর্ব্বকালে বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল চামর সংগৃ-হীত হইত, সংস্কৃত শাস্ত্রে স্থানানুসারে তাহাতে বিভিন্ন বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল সংস্কৃত শ্লোকের প্রমাণ উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহার মর্ম্মাংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

মেরু পর্ব্বতজাত চামর কনকসদৃশ উজ্জ্বল, পীত-বর্ণ; হিমালয়ের চামর শুভ্রবর্ণ; বিন্ধ্যাচলেরও শুভ্র কিন্তু অপেক্ষাকৃত ঘন, কৈলাসের কৃষ্ণবর্ণ কখন কখন শ্বেত মিশ্রিতও দেখিতে পাওয়া যায়, মলয়ের শ্বেত ও পীত মিশ্রিত, উদয় গিরির ঘোর রক্তবর্ণ, অস্তাগিরির নীল ও শ্বেতাভাস বিশিষ্ট এবং গন্ধমাদনের চামরগুলি কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ ও কখন কখন পাণ্ডুবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। যে চামরগুলি অতি দীর্ঘ, লঘু, স্বচ্ছ ও ঘন তাহাই উৎকৃষ্ণ শ্রেণীর এবং যে গুলি খর্ব্ব, গুরু, বিবর্ণ ও মলিন তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া উপে-ক্ষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর চামরাধিকারীর দীর্ঘ জীবন, অতুল সম্পদ, যশ ও উন্নতি লাভ হয়, কিন্তু নিকৃষ্ট শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে নানা ব্যাধি ও দুঃখ প্রভৃতি হইয়া অকাল মৃত্যু আনয়ন করে।

স্থলজ চামরের ন্যায় জলজ চামরগুলি সপ্ত-সমুদ্র হইতে সংগৃহীত হইত, শাস্ত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে। ইহা এক প্রকার সমুদ্রচারী জীবের পুচ্ছ। সমুদ্র-গর্ভে অন্যান্য জন্তু তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া পুচ্ছ পরিত্যাগ করে, তাহাই ভাসিয়া বেলা ভূমিতে আসিয়া পড়ে এবং ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহা সংগ্রহ করিয়া লয়। সপ্তসমুদ্রের মধ্যে প্রত্যেক সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চামরের উল্লেখ আছে, শাস্ত্রে তাহাদের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থলজ ও জলজ চামরের পরীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্থলজগুলি অনায়াসদহ্য এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে এক প্রকার মিষ্ মিষ্ শব্দ হইতে থাকে। জলজ চামর বহ্নি-দুর্দহ্য অর্থাৎ ইহাতে সহজে আগুন ধরে না কিন্তু কোনরূপে দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে উহা হইতে ভয়ানক ধূম উদ্গীরণ হইতে থাকে এবং চট্ চট্ শব্দ হয়। যাহা হউক এই জলজ চামরের বর্ণনা সম্বন্ধে অধুনা কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রাচীন কালে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশ হইতে সমুদ্র পথে তাহা আনিত হইত এবং তদ্বিষয়ে বিশেষ অনভিজ্ঞতা হেতু লোকে সেই গুলিকে জলজ চামর বলিয়া জানিতেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এইরূপ অমূলক অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই, কারণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কত পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রাচীন কালে এমন কত জীব কত জন্তু ছিল, যাহাদের চূর্ণ বিচূর্ণ কঙ্কাল এখনও মৃত্তিকাগর্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বরাজ্যের সে জীবগুলি এখন আর আদৌ পরিলক্ষিত হয় না, তাহাদের এককালিন লোপ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এখন এমনও কত নূতন জীব দেখা গিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে যাহা কাহারও নয়নাকর্ষণ করিতে পারে নাই। সুতরাং এক্ষণে জলজচামরের অস্তিত্ব না থাকিলেও কোনও কালে তাহা যে ছিল অথবা এখনও অতি দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না বলিতে হইবে সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রের বর্ণনা ভ্রমাত্মক বলা অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র।

জলজই হউক বা স্থলজই হউক চামরগুলি ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য দণ্ডে আবদ্ধ করা হইত এবং তাহা ধাতু ও মণিমুক্তাদিতে শোভিত করা হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে তাহার বিধি বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে। প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যেও তাহা পরিলক্ষিত হয়।

এইবার ব্যজন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। ভাস্কর্য্যমধ্যে ব্যজন বা পাখার বিবিধ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহেও তাহার যথেষ্ট বর্ণনা আছে। ব্যজন ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্য ব্যব-হারের সামগ্রী, বিশেষ ভারতের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে চিরদিনই যে তাহার যথেষ্টরূপ ব্যবহার আছে তাহা সহজেই অনুভবনীয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে তালবৃন্ত, বংশ, বেত্র, কেশ ও পক্ষ প্রভৃতি ব্যজ-নার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল উপাদান সহযোগে নানা কৌশলে অতি মনোহর ব্যজন রচিত হইয়া থাকে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে চক্রবর্ত্তী বা ছত্রপতি অধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই ব্যজন ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মধ্যে যাহা বর্ণিত আছে, অতি সংক্ষেপে নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

করিব, আমার হৃদয়ের অন্ধকার মিটিয়াছে, মনুষ্য সমাজে ধর্ম্ম জ্ঞান ও শান্তি স্থাপনের জন্য যদি আমার প্রাণও যায়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র শঙ্কিত হইব না আপনার আদেশই আমার শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া, কুমার সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চরণে মস্তক লুটাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সন্ন্যাসী আর অপেক্ষা না করিয়া অশোকের প্রণাম শেষ হইবার অগ্রেই সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমশঃ

ব্রহ্মণ পণ্ডিত।

ভাস্কর্য্য।

(১১ পৃষ্ঠার পর)

ছত্রের ন্যায় চামরও নৃপতিবৃন্দের নিতান্ত সম্মান-সূচক আদরের বস্তু ও রাজ-চিহ্ন বলীর অন্তর্ভুক্ত। ভাস্কর্য্যমধ্যে ইহার বহু আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। নানা স্থানে ব্যজনার্থেও চামর ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে। এই চামরের বর্ণাদি ভেদে যে সকল লক্ষণ আর্য্য-শাস্ত্রমধ্যে লিখিত আছে এক্ষণে সেই সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। "বৃহৎ সংহিতা" ও "যুক্তিকল্পতরুর" বর্ণনানুসারে স্থলজ ও জলজ ভেদে ইহা দ্বিবিধ। স্থলজ চামর পার্ব্বতীয় চমরী গো'র পুচ্ছ। পাহাড়ীরা নানা কৌশলে সেই গো-পুচ্ছ কাটিয়া আনে, তাহাই কাষ্ঠের দণ্ডে আবদ্ধ করতঃ দণ্ডটী স্বর্ণাদি ধাতু ও মণিমণ্ডিত করিলে ব্যবহারোপযোগী হয়। এই চামর সাধারণতঃ মেরু, হিমালয়, বিন্ধ, কৈলাস, মলয়, গন্ধমাদন এবং উদয় ও অস্তগিরি নামক পর্ব্বত সমূহ হইতে প্রাচীন কালে সংগৃহীত হইত। বর্ত্তমান সময়েও ঐ সকলের প্রত্যেক পর্ব্বতে চমরী বিচরণ করে, কি না তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। সংস্কৃত শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট উক্ত পর্ব্বতের কোনও কোনও-টীর স্থান নির্ণয় সম্বন্ধেও বহু মত বিরোধ আছে। সে যাহা হউক ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে যে, অনেক স্থলে এখনও চমরী দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদেরই পুচ্ছ সংগৃহীত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। পূর্ব্বকালে বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল চামর সংগৃ-হীত হইত, সংস্কৃত শাস্ত্রে স্থানানুসারে তাহাতে বিভিন্ন বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল সংস্কৃত শ্লোকের প্রমাণ উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহার মর্ম্মাংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

মেরু পর্ব্বতজাত চামর কনকসদৃশ উজ্জ্বল, পীত-বর্ণ; হিমালয়ের চামর শুভ্রবর্ণ; বিন্ধ্যাচলেরও শুভ্র কিন্তু অপেক্ষাকৃত ঘন, কৈলাসের কৃষ্ণবর্ণ কখন কখন শ্বেত মিশ্রিতও দেখিতে পাওয়া যায়, মলয়ের শ্বেত ও পীত মিশ্রিত, উদয় গিরির ঘোর রক্তবর্ণ, অস্তগিরির নীল ও শ্বেতাভাস বিশিষ্ট এবং গন্ধমাদনের চামরগুলি কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ ও কখন কখন পাণ্ডুবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। যে চামরগুলি অতি দীর্ঘ, লঘু, স্বচ্ছ ও ঘন তাহাই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং যে গুলি খর্ব্ব, গুরু, বিবর্ণ ও মলিন তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া উপে-ক্ষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর চামরাধিকারীর দীর্ঘ জীবন, অতুল সম্পদ, যশ ও উন্নতি লাভ হয়, কিন্তু নিকৃষ্ট শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে নানা ব্যাধি ও দুঃখ প্রভৃতি হইয়া অকাল মৃত্যু আনয়ন করে।

স্থলজ চামরের ন্যায় জলজ চামরগুলি সপ্ত-সমুদ্র হইতে সংগৃহীত হইত, শাস্ত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে। ইহা এক প্রকার সমুদ্রচারী জীবের পুচ্ছ। সমুদ্র-গর্ভে অন্যান্য জন্তু তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া পুচ্ছ পরিত্যাগ করে, তাহাই ভাসিয়া বেলা ভূমিতে আসিয়া পড়ে এবং ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহা সংগ্রহ করিয়া লয়। সপ্তসমুদ্রের মধ্যে প্রত্যেক সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চামরের উল্লেখ আছে, শাস্ত্রে তাহাদের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থলজ ও জলজ চামরের পরীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্থলজগুলি অনায়াসদহ্য এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে এক প্রকার মিষ্ মিষ্ শব্দ হইতে থাকে। জলজ চামর বহ্নি-দুর্দহ অর্থাৎ ইহাতে সহজে আগুন ধরে না কিন্তু কোনরূপে দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে উহা হইতে ভয়ানক ধূম উদ্গীরণ হইতে থাকে এবং চট্ চট্ শব্দ হয়। যাহা হউক এই জলজ চামরের বর্ণনা সম্বন্ধে অধুনা কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রাচীন কালে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশ হইতে সমুদ্র পথে তাহা আনিত হইত এবং তদ্বিষয়ে সবিশেষ অনভিজ্ঞতা হেতু লোকে সেই গুলিকে জলজ চামর বলিয়া জানিতেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এইরূপ অমূলক অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই, কারণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কত পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রাচীন কালে এমন কত জীব কত জন্তু ছিল, যাহাদের চূর্ণ বিচূর্ণ কঙ্কাল এখনও মৃত্তিকাগর্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বরাজ্যের সে জীবগুলি এখন আর আদৌ পরিলক্ষিত হয় না, তাহাদের এককালিন লোপ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এখন এমনও কত নূতন জীব দেখা গিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে যাহা কাহারও নয়নাকর্ষণ করিতে পারে নাই। সুতরাং এক্ষণে জলজচামরের অস্তিত্ব না থাকিলেও কোনও কালে তাহা যে ছিল অথবা এখনও অতি দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না বলিতে হইবে সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রের বর্ণনা ভ্রমাত্মক বলা অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র।

জলজই হউক বা স্থলজই হউক চামরগুলি ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য দণ্ডে আবদ্ধ করা হইত এবং তাহা ধাতু ও মণিমুক্তাদিতে শোভিত করা হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে তাহার বিধি বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে। প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যেও তাহা পরিলক্ষিত হয়।

এইবার ব্যজন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। ভাস্কর্য্যমধ্যে ব্যজন বা পাখার বিবিধ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহেও তাহার যথেষ্ট বর্ণনা আছে। ব্যজন ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্য ব্যব-হারের সামগ্রী, বিশেষ ভারতের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে চিরদিনই যে তাহার যথেষ্টরূপ ব্যবহার আছে তাহা সহজেই অনুভবনীয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে তালবৃন্ত, বংশ, বেত্র, কেশ ও পক্ষ প্রভৃতি ব্যজ-নার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল উপাদান সহযোগে নানা কৌশলে অতি মনোহর ব্যজন রচিত হইয়া থাকে। সামান্য কুটীরবাসী হইতে চক্রবর্ত্তী বা ছত্রপতি অধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই ব্যজন ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মধ্যে যাহা বর্ণিত আছে, অতি সংক্ষেপে নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

তালব্যজন—ত্রিদোষ নাশক ও লঘু; বংশব্যজন—রুক্ষ ও উষ্ণগুণ বিশিষ্ট এবং বায়ু পিত্ত কারক; বেত্র, বস্ত্র ও ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন—ত্রিদোষ নাশক; কেশ বা লোমজ ব্যজন—তেজনাশক।

পূর্ব্বকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ব্যজনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপাদান সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কিন্তু 'পাখা' এই শব্দ হইতে অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে পাখীর ছিন্ন পক্ষ বা পাখা ব্যজনার্থে ব্যবহৃত হইত এবং সেই কারণই ব্যজনের একটী নাম পাখা বা পাঙ্খা হইয়াছে। যাহা হউক ইহার আকার সম্বন্ধে প্রাচীন ভাস্কর্য্য মধ্যে যত প্রকার আদর্শ পাওয়া গিয়াছে—তাহার কয়েকটীর আভাস ভারতের প্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্ম্মার চিত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অন্যান্য এখন ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত আছে। টানা পাখার কোন অনুসন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে সভাস্থলে বড় হাত পাখা দুলাইবার ব্যবস্থা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও অনেক স্থলে আছে।

ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যে দর্পণের আদর্শ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি কোন্ কোন্ উপাদানে কিরূপে প্রস্তুত হইত তাহা জানা যায় নাই। সেকালে দর্পণের এত অধিক প্রচলন ছিল যে, রমণীরা সর্ব্বদা নিজ নিজ মুখশ্রী দেখিবার অভিলাষে বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুরিসহ দর্পণ ব্যবহার করিতেন। সে গুলি দেখিতে প্রায় গোলাকার হইত। তদ্ব্যতীত বেশ ভূষা কালে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দর্পণও ব্যবহার করিতেন। সে গুলিও সাধারণতঃ গোলাকারে নির্ম্মিত হইত। কলিকাতা মিউজিয়মে সংগৃহীত ভাস্কর্য্যের মধ্যে ৮০৬ সংখ্যক মূর্ত্তির হস্তে একটী দর্পণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালের দর্পণ সম্বন্ধে মহাত্মা প্লিনী (Pliny) বলেন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে দর্পণের প্রচলন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, সে কালে কাচ খণ্ডের পৃষ্ঠে পারদাদি দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় দর্পণ প্রস্তুত হইত না—সে কালে রজত খণ্ড বা অন্য কোন উজ্জ্বল ধাতু ফলক প্রস্তর সহযোগে চাকচিক্য করিয়া দর্পণাকারে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এরূপ অনুমানের কারণ কি বুঝিতে পারা যায় না, কারণ কাচ ভারতের অতি প্রাচীন শিল্প, (Plate glass) কাচখণ্ড প্রস্তুত করিবার কৌশল ভারতীয়েরাই আবিষ্কার করিয়াছেন। বেদ মধ্যেও তাহা লিখিত আছে। এবং অন্যান্য প্রতিবেশী প্রদেশেও সে কথা বিদিত আছে।

নিত্য ব্যবহার্য্য পাত্রাদি সম্বন্ধে প্রাচীন ভাস্কর শিল্প হইতে নানাবিধ আদর্শ বহু পুরাতত্ত্ববিদ কর্ত্তৃক সংগৃহিত হইয়াছে। মহানুভব ফার্গুসন প্রভৃতির (Tree & serpent worship) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থাদিতে তাহা যথেষ্টরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলির আকার নিতান্ত নিন্দনীয় বা রুচীবিহীন ছিল না: বরং কোন কোনটীর আকার অত্যন্ত সুন্দর বলিয়াই মনে হয়। এই সকলের মধ্যে ঘটী বাটী, ঝড়া, গাড়ু, জালা, কলসী সকল প্রকার দ্রব্যই আছে। সারনাথের ও অন্যান্য বহু প্রাচীন সহরের মৃত্তিকা খনন করিয়াও নানা প্রকার পাত্র পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে দুই একটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিষয়ের বর্ণনা করিতেছি।

প্রথমতঃ যে সকল আদর্শ পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর ও কাচাদি বিবিধ উপাদান সহযোগে সে কালে ব্যবহার্য্য পাত্রাদি নির্ম্মিত হইত। আমাদিগের শাস্ত্রাদির মধ্যেও সে কথা স্পষ্ট লিখিত আছে। বিশেষ সত্য ত্রেতাদি যুগানুসারে এক এক যুগে এক এক রূপ ধাতুনির্ম্মিত পাত্র যে ব্যবহৃত হইত, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন, কারণ প্রতি বৎসর নূতন পঞ্জিকার প্রারম্ভেই পঞ্জিকাকার সেই যুগ-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাহাতে ব্যবহার পাত্র সম্বন্ধে সত্যযুগে সুবর্ণ, ত্রেতাযুগে রৌপ্য, দ্বাপরযুগে তাম্র ও কলিযুগে, ব্যবহার পাত্র সম্বন্ধে নির্ণয়োনাস্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে সেই প্রাচীন যুগে সুবর্ণাদি ধাতু পাত্রই বিশেষ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যেও যে সকল আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও অধিকাংশ ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সেই সুপ্রাচীন যুগত্রয়ের ভাস্কর্য্যও বিলীন হইয়াছে, যাহা এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও কলির প্রারম্ভ সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া স্থির হইয়াছে, সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রের বর্ণিত বিষয় ব্যতীত সেই অতি প্রাচীন পাত্রাদির আদর্শ কোথাও পাইবার আশা নাই। সে কালেও ধাতু পাত্র ব্যতীত মৃন্ময় পাত্রও যে যথেষ্ট রূপ ব্যবহৃত হইত তাহাও শাস্ত্রাদি পাঠে জানিতে পারা গিয়াছে। আর্য্যদিগের গভীর দর্শন জ্ঞান ও ত্রিকাল দর্শিতার ফল ছান্দপ উপনিষদের পরিশিষ্টে শ্রাদ্ধ তত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়:—

"কুলালচক্রঘটিতসাসুরং মৃন্ময়ং স্মৃতং।
তদেব হস্তঘটিতং স্থাল্যাদি দৈবিকং ভবেৎ॥"

কুলালচক্রঘটিত বা কুম্ভকারের চক্রজাত মৃণ্ময় পাত্র আসুরং বলিয়া কথিত আছে, তাহা দৈব কার্য্যে প্রশস্ত নহে; কিন্তু যে সকল পাত্র কেবলমাত্র হস্তেই প্রস্তুত, তাহাই দৈবিকং বা দৈবকর্ম্মে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা একাল পর্য্যন্ত সমান ভাবেই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও মালসা সরাই দৈবকর্ম্মে ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

বেদের নানা স্থানে মৃণ্ময় পাকপাত্রের বিষয় উল্লেখ আছে। সে কালে তাহা মনুষ্য কপালাস্থির বা মাথারখুলীর অনুকরণে নির্ম্মিত হইত। আমার বোধ হয় তাহা আজকালের মালসার অনুরূপই হইবে। ঋক্ বেদের মধ্যে ঐরূপ পাত্রের নাম 'কপাল' বলিয়াই লিখিত আছে। আজকাল আমরা যে কুম্ভকার চক্র দেখিতে পাই, প্রাচীনকালে তাহা ঠিক এইরূপই ছিল। তাহাতে কুম্ভাদি প্রস্তুত করিয়া অগ্নিদগ্ধ করা হইলে ব্যবহারোপযোগী হইত। ঋগবেদে কেবল যে মৃণ্ময় পাত্রেরই বর্ণনা আছে তাহা নহে, স্বর্ণ পাত্রেরও যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায় এবং রৌপ্য, তাম্র ও পিতলাদির অন্যান্য তৈজস পাত্র এবং যন্ত্রাদির বর্ণণা আছে। মহাভারতাদির মধ্যেও সুবর্ণ ও মৃন্ময় পাত্রের বিষয় লিখিত আছে।

স্বর্ণাদি ধাতুপাত্র ও মৃন্ময়পাত্র প্রভৃতির গুণাগুণ সম্বন্ধে বায়ুপিত্ত কফাদির হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে কালিকাপুরাণে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। সে সকলের উল্লেখ করিলে ক্রমেই পুঁথি বাড়িয়া যায়, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাহা মূল গ্রন্থ দেখিয়া লইতে পারেন। যুক্তিকল্প-

তরুর মধ্যে এবং অন্যান্য শাস্ত্রমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—রাজন্যবর্গের পানপাত্রের জন্য সুবর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক এবং কাচ উপাদান রূপে ব্যবহার করিবার বিধান দিয়াছেন।

"তৎ পানপাত্রং ভূপানাং তজ্জ্ঞেয়ং চষকং বুধৈঃ।
কানক রাজতঞ্চৈব স্ফটিকং কাচমেবচ॥"

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আর্য্যগণ বৈদিক যুগ হইতেই কাচের প্রস্তুতিপ্রণালী ও তাহার ব্যবহার জানিতেন, এক্ষণে উপর্যুদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে, সে কালে পানপাত্রার্থে স্ফটিকাদির ন্যায় কাচও ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এই কাচ কিরূপে কোন কোন উপাদানে প্রস্তুত হইত, তাহা কোন সংস্কৃত শাস্ত্রাদি হইতে জানা যায় নাই, তবে মহাত্মা প্লিনী (Pliny) বলিয়াছেন—আর্য্যগণ দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেও দর্পণের ব্যবহার জানিতেন; তাঁহারই বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে আর্য্যগণ স্ফটিক প্রস্তর চূর্ণ করিয়া অন্যান্য উপাদান সহযোগে কাচ প্রস্তুত করিতেন এবং সেই কারণ জগতের অন্যান্য সকল দেশের নির্ম্মিত কাচ অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট হইত। এতদ্ব্যতীত পোরসেলেনও ভারত হইতেই রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে উজ্জৈনী ও বরোচের বন্দর বা পোর্ট হইতে ইজিপ্ট বাসীরা জাহাজে করিয়া তাহা লইয়া যাইত*। সুতরাং তাহাতেও যে, সে কালে জলপাত্র প্রস্তুত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যান্য পাত্রের ন্যায় স্ফটিক এবং কাচপাত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"জলপাত্রন্তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদোহিতম্।
পবিত্রং শীতলং পাত্রং ঘটিতং স্ফটিকেনযৎ।
কাচেন রচিতং তদ্বৎ তথা বৈদূর্য্যসম্ভবম্।"

আজ কাল অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু কাচপাত্র অশুদ্ধ ও অস্পর্শ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে তাহা বলে না। কাচ স্ফটিকের ন্যায় পবিত্র ও শুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রকার বর্ণনা করিয়াছেন।

কাচাদি ব্যতীত চর্ম্মও পাত্রার্থে বহুল ব্যবহৃত হইত। ঋক্‌বেদে চর্ম্ম নির্ম্মিত ধৃতি বা মষকের উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে চর্ম্মের কুঁপোর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোতলের ব্যবহার ছিল। অগস্থমুণি বিষশোধনার্থ এক সুরাব্যবসায়ীর গৃহ হইতে চর্ম্ম নির্ম্মিত বোতলের ন্যায় এক পাত্র আনিয়া ছিলেন। মনুও অন্যান্যস্মৃতিকার যে চর্ম্মের মষকের কথা বলিয়াছেন, তাহার বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহা এখনকারের মতই ছিল এবং তাহাতে কোনও পদার্থ আনিত হইলে চর্ম্মস্পর্শজনিত অপবিত্র হইত না। এখনও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তৈল ও ঘৃতাদি আনিবার জন্য চামড়ার কুঁপোর যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। কুপ বা ইঁদারা হইতে জল তুলিবার জন্য চামড়ার থলি যাহাকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মোট্ বলে তাহারও বহুল ব্যবহার আছে। শাঙ্খলিপিতে দেখা যায়—"আপোরুপরস গন্ধবত্যঃ পরিশুদ্ধা জীর্ণ চর্ম্মকরণ্ডকৈরভ্যুদ্ধতা। চর্ম্মকরন্তকঃ চর্ম্মপুটঃ।" অর্থাৎ পুরাতন চর্ম্মকরণ্ড মধ্যে জল পরিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহাতে জলের কোনরূপ বিকৃতি হয় না। 'অত্রির' মধ্যেও সেইরূপ চর্ম্মভাণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক এক্ষণে প্রাচীন

* Ibid 11, A P, P, 40

কালের ব্যবহৃত পাত্রাদির গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই অংশ শেষ করিব। ভাস্কর্য্যমধ্যে যে সকল পাত্র'র আকার দেখা গিয়াছে নিম্নে তাহার দুই একটীর চিত্রও প্রদত্ত হইল।

ইহার আকার আমাদের দেশে জালার ন্যায় বৃহৎ কিন্তু দেখিতে ফুলদানির মত। ঠিক এইরূপ ধরণের পাত্র আজ কাল বড় দেখা যায় না। ইহা ভুবনেশ্বরের মন্দির মধ্যে দেখা গিয়াছে।

এই দুইটী জলপাত্রর আদর্শ ভাস্কর্য্যমধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

প্রথমটী চুমকী ঘটীর ন্যায়, ইহা জল পানার্থে ব্যবহৃত হইত, দ্বিতীয়টীর আকার দেখিয়া ধাতুনির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। এটী কতকটা বোতলের অনুরূপ, তৈলাদি তরল সামগ্রী রাখিবার জন্যই বোধ হয় প্রচলিত ছিল।

এইবার বাটী ও গেলাসের কয়েকটী চিত্র দেওয়া হইল, এগুলির আদর্শ প্রাচীন ভাস্কর্য্য হইতেই গৃহিত

হইয়াছে। প্রথমটী চারি কোনা বাটী বা গেলাস, এরূপ ধরণের কোনও বাটী এখন দেখা যায় না, কিন্তু ইহা দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। দ্বিতীয়টী ডাল-গেলাস এ ধরণের গেলাস এখনও প্রচলিত আছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ ধরণের বাটীও এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরশুরাম কাব্য।

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

অবশেষে একদিন সন্ধ্যা আগমনে,
ঘটিল কাননে এক বিচিত্র ঘটনা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ হায় কে খণ্ডাবে বল।

দেবীর পূজার কাল, সম্মুখে আগত
হেরি,—দিবা অবসানে, চলিলেন ঋষি,—
পুষ্পপাত্র করে ধরি মন্দির উদ্দেশে।
পথিমধ্যে,—ঝটিকার কালে, উদ্বেলিত
সিন্ধু সম—কত চিন্তা উদিত অন্তরে।
চিন্তায় বিভোর ঋষি বাহ্যজ্ঞান হারা!—
কত যুক্তি, কত তর্ক, কল্পনা জল্পনা;—
নিজেই উত্তর দাতা, নিজে প্রশ্নকর্ত্তা!—
কভু মহাদুঃখে ছাড়ে ভীম দীর্ঘশ্বাস!—
কভু ক্রোধে রক্তচক্ষুঃ, কভু স্থির ভাব।
কহিতে লাগিলা ঋষি আপনার মনে;—

"আকুল অন্তর হায়, যদবধি, মোর
প্রাণের তনয় রাম, গেছে তেয়াগিয়ে
মোরে, তপস্যার তরে, হিমাদ্রিশিখরে।
ধন্য সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বাছনি আমার!
যদবধি শিশুকালে তার, শুনিয়াছে
সেই ভৃগুকুলান্তক কার্ত্তবীর্য্য কথা!—
তদবধি দৃঢ়পণ,—নাশিবে সমূলে
নৃশংস প্রধান সেই ক্ষত্রকুলাধমে।
শিশুকালে জিজ্ঞাসিত মোরে, সদা সেই
পিশাচের ইতিহাস, পাপ তত্ত্ব পূর্ণ।

শুনিতে শুনিতে, মুষ্টি তার বদ্ধ করি
নিরখি আরক্ত নেত্রে ভূমিপানে, বৎস,
কহিত আমায়,—"পিতা, বৃথাজন্ম মোর
যদি আমি না শাস্তি সমরে কার্ত্তবীর্য্যে।
গিয়াছে বাছনি মোর হিমাদ্রি শিখরে,—
মহা তপে তুষ্ট করি, দেব দিগম্বরে,—
ক্ষত্রকুলান্তক বর লভিবেক বলি'।
যদি দেব দয়াময়, হইয়া সদয়,
প্রদান করেন বর,—তবেত আমার
হয়, সিদ্ধ মনোরথ,—বংশমুখোজ্জ্বল
হয়, মম প্রাণারাম রামনিধি যশে।
পরে অগ্রসরি দ্বিজ মন্দির দুয়ারে,—
উদ্দেশি চামুণ্ডা মায়ে, কহিলা,—অভয়ে!
আমিও মা দিবানিশি অনন্য অন্তরে,
ভক্তিভরে ডাকি তোরে বৈরী নাশ তরে।
দেখো ভক্তপ্রাণা, যেন অপূর্ণ থাকে না
মাতা, তোর ভকতের মনের কামনা।
সহসা দেখিলে দূরে, কালসর্পে যথা
পান্থ, একলক্ষ্যে ছুটে আসে, পশ্চাতের
দিকে,—সহসা, খুলিয়া, মন্দির দুয়ারে,
তপোধন,—মধ্যে কিছু ভয়ঙ্কর হেরি,—
মহাভয়ে ছুটিলেন, পশ্চাতের দিকে।
বিশুষ্ক বদন, জিহ্বা রসহীন, কণ্ঠে
না সরে বচন, বক্ষঃ কাঁপে অবিরল।
মনে মনে জপিছেন কালী কালী বলি।
সন্দিগ্ধ অন্তরে পরে জিজ্ঞাসে আপনা,—
"একি এ মন্দির মাঝে, বীরবেশী কারে
হেরি?"—পুন কুতুহলে অতি সাবধানে,
ভয়ে ভয়ে দেখিলেন অভ্যন্তরে মুনি ;—
সর্ব্বনাশ! এযে এক ক্ষত্রিয় পামর!—
আবার নিরখি তারে অতি সন্তর্পনে,
কহিতে লাগিলা মুনি আপনার মনে ;—
সর্ব্বনাশ! যার ভয়ে, আমি, ছাড়ি প্রিয়
জন্মভূমি, ছাড়ি পূণ্য তপোবন, এই
হিংস্র জন্তু পূর্ণ ঘোর জনহীন বনে,
আছি লুকাইয়া,—যার প্রতিহিংসা তরে,
নিত্য, আসি এ মন্দিরে, পূজি চামুণ্ডারে,
সেই পাপী কার্ত্তবীর্য্য দুরন্ত রাক্ষস
কেমনে সন্ধান করি,—আমার নিধন
আশে, এসেছে হেথায়? উপায় কি করি?
হায় কি করি উপায়? যদি দুষ্টাশয়
দেখে কোনমতে মোরে পুত্রগণ সাথে,—
শত খণ্ডে ছেদিবেক তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে।
এবে উপায় কি করি? কিন্তু দেখিতেছি
মৃগয়ার বেশভূষা পামরের ;—বুঝি,
মৃগয়ায় শ্রান্ত হয়ে, নিদ্রিত আছয়ে
পাপী, এই জনহীন মন্দির ভিতরে।
এই অবসরে পূর্ণ করি মনোসাধ
কালীকার খড়্গমুখে। কিন্তু না না, যদি
পদ-শব্দে, পামরের নিদ্রা ভঙ্গ হয়?—
হেরি অন্য সদুপায়!"—যুক্তি করি মনে
চিন্তিলা ব্রাহ্মণ তবে। পাষাণে নির্ম্মিত
মন্দির দুয়ার—তাহে লৌহের অর্গল!—
কোন মতে ভাঙ্গিবারে সমর্থ না হবে ;
রাখি হেথা বন্দী করি জনমের তরে।
এই ভাবি ত্রস্তে দ্বার, রুদ্ধ করি দ্বিজ,

শৃঙ্খল টানিয়া দিল বহির্দ্দিক হতে।
কিছুই না জানে তাহা রাজা কার্ত্তবীর্য্য!—
নিশ্চিন্তে নিদ্রিত আছে মৃগয়ায় শ্রান্ত।
সহর্ষ অন্তরে দ্বিজ কহিতে লাগিলা,—
"থাক্ পাপমতি! বন্দী থাক চিরতরে!—
অনাহারে হোক্ তোর শীর্ণ কলেবর!—
মহা অত্যাচারে পাপী পীড়িয়াছে মোরে
মহা ক্রোধ আছে মোর পাষণ্ড উপরে।
আজি, কালী কৃপা করি, পুরালেন বাঞ্ছা।
আছে রাম হিমাচলে তপস্যা নিযুক্ত!
যাব আমি তার পাশে দিতে সমাচার ;
লয়ে আসি ত্বরা হেথা প্রাণের কুমারে ;
অতঃপর শত খণ্ড করিবে দুর্জ্জনে।
বুদ্ধিভ্রংশ দ্বিজবর পশ্চাৎ না ভাবি,
চলিলা উন্মত্ত হয়ে হিমালয়োদ্দেশে,
নিযুক্ত তপেতে যথা প্রাণপুত্র তাঁর?—
একবার চিন্তা তাঁর না হইল মনে
যদি অনুচর কেহ এসে থাকে এই
রাজা কার্ত্তবীর্য্য সনে,—অবশ্য খুলিয়া
দিবে মন্দির দুয়ার। রক্ষিতে তাঁহার
অসহায় পত্নী পুত্রে, কি হবে উপায়—
এই দ্বিজকুলদ্বেষী কার্ত্তবীর্য্য করে
যদি হয় নিপতিত দৃষ্টির গোচরে?
ক্রমে বনস্থলী হল আঁধারে আবৃত!—
নাথে অস্তমিত হেরি নলিনী সুন্দরী,
বিষাদে মুদিলা আখি আঁধার সলিলে।
আঁধার প্রকৃতি সতী, আঁধার ধরণী ;
আঁধার পূরবাকাশ, অন্ধময় সব।
জলে, স্থলে, বৃক্ষতলে, না চলে নয়ন
শুদ্ধ সে নিবীড়াঁধারে জোনাকীর দল,
একে একে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটিতে লাগিল।
শাখীশাখে পাখীকুল নীরব হইল ;
ঝিল্লিদল অবিরল ঝঙ্কারে কেবল।
হেনকালে অকস্মাৎ মরি বনপথে
দীপ হস্তে উজলিল, কেবা এ কামিনী,
আঁধার কানন আহা?—অপূর্ব্ব মাধুরী!!!
শুভ্র সাটী পরিধানে,—সিমন্তে সিন্দূর ;—
ধীর মন্থর গমনে, মন্দিরের পানে
অগ্রসিছে, চারিদিক খুঁজিতে খুঁজিতে।
বিস্ময়ে কহিলা বামা চাহি ভূমিপানে,
"একি! পুষ্পপাত্র কেন নিপতিত ভূমে?—
পুষ্প নিক্ষিপ্ত চৌদিকে?" সযতনে বামা
উঠাইল পুষ্পদল পুনঃ পুষ্পপাত্রে।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি পুনঃ চাহিলা চৌদিকে।
কে ইনি রমনী?—কিছু বুঝিতে না পারি?
কি মানসে বনমাঝে উপনীত এবে
অকস্মাৎ? অন্বেষিতে কা'রে চাহিছেন
চারিভিতে?—অনন্তর ত্বরিত গমনে
উঠিতে লাগিলা বামা, মন্দির সোপানে।
দ্বার পার্শ্বে উপনীত বামা দেখিলেন
বহির্দ্দিক হতে দ্বারে শৃঙ্খল আবদ্ধ।
কি কর কি কর মাতা?—হোথা ব্রাহ্মণের
মহা শত্রু আবদ্ধ রয়েছে। দ্বিজবর
অশেষ আয়াসে শেষে সুযোগ পেয়েছে।
কালসর্পে বন্দী করি রেখেছে ভিতরে
মুক্ত হ'লে পুত্রসনে দংশিবে তোমারে।

কি কর কি কর মাতা, খুলোনা দুয়ার।
সর্ব্বনাশ!—কি করিলে?—খুলিলে জননী?
না শুনিলে মোর কথা?—না বুঝিলে ভাষা?
তবে কি হবে উপায়?—বিপদ আগত।
তোমার (ও) ত সর্ব্বনাশ সন্নিকট মাতা।
জান না জননী এই রাজা কার্ত্তবীর্য্য
নির্ব্বংশ করেছে যত ব্রাহ্মণের কুল।
সহসা মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হইল।
হেরিলা সম্মুখে বামা, পুরুষ মূরতি!
পরিধানে রাজবেশ ঝকিছে আঁধারে!
হস্তে তরবারী!—পৃষ্ঠে তূণ বাণ পূর্ণ!—
সাষ্টাঙ্গে রমনী পদে প্রণমিলা শূর!—
জানু পাতি করযোড়ে কহিতে লাগিলা।
একি! তবে কি, এ, রাজা কার্ত্তবীর্য্য নয়?
শুনিয়াছি সে ত অতি নিরদয় হয়।
এত ভক্তি এত স্তুতি পাপীতে সম্ভবে?
না—না—সুনিশ্চয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য এই।
ভাল মতে চিনে তারে জমদগ্ন ঋষি।
চিনে,—জেনে,—তবে ওরে আবদ্ধ করেছে।
কিন্তু একি হেরি?—কেন তবে প্রণমিছে
অজ্ঞাতা রমণী পদে?—বুঝি না কি হেতু
শোন! শোন! জননী বলিয়া সম্ভাষিছে
রমণীরে। কেবা এ রমণী? দেবনারী
তবে বুঝি?—শোন, পুনঃ, কিবা বলে রাজা!
"জননিগো! কার্ত্তবীর্য্যে প্রসন্ন হইয়ে
দিলে দরশন এই বিপদের কালে।
পাইলাম অব্যাহতি তোমার কৃপায়।
নচেৎ নিশ্চয় এই আবদ্ধ মন্দিরে
অনাহারে বা'র হত অভাগার প্রাণ।
এসেছিনু বন মাঝে মৃগয়া কারণ;—
পথ হারা পদব্রজে ক্লান্ত হয়ে অতি,—
নিবিড় অরণ্যস্থিত মন্দির ভিতরে
অগাধ ঘুমের ঘোরে ছিনু অভিভূত,—
বহির্দ্দিক হতে কোন বর্ব্বর তস্কর
শৃঙ্খল আবদ্ধ করি রুদ্ধ করে মোরে।
বহু চেষ্টা করিয়াছি খুলিতে কপাট!—
পাষাণ নির্ম্মিত তাহা খুলিব কিরূপে?
অতঃপর জননিগো, না হেরি উপায়,—
সকাতরে পুত্র তোর ডাকিনু বিস্তর
এক মনে তোমা,—তুমি সদয়া হইয়া
মোর প্রতি কৃপাময়ী খুলিলে দুয়ার,—
শেষে দিলা দরশন। মাগো! মূঢ়মতি
কার্ত্তবীর্য্য! তব তত্ত্ব বুঝিব কি মতে?
তব পদে কোটী কোটী করি প্রণিপাত।
অহো! বুঝিনু এক্ষণে! সত্য বটে এই
সেই পাপী কার্ত্তবীর্য্য!—অন্য কেহ নয়!—
ঘুচিল সংশয় শুনি তার পরিচয়
আত্মমুখে; কারাগারে বিপাকে পড়িয়া
ধর্ম্ম জ্ঞান সমুদিত পাষণ্ড অন্তরে,—
ক্ষণ তরে, ক্ষণপ্রভা যথা অন্ধকারে।
এখন (ও) বুঝিতে নারি, কেবা এই নারী?
হেথায়, আশ্চর্য্য শুন, বিধির বিধান!
জমদগ্নি বন হতে বাহির হইয়া,—
চলিলেন দ্রুত অতি হিমালয় পথে।
বিধির বিপাকে তাঁরে যেতে নাহি হ'ল।
পথিমধ্যে,—"পুত্র তাঁর,"—পান সমাচার

"'তপস্যায় বরলাভ শিবের কৃপায়!
আশ্রমে আগত এবে"। ফিরিলেন ঋষি!
আশ্রমের চতুর্দ্দিক অন্বেষিয়া বহু
উপনীত পুনঃ তিনি মন্দির সমীপে।
দূর হতে দেখিলেন প্রদীপ জ্বলিছে
"সর্ব্বনাশ! একি হেরি! মন্দির দুয়ার
উন্মুক্ত কি লাগি হায়?—কে খুলিল দ্বার!—
যে দৃশ্য দেখিল তথা মন্দিরের দ্বারে
উন্মত্তের প্রায় ঋষি হল অতঃপর।
ক্রোধে আপনারে মুনি বলে বার বার!—
"কেন হেন হরিষে বিষাদ? মোর মনোসাধে
কে সাধিল বাদ? একি! রেণুকা! রেণুকা!
রেণুকা মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়ে কি হেতু?"
অহো! চিনিনু এক্ষণে কেবা এই নারী!
জমদগ্নি ভার্য্যা ইনি রামের জননী।
হায় হায় সর্ব্বনাশ করেছ ব্রাহ্মণি!
না জানি অভাগী ভালে কি ঘটিবে পরে?
কার্ত্তবীর্য্য কালীকা ভাবিয়া, জানুপাতি
করযোড়ে করিলা বিস্তর স্তব তাঁরে।
রেণুকা দাঁড়ায়ে মাত্র কাঁপিতে লাগিল।
"রেণুকা! রেণুকা! কথা কয় কার্ত্তবীর্য্য
সনে? রেণুকা! রেণুকা খুলেছে কবাট?
উন্মত্ত হইলা বিপ্র ক্রমে যত দেখে।
অবশেষে কার্ত্তবীর্য্য কহিলা কাতরে,
"জননি গো! ক্লান্ত অতি পর্য্যটনে, তাহে
সারাদিন অনাহারী। করুণা করিয়া,
পথ দেখাইয়া দাও পুত্রে অচিরায়।"
ইঙ্গিতে রেণুকা তারে দেখাইল পথ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি তাঁরে প্রস্থানিল পাপী।
আস্তে ব্যস্তে অতি ত্রস্তে ব্রাহ্মণী তখন,
ছুটিল কুটীর মুখে, অতি ভীত মনে,
পাছে সেই দ্বিজ-দ্বেষী ক্ষত্রিয় পিশাচ,
প্রাণাধিক পুত্রগণে দেখিবারে পায়!
বিশেষ, চিন্তিত অতি, বহুক্ষণ ধরি
স্বামীর উদ্দেশ কোন না পাইয়া সতী।
নিজ হস্তে কেশ রাশী উপাড়ি স্ববলে,
কহিতে লাগিলা বিপ্র উন্মত্তের প্রায়
ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজিত উচৈঃস্বরে অতি
"রেণুকা খুলেছে তার মরিবার দ্বার
বিনাদেশে মন্দিরের খুলিয়া কবাট!—
সর্পাশরে পদাঘাত করেছে পিশাচী।
জমদগ্নি-মনোসাধে সাধিয়াছে বাদ!
বিবাহিতা ভার্য্যা মোর স্বচক্ষে-দেখিনু,
কার্ত্তবীর্য্য সনে, ছিল মত্ত প্রেমালাপে।
রেণুকার নিশ্চয় লইব প্রাণ আমি।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আসিয়া যদ্যপি
রেণুকারে রক্ষা করে, নাহি অব্যাহতি।
প্রতিজ্ঞা করিলে ভঙ্গ, কহিনু নিশ্চয়,—
অন্য জন্মে ছাগগর্ভে জন্ম হবে মোর।
হিমালয়ে তপস্যা করিয়া সমাপন
ক্ষত্রকুলান্তক বর অক্ষয় তূনীর,
পাশুপত অস্ত্র লভি মহেশ্বর পাশে,
আগত নৈমিষে এবে জামদগ্ন্য রাম।
কুটীরে আসিয়া তিনি উপস্থিত মাত্র,
হেন কালে মাতা তাঁর হন প্রত্যাগত
প্রাণ ভয়ে শশব্যস্তে মন্দির হইতে।

বন্দিলেন ভৃগুরাম জননী-চরণ
পৃষ্ঠে বাঁধা শিবদত্ত অক্ষয় তূণীর
পাশুপত অস্ত্র করে কুঠার দুর্জ্জয়।
পুত্র হেরি দ্বিজ-নারী মায়ামুগ্ধ মন,
সমস্ত দুশ্চিন্তা তার হল দূরীভূত,
কোলে লয়ে পুত্রনিধি চুম্বিলা বদন;
আনন্দাশ্রু দুনয়নে দর দর ঝরে,
নাহি আর শত্রুভয় সাহস অন্তরে।
কহিলা ভার্গব তাঁরে বিনম্র বচনে
জননি! আশীষ মোরে হর্ষিত মনে,—
মনস্কাম পূর্ণ মোর, প্রসন্ন শঙ্কর,—
স্তবে তুষ্ট দিগম্বর দাসের উপর;
দয়া করে দিলা মোরে ক্ষত্র বিনাশন
অক্ষয় তূনীর আর পরশু ভীষণ;
যাহে হবে কার্ত্তবীর্য্য সবংশে নিধন।
নিক্ষত্র করিব ধরা করিয়াছি পণ।
স্তবে তুষ্ট বামদেব বলিলেন মোরে,—
"তপস্যায় কাজ নাই, যাও রাম ঘরে।
গৃহে বসি জনকেরে পূজ কায়মনে;
সর্ব্বদেবে পূজা হয় পূজিলে যেজনে।
পিতার আদেশ আগে পাল প্রাণ দিয়া,
ক্ষত্রান্তক বর লভ তাঁহারে তুষিয়া।
পূর্ণ হবে মনোরথ আশীষে যাঁহার;—
নাহি পূজ্য যাঁর তুল্য সংসার মাঝার
যাঁর আজ্ঞা শিব আজ্ঞা হইতে বিশেষ,
তুচ্ছ হয় তুলনায় বেদের আদেশ।"
পুরাব মানস মাতা আশীষে তাঁহার;—
পূর্ণ হবে মনোরথ অবশ্য আমার;—
অন্নদাতা, জন্মদাতা, দেবের দেবতা,—
তনয়ের পক্ষে যিনি আপনি বিধাতা!—
গগন হইতে যিনি আরো উচ্চতর!
যাঁহার তুলনা ভবে না হয় গোচর!
পালিয়া আদেশ আমি সেই দেবতার,
ক্ষত্র কুল সমূলেতে করিব সংহার।"
পুত্রের বচন শুনি সুখী মার মন;—
পুলকে পূর্ণিত তনু, ক'ন "বাছাধন'
জননী হইয়া, তোরে আশিষী এখন,
ব্যর্থ নাহি হবে কভু আমার বচন,—
অবশ্যই পিতা তব দানিবেন বর,
অবশ্য নাশিবে তুমি অরাতি নিকর!
অবশ্যই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তব,—
লভিবে সুযশ তুমি জিনিয়া আহব!—
চন্দ্রসূর্য্য যদবধি এভবে রহিবে,
ততদিন নরে, তব সুযস গাহিবে।
কথা না হইতে শেষ, ঋষি আসি তথা,
বজ্রের নির্ঘোষ সম বিকট আরাবে
জিজ্ঞাসেন উচ্চৈস্বরে, "আসন্ন মরণ
কার? কে দিল আমার মনোসাধে ছার?
খুলিয়া মন্দির দ্বার বিনাদেশে মোর।
নাহিকো নিস্তার তার এ ভব মাঝার"!—
রক্তবর্ণ আঁখিযুগ!—উন্মাদের প্রায়,—
আস্ফালিয়া বাহু দ্বয়, বক্ষে হানে কর।
বহুদিন পরে হেরি জনক চরণ,—
আনন্দে অধীর রাম, দ্রুত ধেয়ে গিয়ে,
জনকের পদধূলি লইলেন শিরে।
কহিলা পিতারে অতি মধুর বচনে,

"পিতা বহুদিন পরে, নন্দন তোমার
বন্দিল চরণ তব!—পূর্ণ মনোরথ!—
পঞ্চানন প্রীত হয়ে, দিয়াছেন অস্ত্র!—
পিতা! কি চিন্তা হৃদয়ে?—নাশিব নিশ্চয়
সেই ভৃগুকুলান্তক পাপী কার্ত্তবীর্য্যে।
কিন্তু পিতা অনুমতি দিয়াছেন শিব,
লভিতে হইবে বর তোমার সমীপে।
কহিলেন কৃত্তিবাস, অবনীমণ্ডলে,
পিতৃ আজ্ঞা পূজ্যতর, শিব আজ্ঞা হতে,—
বেদের লিখন হতে শ্রেষ্ঠ পিতৃবাণী!—
দাও আজ্ঞা কি আদেশ পালিব তোমার?"
কে আর শুনিবে?—বিপ্র বাহ্যজ্ঞানহারা!—
উচ্চৈস্বরে, উন্মত্তের প্রায় কন মাত্র,
"দিব বর! দিব আজ্ঞা রাজা হবি তুই!—
কিন্তু কোথা কার্ত্তবীর্য্য? কে খুলিল দ্বার?
আসিয়াছে ভৃগুরাম!—থাকিলে মন্দিরে,
এতক্ষণ ছিন্ন শির লুটিত ভূতলে।"
পতির উন্মত্ত ভাব নিরখি রেণুকা,
কিছুই বুঝিতে নারে, কিবা তার হেতু!—
সভয়ে, কাতরে সতী জিজ্ঞাসে পতিরে,—
"প্রভো! একি মূর্ত্তি হেরি!—কি হয়েছে, তব?
উন্মত্তের প্রায় হায়! কেন হেরি তোমা?
আসিয়াছে প্রাণারাম রাম মোর, ঘরে!—
আশিষি, হরিষে, তুমি কোলে লও তারে।
কহে জমদগ্নি পুনঃ—"মন্দির দুয়ার
কে করিল উন্মোচন?—প্রাণ লব তার!—
ছিল মম মহা বৈরী আবদ্ধ ভিতরে!—
কে দিল নিষ্কৃতি তারে, কহ সত্য করি?—"
এতক্ষণে ঘটনার মর্ম্মভেদ হ'ল।
ক্রোধের কারণ তবে রেণুকা বুঝিল।
মহা অপ্রতিভ হয়ে, ভয়ে, ক্ষমা তরে
পতি মুখ প্রতি চাহি কহে কর যোড়ে!
"আমিই অজ্ঞাতে দোষ করেছি স্বামীন!
বিলম্ব তোমার দেখি, তোমারে খুঁজিতে,
গিয়াছিনু বন মধ্যে মন্দির ভিতরে;—
পুষ্পপাত্র নিপতিত দেখি ভূমিতলে,—
সেই কালে বুঝেছিনু, অবশ্য ঘটেছে
কিছু!—তবু পূজাকাল অতীত দেখিয়া;
বিলম্ব দেখিলে পাছে ক্রুদ্ধ হও তুমি
চামুণ্ডারে পূজিবারে খুলেছিনু দ্বার!—
দেখেছিনু রাজবেশী এক দুরাচার!—
চামুণ্ডা ভাবিয়া মোরে, জননী বলিয়া
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চলি গেলা দূরে"।
বলিতে বলিতে, মুখ হতে বাহিরিল
ভয়ঙ্কর আজ্ঞা,—"জানি আমি—দেখিয়াছি—
তুইরে রাক্ষসী হয়ে খুলেছিস দ্বার!—
পত্নীরূপী ভুজঙ্গিনী কালকূটে ভরা—
দংশেছিস গুরুতর হৃদয়ে আমার।
পাল তব পিতৃ আজ্ঞা রাম!—ছিন্ন কর
রাক্ষসীর শির, তীক্ষ্ণ কৃপাণের আগে।"
অন্তর্ধ্যান হল মুনি আদেশি ত্বরায়!—
শূন্য হতে বজ্রাঘাত হইল মস্তকে!—
মূর্চ্ছিতা রেণুকা সতী স্বামী আজ্ঞা শুনে,
মূর্চ্ছিত মায়ের কোলে পুত্র ভৃগুরাম!—
নিকটে নাহিকো কেহ সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে।
কতক্ষণে জ্ঞান হলে, উঠি বীরবর,

কপালেতে কর হানি, কাঁদিতে লাগিল।
"হায়রে কপাল মোর! আছয়ে হৃদয়ে
এ ঘোর যাতনা, তেঁই বুঝি শিশু কালে
জননীর স্নেহনীড় ত্যজি গিয়াছিনু
হিমাচলে, পূজিবারে শশাঙ্ক-শেখরে?
পিতা গো! কেন গো হলে এতেক নির্দ্দয়?
অন্তর্হিত হইলেন কোথায় জনক?
হায়! কিবা দুরদৃষ্ট, এত যত্নে পূজি
যেগেন্দ্রেরে লভিলাম এই হলাহল?
দিয়াছেন অনুমতি অম্বিকা-রঞ্জন,—
পালিবে যতনে তুমি পিতার বচন,—
অবশেষে অভাগার ভাগ্য দোষে হায়!—
কঠোর আদেশ হেন পালিতে হইবে?
ধরেছি মনুজ কায়া যাঁহার প্রসাদে—
যাঁর বাড়া শ্রেষ্ঠ গুরু নাহি ত্রিগজতে
পবিত্র পীযূষে যাঁর রক্ত মাংস মোর!—
যাঁর স্নেহনীড়ে হায়, হইয়া পালিত
বর্দ্ধিত এ কলেবর!—সেই স্নেহময়ী
মায়ার আধার—মোর জননীর প্রাণ
নাশিতে হইবে এই তীক্ষ্ণ খড়্গ আগে।
জননি গো! বিদাও সন্তানে।—যাই আমি
অন্বেষিতে পিতৃদেবে। ঘোর মনস্তাপে
ক্রোধান্ধ জনক মোর; চরণে ধরিয়া
নির্ব্বাপিত করি তাঁর ভীম ক্রোধানল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিষণ ঘোষ।

ঠাকুরমা।

(৪৯ পৃষ্ঠার পর)

"ফদমপাতা কি ঠাকুরমা?"

"ওরে ও আমার পিস্‌শ্বাউড়ীর নাম ধরতে নেই, তা তুই ঠিক করে বল না?"

'কি, কদমপাতা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুরুজনের নাম কি ধরতে আছে? ওতে ভারি মহাপাতক হয়, তাঁদের অসম্মান করা হয়, বুঝলি? আজ কালকার বৌ ঝিরা তা ত আর মানে না, তাইতে তাদেরও এত খোয়ার! তাদের মেয়ে ছেলেরাও তাদেরকে মানে না। যেমন দেখবে তেমনি ত শিখ্‌বে? যাক্ তার পর শোন—(৩) তিল, সর্ষে, দারুহরিদ্রা, দুব্বো, গোরোচনা আর কুড় সমান সমান নিয়ে ঘোলের সঙ্গে বেটে গায়ে মাখলে গাও যেমন পরিষ্কার হয় আর গা থেকেও তেম্‌নি এক রকম সদ্‌গন্ধ বার হয়। (৪) গায়ে যদি প্রায় ঘামের গন্ধ হয়, তা হলে—হত্তুকি, মুথো, চন্দন, নাগকেশর, বেণার মূল, লোধ, কুড় আর হলুদ জলে বেটে গায়ে মাখ্‌লে দিন কয়েকের মধ্যে তা সেরে যায়। (৫) হত্তুকি আর মুথো সমান ভাগ, কুড় সিকি ভাগ, নখী আধ্ ভাগ এক সঙ্গে বেটে গায়ে মাখলে গায়ে খুব সুগন্ধ হয়। (৬) সোমত্ত বয়েসে অনেকের মুখে ব্রণ হয়, তা কারুর কারো অনেক বেশী বয়স পর্য্যন্তও থাকে, তারা যদি মরিচ আর গোরোচনা এক সঙ্গে বেটে প্রলেপ দেয়, তা হলে মুখের সকল রকম ব্রণই সেরে যায়। (৭) শ্বেত সর্ষে আর তিল দুধের সঙ্গে বেটে মুখে মাখলে সাত আট দিনের ভেতর ব্রণ সেরে গিয়ে মুখের কান্তি

বাড়ে। (৮) অনেকের মুখে নানা রকমে মেচেতা পড়ে, তারা যদি মনঃশিলা, লোধ, হলুদ, ডালচিনি আর সর্ষে সমান সমান নিয়ে জলের সঙ্গে বেটে মুখে দেয়, তা হলে মুখের মেচেতা কাল দাগ সব সেরে গিয়ে মুখের ছিরি খুব সুন্দর হয়। এমন সব জিনিস থাকতে কি না ছাই ভস্ম কত কি আরক মারক মেখে মরে, অথচ যে সেই—কিছুতেই কিছু হয় না! গা ধোবার জন্যে যদি তাড়াতাড়িতে কিছু না যোটে ত একটু বেসন নিয়ে গায়ে দিলেই সাবানের কাজ হয়, অথচ সাবানের খারাপ গুণ এতে আদবে নেই। কেউ কেউ টাটকা সর্ষের খোলও ব্যাভার করে, এও বেশ; কিন্তু যদি যোগাড় করে ফুলোলতেলের খোল আনান যায়, তা হলে ওদের ও সব ভাল সাবান কোথায় লাগে! তোর ঠাকুরদাদা তখন জোনপুর থেকে মাঝে মাঝে আন্‌তেন। তা যদি ব্যাভার করিস ত দেখ্‌বি যে, সে তোর সাবানের রাজা। যেমন গায়ের মলা কাটে, তেমনি গন্ধেও ভুর ভুর করে, আবার এতে গাও খসখসে হয় না। এবার চাক যদি জোনপুরে যায়, ত আন্‌তে বলিস্। গায়ে মাখবার যেমন নানা রকম দিশি মসলা আছে, মুখের জন্যেও সেইরূপ কত কি আছে, দুই একটা শিখে রাখা ভাল। আজ কাল বাজার থেকে যা তা খড়ির গুড়ো, একটু রং করা, একটু গন্ধ দেওয়া, চার আনা আট আনা দিয়ে কিনে আনে, বলে কি না 'টুথ-পাউডার'—তা ক'দিনই বা যায়, আর তাতে কি বা উপকার হয়! মিছে কতক গুলো পয়সা নষ্ট করা বৈ ত নয়? হয়েছে কি? আজ কাল সবাই ফোতো নবাব হয়ে পড়েচে, যা দু পয়সা রোজগার করে তা ঐ বাজে বাবুগিরিতেই কেটে যায়, কি যে সৌখিনতা তা বলতে পারি না। আবার কেউ কেউ টুথ-বুরুষ—কিনা সেই শোরের কুঁচি গুলো দাঁতে ঘসে, কি পৃবিত্তি গা? ছি! ছি!! কেন—মিনিপয়সার দাঁতোনগুলো কি এতই খারাপ? তার উপগারে আর এর উপগারে সমান? শোরের কুঁচির কি গুণ আছে? কিন্তু নিমের কি প্যায়রার কি কুড়চির কি আস্‌সেওড়ার এ সবের যে কত গুণ তা আজ কাল কি কেউ দেখে? তা যদি দেখ্‌তো তা হলে ২০।৩০ বছরের ছেলেগুলো কি দুখানা আখ চিবিয়ে দাঁতের যাতনায় অস্থির হতো, না ছেলে বেলায় দাঁত গুলো তুলিয়ে তুলিয়ে বুড়োদের মত ফোগ্‌লা হয়ে থাকতো? আমরা তো এত বুড়ো হয়েছি, কিন্তু এখনো দুপয়সার কড়াই ভাজা চিবিয়ে খেতে পারি। একটু সদ্ধব নুণ্ দিয়ে দাঁত মাজলে যে কি উপকার হয়, তাওকি ছাই জানে? আর যদি তাই মাজনই ব্যাভার করিস্, তা কি আমাদের ঘরে তৈরি করে নেওয়া যায় না? তোদের ঐ চা খড়ি দিয়েই কর না?—কত খরচ, হদ্দ দু আনা কি তিন আনা, কিন্তু তোর অমন পঞ্চাশ কোটো দাঁত মাজন তৈরি হয়ে যাবে, অথচ খুব উপকারি।"

"সে কি রকম করে করতে হয় ঠাকুরমা।"

"কেন, আমি যা তৈরি করি, বাড়ীশুদ্ধ সব্বাই যা দিয়ে দাঁত মাজে।"

"কি রকম করে কর, তা ত ভাল করে দেখিনি।"

খানিকটা, ধর এই সের খানেক আন্দাজ খড়ি বেশ পিনু করে শিলে গুঁড়িয়ে নিয়ে আগে রেখে দিই, তারপর একটুখানি ফট্‌কিরি, এই ছটাক খানেক হলেই হবে—এক খানা সরায় করে খুব গণ্‌গণে

আগুণে বসিয়ে দিই যখন খুব টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে খৈ হয়ে যায় তখন উল্‌টে পাল্‌টে আগুণে আবার পুড়িয়ে নিই, যখন আদবে কাঁচা না থাকে তখন সেগুলোকেও গুঁড়িয়ে নিই, তার পর চারডি কেলে জিরে, তাম্বূল, মুরামাংসী, চারডি নাগেশ্বর, আর কুড় রৌদ্রে খুব শুখিয়ে গুঁড়িয়ে নিই, সবশেষে সেইগুলো সব এক করে রং করবার জন্য একটু গেরুমাটী গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিই আর একটু পিপারমেণ্টের ফুল আর একটু কর্পূর মিশিয়ে দিই—দেখেচিস ত কেমন মাজন হয়, তোর বাপ্‌ বাজারের কোন মাজন পসন্দ করে না। ক' পয়সা খরচ বল দেখি? একটু পরিশ্রম বই ত নয়, একবারে তৈরি করি, বাড়ি শুদ্ধ দাঁতমেজে ফুরুতে পারে না। (২) এ ছাড়া পিঁপুলের গুঁড়ো ঘি আর মধু সামান্য সামান্য মিশিয়ে যদি এক মাসও খায়, তা হলে মুখে নিত্য কেয়া ফুলের মত গন্ধ বার হয়। (৩) যদি মুরামাংশী, নাগেশ্বর, কুড় এই তিনটে গুঁড়ো করে কেউ দিন পনেরো সকাল বিকেল দাঁত মেজে মুখ ধোয় তা হলে অনেক দিন ধরে তার মুখে কর্পূরের গন্ধ থাকে। এ ছাড়া আরও কত কি আছে, এ সব থাকতে কিনা ছাই ভস্ম গু গোবর পয়সা দিয়ে কিনে এনে বাবুগিরি? ছিঃ! ছিঃ!! এই রকম মাথার তেল—আহা! মাথা আর মুণ্ডু! কি বা তেল, কি যে পসন্দ, আর তার গুণই বা কত? যা তা তেলে একটু রং আর একটু গন্ধ করে দিয়ে, শিশি ভরে ডাক্তারি ওষুদের মত কাগজ মুড়ে দিলেই হল। আর দাম বার আনা না হয় এক টাকা হয়ে গেল তা হলেই তাতে টাক থেকে চুল গজিয়ে পায়ের নখে পড়বে আর মাথা ব্যাথা থেকে আরম্ভ করে গরু হারাণ পর্য্যন্ত তাতে পাওয়া যাবে! কাগজে একটু ছাপিয়ে দিতে পারলেই হল। আজ কালকার লোকগুলো কি ক্রমে গাধার চেয়েও বোকা হয়ে যাচ্চে? খাঁটী সরষের তেলের, নারকেল তেলের যে কত গুণ, তাকি বলবার? আগে আমরা আভাং করে সরষের তেল গায়ে মাখতুম, আর মাথায় নারকেল তেল। তাও আবার মসলা দিয়ে ভিজিয়ে রাখতুম। তার গুণ কত? সে সব তেল এখন আর মেয়ে মদ্দর পসন্দই হয় না! আমি যে মশলার তেল তৈয়রি করি, তার কি মন্দ গন্ধ? তবে ডাক্তারি ওষুধের মত মাপ্‌ তুরন্ত নেই, এই যা! সে তেল তোর বাবাও মাখে, কৈ এক দিনও ত খারাপ বলে নি? সে ত তৈরি করা খুব শক্ত নয়। এক সের নারিকেল তেল একটা ভাঁড়ে কি কড়ি মাটির জারে ঢেলে তাতেই তেলের মশলা—এই পচাপাতা, দনা, অগরু চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গোলাপ ফুলের কুঁড়ি, শৈলজা, জটামাংসী, নখী (নখীগুলি আগে ঘিয়ে ভেজে নিতে হয়) চন্দন কাষ্ঠ, মেথি, আমলা, লোধ, নালুকা আর গন্ধ তৃণ; এ সব বেণের দোকানেই পাওয়া যায়, কিনে এনে একটু থেঁতো করে তেলে দিন দশেক ভিজিয়ে রাখতে হয়, তার পর বেশ করে ছেকে নিয়ে একটু খানি মৃগনাভি কি একটু হেনার আতর মিশিয়ে দিলেই চমৎকার গন্ধ হয়। তা ছাড়া এতে ঐ সব মশলার গুণে মাথা ঠাণ্ডা হয়, চখের জ্যোতি বাড়ে, মাথার অসুখ সারে, এতে স্মরণশক্তিও বাড়ে। তেলে রং করতে হলে একটু এলকানি মিশিয়ে দিলে বেশ লাল রং হয়। এই সব মশলার যদি সব রকম না

জোটে, আর কড়া গন্ধ বলে মনে হয়, তা হলে অত শত না দিয়ে খালি গোলাপের শুক্‌ণো কুঁড়ি চাড্ডি বেশি করে নিয়ে অগুরু চন্দন আর চন্দনকাষ্ঠ একটু থেঁতো করে তেলে ভিজিয়ে দাও তা হলেই বেশ মিষ্টি গন্ধ হবে। তারপর একটু গোলাপি আতর দাও ভাল, না হয় নেই নেই। কেউ কেউ নারিকেল তেলের বদলে তিলের তেলে কি বাদামের তেলে মশলা মিশিয়ে তেল তৈরি করে, তাতে আরও ঠাণ্ডা হয়। আমাদের দেশের ফুলল তেলও খুব ভাল; চামেলি কি বেলা এতেও মাথা খুব ভাল থাকে, আর খুব সৌখিন জিনিস।

এ সবে সখ্‌ আর উপকার তুইই হয়। তবে মাথার চুল উঠ্‌লে, কি টাক পড়লে, কি অসময়ে চুল পাকলে, তা তোমার তেলের চেয়ে অন্য রকমে বেশি উপকার হয়। তাও তুটা একটা বলে রাখি শোন্‌।

১। তিল গাছের মূল, গাওয়া ঘি আর লোধ সমান ভাগে বেটে, গাওয়া ঘির সঙ্গে দিন আষ্টেক মাথায় মাখলে চুল ঘন আর খুব বড় হয়।

২। হাতির দাঁত পুড়িয়ে ছাই করে, তারি কালি করতে হয়। তার পর সেই কালি সমান ভাগ রসাঞ্জন মিসিয়ে টাকের উপর প্রলেপ দিলে, যত দিনের টাক হক না কেন সেরে নতুন চুল গজাবে।

৩। অপরাজিতে ফুল ভাল রেড়ির তেলের সঙ্গে পাক করে চুলে মাখলে পাকা চুল কাল হয়।

৪। কাকলার পাতা আর মূল, পীত ঝিণ্টী আর কেয়া গাছের মূল ছায়াতে শুকিয়ে তার সঙ্গে ভৃঙ্গরাজ আর ত্রিফলার রস এক সঙ্গে মিশিয়ে তেলে দেবে, সেই তেল লোহার কড়ায় ঢেলে বেশ করে ঢাকা দিয়ে মাস খানেক মাটির ভেতর পুতে রাখতে হয়। তার পর শোন্নুড়ির মত পাকা চুলে মাখালে, ভোমরার মত কাল হবে।

৫। পাথুরে চূণ আর সীসে পাথর বাটীতে ঘসতে ঘসতে পাঁশুটে রংএর মলমের মত হয়ে যায় সেই মলম জল দিয়ে একটু পাৎলা করে নিয়ে পাকা চুলে দিলে কালো হয়ে যায়।

৬। মুথো, সর্ষে, বেণার মূল, হত্তূকি, নখী আর আমলকী সমান ভাগে নিয়ে বেটে চুলের গোড়ায় প্রলেপ দিলে পাকা চুল বেশ কাল হয়।

৭। ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা, কেশুত্তে, নীলোৎপল যাকে নীল শুঁদি বলে আর লোহা সমান ভাগ নিয়ে খুব গুঁড়ো করে নিয়ে তেলের পাক করতে হয় তার পর কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়ে চুলে মাখলে চুলের গোড়া যেমন শক্ত হয় তেমনি চুল নরম চকচকে আর কোঁকড়া হয়, তা ছাড়া পাকা চুলও কাল হয়। এ সব জিনিস আমার বড় দিদির কাছে শেখা—এসব কি আজ কালকার মেয়ে ছেলে জানে না শেখে? এর গুণের কথা আর কি বলবো। আজ কাল কেবল ডাক্তারি ওষুধ, তেল, কলপ কিনে মরে এ সব জিনিস ক্রমে নষ্ট হয়ে গেল। ঠাকুরমা এতক্ষণে বিমলার গা পরিষ্কার করিয়া চুল বাঁধিয়া দিলেন। যদিও বিমলা নিজেই নানা রকমের চুল বাঁধিতে শিখিয়াছে তথাপি ঠাকুরমাই আজ চুল বাঁধিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে নাপ্‌তিনীবৌ আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল চুল বাঁধা হইলে ঠাকুরমা বলিলেন "যা আলতা পরে নে।" নাপতিনী আলতার নুটী করিয়া আলতা পরাইতে বসিল। ঠাকুরমা নাপতিনীকে বলিলেন "হ্যাঁরা তোরা নাপতিনীর কাজ কচ্চিস তা ভাল আলতাও কাছে রাখিস নি? এই বিলিতি রংএর আলতা গুলো সস্তায় পাস আর তাই দিয়ে আলতা পরিয়ে যাস এতে যে পায়ের দফা রফা হয়! আজ কাল সবই ফাঁকি সিদ্ধস্থি। আবার তরল আলতা, ঘন আলতা মুণ্ডুর আলতা সব ঐ বিলাতি মেজেণ্টা গুলে গুলে আলতা, হচ্চে। আলতা যে কি জিনিস আর তার গুণ কি তাও আজ কালকার কেউ খোঁজ রাখে না। তোরা নাপতিনি জাত তোরাও কি জানিস্‌ নি?

"না মাঠাকরুণ এ ভাল আলতা আমি আমার ছেলেকে দিয়ে বড় বাজার থেকে আনিয়েছি।"

"দূর দূর—তোদের কি চোকও নেই রং দেখে বুঝতে পারিস নি? একবার জল লাগলেই ও উঠে যাবে। "দেখ দেখি আলতা কারে বলে?" বলিয়া ঠাকুরমা নিজের ঘর হইতে এক খানা আলতা বাহির করিয়া দিলেন। নাপতিনী তাহারই নুটী করিয়া বিমলার পায়ে পরাইতে লাগিল আর বলিল "হ্যা মা-ঠাকরুণ, এ খুব ভাল আলতা।"

"ওরে আলতা কি মেজেণ্টার রংএ হয়রে আলতা গালার রস। শুনেছি যখন পাকা গালা তৈরী হয় তখন আগে কাঁচা গালা জলে ভিজোয়, কত কি করে, সেই কস্‌জল থেকে আলতা হয় এর গুণ কত? এতে পা ফাটে না, বর্ষার জলে হাজে না কোন রকম অসুখ করে না আর ঐ মেজেণ্টা রংএর আলতা বড় খারাপ এক তো এ বেশিক্ষণ পায়ে থাকে না জল লাগলেই উঠে যায়, তার পর শুনেছি—মেজেণ্টা, ও সব কত আরক মারক হতে তৈরী হয়, ওতে নাকি পারার অংশ আছে ও সব রং গায়ে লাগলে নানা রকম ব্যায়রাম স্যায়রাম হতে পারে আর আজ কাল হচ্চেও তাই, সস্তায় সখ করতে গিয়ে মাগি মিন্সে কত যে ভোগে তা আর বলবার নয়। এই সে দিন সতু বলছিলো কারা নাকি ময়রার দোকানের খাবারে ঐ ম্যাজেণ্টা দিয়ে রং করে ছিলো তাইতে দোকানীর নাকি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়ে গেছে। তবু কি হত-ভাগারা তা ছাড়ে? সে দিনে বাজার থেকে অমিত্তি এনে ছেলো সেও ঐ রকম রং করা আমি দেখে তক্ষুনি তা ফিরিয়ে দিলুম। আর বাজারের খাবার আনাই নি। ম্যাজেণ্টা বড় খারাপ রে বড় খারাপ! ও বিষ!! বিষ!!! (ক্রমশঃ)

শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

অহল্যা বাই।

মহ্লার—হোল্কার শ্রেষ্ঠ—ত্যজিলা জীবন
সমর্পিয়া পৌত্র-রত্নে পুত্রবধূ করে।
ভাগ্য-দোষে, মাল্লী, হায়! করিলা বিনাশ
স্বীয় প্রাণ, না ভাবিয়া দেশের মঙ্গল।
বিধবা অহল্যা ভাবি' রাজ্যের ভাবনা
আকুল হইলা চিতে—কি উপায়ে নারী
শাসিবে স্বামীর রাজ্য; নাহি কোন বল—
উপযুক্ত মন্ত্রী কিম্বা বিশ্বাসী সেনানী॥
বুদ্ধিমতী বামা কিন্তু তুকাজীরে বরি'
সেনাপতি-পদে, তথা যশোবন্ত ধীরে
প্রদানি মন্ত্রীত্ব স্বীয়, ঘুচাইলা সব
অভাব—শাসিলা রাজ্য অতি চারু ভাবে।
সেই হেতু অদ্যাপিও ভুবন-ভিতরে
অহল্যা আদর্শ রাজ্ঞী বলিয়া বিদিত॥

ভেবেছ কি মনে কেহ কি হেতু অহল্যা
লভিলা এ হেন খ্যাতি? মালব-নিবাসী
নর নারী কি কারণে পূজে সযতনে
অহল্যারে দেবী সম? শুনাম তাঁহার
অদ্যাবধি বারাণসী ঘোষিছে সুদূরে?
ধর্ম্মভাব মূল তা'র। ধর্ম্মের অভাবে
কে কবে হ'য়েছে বড় এ মহীমণ্ডলে?
ধর্ম্মই প্রধান সেতু ভব-বারিধির॥
রাজ্যের কঠোর কাজ করি' সম্পাদন
লভিতে মনের শান্তি চিন্তাক্লিষ্টা রাণী
রহিতেন রত ইষ্ট-দেব-আরাধনে।
সেই মূর্ত্তি হের আজি সম্মুখে সবার—
পূণ্যময়ী অহল্যারে স্মরহ সকলে
পাপমুক্ত অনায়াসে হইবে যাহাতে॥

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,।

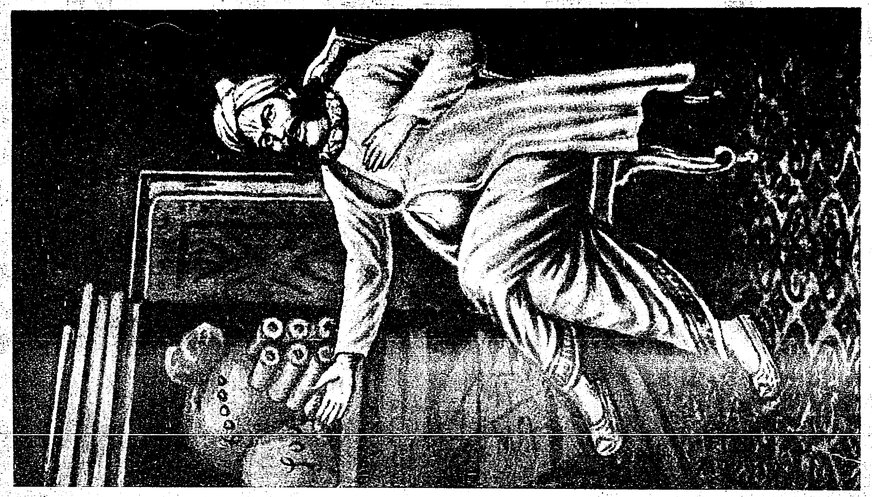

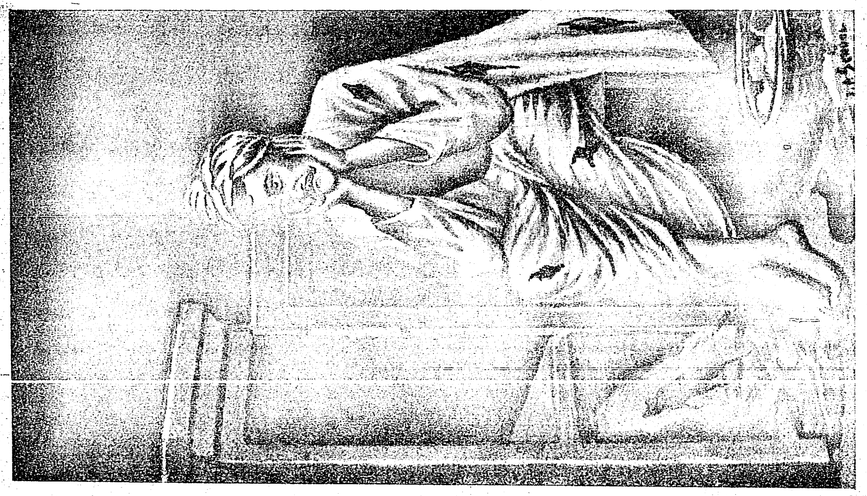

নগদ।

ধার।

.. School, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

…ম খণ্ড। } সন ১৩১৫—পৌষ। { ৪র্থ সংখ্যা।

বর্ণ-চিত্রণ।

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

ছায়ালোক সমাবেশ। (Clair obscure.)

ছায়ালোক সমাবেশ বা ক্লেয়ার অবস্কিওর, চিত্র-বিদ্যায় চতুর্থ সূত্র বা উপাদান। এই ছায়ালোকের সাহায্যেই চিত্রক্ষেত্রস্থিত সমতল আধারোপরি সকল বস্তুর উন্নত অনুন্নত ভাব অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃত পদার্থের অনুরূপ ভাব পরিগঠিত হয়। আমার শিক্ষক বলিতেন "Light and Shade is the form of Painting"—কারণ চিত্রকরণোপযোগী কাগজ বা বস্ত্রখণ্ড স্বভাবতঃ সমতল, তাহার মধ্যে কোন অংশই উন্নত বা অনুন্নত নাই; অথবা তাহার উপর কোন পদার্থের অনুরূপ চিত্র বিন্যস্ত হইলে বাস্তব বস্তুর ন্যায় কোন স্থল উন্নত, কোনও স্থল অনুন্নত, কোন দ্রব্য সম্মুখে, কোনটী বা পশ্চাতে, দূরে, বহুদূরে বলিয়া প্রতীয়মান হয় সত্য কিন্তু সেই চিত্রোপরি যদ্যপি হস্ত পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে আর সেরূপ কিছুই হস্ততালুতে অনুভব করা যায় না—সেই শুদ্ধ সমতল ভাব, চিত্রের পূর্ব্বেও যেমন ছিল পরেও তেমনই আছে—অথচ দূর হইতে দেখিলে সেই উচ্চ অনুচ্চ ভাবই নয়নগোচর হয়। তাহা হইলে এক্ষণে দেখিতে হইবে, চিত্রের এই ভাব কিসে স্পষ্ট প্রকাশ পায়? পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ আলোক আর অন্ধকারই ইহার উপাদান বা প্রকাশক। এই ছায়লোক যে, কেবল চিত্রেরই সুস্পষ্ট ভাববোধক তাহা নহে, ইহাই আবার বিশ্বের প্রত্যক্ষরূপ বা ভগবানের সাক্ষাৎ বিশ্বরূপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, যাহা কিছু ভাল মন্দ বলিয়া অনুভব

করিতেছি, সে সমস্তই ব্রহ্মের সেই শিব-শক্তিস্বরূপ আলোক ও অন্ধকার হইতে জাত। জীব ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের যে অত্যুজ্জ্বল শুভ্ররূপ বা আলোকজ্যোতিঃ নয়নেন্দ্রিয়ে প্রথমেই ধারণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করে, যাহার সাহায্যে ক্রমে অন্যান্য ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট হয়, তাহা শুদ্ধ আলোক নহে, সেই আলোকও অন্ধকারাত্মক। অর্থাৎ আলোক বা শিব স্বয়ং প্রকাশমান নহে, তাহার শক্তি অন্ধকার বা কালী অথবা ছায়া তাহার অংশসম্ভূতা, অথবা পরস্পর ওতপ্রোত ভাবেই জড়িত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানেও ঐ মত সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অর্থাৎ যদ্যপি জগতে কেবলই আলোক থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমরা কোন দ্রব্যই দৃষ্টিগোচর করিতে পারিতাম না। যখনই আমরা কোন জিনিস দেখিতে ইচ্ছা করি, তখনই দেখিতে পাই যে, সেই জিনিসটীর এক দিক হইতে আলোক আসিয়া তাহার সেই দিকটী অল্পাধিক আলোকিত করিয়াছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত দিক সেই অনুপাতে ছায়াময় হইয়াছে। এরূপ হইতেই হইবে, ইহাই আলোকের প্রধান ধর্ম্ম। বাস্তবিক যেখানে আলোক থাকিবে, তাহারই পার্শ্বে ছায়া দেখা যাইবে, আবার ছায়া না থাকিলে আলোকও থাকিবে না, আলোকের অস্তিত্বও থাকিবে না, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু বলিয়া বিবেচিতও হইবে না, তাহা যেন পরব্রহ্মের ন্যায় কেবল নির্গুণপদার্থ হইয়া রহিবে, কিন্তু সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপ ছায়াই আলোকের সহিত মিলিত হইয়া বা যুক্ত হইয়া স্বয়ং প্রকাশমান হয় এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সামগ্রীরই প্রকাশক হইয়া থাকে। সেই ভাব চিত্রের মধ্যেও! চিত্রের মধ্যেও সেই আলোক ও অন্ধকারের যথাযত বিন্যাসেই যে কোনও বস্তুর প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ছায়া ও আলোক দম্পতিযুগলের ন্যায় যেন পরস্পর দৃঢ় আবদ্ধ। তবে যেখানে যেমন আলোক সেখানে তাহার তেমনি ছায়া। উজ্জ্বল প্রখর আলোকের পার্শ্বে ঘন কৃষ্ণ গভীর ছায়া, আবার সামান্য আলোকের বিপরীতে অতি সামান্য অস্পষ্ট ছায়া। অবস্থা, কাল ও স্থান বিশেষে উহার বহু তারতম্য হইয়া থাকে, তাহাতেই নানা ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। (ছায়ালোকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব 'চিত্র বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।) এই ছায়ালোক-তত্ত্ব উচ্চ সংগীততত্ত্বের অনুরূপ। সংগীতে যেমন সপ্তসুর এবং তিন গ্রামে সমগ্র রাগ রাগিনীর বা কালের বিকাশ হইয়া থাকে, চিত্রেও এই ছায়ালোকের সপ্ত বিভাগ ঠিক সেইরূপ কালবোধক বা বিভিন্ন অবস্থার বিকাশ করিয়া থাকে।* কখনও কোন উজ্জ্বল পদার্থ তাহার পশ্চাতস্থিত অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল বর্ণে অথবা কোন অনুজ্জ্বল পদার্থ কোন উজ্জ্বল দ্রব্যে বা উজ্জ্বল ক্ষেত্রপৃষ্ঠদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতিচ্যখণ্ডে ছায়া লোকের এই অদ্ভুত রহস্য বহু প্রাচীনকাল হইতে পরিজ্ঞাত ছিল না। তাহা গত শতাব্দীর বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক মিঃ এন্‌ফিল্‌ডের গ্রন্থ পাঠেই অবগত হইতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"Leonardo da Vinci was the first artist of modern times who treated the subject 'chiaro-scuro' scientifically" অর্থাৎ মহাত্মা লিওনার্ডো ডা ভিন্সিই এই বিষয়টী প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার পর বহু শিল্পী ক্রমে ক্রমে অভ্যাস ও পরীক্ষা করিয়া তাহার অধিক উন্নতি করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। অতি প্রাচীন গ্রন্থ 'মানসারে' উহার যেমন বহু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, মহাকবি কালিদাস প্রণীত প্রসিদ্ধ শকুন্তলার মধ্যেও তেমনি তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শকুন্তলার চিত্র দেখাইয়া রাজা দুষ্মন্ত কেমন আবেগ ভরে—তদ্গত প্রাণে বলিতেছেন—

"আস্যান্তঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃস্থিতা,
দশান্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গেচ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধ প্রভাবাচ্ছিরং
প্রেয়ামন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরাচ বক্ত্রীবমাম্॥

অর্থাৎ এই চিত্রফলক বা উহার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ সমতল হইলেও উহাতে অঙ্কিত স্তনযুগল যেন উন্নতের ন্যায় বা চিত্র হইতে যেন উঁচু হইয়া রহিয়াছে এবং নাভিগহ্বর নিম্ন বা গভীর বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। হস্তের উন্নত বলয়গুলি যেন স্বাভাবিক, হাত হইতে যেন স্পষ্ট পৃথক হইয়া রহিয়াছে! দেহের স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্যও যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে! আহা! প্রণয়াবেশে প্রিয়া যেন আমার মুখের প্রতি বঙ্কিম বা আড় নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, আমায় যেন কি বলিবার নিমিত্তই ইহাঁর চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা যেন মুখে আসিয়াছে কেবল কথায় ফুটিতেছে না, তাই বুঝি প্রিয়ার মুখমণ্ডল মৃদু হাস্যবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে?

চিত্রগতা শকুন্তলার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে উচ্চ অনুচ্চ ভাব, যাহা সমতল চিত্রক্ষেত্রের মধ্যে অতি সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা সেই ছায়ালোকেরই বৈজ্ঞানিক সমাবেশমাত্র। যদ্যপি চিত্রশিল্পের এই বিজ্ঞানতত্ত্ব সে কালে পরিজ্ঞাত না থাকিত, তাহা হইলে শকুন্তলায় এমন স্পষ্ট ভাবে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইতাম না, তাহা তখন সম্ভবপরও হইত না। এ প্রত্যক্ষ ভাব কবির হৃদয় কখন স্পর্শ করিতেও পারিত কি না সন্দেহ! তাহার পর দেহের সেই ঔজ্জ্বল্য—চাক্‌চিক্য প্রদান, তাহাও ছায়ালোকের অঙ্গস্বরূপ। যে শিল্পী চিত্রে তাহা প্রদান করিতে না পারেন, পাশ্চাত্য-শিল্পীর মধ্যেও তাঁহার স্থান অতি হেয়। তাঁহার চিত্র আদৌ প্রশংসাযোগ্য নহে। এই ছায়ালোকের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া-বিশেষ-দ্বারাই দূরে—বহুদূরে অবস্থিত দ্রব্যাবলীর স্পষ্ট অস্পষ্ট নানা ভাব প্রত্যক্ষিভূত হইয়া থাকে। শকুন্তলা-প্রণেতা মহাকবি তাহাও দেখাইতে অমনোযোগী হন নাই। রাজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন—

কার্য্যা সৈকতলীন হংসমিথুনা স্রোতোবহামালিনী।
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণচমরা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ॥
শাখালম্বিত বল্কলস্য চ তরোর্ণির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ।
শৃঙ্গে কৃষ্ণ মৃগস্য বাম নয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥

স্রোতস্বতী মালিনী, গৌরীগুরু হিমালয়ের গিরি-অঙ্কে ধীরে ধীরে প্রবাহিতা, তাহারই বালুকাময় সৈকত-প্রদেশে ক্রীড়াপরায়ণ হংসমিথুন সকল লীন হইয়া রহিয়াছে, পর্ব্বতপাদে তপোবনের পবিত্রতা সম্পাদক

* ৬ষ্ঠ বর্ষের শিল্প ও সাহিত্যে ৩১ পৃষ্ঠার ছায়ালোক প্রবন্ধ দেখুন।

চমরীগুলি নিষণ্ণ রহিয়াছে, বৃক্ষশাখায় বল্কল বিলম্বিত-তাহারই নিম্নে একটি কৃষ্ণসার দাঁড়াইয়া, একটী মৃগী নিজ বাম নয়ন সেই কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে কণ্ডূয়ণ করিতেছে। এইরূপ দৃশ্য চিত্রের পশ্চাৎ দিকে বা তলপৃষ্ঠে (Backgroundএ) অঙ্কিত করিব।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, চিত্রে সম্মুখস্থ শকুন্তলাদির প্রতিমূর্ত্তি, তাহার পশ্চাতে অতি সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী, তাহা আবার বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। দূরত্বহেতু মালিনীর সেই সৈকতে হংসমিথুন যেন অস্পষ্টভাবে লীন হইয়া রহিয়াছে, এই যে লীন হয়ন (Vanishing) ভাব, ইহা অতি উচ্চ বিজ্ঞান সম্মত। চিত্রে ইহার বিন্যাস বা প্রকাশ করা নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) বিজ্ঞানোক্ত ছায়াতত্ত্বে (Projection of shadows) সম্যক জ্ঞান না থাকিলে কোন শিল্পীই চিত্রমধ্যে ইহার যথাযথ সমাবেশ করিতে পারিবেন না। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মানুসারে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে; এই ছায়াতত্ত্ব আর্য্যেরই একমাত্র গবেষণার ফল। ইহা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও আজ তাহা ভারত হইতে যেন বিলুপ্তপ্রায়! ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনর্প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, শিক্ষার্থিগণের চিত্রবিদ্যান্তর্গত অন্যান্য সূত্রের ন্যায় এই আলোক ও ছায়াতত্ত্বেও বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে।

বর্ণ-বিলেপন (Colouring)।

বর্ণচিত্রণের অঙ্গস্বরূপ সূত্রপঞ্চকের আলোচনা উদ্দেশে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে কোন স্থলেই বর্ণ সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। কেবল তাহার লাঞ্ছন বা অঞ্চন কার্য্য বিষয়ক চারিটী সূত্র বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই বর্ণ বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনা করিব।

চিত্রমধ্যে নানাবিধ বর্ণপূরণ চিত্র-বিদ্যার পঞ্চম বা শেষ সূত্র। এই বর্ণ সাহায্যেই চিত্রান্তর্গত সকল বস্তুর প্রকৃত স্বাভাবিক ভাব প্রতিভাত হইয়া থাকে। যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রানুগত কার্য্যদ্বারা চিত্রান্তর্গত সমস্ত বিষয়ের আকার, গঠন, স্থান, কাল ও অবস্থা সমস্তই পরিকল্পিত ও পরিগঠিত হয় তথাপি তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ এই বর্ণ ব্যতীত সম্ভবপর নহে। যদিও কেবল মাত্র বর্ণ-বিলেপন এই শিল্পের শ্রেষ্ঠ উপকরণ নহে, বা কিছুতেই উদ্ভাবনা ও ছায়াতত্ত্বের উন্নত ভাবাবলীর সমকক্ষ নহে তথাপি বর্ণ তাহাদের প্রকাশক বা পরিস্ফূরক বলিয়া তাহার এত আদর, পক্ষান্তরে যথাযথ বর্ণে রঞ্জিতকরণ ব্যাপারটীও নিতান্ত সহজ নহে; এই সকল নানা কারণে ইহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে সতত ইচ্ছা হয়। আমরা অতি সামান্য বস্তুর চিত্র হইতেই ইহার প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি। একটী গোলাপ বা প্রফুল্ল কমল অথবা সুন্দর আম, জাম কি আঙ্গুরগুচ্ছ অতি নির্ভুল আলিম্পন সাহায্যে অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে আমরা সেই অঙ্কিত চিত্র হইতে ঐ ফুল বা ফলের একটী অতি ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ আভাষ পাইয়া থাকি, কিন্তু যদ্যপি তাহারই উপর তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণসমূহ দ্বারা সুন্দর ভাবে রঞ্জিত করা হয়, তাহা হইলে হয়ত আমরা প্রকৃত বোধে সেই ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে বা সেই ফলগুলির বর্ণ

দেখিয়া অতি সুমিষ্ট বোধে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিব। এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে! য়ুরোপের মধ্যে কোন কোন শিল্পী এইরূপ ফুল ফলের চিত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা স্বাভাবিক হইল কি না পরীক্ষার জন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে রাখিবার পর দূরে অন্তরাল হইতে দেখিয়াছেন যে, নানাবিধ পক্ষী অতি সুপক্ক ফল ভ্রমে তাহার উপর বার বার আসিয়া পড়িতেছে ও চিত্রের সমতল ক্ষেত্রের উপর বসিবার তিলমাত্রও স্থান না পাইয়া পুনরায় উড়িয়া যাইতেছে। একজন শিল্পী এইরূপ ফল পুষ্পের চিত্র প্রস্তুত করণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি তাহাতে বিশেষ গর্ব্বও অনুভব করিতেন। একদিবস তাঁহার এক স্বতীর্থ বন্ধুকে তিনি বলেন "দেখ আমি যে সকল ফল অঙ্কিত করি, তাহা এত স্বাভাবিক হয় যে, বনের পক্ষীও তাহা আসল বলিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়ে, তাহার পর বিফলমনোরথ হইয়া উড়িয়া যায়।" উত্তরে তাঁহার বন্ধু বলিলেন "দেখ তুমি চিত্র প্রস্তুত করিয়া বনের পশুপক্ষীকে ভুলাইতে পার, কিন্তু আমি চিত্রে তোমার মত শিল্পীকেও ভুলাইতে পারি।" তাহাতে প্রথমোক্ত শিল্পী গর্ব্বভরে দ্বিতীয়কে তখন কৌতুক করিলেন। তাহাতে দ্বিতীয় আর কোনও কথার উত্তর দিলেন না। সে কথা সেই খানেই শেষ হইল। কিয়দ্দিবস পরে এক সময় প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়ের চিত্রশালায় কোন কার্য্য উপলক্ষে উপস্থিত হইলে, নানা কথা বার্ত্তার পর দ্বিতীয় শিল্পী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "ভাই, আজ আমি বড়ই গোলযোগে পড়িয়াছি—একটী ভদ্র মহিলা নিজ প্রতিমূর্ত্তি চিত্র প্রস্তুতের জন্য এখানে আসিয়া ঐ ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার দাসী আসিয়া বলিল, তাহার প্রভু ঠাকুরাণীর হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া দেখি, বাস্তবিকই বেচারী বড় কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় অল্প আয়াসে অল্পক্ষণের মধ্যেই সারিয়া গেল। শুনিলাম ইতিপূর্ব্বে তাঁ'র এরূপ অসুখ আর কখনও হয় নাই। আমি তাঁ'র দাসীকে বলিলাম, তোমার প্রভুকে এখন ঐ বিছানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বল, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বেশ সুস্থ হইলে, তাঁহার চিত্র আরম্ভ করিব। এরূপ অবস্থায় এক ভাবে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিলে হয়ত তাঁ'র আবার অসুখ হইতে পারে। তিনি দাসী মুখে আমার কথা শুনিয়া সম্মত হইলেন। বিছানায় শয়ন করিলেন, বিশ্রাম করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন, এখনও জাগ্রত হন নাই। দাসী তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় নিদ্রিতা দেখিয়া খাটের মোসারী ফেলিয়া কি কার্য্যে অন্যত্র গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল, "মহাশয়, ও ঘরে কেউ যেন না যায়, তিনি নিদ্রিতা আছেন, আপনি একটু লক্ষ্য রাখিবেন। আমি এতক্ষণ নিজের কাজেই ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এখনও তিনি ঘুমাইতেছেন কেন? জানিতে না পারিয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম, এদিক ওদিক দেখিলাম—তাঁহার দাসী এখনও ফিরিয়া আসে নাই, তারপর পরদার পাশ দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখি—সুন্দরী অকাতরে ঘুমাইতেছেন, গায়ের কাপড় চোপড় প্রায় আলু থালু হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার সেই অবস্থা এমন সুন্দর যে, দেখিলে চোখ ফিরাণ যায় না। তাঁহার বন্ধু শুনিয়া বলিলেন "কৈ দেখি?" উভয়ে সেই

পর্দ্দার পার্শ্ব দিয়া পুনরায় দেখিলেন, বাস্তবিক সে রমণী এখনও গাঢ় নিদ্রিতা। বন্ধুটী রমণীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার একটী চিত্র গ্রহণ করিবার প্রলোভন আদৌ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি কাগজ পেন্সিল চাহিলেন, কিন্তু ইনি বলিলেন 'আমি তোমায় বলি নাই, এই দেখ—ইতিমধ্যে আমি তাহার অবয়ব লাঞ্ছিত (Sketch) করিয়াছি" এই বলিয়া এক খানি কাগজের উপর পেন্সিলে অঙ্কিত একটী চিত্র দেখাইলেন। সে ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বলিলেন "বাঃ এ ঠিক হইয়াছে, চল আর একবার ভাল করিয়া মিলাইয়া লই।" দেখিতে দেখিতে তাঁহারা এত মোহিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহারা আর পরদার পার্শ্ব দিয়া দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, অতি সাবধানে পরদাটী সরাইয়া পাছে পায়ের শব্দে রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই ভাবিয়া পায়ের জুতা খুলিয়া অতি সাবধানে ধীরে ধীরে যেন চোরের মত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; মুখে কথা নাই, উভয়ে সেই পেন্সিল-অঙ্কিত চিত্রটীর মধ্যে কোন্ কোন্ স্থল সংশোধন করিতে হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নবাগত বন্ধু চুপি চুপি বলিলেন আচ্ছা ভাই, তুমি এক কাজ কর, তুমি এচিত্র যাহা লাঞ্ছিত করিয়াছ, তা খুব ঠিক হইয়াছে, আমি ও পাশে যাইয়া দেখি, যদি ও দিক হইতে ইহা অপেক্ষা আরও ভাল দেখায় তাহা হইলে ও পাশেরও একটী স্বতন্ত্র চিত্র আমি অঙ্কিত করিব।" তাহাতে ইনি বলিলেন, "না হে, আর এখানে আর থাকিয়া কাজ নাই, কি জানি—যদি আমাদের গুজগুজানিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কি সেই দাসীই আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে বড়ই লজ্জায় পড়িতে হইবে।" কিন্তু সেই বন্ধু কিছুতেই মানা শুনিলেন না তিনি কাগজ পেন্সিল লইয়া পিছন দিকে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, অগ্রসর হইলেন, যেমন তিনি সেই খাটের পাশ দিয়া অন্য দিকে যাইবেন, অমনি তাঁহার মাথায় কি ঠেকিল, তখন তিনি লজ্জায় তাঁহার বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই তোমার কথায় আর কাজে প্রকৃতই এক হইয়াছে, আমি ঠকিয়াছি। তুমি এমন কৌশলে এই প্রকাণ্ড চিত্র প্রস্তুত করিয়াছ এবং এমনভাবে দেয়ালের সহিত আবদ্ধ করিয়াছ যে, আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না যে, এ রমণী মূর্ত্তি তোমার চিত্রিতা! যেমন জীবন্ত ভাব, তেমনি প্রকৃত মোসারীর অনুকরণ, তেমনি খাট বিছানা, এমন প্রকৃতানুরূপ বর্ণবিন্যাস আমি আর কখনও দেখি নাই, ছার আমার ফল ফুল চিত্রিত করা!"

এখন দেখুন সুশিল্পীর বর্ণ চাতুর্য্য কি অদ্ভুত জিনিস। যদ্যপি সেই শিল্পী কেবল পেন্সিল দিয়াই ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেন, তাহা হইলে কি অন্য ব্যক্তি এরূপ ভ্রমে পড়িতেন? কখনই না। সুতরাং বর্ণ-বিজ্ঞান ও তাহার যথাযথ বিন্যাসকরণ চিত্র-শিল্পের সর্ব্ব প্রধান উপকরণ বলিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

তন্ত্র কি?

(৫৫ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টবিধ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সংক্ষেপেই বলা হইল, ইহাদ্বারা বুদ্ধিমান পূজক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, প্রণায়াম সাধনাদ্বারা অল্পকালের মধ্যেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত বহুবিধ যোগৈশ্বর্য্য বা যোগবিভূতি লাভ হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্তির শক্তি উদ্বোধিত হয়, মনের নির্লিপ্ততাভাব ও পরমানন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে। দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন, বাক্‌সিদ্ধি, ইচ্ছা গমন, এমন কি ত্রিলোক-পর্য্যটন করিবারও শক্তি আইসে, ইহা শিবের আজ্ঞা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাণায়াম যে যোগের প্রধান অঙ্গ বা পূজাতত্ত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে সিদ্ধ হইলে ক্রমে নিম্নোক্তরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, নিম্ন বা অধম অবস্থায় সাধকের দেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়। (সেই ঘর্ম্ম শরীরে মর্দ্দন করা আবশ্যক, না করিলে শরীরের ধাতু বিনিষ্ঠ হইয়া থাকে।) দ্বিতীয় বা মধ্যমাবস্থায় শরীরে কম্প এবং তৃতীয় বা উত্তমাবস্থায় দর্দ্দুর বা ভেকের ন্যায় গতি অর্থাৎ বদ্ধ পদ্মাসনস্থিত যোগীকে অবরুদ্ধপ্রাণ বায়ুপ্লুত-গতির ন্যায় চালিত করে। ক্রমে অধিক কাল কুম্ভকের অভ্যাস হইলে, সাধক ভূমি হইতে শূন্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলে যোগীর অল্প নিদ্রা, অল্প মলমূত্র হইবে; শারীরিক বা মানসিক রোগ বা শোক দুঃখ থাকিবে না। সাধক সদাই হৃষ্টচিত্ত হইবে।

যোগের পঞ্চমাঙ্গ—'প্রত্যাহার'।

ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়লিপ্ত হইতে না দেওয়ার অভ্যাসকে প্রত্যাহার কহে। স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়গণ নানাবিধ ভোগ লালসায় প্রধাবিত হইতে থাকে, তাহাকেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত মানস-পূজার অভ্যাস ও ইচ্ছামাত্রই অন্তরমধ্যে কুম্ভককে প্রত্যাহার বলে।

যোগের ষষ্টাঙ্গ—'ধারণা'।

আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে, ধারণা অভ্যাস করিতে হইবে। চিত্তকে নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃৎপদ্মে, চন্দ্রে, সূর্য্যে বা কোন প্রতিমূর্ত্তিতে অথবা ব্রহ্মে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার নাম ধারণা। মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানে, নাভিদেশে মণিপুরে, হৃদ্দেশে অনাহতে, ও ভ্রূমধ্যে ঊর্দ্ধদেশে এই পঞ্চ স্থানে যোগীগণের উপাস্য বস্তুর ধারণা করিতে হয়।

যোগের সপ্তমাঙ্গ—'ধ্যান'।

ধারণা দ্বারা ধারণীয় বস্তুতে চিত্তের যে একাগ্রতাভাব জন্মে, তাহারই নাম ধ্যান। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার। ষট্‌চক্র মধ্যে বা দেবতাদিগের ধ্যান-মন্ত্রানুসারে যে ধ্যান করা যায়, তাহার নাম সগুণ ধ্যান এবং সহস্রারে যে পরমাত্মার ধ্যান করা হয়, তাহার নাম নির্গুণ ধ্যান। এ সকল বিষয়ে ভাষায় বলিবার কিছুই নাই। সাধকের অবস্থানুসারে ক্রমে তাহা আপনাপনি উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যোগের অষ্টমাঙ্গ—'সমাধি'।

ধ্যান করিতে করিতে ধ্যেয় বস্তু বা পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য বিধানকেই সমাধি বলে। সমাধি

অবস্থায় মন প্রাণ সমস্ত ধ্যেয় বস্তুতে লয় হইয়া যায়। সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প ও অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সমাধি অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত সম্প্রজ্ঞাত ভাব, অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সে সব কিছুই থাকে না। এ সকল কথা সাধকের হৃদয়ে সাধনাদ্বারাই উপলব্ধ হইবে, নতুবা বৃথা বাক্যজাল ও তর্কের উপাদান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে। সেই কারণ সাধু মহাত্মগণ বলেন, ক্রমে সাধনাসহযোগেই এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবে। পূর্ব্ব হইতে ইহার আভাষ মাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইল। সুতরাং এসম্বন্ধে যথা নিয়ম প্রাণায়ামাদি বিষয়ে যথাক্রমে অভ্যস্থ না হইয়া বৃথা তর্ক, প্রতিবাদ বা অধিক আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই।

যোগারম্ভ কাল।

পূজা বা যোগসাধনার নিমিত্ত শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট কালেরও উল্লেখ আছে। অনভিজ্ঞ গুরু বা সাধনাভিলাষী শিষ্য তাহা না জানিয়া যে কোনও একখানি যোগ শাস্ত্রের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই তাহার কিয়ৎ পরিমান স্থূল মর্ম্ম গ্রহণান্তর সাধনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতেই তাঁহারা সময় সময় সাধনপর যোগীরূপে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া করিয়া অবশেষে শ্বাস কাশের ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু সিদ্ধ যোগীগণ শিষ্যকে যোগশাস্ত্রের উপদেশ কালে বলেন—"বাবা বসন্ত অথবা শরৎকালে নৈমিত্তিক পূজা সাধনা বা যোগাভ্যাস আরম্ভ করিবে, তাহা হইলেই অনায়াসে যোগ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

"বসন্তে বাপি শরদি যোগারম্ভং সমাচরেৎ।
তদা যোগো ভবেৎ সিদ্ধো বিনায়াসেন কথ্যতে॥"

তাহার পরই আবার বলিতেছেন :—

"হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা।
যোগারম্ভং নকুর্ব্বীত কৃতে যোগো হি রোগদঃ॥
বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগারম্ভং সমাচরেৎ।
তথা যোগী ভবেৎ সিদ্ধো রোগোন্মুক্তো
ভবেদ্ ধ্রুবম॥"

অর্থাৎ হেমন্ত, শিশির বা শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যোগ বা নৈমিত্তিক পূজা আরম্ভ করিবে না, তাহা হইলে সেই যোগ হইতে নিশ্চয়ই রোগ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু শরৎ ও বসন্তকালে যোগাভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হইবে, পরন্তু কোন রোগ থাকিলেও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

এক্ষণে বৎসরের মধ্যে কোন্ কোন্ মাস কোন্ কোন্ ঋতু পরিব্যঞ্জক তাহাও যোগীগণ যোগশাস্ত্রানুসারেই নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন। চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত; জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুইমাস গ্রীষ্ম; শ্রাবণ ও ভাদ্র—বর্ষা; আশ্বিন ও কার্ত্তিক—শরৎ; অগ্রহায়ণ ও পৌষ—হেমন্ত; মাঘ ও ফাল্গুন শিশির বা শীত কাল বলিয়া জানিবে।

"বসন্তশ্চৈত্র বৈশাখৌ জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ৌচ গ্রীষ্মকৌ।
বর্ষা শ্রাবণ ভাদ্রাভ্যাং শরদা আশ্বিন কার্ত্তিকৌ।
মার্গপৌষৌ চ হেমন্তঃ শিশিরো মাঘ ফাল্গুনৌ॥"

গোরক্ষ সংহিতা।

দেখা যাইতেছে প্রকৃতি অনুসারে জল বায়ুর যেমন পরিবর্ত্তন হয়, শরীর মধ্যেও সেইরূপ নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা সাধনারও সিদ্ধি

বা অসিদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশেও নৈমিত্তিক পূজা বা আরাধনার প্রচলিত দুইটী প্রশস্ত কাল দেখিতে পাওয়া যায়। একটী শরৎকাল আর একটী বসন্তকাল। শরতে শারদীয়া নবরাত্র বা দুর্গাপূজা হইতে লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী আদি যেমন বহুপূজা হইয়া থাকে, বসন্ত কালেও সেইরূপ বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, শ্রীরাম নবমী ও চড়ক সংক্রান্তি আদি নানা পূজা বা সাধনার ব্যবস্থা আছে; সুতরাং এই সমস্ত প্রধান প্রধান পূজা ও অর্চ্চনার সহিতই প্রাথমিক সাধনা আরম্ভ করা বিধেয়।

সাধনানুকূল স্থান।

শাস্ত্রে সাধনানুকূল কালের ন্যায় স্থানেরও যথেষ্ট উল্লেখ আছে। শাস্ত্রের সেই সকল বিস্তৃত শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মানুবাদ ও উদ্দেশ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

সাধনার জন্য এমন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া আবশ্যক যেখানে পূজার্চ্চনার পক্ষে কোন বিঘ্ন ব্যাঘাৎ উপস্থিত না হয়। প্রথমতঃ ধার্ম্মিক রাজা বা জমিদারের রাজ্যে অথবা উপদ্রবশূন্য স্বধর্ম্মপরায়ণ ভদ্র-পল্লীর প্রান্তভাগে যে স্থানে খাদ্যদ্রব্য সুলভ এবং সহজ-প্রাপ্য অথচ স্থানটী বেশ নির্জ্জন, কূপ, তড়াগ, সরোবর বা দীর্ঘিকা অথবা স্রোতস্বতী ও নির্ঝরণী আদির সুবিধা আছে, এমন স্থানে প্রাচীর পরিবেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে অতি উচ্চও নয় অত্যন্ত নিচুও নয় এমন কুটীর নির্ম্মাণ করাইবে। গোময় দ্বারা চতুর্দ্দিক বেশ মর্জ্জিত করিয়া লইবে যাহাতে সম্পূর্ণ কীটাদি বর্জ্জিত হয়। কুটীর প্রাঙ্গণ সুরভি পুষ্পসমূহের তরু গুল্মও লতাদি দ্বারা পরিশোভিত হইবে। এইরূপ স্থানই পূজার্চ্চনা বা সাধনার সম্পূর্ণ অনুকূল বলিয়া জানিবে। প্রথম সাধনাবস্থায় দূরদেশ, বন, রাজধানী বা বহু লোকাকীর্ণ প্রদেশ, জীর্ণ গোশালা, নদীতট, শ্মশান ও সরীসৃপাদির ভয়যুক্ত স্থান ও প্রাচীন বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করিবে, এসকল স্থান যে চিত্ত স্থিরিকরণে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং যেখানে কোনরূপ বাধা পাইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ স্থানটী বেশ মনোরম, চিত্তে আনন্দ প্রদায়ক, সেই স্থানই সাধনারম্ভের অনুকূল বিধায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবে।

সাধনানুকূল আহার্য্যাদি।

সাধনার সময় সাধকের আহারাদির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। এ অবস্থায় ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, কর্পূর, শষ্পূকাদির চুণ বর্জ্জিত তাম্বুল, শালি অন্ন, যব, গোধূম, পটল, কাঁঠাল, মানকচু, কাঁকুর, বদরি, করঞ্জ, কদলি, ডুম্বুর, কাচকলা, কদলিদণ্ড, মূলা, বেগুণ আদি তরকারি; পলতা, হিঞ্চা ও পালমাদি শাক; ত্বকবর্জ্জিত মুগ ও ছোলা আদি হইতে প্রস্তুত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ; উপরোক্ত স্থানে বাস এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত স্থির করিতে যত্ন করিবে।

অম্ল রুক্ষদ্রব্য, ঝাল, লবণ, সর্ষপ তৈল, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও কটুদ্রব্য অধিক পথপর্য্যটন, প্রাতঃস্নান, অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ, প্রাণিহিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার কুটিলতা, উপবাস, অসত্যভাষণ, মোহ অর্থাৎ সংসারে অত্যাশক্তি, প্রাণিপীড়ন মৈথুন, অগ্নিসেবন, বহুভাষণ ও অতিভোজনাদি চিত্তস্থিরতা পক্ষে বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে কোনও কার্য্য পরিত্যাগ করিবে।

প্রাণায়ামান্তে ঘর্ম্ম হইলে তাহা শরীরে মর্দন করিবে। পূর্ণোদরে বা ক্ষুধার্থ অবস্থায় অথবা মল, মূত্রের বেগ রোধ করিয়া কিম্বা পথশ্রান্ত বা চিন্তা ক্লিষ্ট হইয়া পূজার্চ্চনা করিবে না। তাহাতে আদৌ চিত্তস্থির হইবে না, সুতরাং সাধনায় পণ্ডশ্রম হইবে।

সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ত্যাগশীল ও স্পৃহা-শূন্য ভাবে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে অর্চ্চনা করিলে এক বৎসরের মধ্যেই যোগ-বিভূতি পরিলক্ষিত হইবে ও সিদ্ধিপথ সুগম হইবে। আজ কাল অনেকেই নানা চিন্তা ও নানা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে দিবসব্যাপী স্বার্থ-পরতা এবং হীনপ্রবৃত্তিক কর্ম্ম করণান্তর কয়েক মুহূর্ত্ত কাল সন্ধ্যাবন্দন করিয়াই মনে করেন আমরা যথেষ্ট করিলাম। অনন্তর সিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া শাস্ত্রনিন্দুক হইয়া পড়েন, কিন্তু এই প্রত্যক্ষ সাধন শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কর্ম্ম করিলে যে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারা যায়। তবে সকলের চিত্তের গতি ও ধারণাশক্তি সমান নহে, তাহার উপর পূর্ব্ব কর্ম্মফল ও ভগবচ্ছক্তির কৃপা অবশ্যই সাধকের ফল-লাভ পক্ষে বিভিন্ন কালের আবশ্যক হয়। এই কারণেই চিরকাল ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই সাধনা আবদ্ধ ছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণও সংসারযাত্রা পরিচালনে সংস্থানপর স্বার্থানুসন্ধী, কুটিল, হীনবীর্য্য, পরশ্রীকাতর, পর পদসেবী, চাটুকার, বৈশ্য ও শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছে, সেই কারণ সাধনাও ধীরে ধীরে তদসমীপ হইতে যেন বহু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে মুখে গল্পছলে শাস্ত্রের দুই চারিটা বুলি শুনিয়াই কাহারও বা সিদ্ধ-পুরুষ হইবার ইচ্ছা, আবার কেহ বা শাস্ত্রগুলা কিছুই নহে, 'ও কেবল ব্রাহ্মণ সমাজের চালাকিমাত্র' এই রূপ ধারণা পোষণ করিয়া নিজে অতি বড় শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া দম্ভ বিকাশ করেন। এরূপ হওয়াও কিছুতে যুক্তি যুক্ত নহে। সাধনা করিতে হইলে যথাবিধি সকলকার্য্য গুরুমুখাগত হইয়া সম্পন্ন করা বিধেয়।

মন্ত্র রহস্য।

এতক্ষণ সাধনা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম তৎসহ আচমন হইতে আসনশুদ্ধি, জল শুদ্ধি ও ক্রমে জপ করিবার জন্য শাস্ত্রে বহুবিধ মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধকসমাজেও যথেষ্ট প্রচলিত আছে। এক্ষণে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মন্ত্র অর্থে আমরা কি বুঝিয়া থাকি—সাধারণতঃ কতকগুলির সংস্কৃত শব্দমাত্র সাময়িক ভাবে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়; তাহার উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা সম্বন্ধেই সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিবার আছে। অনেকে বলেন "মন্ত্র কয়েকটী সংস্কৃত শব্দ বা বাক্য-মাত্র, ইহার উদ্দেশ্য কিছুই নাই, সাধারণ পূজক উহার অর্থ ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তোতা পাখীর মত কেবলমাত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহাতে কোনই ফল নাই, বরং তাহার উদ্দেশ্য নিজ নিজ কথোপকথনের ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলে অনেক সুবিধা হয়।" ইহার উত্তরে অধিক কথা বলি-বার ইচ্ছা নাই, তবে মন্ত্র-সিদ্ধ সাধকগণ বলেন, "মন্ত্রের অনুবাদ হইতে পারে না বা তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; মন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ দৈব বা অপার্থিব বস্তু।" মন্ত্র অর্থে শব্দ বা নাদ্ বুঝায়, উহাকেই পরমাত্মার অনাদি ও অনন্তপ্রত্যক্ষ রূপ বলিয়া জানিবে। বিন্দুমাত্রও তাহাতে সন্দেহ করিবে না। জীব যখন কোন শব্দ উপকরণ করে, তখন উহা কোন্ যন্ত্র সাহায্যে দেহের কোন্ স্থান

হইতে সমুত্থিত ও বিকশিত হয় তাহার অনুসন্ধান করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে যে, 'শব্দ' কি? কণ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত, ও তালু ইত্যাদি দেহের নানা স্থান হইতে শব্দের বিকাশ হয়, এইরূপ অনেকেই মনে করেন, কিন্তু এই সমস্ত দৈহিক যন্ত্রাদি বর্ত্তমান থাকি-তেও কোন্ এক অদ্ভুত ও অনির্বচনীয় শক্তির অভাবে (শবাবস্থায়) আর তাহার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ হয় না, অতি ধীরভাবে তাহার চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজে বুঝিতে পারিবে, 'শব্দ' জিনিষটী কি? মানুষ 'আমি' 'আমার' বলিয়া পাগল হয়, কিন্তু সেই 'আমি' বোধক ব্যক্তি কে? এই মল-মূত্র রসযুক্ত, অস্থি-মজ্জা পরিপূরিত দেহযষ্টীই কি 'আমি'? নির্জ্জনে চিত্তস্থির করিয়া গভীর ভাবে একবার ভাব দেখি, কোন্ শক্তির অভাবে এই অতি যত্নে রক্ষিত দেহখানি এক দিন স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিবে কিন্তু 'আমি' শব্দ আর উচ্চারণ করিবে না? অতি ধীরে সেই 'আমির' বা আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, 'শব্দ' কি? মন্ত্ররূপী এক একটী শব্দ উচ্চারণ কর আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহাভ্যন্তরের অতি গভীরতম প্রদেশে অনুসন্ধান কর, কোন্ স্থান হইতে ঐ শব্দ বা নাদ উত্থিত হইতেছে, তাহা হইলে ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে শব্দ' কি? এই শব্দই যে ব্রহ্ম, এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। পাশ্চাত্য জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রাচ্য গুরুমণ্ডলীর সিদ্ধশিষ্য ভগবান শ্রীখ্রীষ্টও তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ 'বাইবেলে' প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন "The word is God" অর্থাৎ 'শব্দই ঈশ্বর' বা 'নাদঃ ব্রহ্ম'। এ কথার অর্থ বর্ত্তমান খৃষ্টানগণও ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহাহউক এই শব্দই মন্ত্রাত্মক। ঋষিপ্রবর্ত্তিত মন্ত্রমধ্যে শব্দসমষ্টির এমনই বিচিত্র সমাবেশ (Com-bination) আছে, যাহাতে তাহার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণদ্বারা সাধকের অভিলষিত ভাবের ঔৎকর্ষ্য ও আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। উহার মর্ম্ম সাধনাসাহায্যে অন্তরেই উপলব্ধির বিষয়, শব্দার্থে বাস্তবিক উহা অব্যক্ত।

ক্রমশঃ—

শ্রীসচ্চিদানন্দ।

—o—

ভাস্কর্য্য।

(৫৮ পৃষ্ঠার পর)

স্বামীর আয়ু ও উন্নতি কামনায় সধবা স্ত্রী মাত্রেই মাঙ্গলিক আভরণ রাশি তাহাতে রক্ষা করিতেন এবং তাহা তাহাদের অতি প্রিয় বস্তু বোধে নিরন্তর নিকটেই থাকিত, মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত নিম্ন লিখিত শ্লোক হইতেই তাহা জানিতে পারা যাইতেছে।

"হরিদ্রাং কুঙ্কুমঞ্চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা।
কার্পাশকঞ্চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভম্॥
কেশ সংস্কারকবরী করকর্ণবিভূষণম্।
ভর্ত্তুরায়ুষ্যমিচ্ছন্তি দূরয়েন্ন পতিব্রতা॥"

এক্ষণে এই সকল সামগ্রী সাধ্বী সাধবা স্ত্রীর অবশ্য নিত্য ব্যবহার্য্য বলিয়া প্রচলিত নাই, তবে লৌহ বলয় ও সিঁথির সিঁদুর সর্ব্বদা তাঁহাদের বর্ত্তমান থাকে, একথা সকলেই অবগত আছেন। সিন্দূর পরিবার জন্য সেকালে পাতার বা কাগজের কলিপাতা (Stensil) কাটা হইত এবং তাহাও সেই সিন্দূর-

পেটিকার মধ্যে থাকিত। এখন সেরূপ কলিসিন্দুর পরিবারও প্রচলন নাই। কোন কোন স্থলে কেবল বিবাহ কালেই তাহার ব্যবহার আছে। যাহা হউক সিন্দুর পেটিকা ও মঞ্জুষা আদি নানাবিধ আভরণাধার যে, সে কালে ব্যবহৃত হইত, তাহা প্রাচীন শাস্ত্র ও ভাস্কর্য্য হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বরও শাঁচির ও ভাস্কর্য্য এবং সারনাথের ভূগর্ভোত্থিত পাত্রনিচয়ের মধ্যে মন্থনদণ্ড, সুর্প বা কুলা, ওখলি বা হামান দিস্তা, শিল, নোড়া, জাঁতা চাকি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীসকল ঠিক বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত সামগ্রীরই অনুরূপ ছিল, বিশেষ কিছু যে, প্রভেদ ছিল তাহা, বলিয়া বোধ হয় না। হাঁড়ি কলসির গঠন সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কতকগুলি পাত্র সারনাথ ও অন্যান্য স্থানের মৃত্তিকাগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর সুন্দর এনামেল করা আছে। সে গুলি যে ঠিক কোন সময়ের তাহা এখনও নিশ্চয় করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু নিতান্ত আধুনিক বলিয়াও বোধ হয় না। বৌদ্ধ যুগ হইতে মোসলমান প্রাধান্যের মধ্য কাল পর্য্যন্ত তাহার প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ বাঙ্গালার মধ্যেও প্রতাপাদিত্যের সময়েও যে তাহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই এনামেল কার্য্য তখন এত সুলভ ও সাধারণ ভাবে প্রচলিত ছিল যে, সংসারের নিত্যব্যবহার্য্য হাঁড়ি কলসিতেও লোক এনামেল করাইয়া লইত। আজ কাল চুণার-পটারী বা বার্ণকোম্পানীর পটারীর উপর যেমন এনামেল হয়, সে কালে তাহা অপেক্ষাও যেন ভাল এনামেল হইত বলিয়া বোধ হয়। মোসলমানদিগের রাজত্বকালে গৃহ অট্টালিকার ইষ্টক প্রান্তেও এনামেল হইত। অনেক প্রাচীন মসজিদ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রাচীন কালে বাক্স ও সিন্দুকাদি কাষ্ঠ এবং পাথরে নির্ম্মিত হইত। সারনাথের মৃত্তিকাগর্ভে বহু ধন রত্ন প্রোথিত ছিল। জেঃ কানিংহামের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যেই বহু ধন রত্ন পূর্ণ একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সিন্দুক পাওয়া গিয়াছিল, তাহার পরিমাণও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, প্রায় ২।৩ হাত লম্বা ও চওড়া হইবে। সম্প্রতি সারনাথের মধ্যে আর একটী প্রস্তরময় সিন্দুক পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় ৭।৮ হাত লম্বা এবং প্রস্থেও ৩। ৪ হাত হইবে। উহার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড শিবতাণ্ডব মূর্ত্তি ছিল। মূর্ত্তিটী দেখিলে বোধ হয় যেন উহা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু কাশীর প্রসিদ্ধ মাননীয় মুন্সী মাধোলাল বলেন, উহা বহুদিন মৃত্তিকাগর্ভে থাকিবার কারণেই ক্রমে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই কারণ এমন অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক উহার আধার বাক্সটীই এখানের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইরূপ কাষ্ঠের সিন্দুকও সে কালে যথেষ্ট প্রস্তুত হইত, তাহাকে আমাদের সাধারণ ভাষায় গাছ সিন্দুক বলে। এখনও অনেক বনিয়াদি ঘরে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

এইবার লেখণী ও লিখনাধার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। অবশ্য ভাস্কর্য্যমধ্য হইতে ইহার যথাযথ আদর্শের আশা করা অসম্ভব, তবে ইণ্ডিয়ান

মিউজিয়মের মধ্যে সংগৃহীত একখানি প্রস্তর ফলকের উপর একটী নগ্ন স্ত্রী মূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহার দক্ষিণ হস্তে একটী লেখনী এবং বাম হস্তে লিখনাধার, পাটা বা শ্লেটের মত একটী আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে অনুমান হয়, উৎকল প্রদেশে এখনও যেমন লৌহ নির্ম্মিত লেখনী সাহায্যে তালপত্র বা অন্যান্য উপাদানের উপর লিখিত হয়, উহাও ঠিক সেইরূপ।

আজ কাল স্কুলের বালকগণ শ্লেটের উপর পেন্সিল দ্বারা লিখিয়া থাকে পূর্ব্বে কাষ্ঠ ফলকের উপর খড়িমাটিদ্বারা সেইরূপ ভাবে লিখিবার ব্যবস্থা ছিল। আমরাও বালককালে দেখিয়াছি যে, সাধরণ মুদী বা বেনিয়ার দোকানে দোকানদারগণ কাষ্ঠের পাটায় হিসাব পত্র লিখিয়া রাখিত। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এখনও সেই ভাবেই লিখিবার প্রথা প্রচলিত আছে। স্মৃতিকার মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন শিরোমণি তাঁহার ব্যবহারতত্ত্বের মধ্যে ব্যাসসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে—

পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
উনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥

কোন বিষয় প্রথমে পাটায় বা ভূমিতে খড়ি দ্বারা লিখিয়া যথা সম্ভব সংশোধনান্তে তাহা পুনরায় ভাল করিয়া পত্রে লিখিবে। আমাদিগের শাস্ত্রাদি গ্রন্থ প্রাচীনকালে তালপত্রে লিখিত হইত। উড়িয়াগণ এখনও তালপাতাতেই লৌহ শলাকা বা কলমে লিখিয়া থাকে। যোগিণী তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

বংশত্বচ্যা লিখেদ্বর্ণং তস্য হানির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
তাম্রত্বচ্যাতু বিভবো ভবেন্ন তৎক্ষয়ো ভবেৎ॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেন্নিত্যং সুবর্ণস্য শলাকয়া।
বৃহন্নলস্য ত্বচ্যা বৈ মতিবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
তথা অগ্নিময়ৈর্দেবি পুত্র পৌত্রধনাগমঃ।
" অগ্নিময়ৈশ্চিত্রকাষ্ঠময়ৈঃ
রৌপ্যেন বিপুলা লক্ষ্মীঃ কাংস্যেন মরণং ভবেৎ॥
অষ্টাঙ্গুল প্রমাণেন দশাঙ্গুলেন বাথবা।
চতুরঙ্গুলত্বচ্যা বা যো লিখেৎ পুস্তকং শুভে॥
তত্রদক্ষরসংখ্যে স্বল্পায়ুর্য্যাতি বৈ দিনে।"

ভাবার্থ—বাঁশের বা কঞ্চির কলমে লিখিতে নাই, তাহাতে লেখকের হানি হয়; বৃহন্নল বা সরের কলমে লিখিলে মতি বুদ্ধি হয়, কাঁশা বা অন্য কোন মিশ্রিত ধাতুনির্ম্মিত লেখনী লেখকের হানিকর। তাম্র, রৌপ্য ও সুবর্ণ লেখনী যথাক্রমে উত্তম হইতে উত্তমতম। ইহাদের পরিমাণ অষ্ট অঙ্গুল হইতে দ্বাদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত হইবে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, পূর্ব্বে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় স্বতন্ত্র নিবের ব্যবহার না থাকিলেও ধাতু নির্ম্মিত লেখনীর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাচীনাদিগের "তোমার সোনার দোয়াত কলম হউক" এই আশীর্ব্বচনে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই মূল্যবান ধাতুনির্ম্মিত মস্যাধার ও লেখনী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন। এইরূপ লেখনী ব্যতীত চিত্রাদি লিখন জন্য লোমজ লেখনী বা তুলিকারও বহুল প্রচলন ছিল। সে কালের নর নারী সকলেই চিত্রলিখন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইতেন। এ বিষয় আমার "বর্ণ-চিত্রণ" নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখনী ও লিখনাধার

ব্যতীত আর একটী উপাদান লিখিবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাহার নাম মসী বা কালী। গ্রাম্য ভাষায় কথিত আছে "কালি কলম মন, লিখে তিনজন"। সুতরাং কালিও লিখিবার একটী প্রধান উপাদান। এ সম্বন্ধে এ স্থানে বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক নাই, কারণ ইহা ভাস্কর্য্যের সীমা-বহির্ভূত। এ বিষয় আমার 'শিল্পসংগ্রহ" গ্রন্থে মসী অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতে তাহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

আর্য্যগণ বেশভূষা, লিখন পঠন, শিল্প সঙ্গীত সকল বিষয়েই সমান আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, ভাস্কর্য্যের প্রত্যক্ষ আদর্শ হইতেই তাহার সপ্রমাণ হইতেছে। সঙ্গীত বিষয়ক যন্ত্রাদি সম্বন্ধে ভাস্কর্য্য হইতে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায়, এক্ষণে নিম্নে তাহাই বিবৃত হইতেছে। সেকালে সামগানাদি সাধনসঙ্গত কণ্ঠ-সংগীতাদির যেরূপ যথেষ্ট প্রচলন ছিল, বাদ্য ও যন্ত্র-সঙ্গীতেরও সেইরূপ বহুল ব্যবহার ছিল। একা এক অথবা একত্রে বহু ব্যক্তি বহু যন্ত্র মিলাইয়া একতানে সঙ্গীতালাপ করিতেন। শাঁচী, অমরাবতী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও সারনাথ আদি স্থানে বহু প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরগাত্রে, গিরিগুহার অভ্যন্তরে শোভাযাত্রার অনুরূপ বহু নৃত্যগীত পরায়ণা খোদিত চিত্রগুলিই তাহার সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

এই সকল সংগীত-যন্ত্র সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত। প্রাচীন শাস্ত্র হইতেই তাহা অবগত হওয়া যায়।

"ততমানদ্ধশুষির ঘনানীতি চতুর্বিধং।
ততঃ বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মূরজাদিকং॥
বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংশ্যতালাদিকং ঘনং।

প্রথম ততঃ—বীণা সারঙ্গ ইত্যাদি তার বা তাঁতের স্বর-যন্ত্র; দ্বিতীয় আনদ্ধং—ঢোলক, মর্দ্দল বা মৃদঙ্গাদি বাদ্য-যন্ত্র; তৃতীয় শুষিরং—বংশী, শিঙ্গা প্রভৃতি সুর-যন্ত্র, যাহা মুখ দিয়া বাজান যায়; চতুর্থ ঘনং—কাঁশী, করতাল আদি তাল-যন্ত্র। এই চতুর্ব্বিধ যন্ত্রেরই আদর্শ ভাস্কর্য্যে চিরদিন পরিলক্ষিত হয়। এবং একাল পর্য্যন্ত এই চারিবিধ যন্ত্র ব্যতীত পঞ্চবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনেই হয় না।

আর্য্যদিগের ততঃ জাতীয় যন্ত্রাবলীর মধ্যে বীণাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত আছে। তাই সংগীত-শিল্পেশ্বরী ভগবতী ভারতী বীণাপাণী নামে পূজিতা হইয়া থাকেন। বীণা আর্য্যদিগের আদি যন্ত্র কিনা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বীণা যে সমগ্র যন্ত্রাবলীর ঔৎকর্ষ-স্বরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বরের প্রকৃত বিকাশ বীণা ব্যতীত আর কোনও যন্ত্রেই পরিলক্ষিত হয় না। এই বীণা আর্য্য-ইতিহাসের অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রচলিত আছে। একতন্ত্রী বা একতারা, দ্বিতন্ত্রী বা যুগলতারা, ত্রিতন্ত্রী বা তেতারা অথবা সেতারা (পারসীক শব্দে ত্রি অর্থে সে বুঝায়) এবং তুম্বর মুনি প্রবর্ত্তিত চারিতার বিশিষ্ট তুম্বুরা আদি ততঃ শ্রেণীয় যন্ত্র ভাস্কর্য্যমধ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল যন্ত্রই অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া সেতার, সুরবাহার, এসরার বা এসরাজ, বাহুলীন্ বা বেহালা, সারঙ্গ, শরদ্ ও গিটার আদি প্রাচীন ও আধুনিক নানাবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। আশ্চর্য্যের

বিষয় হার্প ও গিটার আদি পাশ্চাত্য প্রদেশের যন্ত্রাবলীর অনুরূপ যন্ত্রও এ দেশে বহু প্রাচীন সময়ে প্রচলিত ছিল। শাঁচি ও আমরাবতীর ভাস্কর্য্যমধ্যে

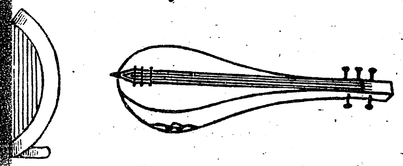

উপরি প্রদত্ত চিত্রের অনুরূপ হার্প ও গিটার দেখা গিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগৃহীত এক খানি প্রস্তরগাত্রে গিটারবাদিনী একটী রমণীমূর্ত্তি খোদিত আছে। প্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য্যগণ বলেন, সেতার হইতে গিটার এবং গিটার হইতে সেতারের আবিষ্কার হইয়াছে। অথবা ত্রিতন্ত্রী হইতে সপ্ততারের গিটারের সৃষ্টি। পূর্ব্বোক্ত এসিয়াটীক সোসাইটীর আদর্শ গিটারটী সপ্ততার বিশিষ্ট। কিন্তু ইহাতে আধুনিক সেতারের অনুরূপ পরদা নাই। সে কালে একতন্ত্র হইতে বহুতন্ত্র বিশিষ্ট যন্ত্রে স্বরের আলাপন হইত। কল্পসূত্র ও কাত্যায়ণাদি গ্রন্থে শততন্ত্র বিশিষ্ট যন্ত্রেরও উল্লেখ আছে।

আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র মধ্যে ঢোলক সর্ব্ব দেশেই সাধারণভাবে প্রচলিত। তবে ঢুলী-জাতীয়দিগের ঢোল হইতে সাধারণ ঢোলের সামান্য পার্থক্য আছে। তাহা সকলেই অবগত। পুরাতন ভাস্কর্য্যমধ্যে খোদিত ঢোলক সাধারণ ঢোলকেরই অনুরূপ, ইহার উভয় মুখ সমান। কোন কোনও স্থলে ঢোলকের এক মুখ অন্য মুখ হইতে সামান্য বিস্তৃত দেখা গিয়াছে। মূরজ, মৃদঙ্গ, মার্দ্দল বা মাদল অথবা পাখোয়াজ প্রভৃতি প্রায় একরূপ। অতি প্রাচীন কালে সাধারণতঃ মূরজ ও মাদলই যে এদেশে বাদিত হইত সে বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতেও প্রমাণিত হয়। রাজমার্ত্তণ্ড, রত্নাবলী ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থে মূরজ ও মার্দ্দল নামক বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন মূরজ ও মার্দ্দলের মধ্যে সামান্য আকার পার্থক্য ছিল, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মার্দ্দলই অধুনা মাদল নামে প্রচলিত এবং উহার উৎকর্ষ বিধান করিয়া মূরজের অনুরূপে মৃদঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। মোসলমান আধিপত্য সময়ে ইহাই পাখোয়াজ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বাঁয়া ও তবলা বা ডাহিনাকে আধুনিক যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, বহু সঙ্গীতাচার্য্যও তাহাই স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন মোসলমান সঙ্গীতালাপীগণ ঠুংরী ও টপ্পাদি নিম্ন অঙ্গের সঙ্গীতের সহিত সঙ্গত করিবার উপযোগী করিয়া মৃদঙ্গকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বাঁয়া ও তবলার সৃষ্টি করিয়াছেন। একথায় এতদিন বেদবাক্যসম আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এক্ষণে সারনাথস্থিত মৃত্তিকা-গর্ভোত্থিত কয়েকটী বৌদ্ধযুগের ও পুরাতন হিন্দু-ভাস্করখোদিত আদর্শ দেখিয়া সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে। সেই আদর্শের মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি, একলব্যের গুরুদক্ষিণা, নর্ত্তকীদিগের একতান বাদন আদি সুন্দর রূপে খোদিত আছে। সেই পাথরখানি কোন হিন্দু মন্দিরের দ্বারশীর্ষ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তাহাতে এক স্থানে কয়েকটী রমণী নৃত্য করিতেছে, পার্শ্বে কয়েক জন নানা যন্ত্রসাহায্যে সংগীতালাপ করিতেছে

তাহাতেই বাঁয়া ও তবলার সুস্পষ্ট আদর্শ দেখা গিয়াছে, বাঁয়া কাৎ ভাবে বাম হস্তে এবং তবলা খাড়াভাবে দক্ষিণ হস্তে বাজাইতেছে, সে বাজাইবার প্রণালী ও সেই যন্ত্র ঠিক বর্ত্তমান সময়ানুরূপ। প্রাচীন সময়ে এই বাদ্যযন্ত্রের কি কি নাম ছিল তাহা জানা যায় নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

পরশুরাম কাব্য।

দ্বিতীয় স্বর্গ।

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

মহারাজা কার্ত্তবীর্য্য সম্রাট প্রধান!—
একছত্র অধিপতি মহা ভাগ্যবান।
সসাগরা ভূমণ্ডল জিনি ভুজবলে,
প্রবল প্রতাপ রাজা শাসেন ধরণী!—
বিভব ঐশ্বর্য্য তাঁর না যায় গণন;—
ধন জন পরাক্রম সম্ভ্রম সুযশ
এ সকলে অধিকারী প্রচুর প্রমাণ।
প্রতাপে কম্পিত যত সুরনর গণ!—
বিখ্যাত সহস্রবাহু বলি ত্রিভুবনে।
সম্পদ গৌরব যশ-ধনে বশীভূত!
সেবিছে সহস্র রাণী সে বীর চরণে।
শ্রেষ্ঠ ভোগ্য যাহা কিছু আছে চরাচরে,
সকলে আয়ত্ত করি আনে অধিকারে।
ভাসিছে বিলাস স্রোতে দিবস যামিনী,
আমোদে তরঙ্গ বহে, যেন স্রোতস্বিনী।
সুসজ্জিত স্তরে স্তরে চারুশিল্প ভার,
নাহি কিছু ত্রিভুবনে অভাব তাঁহার।
নাহি চিন্তা নাহি শোক, দুঃখ ক্লেশরাশী!—
অভাবের কশাঘাতে জীর্ণ নহে তনু।
তিতিক্ষা যন্ত্রণানলে নহে কভু দগ্ধ!—
নব ফুলে নিত্য ভ্রমে ভ্রমরের মত।
কত পূণ্য পূর্ব্ব জন্মে করেছে নিশ্চয়!—
তা না হলে কার ভাগ্যে ফলিছে এমত!—
বিধির বিধান কিন্তু অতীব কঠোর,
এ সংসারে কোন বস্তু চিরস্থায়ী নয়।
সুখ দুঃখ অবিরত চক্রাকারে ঘোরে,
সুখের পরেতে দুঃখ দুঃখ পরে সুখ।
কুক্ষণে, কি শুভক্ষণে, কেমনে বলিব?
রাজ্য হতে বাহিরায় মৃগয়া কারণ
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
সঙ্গেতে সহস্র রাণী, সৈন্য বহুতর
অমাত্য সামন্ত বহু অসংখ্য কিঙ্কর।
নৈমিষের বহির্দ্দেশে শিবির সংস্থাপি,
বিস্তর বিলাস দ্রব্য সঙ্গেতে আনিয়া,
আমোদে উন্মত্ত রাজা কিছুদিন ধরি।
কভু মৃগয়ায় ব্যস্ত; কভু জলকেলী,
সহস্র যুবতী সঙ্গে; কভু নৃত্য গীত,
আমোদ নূতন নিত্য, যেবা যবে মনে।
কুক্ষণে কি শুভক্ষণে বুঝিবারে নারি।
তথা হতে প্রাতে ভূপ, পশে মৃগয়ায়।
শ্রান্ত হয়ে, নৈমিষের নির্জ্জন মন্দিরে

আশ্রয় লইয়া হয় নিদ্রা অভিভূত!—
কুক্ষণে ভার্গব তাঁরে আবদ্ধ করিল।
নিদ্রা ভঙ্গে নরনাথ প্রমাদ গণিল;—
বাহিরিতে প্রাণপণে বিস্তর চেষ্টিল।
সকলি হইল ব্যর্থ বিধির বিপাকে।
অবশেষে উদ্ধারের না হেরি উপায়,
কালীর শরণাগত, হল প্রাণভয়ে।
জনমেও কভু নাহি পূজে দেব দেবী;
আনে নাই জিহ্বাগ্রে কভু বিভুনাম।—
ত্রিভুবন ভয়ে ভীত যাঁর নাম শুনি—
সেই কার্ত্তবীর্য্য এবে কালী কালী বলি,
পড়ে কালী পদতলে, রক্ষার কারণ।
ব্রাহ্মণ রমণী বেশে, পুষ্প পাত্র হাতে
সদয়া হইয়া কালী দিলা দরশন;—
মরণ শঙ্কট হতে উদ্ধারিলা বীরে,
মাতা। আর কি জনমে, ভুলিতে সে পারে
কালভয় নিবারিণী করালিনী নাম?
বিপদে পড়িলে লোকে ভগবানে ডাকে।
বিপদ না হলে ভক্তি শিক্ষা নাহি হয়।
বিপদেতে জ্ঞান চক্ষু করে উন্মীলন।
যে যত বিপদে পড়ে, সে তত পণ্ডিত।
বিপদে পড়িলে মনে বহে ভক্তিস্রোত।
তুমি যবে সুখসরে থাক নিমগন,
ভুলেও কি ভাব কভু, প্রভু দয়াময়ে?
বন্দী হয়ে, অনাহারে বাহিরিবে প্রাণ?—
এই ভয়ে প্রমাদ গণিয়ে মনে রাজা
প্রাণ খুলি ডাকিয়াছে কালী কালী বলি,
পরে বুঝিয়াছে মনে, অনন্য অন্তরে
যেবা লয় মায়ের শরণ;—ভক্তিভরে,
একমনে যেবা ডাকে দয়াময়ী মায়ে!—
নিশ্চয় বিপদ তার চলি যায় দূরে।

ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।

ঠাকুরমা।

ষষ্ঠ সোপান।

(৭৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

বিমলার শ্বাশুড়ীর ভারি অসুখ, ডাক্তার বৈদ্য ঘন ঘন আসিতেছে, বিমলা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কখন গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে, কখন পাখার বাতাস করিতেছে। আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই দেখিতে আসিতেছে। আজ বিমলার বাপেরবাড়ী হইতে লোক আসিয়াছিল, তাহার মুখে গিন্নীর বাড়াবাড়ি অসুখের খবর শুনিয়া বিমলার বাপ্ আর ঠাকুরমা এই-মাত্র দেখিতে আসিয়াছেন, সকলেই চিন্তিত, কখন কি হয় বলা যায় না। এ অবস্থায় চারুকে টেলিগ্রাফ করা উচিৎ, নিদেন-সময়ে মায়ের সঙ্গে একবার দেখা না হলে চিরদিন তার ভারি দুঃখ থেকে যাবে। সকলেরই ইচ্ছা তাহাকে এখনই জরুরি তারে খবর দেওয়া হউক। বিমলার ঠাকুরমা রুগ্নার পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "কেমন আছ মা! ভারি কষ্ট হচ্ছে বুঝি?"

রোগিনী চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "জল, জল দাও।"

"ভারি পিপাসা দেখছি, বিমল একটু জল এনেদে।" বিমল জল আনিয়া দিল। ঠাকুরমা

বলিলেন "দেখ চাড্ডি মৌরি একটু ভাল ন্যাকড়ার পুঁটুলি করে বেঁধে ওতে ভিজিয়ে দে, ঐজল একটু একটু মুখে দিলে এখনই পিপাসা কমে যাবে এখন।" বিমলা তাহাই করিল। তিনি কিছুক্ষণ পরেই রোগীর অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিলেন, তখন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা অত ব্যস্ত হওনা, রোগীর এ ত আর মারাত্মক ব্যায়রাম নয়, মিছি মিছি চাকরকে জরুরি তারের খবর দিয়ে ব্যস্ত করবার কোন কারণ দেখছি না। আজকের দিনটা যাক কাল কেমন থাকে দেখে তখন তার কোরো।" সকলে কথা শুনিয়া বিশেষ বিমলার দেওর বলিতে লাগিলেন "তা আপনি কেমন দেখচেন্, আমরাত বুঝতে পাচ্ছি না, সকলেই ছেলেমানুষ, তাই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, আপনি অনেক দেখেছেন অনেক শুনেচেন, আপনি যা বুঝতে পারবেন তা অনেক নতুন ডাক্তার বদ্যিও বুঝতে পারবে না, তা আপনি কি বলেন, দাদাকে তবে কি আজ টেলিগ্রাফ করবো না?" বিমলার পিতা বলিলেন "না, মা যা বল্‌ছেন তাই কর, আজকের দিনটা দেখে কাল যাহা হয় কোরো। আমারও বোধ হয় আজ রাত্রে বেন্‌ঠাকরুণ একটু ভাল ই থাকবেন।" এইরূপ কথাবার্ত্তার কিছুক্ষণ পরে বিমলার পিতা বলিলেন "মা, তুমি আজ এখানেই থাক, এরা সব ছেলেমানুষ কিছু বোঝে টোজে না, একেবারেই উতলা হয়ে পড়ে।"

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করছিলেম, আমি আজ এখানেই থাকবো।"

রোগীর ব্যায়রাম জ্বর-অতিসার। জ্বর একটু কমিয়াছে, কিন্তু পেটের দোষ কিছুতেই সারিতেছে না। বিমলার ঠাকুরমা সেই অবধি এখানেই আছেন। বিমলা প্রাণপণে শ্বাশুড়ীর সেবা করিতেছে, ঔষধ খাওয়াইতেছে, স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছে, সদা-সর্ব্বদা শ্বাশুড়ীর মুখের কাছে বসিয়া আছে, কখন কি চাই, কখন কি দরকার পড়ে; আবার ঠাকুরমার উপদেশ মত পথ্যেরও জোগাড় করিতেছে। ঠাকুরমা বলিতেছেন "ও ডাক্তার যা বলে বলুক, ও কথা শুন্‌লে চলবে না, রোগী কাহিল হয়ে পড়েছে আমি আজ চার দিন ধরে তাই দেখে আসছি, ওর আহার দিতে হবে, যখন জ্বর নেই, তখন চাড্ডি চাড্ডি ভাত দেওয়া চাই—তা বিমল, তুই এক কাজ কর, খুব পুরাতন দাদখিনি চাল আনা, তাই বেশ করে ধুয়ে ঘুঁটের পোড়ে এক ছটাক চালের ভাত রাঁধ, মনে আছে ত সেই নিমির অসুখের সময় যেমন দেখিয়ে দিয়েছিলুম—পুরোণো চাল, দেখিস্ ভাতগুলো যেন খুব সেদ্ধ হয়। আর বাগান থেকে একটা কাঁচা বেল আনা, বেলটা দুখানা করে ভেঙ্গে কাটি দিয়ে বিচিগুলো বার করে ফেল, তারপর চাড্ডি যোয়ান, একটু সন্ধব নুণ গুঁড়িয়ে তারির ভেতর পুরে বেলটা জোড়া দিয়ে আগুণে পুড়তে দে, বেশ পুড়ে গেলে আনিস, যা এখনই যা, আর এক কাজ কর, এক টুক্‌রো কাচকলা, দুটো ডুমুর কুচিয়ে সামান্য একটু জিরে মরিচ বাটা দিয়ে একটু ঝালের ঝোলের মতও করে আনিস, তাই দিয়েই তোর শ্বাউড়ীকে দুটো ভাত খাইয়ে দেব। দেখিস্ আর কারুর উপর যেন নির্ভর করিসনে নিজে হাতে খুব সাবধানে করবি।

"না ঠাকুরমা আমি নিজেই করে আন্‌ছি।" বিমলা চলিয়া গেল, রোগীর এতক্ষণ একটু তন্দ্রা

হইতেছিল, বিমলার ঠাকুরমা পার্শ্বে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। রোগীর তন্দ্রা ভাঙ্গিলে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "কেমন আছ মা, একটু ঘুমুচ্ছিলে বলে তাই ডাকি নি, বেলা হয়েছে এখনও ওষুধ খাও নি; বিমলা এতক্ষণ বসে বসে এইমাত্র উঠে গেল।"

"বৌমার আমার ভারি কষ্ট হয়েছে, কি করবো বল মা, দুধের বাছা—না খাওয়া না দাওয়া—দিনরাত আমার সেবা করছে—আর আমি পোড়াকপালি পড়ে রয়েছি, মরণও হয় না, মা এত যন্ত্রণা আর কত দিন ভোগ করবো মা!"

"ছিঃ মা, আমার সামনে ও কথা কি বলতে আছে? আমি মরি—তোমরা মনের সুখে থাক, বউ ব্যাটা নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর, হরি তোমায় নিরোগা করুন, স পাঁচ আনার হরিন্নোট দেবো মেনেছি। এই নাও মা, ওষুধটুকু খাও দেখি। আজ কি ক্ষিদে হয় নি, কি খাবে?"

"কি আর খাব বাপু, ক্ষিদে হলেও আর ও বার্লিক ফার্লিক গুলো গিল্‌তে পারি নি—গা বিড়িয়ে ওঠে।"

"না—আজ আর তোমায় বার্লিক দেবো না—দুটী ভাত খাবে?"

"হুঁ—ডাক্তার বদ্যি কি আর এ জন্মে ভাত খেতে দেবে?"

"ডাক্তার বদ্যির কথা ছেড়ে দাও মা, যদি খেতে ইচ্ছে হয় ত এক মুটো চুপি চুপি খাও, তাতে ভয় নেই—যখন আজ কদিন জ্বর নেই, শুধু পেটের অসুখ, তখন ও ভেতো নাড়ীতে দুটো ভাত না পড়লে কিছুতেই সারতে পারবে না। আমি বলছি দুটো খাও।"

"তা বাপু যা ভাল বোঝ তাই কর, আমি আর বার্লিক ফার্লিক গিল্‌তে পারি নি মা।"

বিমলার ঠাকুরমা ঔষধ খাওয়াইয়া বিমলাকে ডাকিলে বিমলা আসিয়া বলিল "হয়েছে ঠাকুরমা, এই মার ঠাঁই করে দেই। ঔষধ খাওয়ান হয়েছে কি?"

'ঔষধ খাওয়ান হয়েছে তোর শ্বাউড়ীকে চুপি চুপি আজ দুটো ভাত দে। বেলটা পোড়ান হয়েছে কি।"

'হয়েছে, তাও আন্‌ছি', বলিয়া বিমলা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিয়ৎপরে একটী পাথর বাটীতে সেই বেল পোড়া আনিয়া দিল। পরে একখানি আসন পাতিয়া, হাত মার্জ্জনা করিয়া সেই ঘুঁটের পোড়ের ভাতগুলি বেশ করিয়া বাড়িয়া, দুখানি কাঁচকলা ভাজা গুটিকতক ডুমুর ভাজা, সেই ঝালের ঝোলটুকু বাটীতে করিয়া আনিয়া দিল। শ্বাশুড়ি দেখিয়া ভারি খুসি, বলিলেন. "বৌমা, এরি মধ্যে এত করেছ মা। এই ত আমার কাছে বসেছিলি গা, কখন যে উঠে গেছলে তাও জান্‌তে পারি নি! আহা, মা আমার খেটে খেটে ক'দিনে কালো হয়ে গেছে—মুখ খানি একেবারে শুখিয়ে গেছে।"

বিমলার ঠাকুরমা বলিলেন "কি করেছে বাপু, আর কারই বা করেছে, তোমার সেবা করা ওর ত সৌভাগ্য, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখে থাক—তোমাদের গতর ভাল থাকুক—আমার চারু সুখে থাকুক, বিমলার হাতের নো' ক্ষয় যাক্, ও যেন পাকা মাথায় সিঁদুর পরে।"

"তাই বল মা—তাই বল।" ক্রমশঃ—

শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

ধার ও নগদ।

—o—

গঞ্জমাঝে ফাঁদিয়া দোকান, মহাজন,
সাজাইয়া থরে থরে দ্রব্য সুপ্রচুর
লয়ে মাত্র দস্তখৎ কাগজে জামিন,
অবিশ্রান্ত ধারেতে বেচিয়া—অচতুর,
অবশেষে একদিন অভাবে টাকার
খুলি পেটি, তাগাদায় পাবে টাকা আশা—
হানি কর শিরে বৃথা করে হাহাকার
সর্ব্বস্ব ইন্দুরে কাটা দেখিয়া সহসা ;
অলস, এ ভব-হাটে বসি, হেন ভাবে—
বেচে যায় দিন রাত আদায়ের আশে,—
অবশেষে আসি যম ইন্দুরের বেশে
দেহের দলীল কাটে একদিন যবে,
বুঝে তবে—লয়ে জীবনের মূলধন
ধারে কারবার, নহে শুভ কদাচন।

* * *

ক্ষুদ্র ব্যবসায় হতে আরম্ভ করিয়া
হিসাবী সুমহাজন অতি সাবধানী,
নগদ কারবার তায় ক্রমে বাড়াইয়া
অবশেষে হয় যথা কালে মহাধনী,
ধারে চাহিলেও ধনী, না রাখে খাতির,
ধনী বা নির্ধন ক্রেতা তুল্য তার কাছে ;
এ ভব দোকানে তথা যেজন সুধীর
না করি খাতির ভোগে, মূল্যবান সাজে,
এক হাতে নিয়ে দাম সত্য সার খাঁটি,
ওজনে সংসারে বেচে দিন জীবনের,—
সেইত মালিক হয় প্রকৃত ধনের,—
কত উমেদার তথা করে হাঁটাহাঁটি ;
ধন্য সে নগদ ব্যবসায়ী, ভব মাঝে,
ধন যদি চাও কেহ, যেও তার কাছে।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র বি,এ,।

প্রার্থনা।

তোমার অনন্ত বিশ্বে হে সুন্দর হরি,
জাগিতেছে নিত্য যেই আনন্দ-কল্লোল,
তা'রি এক-প্রান্তে মোরে বিন্দু কৃপা করি'
নির্দ্দেশ করিয়া দাও চির-বাসস্থল !
ভাল নাহি লাগে আর কেবলি ক্রন্দন,
কেবলি হৃদয়-ভেদী তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস ;—
নিস্ফল-কামনা-যন্ত্রে অন্তর-পেষণ,
বক্ষভরা নিশিদিন আগ্নেয় উচ্ছ্বাস !
দেখাও প্রকৃত-পন্থা আমারে এবার,
দিকে দিকে তোল শুধু কর্ম্ম-কোলাহল ;—
আমারে নিমগ্ন তায় রাখ অনিবার
নিষ্ঠুর সংসার প্রভো, ভুলায়ে কেবল !
তুমি রহ প্রাণে মোর, প্রাণ-মণি, হয়ে ;—
আমি রহি অনুক্ষণ হরষে নির্ভয়ে !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

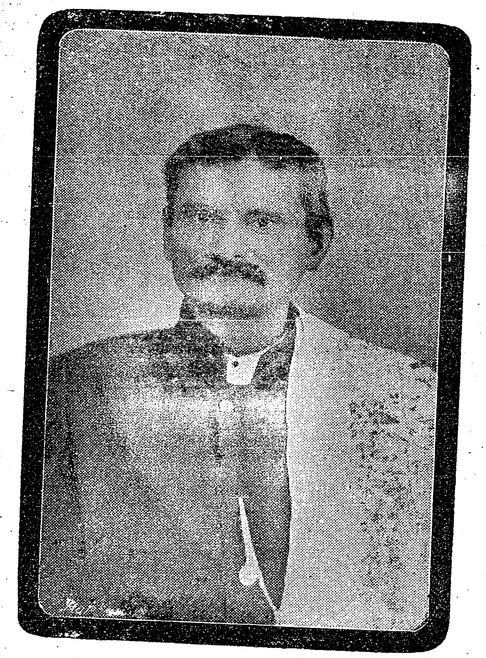

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

I. A. School, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড। | সন ১৩১৫—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

ত্রিরত্ন-বিজয়।

(৫৮ পৃষ্ঠার পর)

রাজপ্রাসাদে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, পাটলীপুত্রের বিশাল রাজপ্রাসাদের এক সুসজ্জিত কক্ষে দুইটী যুবতি বসিয়া কথোপকথন করিতেছে, দুইটীই পরমা সুন্দরী—দুইটীরই বেশ ভূষার পারিপাট্য—বিশেষ সমৃদ্ধিসূচক, দেখিলে বোধ হয় দুই জনেই রাজকুলকামিনী।

"কুন্তলা, তোমার কি মনে হয়?"

'রাজকুমারি!—আমার মনে হয় যেন একটা গুরুতর ব্যাপার ভিতরে ভিতরে চলিতেছে, আমরা যাহাতে তাহার কিছুই শুনিতে না পাই, তাহার জন্য রাজমহিষী পর্য্যন্ত সর্ব্বদা যেন সাবধান"।

এই কথা বলিয়া কুন্তলা রাজকুমারীর মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল উভয়ের নেত্রেই অতর্কিত ভীতি ও বিষাদের কেমন একটা বিভীষিকাময় ছায়া—তাহাদের অনিন্দ্যসুন্দর-মুখকান্তির উপর অস্ফুট-কালিমা ঢালিয়া দিতে ছিল।

এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, একটা বড় জোরে দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া রাজকুমারী বলিলেন—"কুন্তলা, আমি কিন্তু সব জানিয়াছি! দেখ ভগিনি! তোমার ও আমার বিপদ্ বড়ই গুরুতর, এখানে আমাদের এক্ষণে সকলেই শত্রু হইয়াছে, কাল সন্ধ্যার সময় আমরা যখন রাজমহিষীর নিকট বিদায় লইয়া অনাদিনাথের আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরে যাই, সেই সময় মহিষী আমাকে কি বলিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি শুনিয়াছিলে?"

"না সখি কই আমার ত কিছুই মনে পড়ে না" ?

"তিনি বলিলেন 'মন্দা, আমার কাছে ছুটি লইবার জন্য আর আগ্রহ কেন ?—বোধ হয় কয়েক দিন পরে আমিই আরতি দেখিবার জন্য—তোমার'—এই পর্য্যন্ত বলিয়া—রাজমহিষী কেমন অপ্রস্তুতের ন্যায় হইলেন ; তাঁহার মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে কিন্তু আমার সাহস হইল না, তাহাঁর কথা যেন তাড়াতাড়িতে আমি শুনিতেই পাই নাই, এই ভাবে তাহাঁকে প্রণাম করিয়া তোমার হাত ধরিয়া তখন মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম, এই ব্যাপার দেখিয় কিন্তু আমার অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিয়াছে, আমার বোধ হয়, ইহাঁদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ বাধিতে আর বিলম্ব নাই, অথবা এতদিন বাধিয়া গিয়াছে ?—"

রাজকুমারী মন্দাকিনীর কথা শুনিয়া কুন্তলার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

মন্দাকিনী আর একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

"সখি! আমার বেশ বোধ হইতেছে, যে রাজকুমার অশোক বিদ্রোহী হইয়াছেন। এবং মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তিনি বারাণসী হইতে সসৈন্যে যাত্রাও করিয়াছেন। কুন্তলা—এই বিদ্রোহ করিয়া যদি কুমার কৃতকার্য্য না হন, তাহা হইলে আমাদের কি পরিণাম হইবে ?" এই কয়টী কথা বলিতে বলিতে রাজকুমারী মন্দাকিনীর নয়ন জলভারাবনত হইয়া আসিল, তাহাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, দেখিতে দেখিতে দুইটী মুক্তার ন্যায় দুইটী অশ্রু-বিন্দু অতর্কিতভাবে নয়নদ্বয় হইতে বাহির হইয়া সেই অরুণ কিরণোদ্ভাসিত কুবলয়দলকল্প কপোল ফলকে পতিত হেমন্তের দুইটী শিশির বিন্দুর কান্তিকে বিড়ম্বিত করিল। মন্দাকিনী অশ্রুপ্রবাহ রুদ্ধ করিবার শক্তি হারাইলেন, তখন কুন্তলার কণ্ঠে কণ্ঠ আসক্ত করিয়া মন্দাকিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কান্দিতে কান্দিতে কুন্তলাও নিজের অঞ্চলদ্বারা তাহার চক্ষুর জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল।

"রাজকুমারি!—এখন কান্দিলে কি হইবে? এখন আমাদের কি করিতে হইবে—তাহার কিছু ভাবিয়া থাক ত বল, তোমার কল্পনা যে সত্য, তাহা আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি। তাই আজ সকালে আমার সহিত যখন মহিষীর সহচরী সাবিত্রীর সহিত দেখা হয়, তখন সে বলিয়াছিল যে, ও কুন্তলাদিদি! আর যে মাটীতে পা পড়েনা দেখিতেছি! বলিহারি যাইক সিংহল দেশের খেলা!"

কুন্তলার কথা শুনিয়া রাজকুমারীর মুখে বিষাদের ছায়া আরও গাঢ়তর হইল, কুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—

"দেখ কুন্তলা তুমি ছাড়া এ হতভাগিনীর এ জগতে আপনার বলিবার আর কেহ নাই, আপনার জনের কাছে মনের ভাব গোপন করিয়া লাভ কি ?—আমি স্থির করিয়াছি যে, আজই আমি এই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিব"।

বিস্মিত হইয়া কুন্তলা বলিল, "সে কি কথা আজই কোথায় যাইবে!"

"কোথায় যাইব তাহা জানি না, কিন্তু, এখানে আমার আর থাকা কিছুতেই উচিত নহে, আমার প্রতি যখন রাজমহিষী সন্দেহ করিয়াছেন, তখন

নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র আমাকে লইয়া অনেক প্রকার টানাটানি ঘটিবে, আমার কাছে রাজকুমারের এমন কতকগুলি পত্র আছে, সেগুলি যদি রাজমহিষীর হস্তগত হয়, তাহা হইলে কুমারের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা" রাজকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া কুন্তলা বলিল—

"ইহার জন্য এ স্থান ছাড়িতে হইবে কেন ? তাহা ত বুঝিলাম না, সেই পত্র কয়খানি নষ্ট করিলেই ত সব আপদ্ চুকিয়া যায়।"

"না কুন্তলা!—আমি মরিতে হয় মরিব, তাহাতে ক্ষতি নাই, কুমারের পত্রকয়খানি ছাড়িয়া আমার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা" এই কথা বলিতে বলিতে রাজকুমারীর চক্ষু দুইটী অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল, তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

"বুঝিয়াছি রাজকুমারি!—আর কিছু শুনিতে চাহি না, আমারও তবে তোমার সঙ্গেই যাওয়া স্থির, তোমাকে ছাড়িয়া এই শ্মশানপুরীর মধ্যে কুন্তলা এক মুহূর্ত্তের জন্য থাকিতে পারিবে না ইহা স্থির।" এই বলিয়া কুন্তলাও কান্দিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা বর্ষাঝটিকান্দোলিত মাধবীলতা দুইটীর ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ও কম্পিত কলেবরে কান্দিতে কান্দিতে চুপি চুপি অনেকক্ষণ করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, শেষে তাহারা স্থির করিল যে, অদ্য রাত্রিতে যে কোন প্রকারেই হউক না কেন তাহাঁরা অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিবেই করিবে।

শোণ সৈকতে।

রাজকুমার অশোকের চতুরঙ্গিনী সেনা এক্ষণে শোণভদ্রের উত্তর তীরে সন্নিবেশিত, কুমার মহেন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার পরই তিনি দ্রুত গতিতে সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন, কি অভিপ্রায়ে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন তাহা কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই, তথাপি যাহারা তাঁহার পার্শ্বচর, তাহারা সকলেই বুঝিয়াছিল, যে রাজকুমার অশোক পিতৃসিংহাসনের জন্য জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সুতরাং অচিরৎ যে, একটা প্রবল সংঘর্ষ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, ক্রমে অল্পে অল্পে সেই মহতী সেনার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল, সুতরাং সেই সুবিশাল বাহিনীর মধ্যে প্রবল যুদ্ধের পূর্ব্বে অবশ্যম্ভাবি উদ্বেগের পরিস্ফুট চিহ্নগুলি দিন দিন বাড়িতে লাগিল, রাজকুমার অশোক এ ব্যাপার দেখিয়া আরও একটু চিন্তিত হইলেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার পাটলিপুত্রের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি এই প্রকার ভাবের আরোপ কেহ যেন না করিতে পারে।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি অমল ধবল জ্যোৎস্নায় দিঙ্মণ্ডল ধবলিত, পরিণত শরতের শোণভদ্র—সুতরাং সে কূলপ্লাবি স্রোতঃ মন্দ হইয়া আসিয়াছে, নদের বক্ষে সৈকত জাগিয়া উঠিয়াছে, রজত ধবলচন্দ্রিকাধৌত বিশাল সৈকতের বালুকারাশিতে শত শত হীরককণার প্রতিক্ষণ প্রতিফলনে—শোণ বক্ষে এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে,—শান্ত নীরব রজনী যেন সেই শরচ্চন্দ্রিকারূপ শুভ্রবসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধির অভ্যাস করিতেছে। শোণের উত্তরতীরে রাজকুমার অশোকের সেই পটমণ্ডপ মণ্ডিত সুবিস্তৃত

প্রান্তরব্যাপী সেনানিবাস—নীরব ও নিস্তব্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরীগণের পাহারার শব্দ, আর অকস্মাৎ প্রবুদ্ধ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছেনা, শান্ত রজনীর শান্তিময় অঙ্কে নির্ভর করিয়া সেই বিশাল জনতা সুষুপ্তির অব্যক্ত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে—অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতাময় সেনানিবেশের সুদূর প্রান্ত হইতে সুমধুর মুরলীর শ্রুতিমনোহারিণী স্বরলহরী—নিদ্রাক্লিষ্ট প্রহরীগণের কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। এমন সুন্দর বংশীর ধ্বনি মনুষ্যলোকে যে সম্ভবপর তাহা বিশ্বাস করিতে তাহাদের যেন প্রবৃত্তি হইতেছেনা, তাহারা রাত্রিজাগরণের ক্লেশ ভুলিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর গ্রাম হইতে, সেই স্বর্গীয় তানলয় বিশুদ্ধ স্বরলহরী তাহাদের কর্ণ, মন ও প্রাণকে মোহময়, আনন্দময়, আবেগময় আবেশে পরিপূরিত করিতে লাগিল।

কে এ বংশী-বাজায়! কুমারের আদেশ রাত্রিকালে সেনানিবেশে কোন প্রকার বাদ্য হইবে না, সে আদেশ লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য! ক্রমে রাজকুমারের কর্ণেও সেই বংশীধ্বনি সেই ভাবেই প্রবেশ করিল, সেনানিবেশের মধ্যে কেহই যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেনা এ বিশ্বাস তাহাঁর সম্পূর্ণরূপই ছিল, তথাপি কে এমন সুন্দর বংশী বাজাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাহার ঔৎসুক্য হইল। প্রতীহারী কুমারের আদেশানুসারে বাহিরের প্রহরীকে জানাইল যে, এই রাত্রিতে কুমারের নিষেধ না মানিয়া যে বংশী বাজাইতেছে তাহাকে অবিলম্বে ধৃত করিয়া কুমারের নিকট হাজির করিতে হইবে, ইহা কুমারের ইচ্ছা।

আদেশ শ্রবণমাত্র কতকগুলি প্রহরী দল বাঁধিয়া সেই বংশীবাদকের সন্ধানার্থে দ্রুতপদে যে দিক হইতে বাঁশীর শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে ধাবিত হইল, তাহারা অনেক অনুসন্ধানে কোথায়ও কাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না, এদিকে বংশীধ্বনিরও কিন্তু বিরাম হইল না। নব বসন্ত সমাগমে প্রথম বহনশীল মলয়মারুতের ন্যায় মধ্যে মধ্যে মিশাইয়া মিশাইয়া সেই বংশীস্বর, আবার প্রবল হইতেছিল; সেই স্বরের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে যেন নূতনতর হইয়া প্রত্যেক শ্রোতার কর্ণে—কর্ণে—সুধাবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিল, প্রহরীগণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোন সন্ধান না করিতে পারিয়া প্রায় একপ্রহর কাল পরে শিবিরে প্রত্যাগমন করিল, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, বাঁশী কিন্তু তখনও স্বরলহরী বর্ষণে বিরত হয় নাই। তাহাদের অকৃতকার্য্যতায় রাজকুমার অশোক নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। স্বয়ংই যাইয়া সেই তথ্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবেন, এই ভাবিয়া একজনমাত্র পরিজনসহ তিনি তখন শিবির পরিত্যাগ করিলেন।

কে বাঁশী বাজায়?—

সেই শরচ্চন্দ্রিকা-ধবলিত নিশীথ রজনীতে রাজকুমার অশোক একজনমাত্র অশ্বারোহী অনুচরের সহিত সেনানিবেশ ছাড়িয়া প্রায় একক্রোশ দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, শোণের উত্তর তীরের উপর একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকার মৃত্তিকাস্তূপের নিম্নে আসিয়া তাহার বোধ হইল, যেন সেই স্তূপের উপরিভাগ হইতেই বাঁশীর স্বর উদ্ভূত হইতেছে, সে স্বর এত মধুর এত প্রাণস্পর্শী ও এত উচ্চ যে তাহা শুনিতে

শুনিতে কুমারের সকল ইন্দ্রিয় যেন অবশ হইয়া পড়িতেছিল এবং সকল ইন্দ্রিয় যেন এক হইয়া সেই স্বরলহরী-প্লাবিত হৃদয়ের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া, কুমার মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই পর্ব্বতাকার মৃন্ময় স্তূপের নিম্নদেশে অশ্বের উপরই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন, সেই স্তূপের চারিদিকই এমনই বন্ধুরভাবে সন্নিবেশিত ছিল যে, তাহার উপর দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণে গতি এক প্রকার অসম্ভব, অথচ উপরে না উঠিতে পারিলে কুমারের ঔৎসুক্য মিটিতেছে না, তখন তিনি অগত্যা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুচরও অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, কি জানি কি মনে করিয়া কুমার ইঙ্গিতের দ্বারা তাহকে তাহাঁর অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং সেই স্থানেই অশ্ব লইয়া, তাহাঁর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া, কোষোন্মুক্ত অসি হস্তে সেই মৃন্ময় পর্ব্বতোপরি দ্রুতপদে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপরে উঠিবার কোন পথ নাই বলিলেও চলে, তাহার উপর সেই মৃন্ময় পর্ব্বতের গাত্রে চারিপার্শ্বেই বড় বড় ঝোপ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে ছিল, সুতরাং তাহাঁর পক্ষে সেই পর্ব্বত শিখরে উঠিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। হরি হরি! তিনি যখন এত ক্লেশ করিয়া সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিলেন, ঠিক্ সেই সময় হইতে বাঁশীর স্বর আর শুনা যাইল না, শান্ত রজনীর নিস্তব্ধতাময় অঙ্কে সেই স্বর্গীয় স্বরলহরী যে কোথায় মিশিয়া গেল তাহা বুঝা গেলনা, কেবল সেই অতি মধুর অতি মর্ম্মস্পর্শী স্বরলহরীর সংস্কারময় ঘাত-প্রতিঘাতগুলি তখনও যেন হৃদয়ের নিভৃততম তন্ত্রীতে মধ্যে মধ্যে মধুর ঝঙ্কার দিতে লাগিল।

বিস্মিত স্তব্ধ ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় কুমার তখন একবার অতীত ও ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন, বর্ত্তমান তখন তাঁহার কাছে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেনানিবেশের এত দূরে একাকী এই ভাবে এরূপ সময়ে চলিয়া আসা—বাল্যসুলভ চাপল্যের বশে একেবারে অসহায়ভাবে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ—তাহার পর যাহার জন্য আসা, তাহার—সেই বংশী স্বরের বা বংশীবাদকের—অকস্মাৎ অন্তর্ধান, এই সকল ভাবনায় তাহাঁর হৃদয় ক্ষণকালের জন্য চকিত হইয়া উঠিল, যাহা হউক, যাহা ঘটিবার তাহা ত ঘটিয়াছে, এখনকার কর্ত্তব্য কি তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি যেমন চারি পার্শ্বে ফিরিয়া দেখিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বোধ হইল—সম্মুখে একটী প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত বেদিকার উপর যেন একটি স্ত্রীলোক স্থিরভাবে বসিয়া আছে—তিনি যেখানে উঠিয়াছিলেন সেই স্থানটী বেশ সমতল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তাহার উপর—ঠিক মাথার উপর শরতের পূর্ণচন্দ্র অমল ধবল স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা বিকিরণ করিতেছিল, সুতরাং সেখানে যাহা কিছু ছিল তাহা সকলই অতি স্পষ্টভাবে কুমারের নয়নপথের পথিক হইল, তিনি বিস্ময় ঔৎসুক্য ও আশঙ্কার সহিত সেই প্রস্তরময় বেদিকার দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহাকে নিকটে সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সেই রমণীমূর্ত্তি একটুও বিচলিত হইল না, রমণী স্থিরভাবে যেমন বসিয়াছিল সেই ভাবেই বসিয়া রহিল, চারুচন্দ্রিকাচ্ছুরিত তদীয় বদনমণ্ডলে কোন প্রকার ভয় বা আবেগের কোন চিহ্নই

প্রকটিত হইল না, তাহা সেই নির্ম্মল চন্দ্রিকালোকে রাজকুমার স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। কুমার আর অগ্রসর হইলেন না, কেবল স্থিরভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন রমণীর পরিধান কাষায় বসন তখনকার নব প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের "ভিক্ষুণী"গণ সাধারণতঃ যে ভাবে আলখেল্লার ন্যায় উত্তরীয় বসন দ্বারা অঙ্গের উপরিভাগকে আবৃত করিতেন এ রমণীরও কণ্ঠ পর্য্যন্ত উপরি দেহ সেই ভাবেই আবৃত ছিল; মস্তকে নিবিড় জলদমালার ন্যায় আলুলায়িত কেশগুচ্ছ, তাহার নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকার রমণীয় ভ্রূযুগ-মণ্ডিত মনোহর উজ্জ্বল ললাট; আর সেই অপরূপ ভ্রূযুগের অধোভাগে সেই বিশাল জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত ও উজ্জ্বল নয়নদ্বয়; এ যে রাজান্তঃপুরের অলঙ্কার এত রূপ ভিক্ষুণীর হইতে পারে ইহা কুমার কখনও ভাবিতে পারেন না; এ কি ব্যাপার!—এই অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতি এত রাত্রিতে একাকিনী ভিক্ষুণীর বেশে এই নিভৃত স্থানে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল কেন? এই ভাবনাগুলি কুমারের মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ সেই রমণীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া উঠিল দুই তিন পদ কুমারের দিকে আরও অগ্রসর হইয়া, দক্ষিণহস্ত তুলিয়া কমনীয় কণ্ঠস্বরে কুমারের হৃদয়তন্ত্রী নিনাদিত করিয়া, কহিল বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জয় হউক; উপাসক, তোমার প্রতি ভগবানের পূর্ণকৃপা হইয়াছে; যাও উপাসক, আর বিলম্ব করিওনা, মগধের সিংহাসনে বিনা রক্তপাতে উপবেশন কর, জীবোদ্ধার কার্য্যে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের সহায়তা কর!

রাজকুমার অশোক ত ব্যাপার দেখিয়া অবাক! তাঁহার সেই নিস্তব্ধ ও বিস্মিত ভাব দেখিয়া তখন রমণী আরও অগ্রসর হইল, এবং আরও স্পষ্ট স্বরে আবার বলিতে লাগিল।

যুবরাজ অশোক!—ভারতের ভাবি সম্রাট্! তোমাকে এই খানে এই ভাবে আনিবার জন্য আমিই এই বংশী বাজাইতে ছিলাম হৃদয়ের উদ্বেগ যদি কিছু থাকে যুবরাজ তাহা পরিহার কর।" অপরিচিত তরুণীর মুখে হঠাৎ এইরূপ কথা শুনিয়া রাজকুমার আরও বিস্মিত এবং একটু বিরক্ত ও হইলেন এবং কহিলেন—"উপাসিকে, তোমারকথাগুলি তোমার বেশের অনুকূল হইলেও তোমার বয়সের অনুকূল নহে। আমি কে? আমার কর্ত্তব্য কি? তাহা অগ্রে না জানিয়া, আমার প্রতি এই ভাবে কর্ত্তব্যের উপদেশ তোমার মুখে শুনিবার জন্য এখানে আসি নাই; উপাসিকে, তোমার বয়স অধিক নহে, এত রাত্রিতে এইরূপ ভয়াবহ স্থানে তুমি কেন এত মধুরভাবে বাশরী বাজাইতেছিলে?—তুমি এখনও সংসার চিন নাই, এখানে এভাবে একাকিনী থাকা তোমার ন্যায় সুন্দরী উপাসিকার পক্ষে যে বিশেষ ভয়ের কারণ, ইহা কি বুঝিতে পার নাই?

ক্রমশঃ—

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

—o—

তন্ত্র কি?

(৮৫ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বে বলিয়াছি মন্ত্র ঋষি-প্রবর্ত্তিত। "সিদ্ধশব্দং ঋষিপ্রোক্তং ইতি মন্ত্রং" যিনি যে মন্ত্রের প্রবর্ত্তক বা কর্ত্তা, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া বেদাগমে বর্ণিত

আছে। এক একটী মন্ত্রসাহায্যে ঋষিগণ সিদ্ধ হইয়া তাহা স্ব স্ব শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, গুরুপরম্পরায় তাহাই চলিয়া আসিতেছে। পূজা ও জপ ভেদে মন্ত্র দ্বিবিধ। আচমন হইতে পূজান্তে প্রণাম পর্য্যন্ত যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাই পূজা-মন্ত্র, উহা বিস্তৃত এবং জপার্থে যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ক্ষুদ্র, জপ মন্ত্র বলিয়া পরিচিত। সকল মন্ত্রই 'সাংকেতার্থং' বা সাংকেতিক ভাবে সৃষ্ট। রাসায়নিক সাংকেতিকশব্দের (Symbol) ন্যায় মন্ত্রও সঙ্কেতময়। অর্থাৎ রসায়নশাস্ত্রে যেমন H^2.O. বলিলেই জলসম্বন্ধে তাহার বৈশ্লেষনিক সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া যায়, রসায়নবিদের নিকট উহার কোন তত্ত্বই আর অপরিজ্ঞাত থাকে না—কেমন করিয়া কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া দ্বারা কোন কোন উপাদান সহযোগে জলের আবির্ভাব বা তাহার সৃষ্টি, পুষ্টি ও ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, ঐ সিম্বলিক্ বা সাংকেতিকশব্দের উচ্চারণ অথবা শ্রবণমাত্রেই তৎসমুদায় যুগপৎ হৃদয়মধ্যে প্রতিভাত হইয়া পড়ে, মন্ত্রও ঠিক সেইরূপ আর্য্যদর্শনের সিম্বল বা সংকেতার্থক শব্দমাত্র। কোন দেব বা দেবীর বীজমন্ত্র দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ক্রিং, ক্লিং, দং, ঐং, প্রভৃতি বীজমন্ত্রসকল ইহাদের কোনটী সাধকের দর্শনে শ্রবণে বা সম্মুখে উপস্থিত হইলেই অনতিবিলম্বে ঐ ঐ বীজাত্মক দেব দেবীর আবির্ভাব, রূপ, পূজা ও ধ্যান আদি সমস্তই এক কালে স্মৃতিমধ্যে আসিয়া পড়ে। যেমন কোন ব্যক্তির শত্রু, মিত্র অথবা বিশেষ পরিচিত যে কোন ব্যক্তির নাম বা নামের আদ্যাক্ষর মাত্র শ্রুত হইলেই সেই ব্যক্তির নাম, ধাম, আচার, ব্যাবহার বা গুণাগুণ যুগপৎ সমস্তই স্মরণ হইয়া থাকে। জপকালে সেই রূপ ভাবে অভিষ্ট দেব বা দেবীর ধ্যান হৃদয়মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধারণা করিবার জন্য ঘন ঘন বীজ মন্ত্রের উচ্চারণ বা স্মরণ সাধকের বাঞ্ছনীয়। এই মন্ত্রসকল আবার সাধকের অবস্থানুসারে একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী, ত্র্যক্ষরী বা বহু অক্ষর বিশিষ্টা হইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রশক্তি যথাক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পঞ্চাস্বরে মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারাও সাধকের অভিলষিত কার্য্যে বিপুল সহায়তা করে, তাহা কথায় বলা নিতান্তই দুরূহ। সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিলে হৃদয়বান ব্যক্তি বোধ হয় কতকটা মন্ত্রশক্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ব্যাকরণ পাঠক অবশ্যই জানেন, আমাদের দেব-ভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে সকল বর্ণেরই উচ্চারণ-স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, বোধ হয় জগতের কোন ভাষাতেই বর্ণমালার উচ্চারণ স্থান বিষয়ে এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই। যাহাহউক এই বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থান-বিনিশ্রিত বর্ণগুলির কি এক বিচিত্র সমাবেশে মন্ত্রসমূহ গঠিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিদ্বারা প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের সমতা ও পরিপুষ্টি সাংসাধনান্তর আত্মজ্ঞানানুকূল চিত্তের স্থিরতা-সম্পাদনাদি অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। বর্ণাত্মক শব্দাবলীর এরূপ শক্তি উচ্চ সঙ্গীত-বিজ্ঞান হইতেও উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আর্য্যঋষিগণ সেই সঙ্গীতকেও নাদসিদ্ধি বা ব্রহ্মসাধনানুকূল যোগাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অনাদিকাল হইতেই তাহা সামগানরূপে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। সেই সামগাণের দ্বিতীয় আভায় ধ্রূপদ-আলাপনে পরিলক্ষিত হয়, যোগীগণ সিদ্ধমন্ত্র-সহযোগে তাহার

বিহিত সাধনা করিতেন। ক্রমে অনার্য্য-উৎপীড়নায় সে বিধির প্রায় বিলোপ হইয়াছে। কিন্তু সে নীতি এবং তাহার ফল-শক্তির অতি ক্ষীণ বিকাশ এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরসিদ্ধ-সঙ্গীতাচার্য্যের কণ্ঠনিসৃত বিশুদ্ধ সুরলহরীতে সকলকেই মোহিত হইতে হয়। এই বিশ্ববিমোহিনী শক্তি স্বর-সমষ্টিমধ্যে কিরূপে আবির্ভূতা হন, সামান্য চিন্তা করিলেই তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সঙ্গীত-বিজ্ঞানমধ্যে ষড়জ আদি সাতটী সুর ও উদারাদি তিনটী গ্রামের বিভিন্ন সমাবেশে বিবিধ রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সেই রাগ-রাগিণীগুলির কোনটী প্রাতে কোনটী মধ্যাহ্নে, কোনটী সয়ংকালে আবার কোনটী বা গভীর নীশায় গীত হইয়া থাকে। সিদ্ধ গায়কগণের মধ্যে কেহ কোনও রাগ অসময়ে আলাপ করেন না। এরূপ করিবার কারণ অনেকেই হয়ত অবগত নহেন, তবে চির প্রথা অনুসারে সকলেই তাহা মানিয়া আসিতেছেন। আমাদিগের সকল কর্ম্মই শরীর ও ধর্ম্ম রক্ষায় সম্পূর্ণ সহায়ক। শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব এবং ধর্ম্ম ব্যতীত শরীর ধারণও বৃথা। আর্য্যদিগের এই সুগভীর সূক্ষ্ম দর্শন-সাহায্যেই জগৎ-গুরুর পবিত্র আসন তাঁহারা চির-স্বাধীন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাল ভেদে স্বরের বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। প্রভাতের সেই কোমল-মিশ্রিত স্বরগুলি সে সময় কণ্ঠ হইতে অতি সহজে যেমন ভাবে বিনির্গত হয় নিশাকালে সে গুলি ঠিক সেইরূপ ভাবে হয় না এবং সন্ধ্যার তীব্র স্বরসমূহ মধ্যাহ্নে যথাযথ প্রকাশ হওয়াও অসম্ভব বা প্রকৃত পক্ষে তাহা প্রকৃতির অপ্রিয়। সেরূপ অন্যায় আলাপনে দেহ-ধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে, পক্ষান্তরে বিভিন্ন কালানুগত স্বাভাবিক স্বরের বিকাশ জীব-দেহের মঙ্গল বিধায়ক। এই হেতু প্রাতঃকালিন রাগ সন্ধ্যায় বা সময়ের রাগ অসময়ে আলোচনা করা গান্ধর্ব্ব বা সঙ্গীত-বেদ-বিরুদ্ধ। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কালে ও উচ্চারণ ভেদে স্বরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে। সেই স্বরও স্বর ব্যঞ্জনাত্মক, দেব-বর্ণগুলি উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নিয়ম-বিধানে সমাবিষ্ট হইয়া সিদ্ধ ঋষিমুখে বিবিধ মন্ত্ররূপে প্রকাশ হইয়াছে, তাহার শক্তি যে অনন্ত ও অব্যক্ত, তাহা কি আরও বুঝাইয়া বলিতে হইবে? যদ্যপি ইহা অপেক্ষা মন্ত্রের প্রকৃত শক্তি বা মন্ত্রের গুঢ় অব্যক্ত রহস্য বুঝিবার অভিলাষ থাকে, তবে সাধক গুরু-মুখাগত হইয়া সাধনা সাহায্যে তাহা অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ করুন। শাস্ত্রে মন্ত্রকে 'বিদ্যা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্রময়ী দেবতা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যিনি যে মন্ত্রকে প্রথমতঃ সিদ্ধ করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের 'ঋষি,' সেই কারণ গুরুত্ব হেতু তাঁহার ন্যাস* করা কর্ত্তব্য এবং সেই ন্যাস গুরু-স্থান অর্থাৎ মস্তকেই করা বিধেয়। সমস্ত মন্ত্র তন্ত্রের ছাদন অর্থাৎ নিজ অধিকারমধ্যে সংরক্ষণ করিতে হয়, এই হেতু ছন্দ নিবদ্ধ মন্ত্রের নাম "ছন্দঃ" হইয়াছে এই ছন্দের অমরত্ব ও পদত্ব হেতু তাহার ন্যাস মুখেই বিহিত হইয়াছে, মন্ত্রাত্মক বা মন্ত্রময়ী "দেবতা" সাধকের হৃদয়মধ্যে ধ্যেয়, সেই কারণ হৃদয়াভ্যন্তরেই তাঁহার ন্যাস করিবার বিহিত বিধান আছে। মন্ত্রের ঋষি ছন্দ ও দেবতা সম্যক পরিজ্ঞাত না হইলে

* ন্যাসের বিস্তৃত অর্থ পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

সাধক মন্ত্রের শক্তিলাভ করিতে পারিবে না। মন্ত্রের বিনিয়োগ অর্থাৎ কোন্ মন্ত্র কোন্ উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও না জানিলে, মন্ত্রশক্তি দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। সুতরাং প্রত্যেক মন্ত্র সাধনার পূর্ব্বে গুরু-মুখে তাহার রহস্য ও উদ্দেশ্যসহ বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

যন্ত্র-তত্ত্ব।

মন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রেরও অনির্ব্বচনীয় শক্তির বিষয় সাধক-সমাজে প্রকাশিত আছে। সাধক সাধনা-সাহায্যেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। সুতরাং সে বিষয় ভাষায় বলিবার কিছুই নাই, তবে যন্ত্রের বিধান সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

"যন্ত্র" এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই বুঝা যায় যে, যাহা দ্বারা বা যে কোন উপায়ে যে কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, তাহাই সেই কার্য্যের যন্ত্র। সেইরূপ সাধনা বা পূজা-কার্য্যেও যাহাতে সহজে লক্ষ্য স্থির করিতে পারা যায় অথবা পূজা করিবার আধাররূপে যাহাতে ধ্যেয় বস্তুর স্থিরীকরণ করিতে পারা যায়, বা যে উপায়ে তাহা সিদ্ধ হয়, ভগবৎ সাধনায় তাহাই সাধন-যন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঘটে, পটে, প্রতিমা, পাষাণে, মন্ত্র ও যন্ত্রে পূজা করিবার শাস্ত্র-বিহিত যে বিধি আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন; তবে প্রতিমা ও পটাদির ন্যায় যন্ত্র-পূজা সাধক ব্যতীত সাধারণের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। সাধক ক্রিয়াবান হইলেই যন্ত্র-পূজার অধিকারী হন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মন্ত্র, সাধনা-বিজ্ঞানের সিম্বলিক বা সাঙ্কেতিক স্বর অথবা বিদ্যা বা মন্ত্রময়ী দেবতা; যন্ত্রও সেইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে ধ্যেয় বস্তুর অন্যতর সিম্বল বা যন্ত্রময়ী প্রত্যক্ষ দেবতা। সিদ্ধযোগী অন্তর্পূজার প্রথম উপকরণ হইতেই যন্ত্রের আরাধনা করিয়া থাকেন। সেই কারণ বাহ্য-পূজা হইতে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাসময়ে তাহাই অন্তরে নিয়োজিত করিবার বিহিত বিধান শাস্ত্রে নির্ণিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন সাধনোদ্দেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োগ আছে, যন্ত্র-সাধনায়ও সেইরূপ বিভিন্ন দেব দেবীর নানাবিধ যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। পূজার্থী গুরুমুখে যন্ত্রের সহিত তাহার গ্রহণাধিকার ও উপদেশ পান। সেই সকল যন্ত্রের মধ্যে পরস্পর রূপ-স্বতন্ত্র থাকিলেও মূলতঃ সকলগুলিই ত্রিকোণাকার এক একটী ক্ষেত্রমাত্র, একই বিষয়-বিজ্ঞাপক যন্ত্রের এই মূল ভিত্তি ত্রিকোণাকারে কেন কল্পিত হইল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যেও তাহার অতি স্থূল মর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে বোধগম্য হইতে পারে। অধুনা তত্ত্ব-সভা বা থিয়োসফিকেল সোসাইটীর সঙ্কেত-চিহ্নে আমাদের মূল যন্ত্রের অনুকরণে সেই ত্রিকোণাকার চিত্র ব্যবহৃত হইতেছে। জানি না, তাঁহারা উহার মর্ম্ম কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তবে একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, যিনি তত্ত্ব-সভার প্রধান সঙ্কেত-চিহ্নে উহার প্রথম প্রচলন করিয়াছেন, তিনি আর্য্যদর্শনের যন্ত্র-তত্ত্ব বিষয়ে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। যাহা হউক উক্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, তিনটী বিভিন্নমুখী বিদ্যুচ্ছক্তি সমত্রিভুজাকারে পরস্পরের দিকে পরিচালিত করিলে যদ্যপি উহাদের গতিত্রয় ঐ ত্রিভুজের কেন্দ্র স্থলে কোনরূপে একত্রীভূত হয়,

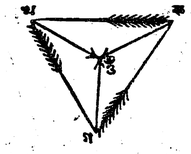

তাহা হইলে সেই স্থানেই উহাদের শক্তিসমষ্টির ক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে, তখন সেই শক্তিত্রয়ের আর কোন ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হইবে না। আর্য্যদর্শনের গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে, যোগাচার-নির্দ্দিষ্ট মূলাধার নামক মূল চক্রে, ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না-গতির সমাহারে বা কেবলী-কুম্ভকাবস্থায় দৈহিক ক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া যায়। এক্ষণে মূলাধারের সংক্ষিপ্ত আভাষ না পাইলে সাধনাকাঙ্খী ইহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। মূলাধার বর্ণনায় গুরুমুখে এইরূপ প্রকাশ আছে যে,—

"গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
চতুরঙ্গুল বিস্তারমাধারং বর্ত্ততে সমম্॥
তস্মিন্নাধার পাথোজে কর্ণিকায়াং সুশোভনা।
ত্রিকোণাবর্ত্ততে যোনিঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥
তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
সার্দ্ধত্রিকারা কুটিলা সুষুম্নামার্গসংস্থিতা॥
জগৎ সংসৃষ্টিরূপা সা নির্ম্মাণে সততোদ্যতা।
বাচামবাচ্যা বাগদেবী সদা দেবৈর্নমস্কৃতাঃ।"

অর্থাৎ গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে লিঙ্গের দুই অঙ্গুলি নিম্নে পশ্চাৎ দিকে ঠিক মেরুদণ্ডের নিম্নে ও সম্মুখে চারি অঙ্গুলি বিস্তির্ণ চতুর্দ্দল মূলাধার নামক কমল অবস্থিত আছে, এই মূলাধারের কোরকমধ্যে অতি সুন্দর একটী ত্রিকোণমণ্ডল বিরাজিত আছে, ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের কেন্দ্রকে যোনিমণ্ডল কহে, তাহা সর্ব্বতন্ত্রের মধ্যেই অতীব গোপনীয়া, ঐ যোনিমণ্ডলের মধ্যভাগে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকার বিশিষ্টা সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা কুটিলা পরম দেবতা কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি শিববেষ্টিতা হইয়া ব্রহ্মপথ রোধ করতঃ অবস্থান করিতেছেন। জগৎ সংসৃষ্টিস্বরূপা এই কুলকণ্ডলিনী নিরন্তর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করণে সমুদ্যতা, ইনি বাগদেবী, সর্ব্বদেবতার পূজনীয়া ও বাক্যে অনির্ব্বচনীয়া। ইনিই মূল যন্ত্রস্বরূপা। গুরুকৃপায় সাধনাসাহায্যেই ইহা অনুভবনীয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিদ্যুচ্ছক্তির ন্যায় বিদ্যুল্লতাকারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যোগাঙ্গিভূত প্রাণায়াম সাধনায় ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না গতিতে পরিচালিত হইবার পর যখন যোনিমণ্ডলে ত্রিকোণ-কেন্দ্রে কুণ্ডলিত বা ত্রিবলয়াকারে শিববেষ্টিতা হইয়া ক্রিয়াশূন্যা বা ব্রহ্মপথরোধ করতঃ অবস্থান করেন, সিদ্ধযোগী সধনাদ্বারা তাহা যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, তখনই তাহার বাহ্য-জগতের ক্রিয়া অবসান প্রায় হয়। সাধকের তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে স্থিরীভূত হয়। অনন্তর সাধক সেই কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধনোদ্দেশে তখন ভিন্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যাহা হউক এক্ষণে সেই মূলাধার নির্দ্দিষ্ট ত্রিকোণাবর্ত্ত মূল-যন্ত্রের অনুকল্পে নিম্ন-সাধক বাহ্য-পূজায় যে বাহ্য-যন্ত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সাধনাতত্ত্বে কমলকোরকমধ্যে সেই ত্রিকোণাবর্ত্ত যন্ত্রময়ী দেবশক্তিকে পূজা করিবার বিধি আছে। ভূগোল শিক্ষায় মানচিত্র দর্শনের ন্যায় আধ্যাত্ম শিক্ষায় মূল যন্ত্রের উপলব্ধি উদ্দেশে বাহ্য-যন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হয়। সেই কারণ সাধক বাহ্যপূজায় ঘট, পট, প্রতিমার পর মস্তে আরাধ্যা দেতার ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন। কখন কখন সিদ্ধ পূজক কুণ্ডলিনীশক্তির উদ্বোধনান্তর হৃদয়ে

অভীষ্ট দেবতার ধ্যান ধারণা করিয়া প্রশ্বাস বায়ু সহযোগে যন্ত্র-পুষ্পোপরি তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়া বাহ্য-যন্ত্রাসনে রক্ষা করতঃ বাহ্যপূজা করিয়া থাকেন। ইহাতে সাধক পরামন্দ উপভোগ করিতে পারেন। সাধনার এই বিচিত্র বিধি বাস্তবিক বাক্যাতীত; ইহা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের গভীর গবেষণার ফল। ইহাতে সন্দিহান হইবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই, সুতরাং সাধনাকাঙ্খী সাধক মন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রকেও অপার্থিব বা দৈব বস্তু বলিয়া জানিবে ও পরমাত্মার প্রত্যক্ষ স্বরূপ বলিয়া ভাবনা করিবে।

ন্যাস-তত্ত্ব।

পূর্ব্বে মন্ত্র-তত্ত্বের মধ্যে মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাসের উল্লেখ করা হইয়াছে। ন্যাসের উদ্দেশ্যকল্পে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে,—

"ন্যায়োপার্জ্জিত-বিত্তানামঙ্গেষু বিনিযোজনাৎ।
সর্ব্বরক্ষাকরত্বাচ্চ ন্যাসইত্যভিধীয়তে।"

ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত ধনরত্ন অলঙ্কাররূপে নিজ অঙ্গ ভূষিত করিলে তাহা যেরূপ আনন্দের বা বিপদাপদে যেমন সহায়ক হয়, মন্ত্ররূপী দেব-বীজগুলিও সেইরূপ সাধকের নিজ সাধনা বা অঙ্গন্যাসাদি অনুষ্ঠান দ্বারা নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিন্যস্ত হইলে এক পক্ষে যেমন ব্রহ্মানন্দের উপভোগ, পক্ষান্তরে সেইরূপ পারত্রিক নির্ভরেরও কারণ হয়। এক্ষণে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকাঙ্কের "ন্যায়োপার্জ্জিত" ইত্যাদি প্রথম ছত্রের আদ্যক্ষর (ন্যা) এবং দ্বিতীয় ছত্রের "সর্ব্বরক্ষকরত্বাচ্চ" ইত্যাদির প্রথম অক্ষর (স) মিলিত হইয়া ন্যা+স=ন্যাস শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দেবতার ভাবতন্ময়তা সিদ্ধির জন্য ন্যাসের তুল্য অনুষ্ঠান আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। খণ্ড খণ্ড ন্যাস দ্বারা প্রথমে নিজ অভীষ্ঠ দেবতাকে পরিচ্ছিন্ন মন্ত্রশক্তিরূপে সাধক সাঠাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ব্যাপক ন্যাস-দ্বারা পাদমূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সেই খণ্ড খণ্ড মন্ত্রময়ী শক্তিসমূহের আত্মস্বরূপিনী একমাত্র দেবতার অনুভূতি করণই ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অথবা পূজাকালে মন্ত্রশক্তি দ্বারা নিজ দেহ সম্মক আচ্ছন্ন বা সাধকের 'আমিত্ব ভাবটী মন্ত্রময়ী অভীষ্ঠ দেবতার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া নিজে মন্ত্রময় বা দেবতাময় অনুভব করাই ন্যাসতত্ত্বের গভীর উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে ন্যাসানুষ্ঠানকল্পে সাধক শাস্ত্রোপদিষ্ট যে সকল ক্রিয়া করিয়া থাকেন তাহাও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক। পূর্ব্বে আসন-ব্যবস্থায় বলা হইয়াছে, পূজা কালে চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের স্থিরতাসম্পাদনে সহায়তা প্রদানই আসনের প্রধান লক্ষ্য, ন্যাসও সেই কার্য্যে আরও সূক্ষ্মভাবে সহায়তা করে। যখন সাধক আসনসিদ্ধ হইয়া সাংসারিক বা বাহ্য-শক্তির উপদ্রব হইতে ক্ষণিক শান্তিলাভের জন্য প্রয়াস পায়, তখনও নিজ দেহস্থিত শক্তিসমূহ দেহের নানা স্থানে অযথা পরিচালিত থাকিবার কারণ চিত্তের প্রকৃত স্থিরতাপক্ষে নানা বাধা উৎপাদন করে, সেই কারণ সেই শক্তিগুলিকে যথাযথ স্থানে সমানভাবে বিন্যস্ত করিবার জন্য ন্যাসের প্রয়োগ তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট। আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, মেঘমণ্ডলে সঞ্চিত বিদ্যুৎরাশি ধরাতলস্থিত বিদ্যুদ্ভাণ্ডারে মিলিত হইবার জন্য যখন প্রবল বেগে বজ্ররূপে পতিত হয়, তখন তাহার পতনপথে বাধারূপে যাহা কিছু থাকে সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, বিজ্ঞানবিদ্ মানব

বিদ্যুতের সেই বেগ হইতে নিজ নিজ গৃহ অট্টালিকাদি রক্ষাকল্পে গৃহভিত্তিসংলগ্ন এক সূক্ষ্মমুখী লৌহদণ্ডের আবিষ্কার করিয়াছে। বিদ্যুৎ যেমনই প্রবল হউক না কেন বিস্তৃত ধাতুময় সেই সূক্ষ্মপথে বিনাবাধায় তাহা পরিচালিত হয়। যে কোন সূক্ষ্মমুখী পথে পরিচালিত হওয়াই বৈদ্যুতিক সতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল অবস্থাতেই বিদ্যুতের এবম্বিধ ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। তাড়িতাধার পৃথিবীর সহিত জীবদেহে স্থিত তাড়িতের নিরবচ্ছিন্ন আদান প্রদান চলিতেছে, সেই কারণ সেই ক্রিয়ারোধক বা সেই শক্তি-পরিশোধক আসনের আবিষ্কার হইয়াছে, এ কথা আসন-তত্ত্বের মধ্যেই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সাধক আসনসিদ্ধ হইয়া পৃথিতত্ত্ব হইতে সেই ক্রিয়া-বিচ্ছিন্ন হইলেও চিত্তস্থিরতায় সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারেন না। তাহার কারণ, নিজ অঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে সেই শক্তি বিচ্ছিন্ন বা অসমান অবস্থায় আবদ্ধ অথবা বিক্ষিপ্ত থাকিবার হেতু ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রিয়া করিতে থাকে ; সুতরাং অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাসাদির অনুষ্ঠানে দেহের সূক্ষ্মমুখী পথ দিয়া, বিশেষ অঙ্গুলিগুলির পরস্পর মিলন দ্বারা (পূর্ব্বকথিত গৃহভিত্তিসংলগ্ন লৌহদণ্ডের অনুকরণে) শির হইতে পদতল পর্য্যন্ত দেহের সকল স্থানের সেই শক্তিগুলির সমতা আনয়ন করিতে হয়। শিখা, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি সূক্ষ্মপথ বলিয়া ন্যাসকালে সেই সকল স্থানে অঙ্গুলি স্পর্শ করাইবার বিধান আছে। সাধক খণ্ড খণ্ড ন্যাসদ্বারা শরীরস্থ শক্তিকে সর্ব্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ব্যাপক-ন্যাস দ্বারা সেই খণ্ড খণ্ড শক্তিগুলিকে অখণ্ডরূপী এক শক্তিতে পরিণত করেন। ব্যাপকন্যাসে পাদমূল হইতে শিখাগ্র পর্য্যন্ত যে ভাবে উভয় হস্তের অঙ্গুলিগুলি পরিচালিত করা যায়, তাহাতে দেহস্থিত সকল শক্তির সমতা হইয়া আত্ম-তন্ময়তা উপস্থিত হয়। আত্মিকতত্ত্বে কথিত (Self-Mesmerism বা Self Hypnotism) অতি স্থূলভাবে ইহারই অনুরূপ বলা যাইতে পারে। যাহা হউক ন্যাসতত্ত্বে দৈবশক্তির গূঢ় মর্ম্ম গুরুমুখাগত।

ভাবতত্ত্ব।

এক্ষণে পূজা অর্চ্চনায় যন্ত্র মন্ত্রাদির পর ভাবতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলেই 'পূজাতত্ত্ব' নামক সনাতন সাধনতত্ত্বের 'চতুর্থস্তবক' এক প্রকার সমাপ্ত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে যথাক্রমে দিব্য, বীর ও পশুভাবে পূজা করিবার বিধি শাস্ত্রে উক্ত আছে। "ভাবস্তু ত্রিবিধা প্রোক্তো দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।" এই ত্রিবিধ ভাবমধ্যে আদ্য অর্থাৎ দিব্যভাব সর্ব্বমঙ্গলনিদান ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, দ্বিতীয় বীরভাব মধ্যম ও তৃতীয় পশুভাব বিশ্বনিন্দিত। এই ভাবত্রয়ের মধ্যে যিনি যে ভাবেরই সাধক হউন না কেন, তিনি হোম, জপ ও তপস্যাদিদ্বারা প্রাণপণে সাধনা করিয়াও যদি ভাবতন্ময় না হইতে পারেন, তবে তাঁহার তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র কিছুই ফলপ্রদ হইবে না। "ন ভাবেন বিনা চৈব তন্ত্র মন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে ভাবের প্রভাবেই সাধক নিষ্কাম বা মুক্তিলাভ এবং সকাম বা কুল-গোত্রাদির বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সাধনার ক্রম-বিধানানুসারে শাস্ত্রে কথিত আছে যে,

ও অতীব সুন্দর দিব্যভাবের অধিকারী হইতে পারিবেন না। 'রুদ্রযামলে' একথা স্পষ্ট উক্ত আছে :—

"পশুভাবং মহাভাবং ভাবানাং সিদ্ধিদং পুনঃ।
আদৌভাবং পশোঃকৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদবশ্যকং।
বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমাত্তমং।
তৎপশ্চাদতিসৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলং॥"

যাহা হউক এই ভাবসিদ্ধি ব্যতীত সাধনার সকল কর্ম্মই পণ্ডশ্রম মাত্র। সদাশিব তাই "কৌলাবলীতে" খুলিয়া বলিয়াছেন যে, বেদহীন বিপ্র যেমন বৈদিক সংস্কারে অসমর্থ, বিষ্ণু-ভক্তি ব্যতীত ভক্তিতত্ত্ব যেমন সম্যক পরিস্ফূট হয় না, শক্তিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি যেমন উপহাসের কথা, গুরু ব্যতীত তন্ত্র-শাস্ত্র যেমন অনধিগম্য, পতিহীনা নারি যেমন সর্ব্ববিধ মাঙ্গলিক কর্ম্মে বিবর্জ্জিতা, কুলতত্ত্ব ব্যতীত দেবী বা আমার সাধনায় যেমন অনধিকারী, ভাবহীন সাধকও সেইরূপ যে কোনও সাধনায় সিদ্ধিলাভে অসমর্থ। এই ভাবের অভাবেই কুলশাস্ত্রে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই এবং সেই কারণেই ভাববিশুদ্ধ সাধককে প্রকৃত কৌলিক বলিয়া সকলে পূজা করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ—

শ্রীসচ্চিদানন্দ।

—o—

পরশুরাম কাব্য।

(৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

দুঃখী জনে কত দয়া জননীর প্রাণে !—
করুণা-রূপিণী মাতা ভক্তের অধিনা !—
কত সুধা নামে নিত্য ঝরে অবিরল ;—
দুর্গম শঙ্কটে আহা ! যেজন পতিত,
সে যদি বারেক মাকে ডাকে কালী বলে,
দুঃখ হরা দুঃখ তার, দেন দূর করে
দুর্গতিহারিণী দুর্গা দুর্গমে তারিণী।

আর কি জীবনে, রাজা, ভুলিবে কখন
মধুর সে কালী নাম, সুধার সদৃশ।
আজীবনে করিয়াছে কত মহাপাপ !—
জানেনা জীবনে কভু ধর্ম্মের আস্বাদ।
আজীবন অন্ধকারে কাটায়েছে যেই,—
ধর্ম্মের পবিত্র আলো যদি আঁখি পরে
পড়ে তার, আর কি ভুলিয়ে পুনঃ সেই
অন্ধকারে যেতে চায় !—হায়, এজগতে
অন্ধ যদি চক্ষু পায় বিধির কৃপায়—
চন্দ্র সূর্য্য শোভা হেরি কত প্রীতি পায় ;
প্রকৃতির মধুময় মাধুরী নিরখি,
পুলকে প্রমত্ত হয়ে, নাচে তার হিয়া,—
কে বল আদরে এত বাসন্তী সমীরে
গ্রীষ্মের উত্তাপে যদি তনু না দহিত ?
নির্ধন সে ধন পেলে কত সমাদরে।
আর কি ভুলিবে রাজা, সে পবিত্র নাম !

কালীর করুণা বলে কারামুক্ত হয়ে,
বীর পদে বীর, চলে শিবির উদ্দেশে।
বহু পরে উপনীত হইল তথায়।
জিজ্ঞাসে, স্বজনগণ বিলম্ব কারণ ?
রাজা কিন্তু কারো প্রশ্নে না দিল উত্তর ;—
নিরজনে সারানিশি করিল যাপন।
কেবল বদনে সদা কালীকার নাম !—
কালীময় দশদিশি, যেদিকে যখন
ফিরায় নয়ন, দেখে কালিকা সম্মুখে

যেন আবির্ভূতা এক ব্রাহ্মণীর বেশে।
প্রভাতে উঠিল রাজা শয়ণ ত্যজিয়া!—
হেনকালে, সেনাপতি আসি জানাইল;
"সৈন্যগণ সুসজ্জিত মৃগয়া কারণ!—
অতি উদাস অন্তরে, আজ্ঞাদেন ভূপ—
"মৃগয়ায় আর মোর নাহি প্রয়োজন;
বিশ্রাম করুক যত সৈন্য সেনাপতিগণ,
বিশ্রাম করুক সুখে আজি মৃগগণ।
রাজার বিশ্রামে বাঞ্ছা, একথা যখন
শিবিরে প্রচার হল,—পারিষদগণ
রাজার বিনোদ হেতু, করে নানাবিধ
উৎসবের আয়োজন নৃত্য গীত আদি।
মনোহর বেশ ধরি সহস্র সুন্দরী
রাজার সেবার তরে এল ত্বরা করি।
সাজায় সুন্দর করি ফুল মালা দিয়া,
শিবিরের চারিদিক শোভা বিন্যাসিয়া,—
আনিল বিলাস দ্রব্য কিঙ্কর নিকর—
কেহ গন্ধবারি—কেহ কুঙ্কুম কস্তুরী,
পুষ্পমাল্য হাতে লয়ে যতেক কিঙ্করী।
কিন্তু নৃপ এ সকলে তিক্ত-অনুভব,
বিরক্ত হইয়া ক'ন, "কাজ নাই ইথে।—
যাওহে অমাত্যগণ, যে যাহার স্থানে,—
রাণীগণ যাও চলি আপন সদন।
কাজ নাই কোলাহলে যাপিব নির্জনে!
নাহি ইচ্ছা আমোদেতে, বিতৃষ্ণা জন্মেছে;
এই বলি নরপতি নিভৃতে চলিল।
আঁখি মুদি করযোড়ে বহুক্ষণ তথা,
ইষ্টদেবী শ্রীচরণ স্থিরভাবে ভাবে।
তাতেও অন্তর কিন্তু পরিতৃপ্ত নয়!—
সাধ হয় দেখিতে, মায়ের সে পবিত্র
সজীব স্বর্গীয় মূর্ত্তি, ধরা আলো করা।
বরষার প্রবল বন্যায়,—স্রোতস্বিনী
ভেসে যায় যবে, ডুবে যায় বনস্থলী
ডুবে যায় অচিরাৎ, শোভাময় তট;—
কত গ্রাম, কত পল্লী, বন, উপবন
সুসুন্দর, মহীরুহ, নগেন্দ্র, গিরীন্দ্র
নদীতীরে বিরাজিত যত, ডুবে যায়
সে প্রবল স্রোতে কত প্রকাণ্ড অটবী
গ্রীষ্মের প্রখর তাপে, সে নগেন্দ্র শিরে
শুষ্ক হয়ে পড়ে থাকে, যবে তরঙ্গিণী
প্রবেশে কাননে, সেই শুষ্ক বৃক্ষগণ
স্রোতের বেগেতে চলে, নদীগর্ভ পানে,—
বন্যায় প্রবল টানে, ঊর্দ্ধশ্বাসে চলে।
ক্ষত্রিয়ের নশ্বর গরিমা, দিবানিশি
সেই শুষ্ক কণ্ঠসম জ্বালায়েছে হায়
অন্তর আমার; এবে প্রেমভক্তি স্রোতে
কালিকা মন্দির পানে ছুটিবারে চাহে।
দম্ভ গর্ব্ব তেজ হিংসা ক্রোধ কাম আদি,
বিরাজিত ছিল যারা হৃদয় তটিনী-
তীরে, ডুবিয়া গিয়াছে ভক্তির পাথারে;—
ডুবে গেছে এবে হায় পাপের পাহাড়।
যা কিছু আছিল মন্দ, ডুবে গেছে সব।
শুভক্ষণে মৃগয়ায় শ্রান্ত হয়ে কালী,
নিদ্রামগ্ন হয় রাজা মন্দির ভিতর!—
মরি কি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ হেরিলা নরেশ!—
আর কি জনমে নাহি পাব নিরখিতে?
সে অভয় পদদুটী রাজীব সুন্দর।"
এই কথা ভাবি ক্ষিপ্ত প্রায় হল ভূপ!—
মায়ের সেমূর্ত্তি সদা দেখিবারে সাধ!
চলিল আপন মনে মন্দির উদ্দেশে।

শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।

বর্ণ-চিত্রণ।

(৮০ পৃষ্ঠার পর)

যাহা হউক চিত্রের এইরূপ জীবন্তভাব আমাদিগের প্রাচীন আর্য্য-চিত্রাবলীর মধ্যেও যে, ছিল না, এ কথা কে বলিল? শকুন্তলাতেই যে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

রাজা দুষ্মন্ত, বিদূষক ও মিশ্রকেশী যখন চিত্র দেখিতে দেখিতে তদ্গতচিত্ত হইয়াছেন, সকলেই একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন বিদূষক বলিলেন—

"ভো চিত্তং কৃখু এদং" ॥ ১৩২।
মহারাজ, এ যে চিত্র!
রাজা—কথং চিত্রম্? ১৩৩॥
কি—চিত্র?
মিশ্র—অহি দাণিং অবগদথা কিং উণ জধাচিন্তি-
দানুসারী এসো ॥ ১৩৪ ॥

তাইত আমিও এখন চিত্র বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। আমারই যখন এমন ভ্রম হইয়াছে, তখন ইনি ত যেরূপ সংঘটন, সেইরূপ চিন্তারই অনুসরণ করিতেছেন, সুতরাং ইহাঁর চিত্রলিখিত বিষয়কে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

রাজা—কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরোভাগ্যম্॥
দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া যে পুনরপি চিত্রীকৃতা
কান্তা ॥ ১৩৬।

এই সকল কি একমাত্র দোষের জন্যই অনুষ্ঠিত হইল? আমি তন্ময়-হৃদয়ে যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রিয়াকে দর্শন করিতেছিলাম, তুমি আমায় স্মরণ করাইয়া, পুনর্ব্বার কান্তাকে চিত্রীভূতা করিয়া তুলিলে।

শকুন্তলার এই অংশে যে ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেকালে চিত্রে বর্ণবিন্যাসের কি অদ্ভুত কৌশল প্রচলিত ছিল! যাহাতে চিত্রিতামূর্ত্তি জীবিতা কি প্রকৃতই চিত্রিতা সে বিষয়ে ঘন ঘন সন্দেহ উপস্থিত হইত। যদ্যপি অতি ক্ষুদ্র আয়তনে অতি সামান্য ভাবে বর্ণচিত্র প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে এই জীবন্তরূপ ভাব কখনই প্রতীত হইত না। সুতরাং ইহা যে, পূর্ণাবয়বে অতি সুন্দর ভাবে নানাবিধ স্বাভাবিক বর্ণপূরণে রঞ্জিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যাহা হউক এই বর্ণ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দৃষ্টি বিজ্ঞান (Optics) শিক্ষা করা আবশ্যক, যাহা প্রকৃতির আলোকতত্ত্বের সহিত বিজড়িত।

আলোকের সাহায্যেই আমরা যে কোন বস্তুর বর্ণ উপলব্ধি করিতে পারি। আলোকই সর্ব্ব বর্ণাধার। সকল বর্ণই ঐ একমাত্র আলোক হইতেই সমুদ্ভূত। আলোক বিশ্লেষণ (Soler spectrum) দ্বারা তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যাইতে পারে। তিন পার্শ্ব বিশিষ্ট ঝাড়ের কলমের মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক

দেখিলে নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বর্ণ সকলের মধ্যে সাধারণতঃ রক্ত, নীল ও পীত এই তিনটী বর্ণই দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিনটীর আবার পরস্পর সম্মিলন বা সহযোগে আরও চারিটী বর্ণের সৃষ্টি ও সাধারণের তাহাই অনুভব হইয়া থাকে, তাহাদের নাম যথাক্রমে (লোহিত ও নীলের মিলনে) পাটল বা বেগুনি, (নীল ও পীতের মিলনে) হরিৎ বা সবুজ, (পীত ও লোহিতের মিলনে) অরুণ বা কমলা-লেবু বর্ণ এবং (পরস্পরের বিকৃতি মিলনে) কৃষ্ণ নীলবর্ণ। পূর্ব্বোক্ত লাল, নীল, পীত এই তিনটী মূলবর্ণ বাকি চারিটী যোগিক বা মিশ্রবর্ণ। বর্ণচিত্রণে ঐ সাতটী বর্ণের সূক্ষ্ম-মিশ্রণদ্বারা আরও বহু বর্ণ প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার বিজ্ঞানতত্ত্ব বিস্তৃত, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিখিত হইবে। চিত্র-শিল্পীকে তাহাই মনোযোগসহকারে আলোচনা ও তাহার ব্যবহার বিষয়ে অভ্যাস করিতে হয়। দৃষ্টিবিজ্ঞান ও বর্ণবিজ্ঞানে উপযুক্তরূপ জ্ঞান না জন্মিলে কিছুতেই উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পী হইবার সম্ভাবনা নাই। টিসিয়ন এ বিষয়ে অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন ছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে য়ুরোপের চিত্রবিত্থালয়গুলির উল্লেখকালে বলা হইয়াছে। তদনন্তর এ পর্য্যন্ত বহু পাশ্চাত্যশিল্পী বর্ণ-বিলেপনে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করা আবশ্যক। তাঁহারা কোন্ কোন্ দ্রব্য কোন্ কোন্ বর্ণের সহযোগে কি ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান এবং তাহার অনুকরণ করা বিধেয়। আমাদের দেশের শিল্পিজাতিরা প্রকৃতানুরূপ বর্ণবিন্যাস করিতে এক্ষণে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং দেশীয় হউক বা বিদেশীয়ই হউক যাঁহার চিত্র দেখিলেই স্বাভাবিক বর্ণ বলিয়া ভ্রম হয় তাঁহারই চিত্র শিক্ষার্থীর অনুকরণ যোগ্য ইহার পর প্রাকৃতিক আদর্শ দেখিয়াও সকল সামগ্রীর বর্ণ অনুকরণ করা বিধেয়। তাহাতে উক্ত জ্ঞানের যথেষ্টরূপ পুষ্টি হইয়া থাকে।

একই দ্রব্য অবস্থা, স্থান ও আলোকের ব্যতিক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদর্শী শিল্পী তাহা দেখিয়া তাহাদের পার্থক্য অনুভব করেন। কোন দ্রব্য যত্তপি প্রখর সূর্য্যালোকে রক্ষা করা যায় তাহা হইলে তাহার যেরূপ উজ্জ্বল বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, ছায়ার মধ্যে কিম্বা গৃহ মধ্যে প্রতিবিম্বিতালোকে রাখিলে সেরূপ বোধ হইবে না, মেঘাবৃত দিবসেও তাহার বর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিবে। আবার যত্তপি সেই দ্রব্যই চন্দ্রালোকে কিম্বা নিশীথ সময়ে দীপালোকে দেখা যায়, তাহা হইলেও তাহার বর্ণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ প্রতীত হইবে। বর্ণের এই স্বাভাবিক পার্থক্য সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই সহজে অনুভব করিতে পারা যায়। বর্ণ-চিত্রণ কালে শিল্পীকে কেবলমাত্র দেখিলে চলিবে না, অতি সাবধানে চিত্রফলকে তাহাই প্রতিফলিত করিতে হইবে। একই বর্ণসমষ্টি যাহা দিবালোকের যে কোন চিত্রে ব্যবহৃত হয়, তাহাই নিশার চন্দ্রালোকের চিত্র রঞ্জিতকরণে প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু শিল্পীর বর্ণমিশ্রণ কৌশলে অতি সামান্ত সামান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কালের ভাব প্রকাশ করিয়া দেয়। ইহাই শিল্পীর শিল্পচাতুরী বা কলা-কৌশল। এই বিষয়টী যিনি যত অধিক আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি ততই উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনটী মূলবর্ণ ও চারিটী মিশ্র-বর্ণ সর্ব্বশুদ্ধ এই সাতটী প্রধান বর্ণ, তাহাও আবার পরস্পরে মিলিত হইয়া বহু বিভিন্ন বর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে। কোন দ্রব্য যে কোনও একটী মূল অথবা নানা মিশ্র বর্ণের হউক না, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণের দ্রব্য হইতে তত্তদ্বর্ণ প্রতিফলিত হইয়া সেই দ্রব্যের উপর পতিত হয় এবং তাহাতে তাহার আর এক স্বতন্ত্র নূতন বর্ণের আভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন মুক্তামালার সন্নিকটে যদ্যপি গোলাপ বা যে কোন গভীর বর্ণের পুষ্প রাখা যায়, তাহা হইলে সেই শুভ্র মুক্তাপুংক্তির মধ্যে নিকটস্থ সেই ফুলের বর্ণসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। মুক্তা অত্যন্ত শুভ্র ও স্বচ্ছ বলিয়া তাহা যেমন অতি সহজেই সকলের বোধগম্য হয়, অন্যান্য বর্ণের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ পদার্থমধ্যে সেরূপ স্পষ্ট তাহা দেখা যায় না, সুতরাং তাহা অতি মনোযোগ সহকারে দেখিবার বস্তু। শিল্পী বা শিল্পামোদী সকলকেই এইরূপ বর্ণ বিষয়ক বিবিধ তত্ত্ব প্রকৃতির, অনন্ত ও উদার গর্ভ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাই চিত্রবিদ্যান্তর্গত সূত্র-পঞ্চকের পঞ্চম সূত্র।

সূত্র-পঞ্চকের উপসংহার।

শিল্প-শিক্ষার্থীর পূর্ব্বোক্ত সূত্রপঞ্চক অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উহারই আনুসঙ্গিক এমন কয়েকটী বিশেষ কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে চিত্রান্তর্গত মূর্ত্তি সমূহের গঠন-পারিপাট্য দৃষ্টিমাত্রেই দর্শকের নয়ন আকৃষ্ট করে, ছায়ালোকের অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক সমাবেশে হৃদয় মোহিত হয়, বর্ণের বিমল ঔজ্জ্বল্য ও ক্রমমিলনে চিত্রে সতই এক স্বাভাবিক ভাব প্রতিভাত হয় এবং চিত্রমধ্যে সর্ব্বাবয়বে তাহার আন্তরিক ভাব-রাশি বর্ণে বর্ণে পরিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। বর্ণ-চিত্রণের শিল্পচাতুর্য্যমধ্যে ইহাই চরম লক্ষ্যস্থল। চিত্রের এই অদ্ভুত ভাবই প্রকৃত পক্ষে তাহার ঔৎকর্ষ-বোধক। ইহা নিষ্পন্ন করিতে হইলে, শিল্পীকে বর্ণ শিল্পের নানা প্রথার অনুশীলন ও চিত্রে তাহার যথা সম্ভব প্রয়োগ করিতে হয়। সে সকল প্রথা বা কৌশল বিশেষে অভিজ্ঞতালাভ করিতে হইলে, শিল্পীর সম্পূর্ণ বহুদর্শিতা ও বিপুল অধ্যবসায়ের উপরই নির্ভর করে। তবে তাহার কয়েকটী সঙ্কেতমাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, যাহাতে শিল্পীর স্বাধীন চিত্তে সেই সকল বিষয় চিন্তা ও অনুশীলন করিবার পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে সহায়তা করিতে পারে।

চিত্রের মধ্যে ভাব-বাহুল্যের সহিত তাহার অমল সারল্য, বিভিন্ন অংশের সহিত তাহার অসমতা, অথচ সমগ্রের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মিলন বা ঐক্যভাব, ইহাই বোধ হয় সেই নয়ন-তৃপ্তিকর চিত্রোৎকর্ষের প্রধান উপাদান বা প্রকৃত আধার।

চিত্রের পাত্রসমাবেশ মধ্যে কোনও এক মূর্ত্তি বা কোনও একটী অংশমাত্র অন্যান্য অংশ অপেক্ষা সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বোধে সহসা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার মূলীভূত প্রধান কারণ—চিত্রান্তর্গত আলোকবিন্যাস। সেই আলোক সমগ্র চিত্রের মধ্যে একভাবে এক দিক হইতে পরিচালিত বা বিন্যস্ত হইলেও চিত্রের সেই বিশিষ্ট অংশ বা মূর্ত্তিকে কেমন এক বিচিত্রভাবে উদ্ভাষিত করিয়া তুলে, সেই অংশের উপরই যেন চিত্ররাজ্যের সিংহাসন স্থাপিত করিয়া আলোক-রাজ চিত্রোপরি আপন অপ্রতিহত আধিপত্য

বিস্তার করিতে থাকে। আলোকের সেই অবিরোধ গতি চিত্রের সকল স্থানে সমান ভাবে পরিচালিত হইবে, অথচ স্থান বিশেষে শিল্পী তাহার অদ্ভুত কৌশল-কলাপে সেই আলোকাংশ এমন ভাবে চিত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবে, যাহাতে চিত্রান্তর্গত নায়কাংশ অতি পরিচ্ছিন্নভাবে দর্শকের নয়ন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। শিল্পীর এই কলাচাতুরি বস্তুতই অতি বিচিত্র বিষয়, ইহার যাথার্থ্য অনুভব করিতে হইলে বিখ্যাত শিল্পাচার্য্যগণের চিত্রাবলী শিক্ষার্থীর অতি যত্নসহকারে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

আলোক বিন্যাসের এই বিচিত্র কলাকৌশল চিত্রের উপর যেরূপ ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে, ঠিক সেইরূপ ভাবেই বর্ণ-চিত্রান্তর্গত কোন একটী বর্ণও চিত্রের প্রাণস্বরূপ হইয়া প্রতি চিত্রের উপর আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করে! অর্থাৎ যে কোন উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও দুইটী বর্ণ কখনও পরস্পর সমান ভাবে তাহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। বর্ণ-চিত্রণের মধ্যে আবশ্যকানুসারে নানা বর্ণ একক বা মিলিত হইয়া ব্যবহৃত হইলেও সততঃ সেই সকল বর্ণের যে কোনও একটীর প্রাধান্য প্রত্যেক চিত্রেই পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ কোন চিত্রে নীল, কোন চিত্রে লোহিত, কোথাও পীত, কোথাও হরিৎ আদি একটী বর্ণেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, সকল বর্ণের মধ্যেই সেই একই প্রাধান্যমূলক বর্ণের একটী ক্ষীণ আভা চিত্রমধ্যে যেন অলক্ষিতে প্রতিভাত হইতে থাকে। এইরূপ বর্ণবিন্যাস উৎকৃষ্ট বর্ণচিত্রের একটী প্রধান সৌন্দর্য্য। পটুয়াদিগের ন্যায় কেবল নানাবিধ উজ্জ্বল উজ্জ্বল বর্ণে অতিরিক্ত রঞ্জিত চিত্র উচ্চাঙ্গের শিল্পানুমোদিত নহে। প্রাধান্যমূলক উক্ত আলোক এবং বর্ণের আনুসঙ্গিক বা অনুচররূপে বিভিন্ন সংকীর্ণ অংশে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে চিত্রিত হইয়া এক যোগে একখানি সমগ্র চিত্রের ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্য-সমষ্টি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর অসমতা, আবার সেই অসমতার সমষ্টির মধ্যে এক অপূর্ব্ব মিলন বা ঐক্য ভাব, ইহাই উচ্চাঙ্গীভূত বর্ণচিত্রণের সার সামগ্রী। বস্তুতঃ চিত্রের পাত্রসমাবেশ হেতু তাহার প্রত্যেক অংশের মধ্যে এমন কোন ভাব কখনও চিত্রিত হওয়া বিধেয় নহে, যাহাতে সেই একই ভাব দুই বা ততোধিক স্থানে পরিব্যাক্ত হইয়া পড়ে। এই বিভিন্ন ও সমতাশূন্য ভাবের চিত্রণ ব্যাপারে নানা বর্ণ নানাবিধ আলোক ও ছায়া নানা ভঙ্গিতে চিত্রিত হইলেও সমগ্র চিত্রখানির মধ্যে তাহার যে এক বিরাট সমষ্টিভাব অর্থাৎ আলোক-রশ্মির একটী ধারাবাহিক স্রোত এবং পূর্ব্ব কথিতরূপ বর্ণ বিশেষের অলক্ষিত প্রাধান্য অর্থাৎ ঐক্যভাব বা মিলন চিত্রশিল্পীর প্রকৃতই কলা চাতুর্য্যের পরিচায়ক।

চিত্রান্তর্গত পাত্রসমাবেশ, ছায়ালোক-বিন্যাস ও বর্ণ-বিলেপনের পার্থক্যবিধি সর্ব্বস্থানেই একরূপ। পাত্র-সমাবেশ কালে পাত্রসমূহমধ্যে যেমন একই ভাব বা ভঙ্গি দুই বা ততোধিক স্থানে প্রস্ফুটিত হওয়া বিধেয় নহে, সেইরূপ সেই ভাবের ঘন ঘন পরিবর্ত্তনও বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিধিবদ্ধ নাই, তাহা হইলে সেই সকল চিত্রের বিমল সারল্য একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং সেই ভাবরাশি এমন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন করিয়া চিত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে

তাহাদের পরস্পর পার্থক্য সত্তেও সেইভাবের মিলন যেন মালার ন্যায় একটী সূত্র-রেখার গ্রথিত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ছায়ালোক সমাবেশ ও বর্ণ-বিলেপনমধ্যেও পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল আলোক ও ঘন-ছায়া এবং বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের সুতীব্র পার্থক্য প্রকৃতই চিত্রের অতি জঘন্য ভাবের পরিচায়ক। সুতরাং ছায়ালোক এবং বর্ণের অতি ধীর পার্থক্য ক্ষীণ-স্রোতা তটিনীর নির্ম্মল তরঙ্গভঙ্গির মত যেন প্রবাহিত হয়। সে পার্থক্যতার ভিতর পরিবর্ত্তনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ থাকিলেও, ভ্রমেও যেন তীব্রতার কোন রূপ আভাস তাহার মধ্যে না আসিয়া পড়ে। তাহা যেন বিবিধ সঙ্গীত-যন্ত্রের একতান সুমধুর স্বর-লহরীর মত চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়। চিত্রে এই সকল ভাব বর্ত্তমান থাকিলে তবেই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে তাহা পরিগণিত হইবে। বাস্তবিক এই সকল বিষয় চিত্রমধ্যে সহজে রক্ষা করা সকল শিল্পীর পক্ষে নিতান্ত সহজসাধ্য বস্তু নহে। ইহা শিল্পীর কেবল মাত্র অভ্যাসলব্ধ সাধারণ সামগ্রী নহে, ইহা কিয়ৎপরিমাণে শিল্পীর স্বাভাবিক বা ভগবদ্দত্ত বস্তু বলিতে হইবে। বাল্যকালে অনেকের চিত্রাঙ্কন বিষয়ে এক প্রকার স্বাভাবিক ইচ্ছা বলবতী থাকে, লিখিতে পড়িতে খেলিতে বসিতে তাহারা নানাবিধ চিত্র বিনা আয়াসে অঙ্কিত করিয়া আনন্দানুভব করে; বালকের সেই শক্তি উচ্চ শিক্ষার সহিত বৈজ্ঞানিক নিয়মে উদ্বোধিতা হইলে, কালে তাহার অভ্যাস বা সাধনাসিদ্ধ করিলে, সেই শক্তির যথেষ্ট পরিস্ফুরণ হইয়া থাকে। শিল্পিগণ কেবলমাত্র অভ্যাসবলে নির্ভুল চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় সত্য, কিন্তু সকলেই পূর্ব্বোক্ত ভাবের সমাবেশদ্বারা প্রকৃত ভাবময় চিত্র সুসম্পন্ন করিতে পারে না, তাহা সেই স্বাভাবিক বা সেই ভগবদ্দত্ত শক্তি ব্যতীত সুসিদ্ধ হইবার নহে। বস্তুতঃ মনুষ্যহস্ত কেবল যন্ত্র-বিশেষমাত্র। শিল্পীর সেই আরাধ্যা অতিনব কবিত্ব-শক্তি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অমূল্য-সাধনার ধন। কিন্তু সে ধন কাহার আছে না আছে বা কতটুকু আছে, তাহা শিল্পীও স্বয়ং পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারে না, বরং অন্যে তাহার অযত্নরচিত বালচিত্র দেখিয়া কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং শিল্পশিক্ষার্থী সংকল্প দৃঢ় করিয়া কায়-মনে তাহার সাধনা-পথে অগ্রসর হইলে, ক্রমে নিজেই সেই শক্তির বিকাশ বুঝিতে পারিবে। গৃহাভ্যন্তরে স্থির চিত্তে বসিয়া কেবলমাত্র চিন্তা করিলেই কেহ কখনও সেই অপূর্ব্ব শক্তি আয়ত্ব করিতে পারে না। শিক্ষার্থী গৃহে প্রান্তরে পথে ঘাটে সর্ব্বস্থানে সকল সময়েই সেই একমাত্র শক্তির অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকিলে এক দিন না এক দিন তাহার সাক্ষাৎ পাইবে। সংসারের মাঝে যাহা কিছু তাহার নয়ন-পথে উপস্থিত হইবে, পলকমাত্র সময়ের মধ্যেই তাহার বাহ্য অভ্যন্তর সকল তত্ত্ব বুঝিয়া লইতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সেই গুপ্ত ভাণ্ডারে তাহাকে আবদ্ধ করিবার জন্য আয়াস করিতে হইবে। মানুষ চলিতেছে, বলিতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, সকল অবস্থাতেই তাহার ভাবের কত পরিবর্ত্তন হইতেছে; তরু, গুল্ম, লতা, কত হেলিয়া দুলিয়া নিত্য কত ফল, ফুল, পল্লব দেখাইয়া, কত নূতন চিত্র ফুটাইতেছে; পশু, পক্ষী, পতঙ্গ হইতে নদ, নদী, পর্ব্বত, প্রান্তর, জলদ, জলধি পর্য্যন্ত জড় অজড় কত বস্তু সতত কত

ভাবের বিকাশ করিতেছে, চিত্রশিল্পীকে একমাত্র নিজ সূক্ষ্মদৃষ্টি সাহায্যেই সেই অনন্ত ভাবের ভাণ্ডার হইতে নিজ অভিলষিত ভাব-রত্নাবলীর আহরণ করিয়া সেই শক্তির পুষ্টি করিতে হইবে। জগতে কদর্য্য বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া শিল্পির চক্ষে কিছু পরিত্যজ্য নহে, কোন বস্তুই সংসারে শুষ্ক বা কঠোর নহে, সকলের মধ্যেই অতি সুমধুর রস বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই রস সংগ্রহ করা চাই। সেই বিন্দু বিন্দু রস, সেই তিল তিল ভাব বা শক্তিকণা সংগ্রহ করিয়া একত্র করিতে পারিলে, তাহার সমষ্টিই একদিন শিল্পীর বিরাট বিচিত্র চিত্ররূপে পরিণত হইবে। অতি জঘন্য অপদার্থ চিত্রও সুশিল্পীর অনেক সুন্দর উপাদান প্রদান করে—তবে সে উপাদান দর্শন করিবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা চাই। পাশ্চাত্য শিল্পগুরু মহানুভব লিউনার্ডো ডা ভিন্সি কখন কখন অগ্নির জ্বালাময়ী বিক্ষিপ্ত শিখাপুঞ্জের মধ্যে, কখন বা প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকাস্থিত গৃহের ভিত্তি-গাত্রে বরষা-জল-লিখিত বিকৃত চিত্রাবলীর আভাস দেখিয়া, কত নূতন অভিনব চিত্রের উদ্ভাবনা করিতেন। এইরূপ অতি ক্ষীণ আদর্শ মাত্রই অবলম্বন করিয়া সুশিল্পী তাহার উদ্ভাবনা-রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

শিল্পীর এই উদ্ভাবনা এবং ধারাবাহিক অভ্যাস-সহযোগে পূর্ব্ব কথিত সেই দৈবশক্তির আবির্ভাব হয়। শিল্পী তাহার আরাধ্য বিদ্যার সাধনায় এইরূপে ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারিলেই প্রকৃত যোগীর ন্যায় তাহার সমাধি অবস্থা আইসে, তখন শিল্পীর বাল্যজীবনের সেই মুকুলিত-প্রতীভা প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে সুরভি বিস্তার করে—জগৎ আমোদিত হয়। প্রতিভার সেই নূতন জ্বালাময়ী বিকাশ বা সেই শিল্প-যোগ-বিভূতি অনেকের পক্ষে সহ্য করা তখন নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সেই শক্তি সহসা কোথা হইতে আবির্ভূতা হইয়া শিল্পীর আরাধ্যা দেবীর যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়—শিল্পীর শিল্পসমূহ তখন যেন জীবন্ত বলিয়া সকলের মনে হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য রবে শিল্পীর আশাতীত প্রশংসা পড়িয়া যায়—আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের অযাচিত প্রশংসার সেই সুতীব্র বেগ সহ্য করা প্রকৃতই বড় কঠিন। শিল্পী, কবি, সাধু, সন্ন্যাসী অনেকেই এ প্রাথমিক বেগ সামলাইতে পারেন না, গর্ব্বভরে উন্মার্গগামী হইয়া সহসা একেবারে নিপতিত হন, সে শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সে প্রতিভাব বিলোপ হয়। সেই কারণ অতি সাবধানে বিহিত ধৈর্য্য-সহকারে শিল্পীকে প্রশংসার তড়িত্তাড়না হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, নতুবা সেই চঞ্চলা শক্তি দেখা দিয়াই অচিরে কোথায় সরিয়া যাইবে, আর তাহার সহসা সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হইবে না।

ক্রমশঃ।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

ধুতুরা।

বাঙ্গলা দেশে ধুতুরা গাছ বেশ জন্মিয়া থাকে। এই গাছ তৈয়ারী করিবার জন্য বেশী লোক খাটাইতে হয় না; অল্প টাকা ফেলিলেই হয়। গরু বাছুরে এ গাছ খায় না, সে জন্য জমি ঘিরিবার জন্য অন্য চাষে যাহা কিছু পয়সা লাগে তাহা ইহাতে কিছুই দরকার হয় না। যে কিছু সামান্য মূলধন

খাটাইতে হয়, তাহা অল্প দিন মাত্র পড়িয়া থাকে। ধুতুরা গাছ ৬।৮ মাসের মধ্যেই বেশ বর্দ্ধিত হয়। এই গাছের কোন অংশই ফেলা যায় না। ইহার পাতার মূল্য আছে, ডাঁটার মূল্য আছে, শিকড়েরও মূল্য আছে। অতএব এ ব্যবসা যে অত্যন্ত লাভজনক তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিলাতে পাতা, ডাঁটা ও শিকর রপ্তানি হয়। এই গাছ হইতে বেলেডোনা Belladona নামক ঔষধ তৈয়ারী হয়।

এই ঔষধ এত দরকার যে ধুতুরা গাছের যতই অধিক পরিমাণে চাষ হউক না কেন, ধুতুরার অভাব যে শীঘ্র পরিপূরণ হইবে না, তাহা বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই গাছের বেশী রপ্তানী হইয়া থাকে।

এ গাছের পাতা ডাঁটা ও শিকড় হইতে বেলেডোনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সমগ্র গাছটীই কাটিয়া বিলাতে পাঠাইতে হয় না, উহার পাতাগুলি বেশ যখন বড় বড় হয়, তখন গাছ হইতে তুলিতে হয়, তারপর ছায়ায় রাখিয়া শুকান আবশ্যক। শুকাইবার কালে পাতার রং যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাছ হইতে তুলিয়া পাতাগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া ৮।১০ দিন ঠাণ্ডায় রাখিয়া দিয়া শুকাইলে পাতার রং নষ্ট হইবে না। যে পাতার রং নষ্ট হইয়া যায়, তাহা কোন কাজে আসে না। এইরূপ শুকান পাতা গোছা করিয়া বাঁধিতে হয়।

তাহারপর সেই বাণ্ডিলগুলি কলিকাতায় চালান হয়। যেমন কাপড়ের গাঁইট বাঁধে, সেইরূপ এই কলে চাপ দিয়া পাতার গাঁইট বাঁধিতে হয়। একটি একটি গাঁইট ওজনে ৫ মণ হইলে ভাল হয়। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় পাঠাইবার জন্য যাহা খরচ হয়, তাহা নিম্নের তালিকার দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে।

কলিকাতায় আনিতে ভাড়া	প্রতি মণ	৷৵০
গ্রামের গরুর গাড়ী ভাড়া	,,	৴০
তদারক	,,	৵০
মফঃস্বলে প্যাক করা	,,	৶০
কলিকাতায় গাঁইট বাঁধিবার জন্য	,,	।০
কলিকাতায় গরুর গাড়ী ভাড়া	,,	৵০
ওজন ও দাগ দেওয়া এবং জাহাজে তোলা	,,	৴০
কলিকাতা হইতে বিলাতে জাহাজের ভাড়া		৷৷৵০
দালাল বিমা ইত্যাদি		।০
	মোট	২৷৴০

বিলাতে প্রতি টন (২৭ মণ ১১) ২০ কিংবা ২২ পাউণ্ড দরে বিক্রয় লইয়া থাকে। অর্থাৎ সেখানে ১ মণ ১২ টাকার হিসাবে বিক্রী হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খরচ খরচা বাদে প্রতি মণে শুধু পাতা বেচিয়া ৯৷৷৵০ লাভ হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধুতুরা গাছের ডাঁটা ও শিকড় হইতেও বেলেডোনা প্রস্তুত হয়। সুতরাং এ গুলিরও বিলাতে দর আছে। সেখানে উহার ১ টন ১৪ কিংবা ১৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দামে বিক্রী হয়। অর্থাৎ ১ মণের মূল্য ৬ কিংবা ৬৷৷০ টাকা।

এক বিঘা জমিতে ৭ হাত অন্তর অন্তর ধুতুরা পুতিলে ১৮০টী গাছ জন্মিতে পারে। এই গাছ ৩।৪ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। প্রতি বৎসর প্রতি বিঘায় ১০ মণ ধুতুরা পাতা পাওয়া যাইবে। পাতা হইতেই মূল লাভ ৯০ টাকা হইয়া থাকে। প্রত্যেক গাছ

হইতে ⁄৩ সের ডাঁটা ও শিকর পাওয়া যায়। ৪০০ গাছ হইতে ৩ বৎসরে ৩০ মণ ডাঁটা ও শিকর পাওয়া যায়। ৬৲ টাকা মণ হিসাবে ১৮০৲ টাকা অর্থাৎ প্রতি বৎসর কেবল ডাঁটা ও শিকড় হইতে ৬০৲ টাকা পাওয়া যায়। মোটের উপর এক বিঘা জমির ধুতুরা চাষ হইতে ১৫০ টাকা বৎসরান্তে লাভ হইবার সম্ভাবনা।

রেলের উভয় পার্শ্ব রেল কোম্পানির যে সমস্ত জমি পড়িয়া আছে, তাহাতে ধুতুরার চাষ লোকে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে। তাহাতে অন্য চাষের হানি হয় না মার্চ্চ মাসে এ সমস্ত জমি বিলি হয়। রেলের উভয় পার্শ্বের ১৮০০ ফিট জমি রেল কোম্পানি ষ্টেশন মাষ্টারকে নিজের ব্যবহারের জন্য দিয়া থাকে। আর বাকী জমি বৎসরান্তে নিলামে বিলি হইয়া থাকে। এই সমস্ত পোড়ো জমিতে ধুতুরা গাছের চাষ করিলে যে, বিশেষ লাভবান্ হওয়া যায়, তাহার আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ধুতুরা গাছ ছাগলে খায় না, ইহার কোন অংশ লোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে এরূপও আশঙ্কা নাই। আরও এক প্রধান সুবিধা যে এ গাছ অনাবৃষ্টিতেও মরিয়া যায় না। আবার ধুতুরা চাষের জন্য জমি বিশেষ করিয়া তৈয়ারি করিতে হয় না। উঁচু জমিতেও চাষ হয়, নিচু জমিতেও চাষ হয়।

এখন কথা উঠিতে পারে ক্রেতা কোথায় এবং তাহার নাম ও ঠিকানা কি? এ সম্বন্ধে কলিকাতার ৩নং ক্লাইব ষ্ট্রীটে Director General of Commercial Intelligence এর নিকটে আবেদন করিলে সুফল ফলিতে পারে।—'কমলা'।

শ্রীকৃষ্ণলাল দাস, এম, এ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভ্রম সংশোধন—'শিল্প ও সাহিত্যের' এই বর্ত্তমান সংখ্যায় "তন্ত্র কি" প্রবন্ধের মধ্যে ১০৭ পৃষ্ঠায় আরম্ভের পূর্ব্বে কম্পোজিটারের অনবধানতা বশতঃ নিম্নলিখিত অংশ ছাড় হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

"পশুভাবরূপ মহাভাব সর্ব্বভাবেরই সিদ্ধিপ্রদায়ক। তাহার কারণ, সাধক প্রথমে পশুভাবে সিদ্ধ না হইলে, পরবর্ত্তী উত্তমোত্তম বীরভাবের সাধক হইতে পারিবে না, এবং বীরভাবে সিদ্ধ না হইলে তৎপশ্চাৎ মহাফলপ্রদ"

* * * *

পদক পুরস্কার।—২৪ পরগণা, ঢাকুরিয়া পবলিক লাইব্রেরির পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "ভারতে নিত্য দুর্ভিক্ষের কারণ ও তৎপ্রশমের উপায়" এবং বিগত ৭৫ বৎসরের মধ্যে বঙ্গভাষার উন্নতি" সম্বন্ধে যাঁহাদের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, উক্ত লাইব্রেরী হইতে তাঁহাদের দুই জনকে যথাক্রমে "কালীপদ মেডেল" ও "ধনবল্লভ মেডেল" নামক দুইটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। বঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধগুলি পরীক্ষিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়। বর্ত্তমান ইংরাজী সালের ৩০শে এপ্রেল তারিখের মধ্যে রচনাগুলি উক্ত লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

* * * *

সাহিত্য-সম্মিলন:—বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারি শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় (ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল ভবনে) সম্মিলনের সহঃ সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত

বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে সম্মিলন-সম্পাদক যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে সভাস্থ সভ্যমণ্ডলী গভীর শোক প্রকাশ করেন ও সাধারণের অনুমতিক্রমে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই সংবাদ প্রেরিত হয়।

অনন্তর কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীন ও প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত ও বরিত হন। সভায় বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

* * * *

ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ—

গত ১৩ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যার সময় প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক ও "সাহিত্য-সম্মিলনে"র সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহসা ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সাহিত্যের সেবায় ও রচনায় তিনি যেরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনটী আজ কাল বিরল। চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার কিরূপ অসাধারণ শক্তি ছিল, তাঁহারই প্রণীত "কনে-বৌ", "খুড়ি-মা", "প্রিয়ম্বদা" "বিমাতা" প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার পূর্ণ পরিচয়। জীবনে তেমন প্রতিষ্ঠা না হউক, জীবনান্তে একদিন না একদিন নিশ্চিতই তাঁহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইবে। তিনি সাহিত্যজীবী ছিলেন। সাহিত্য তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ছিল। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের উপস্বত্ব গ্রন্থসমূহের বিপুল প্রচারের পূর্ণ পরিচায়ক।

সংক্ষেপে তাঁহার জীবন-কথা—সন ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার যোগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১৭ই আশ্বিন মহাপূজার ষষ্ঠীর দিন, ৬ মাস বয়সের সময় ইনি পিতৃহীন হন। পিতার নাম ৺গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নয় বৎসর বয়সের সময় কলিকাতার চাঁপাতলায় জ্যেষ্ঠতাত ৺প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় থাকিয়া ইহাঁর ইংরেজী লেখাপড়া শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১২৮২ সালে এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি জেনারেল এসেমব্লি' কলেজে এফ, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পঠদ্দশাতেই বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ইহাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১৯ বৎসর বয়সের সময় ইনি 'সুধাকর' পত্র প্রকাশ করেন এবং তৎসাময়িক সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ১২৮৫ সালেই 'কল্পনা' নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রেই ইহাঁর প্রসিদ্ধ 'কনে বৌ' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়। 'অনুসন্ধান' পত্রে 'বিমাতা' 'বড়ভাই' 'আমাদের ঝি' প্রভৃতি বহু উপন্যাস ও গল্প প্রথম প্রকাশ পায়। এ পর্য্যন্ত ইনি ২৪ খানি উপন্যাস ও গল্পের পুস্তক লিখিয়াছেন। সামাজিক গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনায় ইনি প্রতিভান্বিত। গৃহলক্ষ্মীগণ অতি আদরের সহিত ইহাঁর উপন্যাস পাঠ করেন। গার্হস্থ্য কার্য্যকুশলতায় সাহিত্যসেবীদের মধ্যে ইনি আদর্শ, তাই বোধ হয়, ইহাঁর উপন্যাসে গার্হস্থ্য চিত্রের স্বাভাবিক সমাবেশ দেখিতে পাই।

* * * *

কবিবর নবীনচন্দ্র—

"১২৫৩ সালের ২৯শে মাঘ, অর্থাৎ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার, চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানার অধীন সর্ব্বজন পরিচিত নয়াপাড়া গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

নবীনচন্দ্র অষ্টম বর্ষ বয়সে চট্টগ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া চট্টগ্রাম বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি শৈশবে বড় দুষ্ট ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন; কাহাকেও ভয় করিতেন না, কেবল খুড়া মদনমোহনকে দেখিলেই একটু শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। বিদ্যালয়ে তিনি "Wicked the great" (দুষ্টের শিরোমণি) উপাধি পাইয়াছিলেন। তাহার বাল্যজীবন কতক লর্ড ক্লাইভের মত। এমন খেলা নাই, যাহা খেলিতেন না, এমন লোক নাই—যাহাকে ক্ষেপাইতেন না। শেষে বিদ্যার পরিচয় পুরাতন সাহিত্য পরিষদে সম্যকরূপে দিয়া আসিয়াছেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ-এ এবং জেনারেল এসেম্বিলি হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যেমন তিনি এক একটী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন, অমনি লোকে স্তম্ভিত হইয়া বলিতে লাগিল, এমন দুষ্ট ছেলে কিরূপে পাশ হইল? বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয় নবীনচন্দ্রের দুষ্টামিতে উৎপীড়িত হইয়া বলিতেন—"গোপীবাবু মাঘ মাসের শীতে এক গলা জলে তপস্যা করিয়া এমন পুত্র পাইয়াছিলেন।" গোপীমোহন প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্রকে দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতায় প্রাইভেট টিউসন করিয়া নিজ অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথম ভাগ "অবকাশ-রঞ্জিনীর" পিতৃহীন যুবক ও শশাঙ্কদূত কবিতায় তাঁহার জীবনের এ অঙ্ক প্রতিভাত হইয়াছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীনচন্দ্র ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি বহুকাল বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় সুখ্যাতি সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। তেজস্বিতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য ডেপুটী-জীবন তাঁহার পক্ষে পুষ্প-শয্যা হয় নাই, বরং সময়ে সময়ে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি অবসর-বৃত্ত ভোগ করিয়াছিলেন। সরকারী কার্য্যে যে সময় তিনি নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় তিনি নিম্নলিখিত পুস্তক সকল লিখিয়াছিলেন :—

১। অবকাশ-রঞ্জিনী ১ম ভাগ। ২। অবকাশ-রঞ্জিনী ২য় ভাগ। ৩। পলাশীর যুদ্ধ। ৪। রঙ্গমতী। ৫। রৈবতক। ৬। কুরুক্ষেত্র। ৭। প্রভাস। ৮। অমিতাভ। ৯। ভানুমতী। ১০ গীতা। ১১। চণ্ডী। ১২। খ্রীষ্ট। ১৩। প্রবাসের পত্র।

তন্মধ্যে তাঁহার রচিত "পলাশীর যুদ্ধ" তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী বাঁচিবে, ততদিন লোকে তাঁহাকে মনোমন্দিরে পূজা করিবে। যাঁহার বীণার বীনোদ ঝঙ্কারে এতদিন বঙ্গ-রাণীর কমল-কানন মুখরিত হইয়াছিল, যাঁহার ভক্তি, প্রীতি, প্রেম ও স্বদেশানুরাগপূর্ণ কাব্যকলাপের সুধা প্রবাহ এতদিন বাঙ্গালীর চিন্তাপীড়িত ও দুঃখদলিত হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ রস ঢালিয়া দিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুতে আজ সমগ্র বঙ্গবাসী দুঃখে ও শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছে। উদয়াস্ত প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের অধীন সকলেই। নবীনচন্দ্রও সেই নিয়মে বঙ্গীয় কাব্যগগনে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুদিত হইয়া কাব্য-জ্যোৎস্নায় বঙ্গীয় সাহিত্যগগন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই নিয়মবশেই তিনি পুনরায় অস্তমিত হইলেন! যাও, অমর কবি, নবীনচন্দ্র, যাও অনন্তধামে, যেখানে মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ গিয়াছেন, সেই সুখ ও শান্তিরাজ্যে অবস্থান কর! তোমার মহান্ কবিকীর্ত্তি তোমায় মর্ত্তে অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে।

কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন।

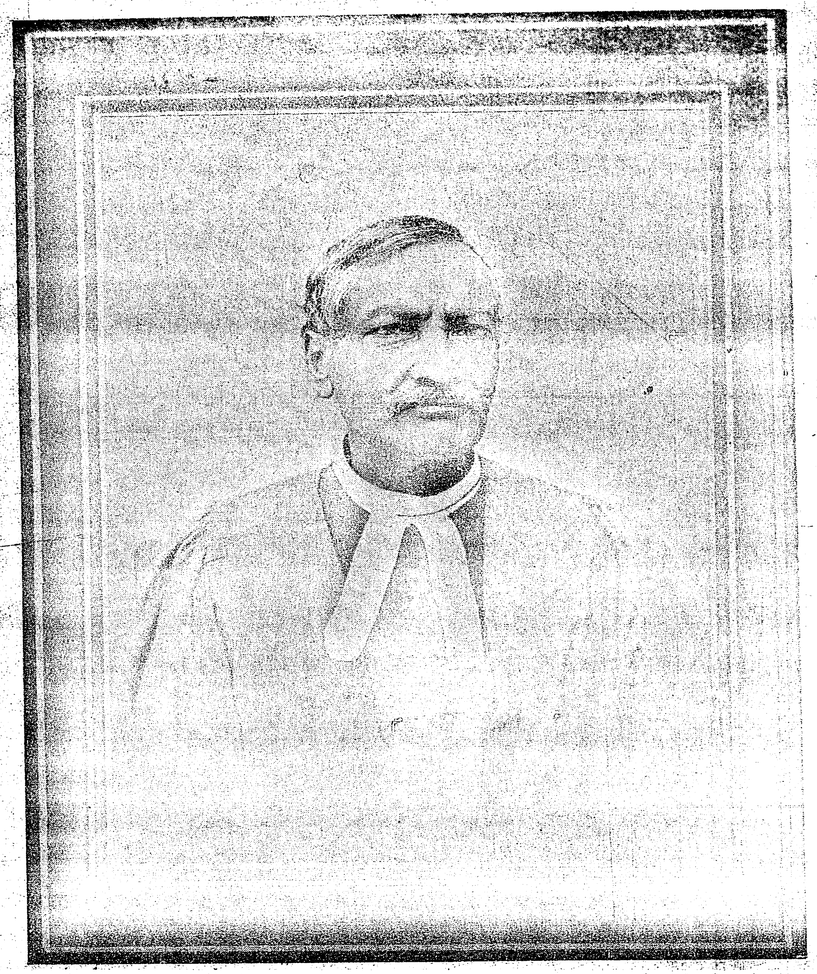

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সারদাচরণ মিত্র এম, এ,।

The Indian Art School, Bowbazar, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য।

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড। | সন ১৩১৫—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ভাস্কর্য্য।

—*—

(৯০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

প্রাচীন কালে এই বাঁয়া তবলার যে নামই থাকুক না কেন, ইহা যে আর্য্য-বাদ্যযন্ত্রাবলীর অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে বর্ত্তমান সঙ্গীতাধ্যাপকগণের সন্দেহমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণ সঙ্গীতাদির আলাপন উদ্দেশে যেরূপ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল, আর্য্যদিগের বিধিবিহিত সমর সময়েও সেইরূপ বিবিধ সমরসঙ্গীত ও তদনুগত রণবাদ্যানুলভ নানা বাদ্যযন্ত্রেরও প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে রণঢক্কা, জয় ঢক্কা বা ঢাক ও টিমটিমি (Lettledrum) আদি বহু বাদ্যযন্ত্র এ পর্য্যন্ত সকলের নিকট পরিচিত রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিক সাহিত্য হইতেও তাহা যেমন পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় ; শাঁচি, মুক্তেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও সারনাথাদির ভাস্কর্য্যমধ্যেও সেইরূপ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাপ্রভু চৈতন্যের সময় হইতে বঙ্গে হরিকীর্ত্তনের বিশেষ প্রচার হইয়াছে, সেই হরিকীর্ত্তনের অঙ্গস্বরূপ বাদ্যযন্ত্র ঢোলকের পরিবর্ত্তে সুমধুর খোলের প্রচলন হইয়াছে। তাহা যে আনদ্ধ শ্রেণীর যন্ত্রাবলীর মধ্যে বাঙ্গলার একটী স্বাধীন আবিষ্কার, বোধ হয় সে বিষয়ে কেহই ভিন্ন মত হইতে পারিবেন না।

প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যে গঞ্জনী ও ডমরু আদি আরও কয়েক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের আদর্শ দেখা গিয়াছে, এবং

তাহার কতক কতক এখন প্রচলিতও দেখিতে পাওয়া যায়।

শুষির শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে বংশী, শিঙ্গা, রামশিঙ্গা ও শঙ্খ প্রভৃতি ভারতে পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভাস্কর্য্যের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে তাহা দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ের কর্ণেট, ক্লারিয়নেট আদি তাহারই ঔৎকর্ষ মাত্র। শানাইএর মত ক্ষুদ্র ও বহু দীর্ঘ সে কালের বাঁশীর আদর্শ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুহাভ্যন্তরে খোদিত এক শোভাযাত্রায় চিত্রে দেখা গিয়াছে, সেরূপ বাঁশী বা বিউগুল্ অধুনা চৌঘুড়ীর উপরে কখন কখন বাজাইতে দেখা যায়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে নিম্নশ্রেণীয় জাতির বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে শোভাযাত্রায় সেরূপ দীর্ঘ বংশীর আভাস দেখা যায়। এ বংশী দেখিতে বাস্তবিক বিচিত্র, কখন কখন বংশীবাদকের প্রায় দেড়গুণ দীর্ঘও দেখা গিয়াছে। আনদ্ধজতীয় রণবাদ্যের সহিত সে কালে শুষির শ্রেণীর নানা রণযন্ত্রেরও ব্যবহার ছিল। এ কালে পাশ্চাত্য রণ-নীতির মধ্যে যেমন শিঙ্গা বা বিউগল ব্যবহারের বিধি আছে, সে কালে তাহা ত ছিলই, তদ্ব্যতীত পবিত্র শঙ্খের ব্যবহার বহুল পরিমাণে ছিল। গীতার প্রথম অধ্যায়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"তস্য সংজনয়ন্‌হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥
তত শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্য হন্যন্ত সশব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥" ১৩

ইত্যাদি—

এই সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে, ধর্ম্ম-যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাহার হর্ষ জন্মাইয়া মহা সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। তদনন্তর সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ আদি নিনাদিত হওয়ায় তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। তখন অন্য পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। হৃষীকেশ—পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয়—দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর—পৌণ্ড্র, রাজা যুধিষ্ঠির—অনন্তবিজয় এবং নকুল সহদেব—সুঘোষ ও মণিপুষ্পক বাজাইতে লাগিলেন, তাহার পর অন্যান্য ভূপালগণ ভিন্ন ভিন্ন শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন, ইত্যাদি। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সে কালে শঙ্খের কিরূপ সম্মান ও ব্যবহার ছিল। সংসারীর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্মে শঙ্খের যেমন আদর, যেমন ব্যবহার ছিল, সসাগরা পৃথিবীর ছত্রপতি সম্রাটেরও সেইরূপ আদরের, সেইরূপ অপরিহার্য্য ব্যবহারের বস্তু বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুতরাং হৃষীকেশ হস্তস্থিত পাঞ্চজন্য আদি শঙ্খই সে কালের শুষির শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যন্ত্র ছিল, অথবা শ্রীকৃষ্ণের কিশোর লীলার সঙ্গের সাথী সেই মোহন মুরলীই প্রধান ছিল তাহা আমরা এ কালের লোক ঠিক বলিতে পারি না। তবে স্থান ও সময় বিশেষে যে উভয়েরই প্রয়োজন ও প্রাধান্য ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ঘন শ্রেণীর যন্ত্র সম্বন্ধে আমার বোধ হয় উহা পূর্ব্বকালেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। সেই কাঁসর, ঘণ্টা, ঘড়ি, বিজয়ঘণ্টা, করতালি, মন্দিরা, কর্ত্তাল ও ঝাঁজর আদি সারনাথ ও অন্যান্য প্রাচীন ভাস্কর্য্য মধ্যে যেমনটী দেখা গিয়াছে এখনও ঠিক সেইরূপই প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং ঘন শ্রেণীর যে বিশেষ উৎকর্ষ বিধান হইয়াছে এরূপ বলিতে পারা যায় না।

ততঃ, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন এই চতুঃ শ্রেণীয় সংগীতযন্ত্র ব্যতীত প্রাচ্য কিম্বা প্রতীচ্য প্রদেশে পঞ্চম শ্রেণীর কোনরূপ সংগীতযন্ত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে এ কালের সংগীতবিদ্‌গণ আর্য্য সঙ্গীতাচার্য্যগণের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

অস্ত্র শস্ত্র।

এইবার ভারতীয় ভাস্কর্য্যের জীর্ণ আবরণ হইতে আর্য্য শাস্ত্রোক্ত অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধে কতদূর কি জানিতে পারা গিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান করিব। আর্য্যের অন্যান্য শাস্ত্র বেদ আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সুদূর অতীত যুগেও আর্য্যগণ বিধিবিহিত রূপে সমর শিল্পে অভিজ্ঞ ছিলেন। ঋগ্বেদের মধ্যে সৈন্য, সেনাপতি, ইষু, ধনু, অস্ত্র, শস্ত্র, রথ, সারথি আদি যে সকল সাংগ্রামিক শব্দের বহুল উল্লেখ আছে, তাহা দেখিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, সে কালে সমর-বিদ্যার সমধিক উৎকর্ষ ছিল। সেই কারণ বেদের অঙ্গ বা উপবেদরূপে 'ধনুর্ব্বেদ' নামক এক খানি সমর শাস্ত্রও তাঁহাদের অধিকার ভুক্ত ছিল জানিতে পারা যায়। প্রতীচ্য মনীষীগণও তাহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিঃ উইলসনের "On the art of war as known to the Hindus;" এবং সার হেনরী ইলিয়টের "On the early use of Gunpowder in India," ইত্যাদি প্রবন্ধাবলী হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শুক্রনীতি, বৈশম্পায়ন নীতি, অগ্নিপুরাণ ও কামন্দক আদি প্রাচীন শাস্ত্র সকলের মধ্যেও আর্য্য সংগ্রামনীতির যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

এই সকল প্রাচীন-গ্রন্থ মূল ধনুর্ব্বেদেরই শাখা প্রশাখা মাত্র। কালের করাল কবলে ও যবনের বিজাতীয় অত্যাচারে তাহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান পাইবারও উপায় দেখি না। মূল ধনুর্ব্বেদের অনুসন্ধানে অনেকেই অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। তবে সেই মূলের অনুসন্ধানে তাহার যে কয়েকটী শাখা পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শিব ও বিরিঞ্চি সর্ব্বপ্রথম দুইখানি মূল ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচার করেন। অনন্তর বিশ্বামিত্রমুনি ও বেদের সংকলন কার বেদব্যাস তাহারই সংক্ষিপ্ত সার সংকলন করিয়া ধনুর্ব্বেদ রক্ষা করিয়া গিয়াছেলেন। কিন্তু সে গ্রন্থেরও অস্তিত্ব নাই। তাহারই আভাষ মাত্র অবলম্বন করিয়া নানা ঋষি নানা শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া যান। মহর্ষি উশনাকৃত নীতিসার, বৈশম্পায়নের নীতি প্রকাশিকা বা ধনুর্ব্বেদ, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৃদ্ধশার্ঙ্গধর, বীরচিন্তামণি, লঘুবীরচিন্তামণি, কামন্দকীয় নীতিময়ুখ, যুদ্ধজয়ার্ণব ও অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম বেণপুত্র পৃথিবীর আদি রাজা পৃথুকে ধনুর্ব্বেদ সহ খড়্গাস্ত্র প্রদান করেন, পরে ধনুক প্রভৃতি অন্যান্য আয়ুধ তাঁহাকে প্রদান করিয়া ছিলেন ঃ ব্রহ্মা, মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, প্রচেতা, মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, ভরদ্বাজ, বেদব্যাস গৌরশিরা ও অন্যান্য কতিপয় মুনি ঋষি রাজ-শাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদের যে আদি বক্তা বা উপদেষ্টা তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত সংগ্রহগুলি হইতেই জানিতে পারা গিয়াছে। এই সকল দেবতা ও ঋষি প্রোক্ত গ্রন্থের

মধ্যে শুক্রনীতি একখানি প্রাচীন, প্রামাণ্য ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার কিয়দংশ অবলোকন করিয়াছিলেন তাহার পর বাবু রামদাস সেন (Indian Antiquary) নামক গ্রন্থে তাহার কিছু কিছু প্রকাশ করেন, অনন্তর যোধপুরাধিপতির সহায়তায় উক্ত সম্পূর্ণ গ্রন্থ খানি বোম্বাই হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উশনার নীতিশাস্ত্র বা গ্রন্থ অসুর গুরু শুক্রাচার্য্যের লিখিত। ইহা মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত, কারণ মহাভারতের শত শত স্থানে ইহার শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে। ইহার পর মাদ্রাজ হইতে পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ গস্তব ওপের (Dr. Gustav Oppert) বৈশম্পায়ন নীতি প্রকাশিকা সংগ্রহ করিয়া "On the Weapons, Army Organization, and Palitical Maxims of the ancient Hindus." নামক এক উপাদেয় প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা প্রকাশ করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাদি হইতে নিম্ন লিখিত অস্ত্র শস্ত্রের নাম অবগত হওয়া যায়।

ধনু, ইষু, ভিন্দিপাল, ভিণ্ডিবাল বা ভিন্দিবাল, শক্তি, দ্রঘণ, তোমর, নলিকা, নাল বা নালিক, লগুড়, পাশ, চক্র, দণ্ডকণ্টক, ভুষুণ্ডী, পরশু, গোশীর্ষ, অসি, কুন্ত, লবিত্র, স্থূণ, প্রাস, পিণাক, গদা, মুদ্গর, সীর, মুসল, পট্টিশ, পরিঘ, ময়ূখী, শতঘ্নী, দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণপাশ, বায়ু অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শির, বিদ্যা, অবিদ্যা, গান্ধর্ব্ব, নন্দন, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্বাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন, নাগাস্ত্র, গড়ুরাস্ত্র, নারাচ ও জৃম্ভণ আদি অস্ত্রগুলির অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের গঠনাদির পরিচয় সবিশেষ জানিতে পারা যায় নাই। তবে পূর্ব্বোদ্ধৃত গ্রন্থনিচয়ের বর্ণনা ও প্রাচীন ভাস্কর-খোদিত আদর্শ হইতে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহা পরে যথাসম্ভব প্রকাশ করিব।

এক্ষণে য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কি ভাবে জগতের প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্রের উন্নতির ইতিহাসে তাহার শ্রেণীবিভাগ বা যুগনির্ণয় করিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। তাঁহারা সেই প্রাচীন কাল চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের যেন একটী সাধারণ বিধি, তাঁহারা সকলেই এই বিভাগ চতুষ্টয় অনুমোদন করেন। আমরাও যে একেবারে অনুমোদন করি না তাহা নহে, বস্তুতঃ সহসা দেখিয়া তাঁহাদের সুতীব্র বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিতেই ইচ্ছা হয়। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম প্রস্তর যুগ (the age of stone), দ্বিতীয় ব্রোঞ্জযুগ (Age of bronze) তৃতীয় লৌহযুগ (the age of Iron) এবং চতুর্থ মধ্য যুগ (the middle age) বলিয়াছেন, এইরূপ বিভাগ সাধারণ সংগ্রহ মন্দিরে বা মিউজিয়মে প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্র সাজাইবার পক্ষে প্রকৃতই অতি সুন্দর ব্যবস্থা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনাদিকাল সভ্য বলিলে যে জাতির পক্ষে অতিশয় উক্তি বলিয়া বোধ হয় না, তাহাদের পক্ষে আপামর সাধারণ সেই একই বিধি প্রয়োগ করিলে নিতান্ত অবিচার বা উৎকট গুরুনিন্দা বলিয়া মনে হয় না কি? বিশেষ প্রস্তর যুগকে প্রথম বলিলে সতত এমনও মনে হয় যে, যে দেশে বা পৃথিবীর যে অংশে পাহাড় পর্ব্বত নাই, সেই প্রদেশবাসী আদিম জাতি প্রথমে প্রস্তরাস্ত্র কোথা হইতে পাইয়াছিল? যখন অরণ্যবাসী সেই

পশুবৎ কোনও জাতি বন হইতে বনান্তরে আহারান্বেষণে বিচরণ করিত, মাত্র বন্য ফল মূল ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জীব জন্তু বধ করিয়া তাহার আমমাংস ভোজন করিত, তখন তাহারা আত্মরক্ষার্থে কেবল মাত্র বৃক্ষশাখা বা বংশ যষ্টি ব্যতীত আর কোন্ অস্ত্র অবলম্বন করিতে সমর্থ হইত বা আর কোন্ অস্ত্র তাহাদের সহজলভ্য ছিল? সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণ পক্ষেই দণ্ড বা লগুড় অস্ত্র সর্ব্ব আদিম বলিতে হয়। আর ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত, কারণ সংগ্রহকারগণ বা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ যে ভাবে প্রাচীন যুগের দণ্ড অস্ত্র পাইবার আশা করেন তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। দণ্ড অস্ত্র প্রস্তর বা কোন ধাতু অস্ত্রের ন্যায় স্থায়ী নহে, অল্প কালের মধ্যেই তাহা জীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং সংগ্রহ-মন্দিরের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইতিহাসে দণ্ড অস্ত্রকেই প্রথম বলিয়া, অস্ত্র ইতিহাসের প্রথম যুগকে 'কাষ্ঠ যুগ' বলাই অধিকতর সঙ্গত, এবং দ্বিতীয় যুগ, বোধ হয় অনেক স্থলে মৃত জীব জন্তুর শৃঙ্গ অস্থি বা কঙ্কালাস্ত্র অবলম্বনে 'অস্থি যুগ' বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কারণ বহু অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও তাহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে এবং পূর্ব্বেও যে ছিল তাহারও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সে যাহা হউক এ সকল বিচারে আমাদের বিশেষ উপকার নাই। তবে গাছ পাথর লইয়া যুদ্ধ করা যে আমাদের ইতিহাসে একেবারেই নাই, তাহা নহে। রামায়ণ মহাভারতেও তাহার উল্লেখ আছে। তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সে আর্য্যদিগের আদিম বা অসভ্য ইতিহাসের কথা নহে, তাহা আর্য্যদিগের সমুন্নত সময়ে বিবিধ যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে কতিপয় অনন্য-সাধারণ ভীমকর্ম্মা মহাবীরের নিজস্ব বিধি ছিল। তাঁহারা সামান্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রাহ্যই করিতেন না, সম্মুখে গাছ পাথর যাহা পাইতেন তাহা দ্বারাই শত্রু-বিজয় করিতেন। সুতরাং তাহা হইতে রামায়ণ বা মহাভারতের সময়কে য়ুরোপীয় বিধি অনুসারে যাহারা প্রস্তর যুগ বলিতে সাহস করেন, তাহাদের বুদ্ধির পরিমাণ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে অস্ত্র শস্ত্রের শ্রেণী বিভাগ যেমনই হউক না কেন। আমাদের শাস্ত্রানুসারে উহা দ্বিবিধ;—প্রথম শস্ত্র Non Missiles, দ্বতীয় অস্ত্র Missiles; তীর সড়কী আদি যাহা নিক্ষেপ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, তাহারই নাম অস্ত্র এবং খড়্গাদির ন্যায় আয়ুধ যাহা হস্তে ধারণ করিয়াই প্রয়োগ করিতে হয়; তাহার নাম শস্ত্র।

"তত্র শস্ত্রাস্ত্রসম্পত্ত্যা দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।
ঋজুমায়াবিভেদেন ভূয়ো দ্বিবিধমুচ্যতে॥"

শস্ত্র এবং অস্ত্র ভেদে যেমন আয়ুধ দ্বিবিধ শ্রেণীর, যুদ্ধও ঋজু এবং মায়া ভেদে তেমনই দুই প্রকার। ঋজু অর্থাৎ সরল বা সম্মুখ যুদ্ধ এবং মায়া আর্থাৎ অলক্ষে বা কপট যুদ্ধ।

অগ্নিপুরাণকার আবার এই যুদ্ধাস্ত্রের দুইটী মূল বিভাগকে পাঁচটী অনুবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথাঃ—

"যন্ত্রমুক্তং পাণিমুক্তং মুক্তসন্ধারিতং তথা।
অমুক্তং বাহুযুদ্ধঞ্চ পঞ্চধা তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
ক্ষেপণী চাপযন্ত্রৈর্যন্ত্রমুক্তং প্রকীর্ত্তিতং।
শিলাতোমরযন্ত্রাদ্যং পাণিমুক্তং প্রকীর্ত্তিতম্॥
মুক্তসন্ধারিতং জ্ঞেয়ং প্রাসাদ্যমপি যদ্ভবেৎ।
খড়্গাদিকমমুক্তঞ্চ নিযুক্তং বিগতায়ুধম্॥

১। যন্ত্রমুক্ত অর্থাৎ যাহা ক্ষেপণী বা চাপযন্ত্র দ্বারা প্রয়োগ করা যায়, ২। শিলা এবং তোমরাদি নিক্ষেপের নাম পাণিমুক্ত ; ৩। যাহা প্রয়োগ করিয়া প্রতিসংহার করা যায়, তাহার নাম মুক্তসন্ধারিত ; খড়্গাদি অস্ত্র প্রয়োগকে অমুক্ত বলে এবং বাহু আয়ুধ দ্বারা যুদ্ধ করাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বলে।

আবার অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য আয়ুধসমূহের প্রধান দুইটী বিভাগ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥

অর্থাৎ নালিক এবং মান্ত্রিক ভেদে যুদ্ধাস্ত্র দুই প্রকার। যে সকল অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহারই নাম মান্ত্রিক। এই মান্ত্রিকাস্ত্র না থাকিলেই নালিকাস্ত্র প্রয়োগ করিবে।

আর্য্যশাস্ত্রকার ও রণনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধনুককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলিয়া গণনা করিয়াছেন এবং ধনুস্ শব্দকে সমস্ত আয়ুধের সাধারণ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই কারণে তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধীয় শাস্ত্র সাধারণ ধনুর্ব্বেদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত সর্ব্ববিধ আয়ুধই ইহার অন্তর্গত। যুদ্ধ সম্বন্ধেও ধনুর্যুদ্ধ তাঁহাদের মতে শ্রেষ্ঠ, অসিযুদ্ধ মধ্যম এবং বাহুযুদ্ধ অধম বলিয়া বিবেচিত হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহার নীতি-প্রকাশিকা বা ধনুর্ব্বেদে বলিয়াছেন, "পৃথিবীর প্রথম অধিপতি পৃথুরাজ খড়্গাস্ত্রের প্রথম প্রচারক, অনন্তর তিনিই ব্রহ্মার অনুগ্রহে ধনুরাদি অন্যান্য আয়ুধ সমূহের প্রচারক হইয়াছিলেন। সেই আদি যুগ হইতে ভারতে ধনুরস্ত্রের যথেষ্ট প্রচার ও প্রশংসা ছিল। মহাবীর ও নরপতিদিগের মধ্যে যিনি ধনুরায়ুধ পরিচালনে অসাধারণ শক্তি ও কৌশল প্রদর্শন করাইতে পারিতেন, তিনি সর্ব্বসাধারণ্যে ধনুর্দ্ধর বা ধনুর্দ্ধার বলিয়া সম্মানিত হইতেন। এ সম্মান সকল বীরের ভাগ্যে হয় নাই, এ সম্মান কেবলমাত্র রাম, রাবণ, অর্জ্জুন, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত দৈবশক্তিসম্পন্ন মহারথগণেরই অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। রঘুকুল-ধুরন্ধর মহাধন্বা শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া এবং কুরুক্ষেত্র-বিজয়ী ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধনঞ্জয় লক্ষ্যভেদ করিয়া ভারতে যে অত্যুজ্জ্বল বীরকীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ কাল পর্য্যন্ত কেহই হীনপ্রভ করিতে পারে নাই। সে যাহা হউক ইহাঁরা বা পুরাকালের বীরমণ্ডলী যে কেবলমাত্র এক ধনুকই ব্যবহার করিতেন তাহা নহে। তাঁহারা আবশ্যক হইলে সকল অস্ত্রই ব্যবহার করিতেন, তবে তাঁহারা অন্যায়, কপট বা মায়াযুদ্ধ আদৌ অনুমোদন করিতেন না, তাহা কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া তাঁহারা আন্তরিক ঘৃণা করিতেন।

ঋজু, সরল বা সম্মুখ যুদ্ধই বীরোচিত বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল ; তাহাতেই যথার্থ বীরের পরীক্ষা হইত, এইরূপ সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহারা দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেও আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় যে কোন প্রকারে শত্রুবিজয় করাকে সে যুগে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই কারণে নালিকাদি প্রবল বা কঠোর অস্ত্র সহসা কেহ ব্যবহার করিতেন না। এই সকল বিষয় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

আমরা অধুনা কোল, ভীল ও অতি অসভ্য জাতির

নিকট যেরূপ ধনুর আদর্শ দেখিতে পাই, তাহাতে প্রাচীন সময়ের উন্নত ধনুর ঠিক অনুভবই হয় না। প্রথমতঃ ধনুকের জাতি বা উপাদান বিষয়ে অযুধ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তিন প্রকার, যথা—শার্ঙ্গ, বাংশ এবং ধাতব। মহিষ, শরভ এবং রোহিষের শৃঙ্গ-বিকারজাত (কাচকড়া) উপাদান সহযোগে যে ধনু নির্ম্মিত হইত, তাহাই শার্ঙ্গ ধনু বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বাঁশ হইতে যে সকল ধনু প্রস্তুত করা যাইত তাহার নাম বাংশ ধনু এবং লৌহাদি ধাতু দ্বারা যে ধনু নির্ম্মিত হইত, তাহাকে ধাতব ধনু কহিত। শার্ঙ্গ ধনু সুন্দরী রমণীর ভ্রূযুগলের ন্যায় সুন্দর সুবঙ্কিম ভাবে নির্ম্মিত হইত। তাহাতে সুবর্ণ সহযোগে মণিরত্নাদিও খচিত হইত। এই শার্ঙ্গ ধনু বিষ্ণুর অতি প্রিয় বস্তু বলিয়া ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে। শার্ঙ্গ ধনুকে ত্রিনত বা তিন স্থানে বাঁকাইবার বিধি আছে কিন্তু বৈণক বা বাংশ ধনু সর্ব্বনমিত বা সর্ব্বস্থানে ক্রম নত বা বৃত্তাভাষরূপে বাঁকান হইত। ধাতব ধনু সাধারণতঃ কৃষ্ণলৌহ বা ইস্পাত সহযোগে গঠিত হইত। শাস্ত্রান্তরে সুবর্ণ, রজত ও তাম্র নির্ম্মিত ধনুকেরও উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভাস্কর্য্যের মধ্যে প্রায় সকল দেবদেবীর হস্তেই পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিনত ধনু

দেখিতে পাওয়া যায়। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে সারনাথের মৃদ্গর্ভ হইতে বৌদ্ধ যুগেরও পূর্ব্বে খোদিত একটী বারাহী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার হস্তে এই চিত্রের অনুরূপ ধনু খোদিত আছে।

ইহাদের পরিমাণসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চতুর্হস্তপরিমিত ধনু উত্তম, সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত মধ্যম এবং ত্রিহস্তপরিমিত অধম ধনু বলিয়া খ্যাত। অশ্ব ও গজারোহিগণ দীর্ঘধনু ব্যবহার করিতেন।

বাংশ ধনু সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অপক্ক বাঁশের ধনু সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, অতিপক্ক বাঁশও ভাল নয়, তাহার ধনু অত্যন্ত কর্কশ হয়, সুতরাং মাঝারি ধরণের বাঁশই উৎকৃষ্ট। যে বাঁশ শরৎকালে জন্মে, তাহা দুই বৎসর মধ্যে মাঝারি রকম পাকিয়া আসিলে শরৎকালেই কাটিয়া লওয়া আবশ্যক ; অর্থাৎ যাহাতে উহা উত্তম রঙ্‌দার ও স্থিতিস্থাপক হয় তাহাই দেখিতে হইবে। ধনুর্ব্বেদে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ লিখিত আছে, সে সকলের উল্লেখ করিতে হইলে স্বতন্ত্র আর এক খানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং এস্থলে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। তবে আজ কাল বাঁখারি হইতে প্রস্তুত যেমন সাধারণ ধনু দেখা যায়, সে কালে তাহাতো ছিলই তদ্ব্যতীত অখণ্ড বাঁশেরও ধনু প্রস্তুত হইত। আজ কালকার কোন বলবান্ ব্যক্তিও তাহার জ্যা আকর্ষণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। সেই অখণ্ড নিরেট বাঁশের ধনুক সে কালে অতি সাধারণ ভাবেই ব্যবহৃত হইত। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার লোক কত বড় বলিষ্ঠ ছিলেন! এখন সেই বাঁশের এক তৃতীয়াংশমাত্র বাঁখারির ধনুক—তাহাও অনেকে নোয়াইতে পারে না।

ধনুর ছিলা বা গুণরজ্জু সম্বন্ধেও নানা ব্যবস্থা আছে, —পাট, শণ, রেসম, চর্ম্ম, কেশ বাঁশের ত্বক বা চাঁচাড়ী, মুর্ব্বা আদির সূত্রদ্বারা তাহা প্রস্তুত হইত।

ধনুকের তীরের জন্য শর ব্যবহার হইত, এই শর সর্ব্বদেশেই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ইহাকে সরই বলে। ইহা অধিক স্থূল বা অত্যন্ত সরু হইবে না, সুপক্ক গ্রন্থি বিহীন দুই হস্ত পরিমাণ সরল উত্তম উত্তম শর তীরের জন্য আহরণ করিতে হয়। যে শরের অগ্রভাগ স্থূল বা আগার দিক মোটা তাহাকে স্ত্রীজাতীয় শর বলে, উহা অধিকতর দূরগামী, যে শরের গোড়ার দিক মোটা তাহাকে পুরুষ জাতীয় শর বলে, তাহাই দূরের বস্তু ভেদ করিবার পক্ষে উপযোগী, যেগুলির আগাগোড়া সমান তাহাকে নপুংসক শর বলে, তাহা লক্ষ্য-সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সকল শরের সরল গতির জন্য তাহার মূলে পক্ষ যোজনা করিতে হয়। কাক, হংস, বক ও ময়ূর আদি পক্ষীর পালক সমান্তর ভাবে শরের গোড়ায় তন্তুদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিতে হয়। সাধারণ ধনুকে ব্যবহারের জন্য ছয় আঙ্গুল পরিমাণ পালক এবং শার্ঙ্গ ধনুর জন্য দশ আঙ্গুল পরিমাণ পালক বাঁধিয়া দেওয়া বিধেয়। শরগুলি এইরূপে প্রস্তুত হইবার পর উহার উপরে ফলক বা তীরের ফলা পরাইতে হইবে।

ফলা—শৃঙ্গ, লৌহ ও প্রস্তরাদিদ্বারা প্রস্তুত হইত। ঋগ্‌বেদে হরিণের শৃঙ্গ নির্ম্মিত ফলকের উল্লেখ আছে, এবং তাহার মুখে বিষসংযুক্ত করিবার বিধান আছে। উক্ত বেদের আর এক স্থানে বিষসংযুক্ত লৌহ ফলকযুক্ত তীরেরও উল্লেখ আছে। ধনুর্ব্বেদের মধ্যে তীরের ফলকে পায়ন বা পান দিবার বিধি আছে, তাহা খড়্গাস্ত্র অংশেই লিখিত হইবে। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্যমধ্যে কয়েকটী তীর ধনুকের আদর্শ দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে তীর বা ধনুকের উপাদান বিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ হয় না। সারনাথের মধ্যে রামচন্দ্রের মূর্ত্তিতেও ত্রিগত ধনুর আদর্শ আছে—বোধ হয় সেটী শার্ঙ্গ ধনু হইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

তন্ত্র কি ?

(১০৭ পৃষ্ঠার পর)

এখন এই 'ভাব' জিনিসটী যে কি তাহা ঠিক বুঝাইয়া বলা বাস্তবিক অসম্ভব, কারণ যে ব্যক্তি কখনও কোন পুষ্করিণী বা নদীতে অবগাহন করে নাই, চিরদিন কুপ হইতেই জল উত্তোলন করিয়া নিত্যকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে যেমন সন্তরণ প্রণালী বুঝাইয়া বলা অসম্ভব, অথবা জলে না নামাইয়া কোন ব্যক্তিকে সন্তরণে শিক্ষিত করা আকাশকুসুমের ন্যায় যেমন নিষ্ফল প্রয়াস, সাধনতত্ত্বের বিশেষ ভাবতত্ত্বের মর্ম্ম ভাষায় ব্যক্ত করাও সেইরূপ মানবের সাধ্যাতীত। ভাবের তত্ত্ব ভাবুকের হৃদয়েই অনুভূত হইয়া থাকে, অন্যের তাহা বলিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। স্বয়ং ভগবান ভবানীপতিও ভাবতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া আত্মভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তাই তিনিও সেই ভাবোন্মত্ত অবস্থায় বলিয়াছেন "ভাবের স্বরূপ বাক্য দ্বারা প্রকাশ অসম্ভব।" তবে স্থূল কথায় এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভাব অর্থে তন্ময়তা। সাংসারিক-ভাব হইতে তাহার কিয়ৎপরিমাণ আভাষ

বোধ হয় অনুভব করিতে পারা যায়। সাংসারিক-জীব, স্ত্রী পুত্রাদির মায়ামোহে প্রেমভাবে বিভোর, সেই প্রেম যখন প্রেমিককে অধীর ও উন্মত্ত করিয়া তুলে, তখন আর তাহার সাধারণ সংসারজ্ঞান থাকে না, তাহার প্রেমের বিষয়ীভূত বস্তুর তৃপ্তি-সাধনজন্যই যেন জীবন যাপন, আর তাহাতেই তাহার তৃপ্তিলাভ। ইহাই সাংসারিকের তন্ময়তা। সেই প্রেম-পাত্রের অভাব বা বিচ্ছেদ হইলেই সংসার যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সমগ্র জগৎ মরুভূমি হইয়া যায়, প্রেমপাত্র যে পথে, নিজেকেও সেই পথে লইয়া যাইতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; ইহাই সংসারে তন্ময়তা, ইহাই সংসারের প্রকৃত ভাব। আবার সেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যার বা ভালবাসা, স্নেহ অথবা ভক্তি-পাত্রের কোন স্মৃতি যদি সংসারপ্রেমিকের সম্মুখে সহসা উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পুনরায় উন্মাদ হইয়া যায়, হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, ইহাকেই বলে সংসারের ভাব। এই ভাবে যিনি যত বিভোর, তিনি ততই ইহাতে তন্ময়। সাধনা রাজ্যেও ভাব বা তন্ময়তা লাভেও ঠিক এইরূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কোন শক্তি হইতে কোন বস্তু সংক্রামিত বা তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে যেমন সেই শক্তিতে তন্ময় করিতে হয় বা তাহার প্রকৃত ভাবে ডুবাইয়া দিতে হয়, ভগবৎ শক্তির বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করিতে হইলে সেইরূপ তাঁহাতে তন্ময় হইতে হইবে, তাঁহার শক্তি আত্মতন্ত্রে সংক্রামিত করিতে হইবে। তাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন, তিনি তাঁহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সত্তাসাগরে আমার আত্ম-অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দেওয়াই আমার তন্ময়ত্ব। এই তন্ময়তা বা ভাব-উন্মাদিতা তাই সাধকের ভাবসিদ্ধি বলিয়া কথিত। সাধক সাধনাপথে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে সকলই এই ভাবসিদ্ধির জন্য। সেই কারণ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ভগবান বলিয়াছেন :—

"দেব এব যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।
ন্যাসংবিনা জপং প্রাহুরাসুরং বিফলং শিবে॥
ন্যাসাত্তদাত্মকোভূত্বা দেবো ভূত্বাতু তং যজেৎ।
প্রাণায়ামৈ স্তথা ধ্যানৈর্ন্যাসৈর্দেবশরীরতা॥"

দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিবে, স্বয়ং দেবতা না হইয়া কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে নাই। হে জগৎকল্যাণি শিবে! মন্ত্রন্যাস ব্যতীত জপানুষ্ঠান আসুর বা অদৈব অর্থাৎ তাহার সকলকর্ম্ম বিফল প্রদায়ক হইবে। সুতরাং পূর্ব্বকথিত ন্যাসাদি দ্বারাই তন্ময় বা অভীষ্ট দেবতাত্মক হইয়া অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে। পূজাঙ্গীভূত পূর্ব্বোক্ত ন্যাস, প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বারা সাধকের দেব-শরীরত্ব লাভ হইয়া থাকে। যখন সাধক সাধনা বলে এইরূপ তন্ময় হইতে সমর্থ হন, তখন তিনি তাঁহার ভাবরাজ্যে কোন অভাবই অনুভব করেন না। তখন সংসারের যে দিকে যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেই তাঁহার ধ্যেয় দেবতার পূর্ণ বিকাশ পরিদর্শন করেন। তখন তাঁহার দিব্যদৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া জলে স্থলে অনলে অনিলে মহামায়ার অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তত্ত্ব দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ করেন, আর সেই বিশ্বপ্রকৃতিমধ্যেই বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বপ্রকৃতির লীলা-রহস্য দেখিতে দেখিতে সাধক প্রকৃতিময় বা আত্মহারা হইয়া যান।

সাধকের এই দেবতাময় হইবার জন্য ন্যাসাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, বাহ্য ভাবে সেই

ধনুকের তীরের জন্য শর ব্যবহার হইত, এই শর সর্ব্বদেশেই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ইহাকে সরই বলে। ইহা অধিক স্থূল বা অত্যন্ত সরু হইবে না, সুপক্ক গ্রন্থি বিহীন দুই হস্ত পরিমাণ সরল উত্তম উত্তম শর তীরের জন্য আহরণ করিতে হয়। যে শরের অগ্রভাগ স্থূল বা আগার দিক মোটা তাহাকে স্ত্রীজাতীয় শর বলে, উহা অধিকতর দূরগামী, যে শরের গোড়ার দিক মোটা তাহাকে পুরুষ জাতীয় শর বলে, তাহাই দূরের বস্তু ভেদ করিবার পক্ষে উপযোগী, যেগুলির আগাগোড়া সমান তাহাকে নপুংসক শর বলে, তাহা লক্ষ্য-সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সকল শরের সরল গতির জন্য তাহার মূলে পক্ষ যোজনা করিতে হয়। কাক, হংস, বক ও ময়ূর আদি পক্ষীর পালক সমান্তর ভাবে শরের গোড়ায় তন্তুদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিতে হয়। সাধারণ ধনুকে ব্যবহারের জন্য ছয় আঙ্গুল পরিমাণ পালক এবং শার্ঙ্গ ধনুর জন্য দশ আঙ্গুল পরিমাণ পালক বাঁধিয়া দেওয়া বিধেয়। শরগুলি এইরূপে প্রস্তুত হইবার পর উহার উপরে ফলক বা তীরের ফলা পরাইতে হইবে।

ফলা—শৃঙ্গ, লৌহ ও প্রস্তরাদিদ্বারা প্রস্তুত হইত। ঋগ্‌বেদে হরিণের শৃঙ্গ নির্ম্মিত ফলকের উল্লেখ আছে, এবং তাহার মুখে বিষসংযুক্ত করিবার বিধান আছে। উক্ত বেদের আর এক স্থানে বিষসংযুক্ত লৌহ ফলকযুক্ত তীরেরও উল্লেখ আছে। ধনুর্ব্বেদের মধ্যে তীরের ফলকে পায়ন বা পান দিবার বিধি আছে, তাহা খড়্গাস্ত্র অংশেই লিখিত হইবে। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্যমধ্যে কয়েকটী তীর ধনুকের আদর্শ দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে তীর বা ধনুকের উপাদান বিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ হয় না। সারনাথের মধ্যে রামচন্দ্রের মূর্ত্তিতেও ত্রিগত ধনুর আদর্শ আছে—বোধ হয় সেটী শার্ঙ্গ ধনু হইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

তন্ত্র কি ?

(১০৭ পৃষ্ঠার পর)

এখন এই 'ভাব' জিনিসটী যে কি তাহা ঠিক বুঝাইয়া বলা বাস্তবিক অসম্ভব, কারণ যে ব্যক্তি কখনও কোন পুষ্করিণী বা নদীতে অবগাহন করে নাই, চিরদিন কূপ হইতেই জল উত্তোলন করিয়া নিত্যকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে যেমন সন্তরণ প্রণালী বুঝাইয়া বলা অসম্ভব, অথবা জলে না নামাইয়া কোন ব্যক্তিকে সন্তরণে শিক্ষিত করা আকাশকুসুমের ন্যায় যেমন নিষ্ফল প্রয়াস, সাধনতত্ত্বের বিশেষ ভাবতত্ত্বের মর্ম্ম ভাষায় ব্যক্ত করাও সেইরূপ মানবের সাধ্যাতীত। ভাবের তত্ত্ব ভাবুকের হৃদয়েই অনুভূত হইয়া থাকে, অন্যের তাহা বলিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। স্বয়ং ভগবান ভবানীপতিও ভাবতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া আত্মভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তাই তিনিও সেই ভাবোন্মত্ত অবস্থায় বলিয়াছেন "ভাবের স্বরূপ বাক্য দ্বারা প্রকাশ অসম্ভব।" তবে স্থূল কথায় এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভাব অর্থে তন্ময়তা। সাংসারিক-ভাব হইতে তাহার কিয়ৎপরিমাণ আভাষ

বোধ হয় অনুভব করিতে পারা যায়। সাংসারিক-জীব, স্ত্রী পুত্রাদির মায়ামোহে প্রেমভাবে বিভোর, সেই প্রেম যখন প্রেমিককে অধীর ও উন্মত্ত করিয়া তুলে, তখন আর তাহার সাধারণ সংসারজ্ঞান থাকে না, তাহার প্রেমের বিষয়ীভূত বস্তুর তৃপ্তি-সাধন-জন্যই যেন জীবন যাপন, আর তাহাতেই তাহার তৃপ্তিলাভ। ইহাই সাংসারিকের তন্ময়তা। সেই প্রেম পাত্রের অভাব বা বিচ্ছেদ হইলেই সংসার যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সমগ্র জগৎ মরুভূমি হইয়া যায়, প্রেমপাত্র যে পথে, নিজেকেও সেই পথে লইয়া যাইতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; ইহাই সংসারে তন্ময়তা, ইহাই সংসারের প্রকৃত ভাব। আবার সেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যার বা ভালবাসা, স্নেহ অথবা ভক্তি-পাত্রের কোন স্মৃতি যদি সংসারপ্রেমিকের সম্মুখে সহসা উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পুনরায় উন্মাদ হইয়া যায়, হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, ইহাকেই বলে সংসারের ভাব। এই ভাবে যিনি যত বিভোর, তিনি ততই ইহাতে তন্ময়। সাধনা রাজ্যেও ভাব বা তন্ময়তা লাভেও ঠিক এইরূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কোন শক্তি হইতে কোন বস্তু সংক্রামিত বা তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে যেমন সেই শক্তিতে তন্ময় করিতে হয় বা তাহার প্রকৃত ভাবে ডুবাইয়া দিতে হয়, ভগবৎ শক্তির বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করিতে হইলে সেইরূপ তাঁহাতে তন্ময় হইতে হইবে, তাঁহার শক্তি আত্মতত্ত্বে সংক্রামিত করিতে হইবে। তাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন, তিনি তাঁহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সত্তাসাগরে আমার আত্ম-অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দেওয়াই আমার তন্ময়ত্ব। এই তন্ময়তা বা ভাব-উন্মাদিতা তাই সাধকের ভাবসিদ্ধি বলিয়া কথিত। সাধক সাধনাপথে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে সকলই এই ভাবসিদ্ধির জন্য। সেই কারণ গন্ধর্ব্ব-তন্ত্রে ভগবান বলিয়াছেন :—

"দেব এব যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।
ন্যাসংবিনা জপং প্রাহুরাসুরং বিফলং শিবে॥
ন্যাসাত্তদাত্মকোভূত্বা দেবো ভূত্বাতু তং যজেৎ।
প্রাণায়ামৈ স্তথা ধ্যানৈর্ন্যাসৈর্দেবশরীরতা॥"

দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিবে, স্বয়ং দেবতা না হইয়া কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে নাই। হে জগৎকল্যাণি শিবে! মন্ত্রন্যাস ব্যতীত জপানুষ্ঠান আসুর বা অদৈব অর্থাৎ তাহার সকলকর্ম্ম বিফল প্রদায়ক হইবে। সুতরাং পূর্ব্বকথিত ন্যাসাদি দ্বারাই তন্ময় বা অভীষ্ট দেবতাত্মক হইয়া অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে। পূজাঙ্গীভূত পূর্ব্বোক্ত ন্যাস, প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বারা সাধকের দেব-শরীরত্ব লাভ হইয়া থাকে। যখন সাধক সাধনা বলে এইরূপ তন্ময় হইতে সমর্থ হন, তখন তিনি তাঁহার ভাবরাজ্যে কোন অভাবই অনুভব করেন না। তখন সংসারের যে দিকে যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেই তাঁহার ধ্যেয় দেবতার পূর্ণ বিকাশ পরিদর্শন করেন। তখন তাঁহার দিব্যদৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া জলে স্থলে অনলে অনিলে মহামায়ার অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তত্ত্ব দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ করেন, আর সেই বিশ্বপ্রকৃতিমধ্যেই বিশ্ব-প্রসবিনী বিশ্বপ্রকৃতির লীলা-রহস্য দেখিতে দেখিতে সাধক প্রকৃতিময় বা আত্মহারা হইয়া যান।

সাধকের এই দেবতাময় হইবার জন্য ন্যাসাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, বাহ্য ভাবে সেই

ভাব-তন্ময়তা সিদ্ধির জন্যও বাহ্য দেহে সেইরূপ নিজ অভীষ্ট দেবের অনুরূপ নানা চিহ্ন ধারণ করিতে শাস্ত্রোপদেশ আছে। অর্থাৎ শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত, ও গাণপত্য ভেদে পঞ্চ উপাসকের পঞ্চবিধ তিলক ও পরিচ্ছদাদির বিহিত বিধান আছে।

যিনি যখন যে দেবতার অর্চ্চনা করিবেন বা যে দেবতার উপাসক হইবেন, তাঁহাকে সে অবস্থায় সেই দেবতাময় হইতে হইবে। স্বয়ং বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণু পূজা করিবে না, তাহা হইলে সে পূজায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না। যদ্যপি বিষ্ণু হইয়া বা বিষ্ণুময় হইয়া বিষ্ণু পূজা কর, তাহা হইলেই এক দিন সাধক মহা-বিষ্ণুরূপে পরিণত হইতে পারিবেন। বাশিষ্ঠ-রামায়ণে তাই বর্ণিত আছে :—

"অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ্ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং মহাবিষ্ণু রিতিস্মৃতঃ॥"

'ভারতে'ও তাই বলিয়াছেন :—

"নাবিষ্ণুঃ কীর্ত্তয়েদ্ বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।
নাবিষ্ণুঃ সংস্মরেদ্বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুমাপ্নুয়াৎ॥"

'ভবিষ্যে' বলিয়াছেন—

রুদ্র না হইয়া রুদ্র পূজা করিবে না :—

নারুদ্রঃ সংস্মরেদ্রুদ্রং নারুদ্রোরুদ্রমর্চ্চয়েৎ।
নারুদ্রঃ কীর্ত্তয়েদ্রুদ্রং নারুদ্রোরুদ্রমাপ্নুয়াৎ॥"

'আগ্নেয়ে' বলিয়াছেন—

"রুদ্রস্তু পূজনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃস্যাদ্বিষ্ণুপূজনাৎ।
সূর্য্যঃস্যাৎ সূর্য্যপূজনাৎ শক্তাদিঃ শক্তি পূজনাৎ॥"

রুদ্রের পূজা করিলে সাধক রুদ্র হইবেন, বিষ্ণুর পূজায় সাধক বিষ্ণু, সূর্য্যের পূজায় সূর্য্য, শক্তির পূজায় শক্তি এবং গণেশের পূজা করিয়া সাধক গণপতি হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে সেই কারণ সাধকের বাহ্য শরীর হইতেই উপাস্য দেবতাময় হইবার জন্য দেবচিহ্ন ধারণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ শিব-পূজায় ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিশূল, বিভূতি, জটাজুট, রুদ্রাক্ষ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ডমরু, নরকপাল ইত্যাদি, বিষ্ণুপূজায়, ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র, পীত বা শুক্লাম্বর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি চিহ্ন, তুলসীমালা গোপীচন্দন ইত্যাদি—সূর্য্য পূজায়, রক্তবর্ণ মণ্ডলাকার তিলক, রক্তবস্ত্র, পদ্মবীজমালা ইত্যাদি, গণপতি পূজায় পীত বা রক্ত বস্ত্র, রক্ত ত্রিপুণ্ড্র, সর্পসূত্র, যোগদণ্ড প্রভৃতি, শক্তি পূজায়, সিন্দূর কুঙ্কুম-রক্তচন্দনাদিময় অর্দ্ধচন্দ্র, যন্ত্রতিলক, মুক্ত কেশ, রক্তাম্বর, ত্রিশূল বা শৈব পরিচ্ছদের ন্যায় সকলই ধারণ করিবে। শৈব ও শাক্ত পরিচ্ছদ প্রায় একরূপ; কারণ 'শিবঃশক্তিরভেদঃ' শিব ও শক্তিতে কোন ভেদ নাই।

অনেকে বিশেষ ইংরাজিশিক্ষিত নব্য সভ্য সম্প্রদায় সাধককে এইরূপ তিলকাদি ধারণ করিতে দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, কেহ কেহ আবার বলেন—অন্তরের বস্তু অন্তরে থাকিলেই হইল, বাহিরে তাহার ভণ্ডামি কেন? ইহার উত্তর আমরা আর কি দিব, সে সকল কথা বলিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দেবময় হইবার পক্ষে ইহা ভগবানের উপদেশ, তাঁহার কোন উপদেশ মান্য করিতে হইলে সকল উপদেশই মানা আবশ্যক। বাহ্য-পরিচ্ছদ যে তাহার অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া দেয় বা পরিচ্ছদানুসারে সকলের অন্তরের বিভিন্ন ভাব পরিকল্পিত হয়, তাহা রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নানাবিধ পরিচ্ছদ হইতেও প্রমাণিত হইয়া

থাকে। সুতরাং পূজার্চ্চনায় পরিচ্ছদবাহুল্য-বিধি প্রভৃত ফলবিধায়ক। ইহা নৈসর্গিক বিধি। মানুষ শিক্ষাভিমানে বলিয়া থাকে, মনে মনে তাঁহার চিন্তা করিলেই হইল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কি মুখের কথায় মন-শুদ্ধি বা ভাব-শুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদি কেহ হইয়া থাকেন, তিনি মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সদাশিব, তাঁহার সহিত সাধারণের তুলনা অসম্ভব। কিন্তু সাধারণ সাধকের পক্ষে এ সকল বিধি অবশ্য পালনীয়, ইহাতে সন্দেহ বা ভাবান্তর নাই। ভগবানের সাধনা করিতে হইলে অন্তরে বাহিরে ভগবানের ভাবে তদ্গত হইতে হইবে। ইহাই ভগবান শঙ্করের আদেশ।

সাধক এইরূপে ভাবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভীষ্ট দেবের পূজা করিতে সমর্থ হইবেক। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র ও যন্ত্রশক্তিসমূহ সঞ্চয় করত আচমন হইতে আসন-শুদ্ধি জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস ইত্যাদি উত্তরোত্তর কঠিন অনুষ্ঠান সকল সিদ্ধ করিয়া ক্রমে ভাবরাজ্যে উপস্থিত হইবেন। ওঁ সদাশিব ওঁ।

"কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা ন বা কেন প্রজল্যতে।
ফলাভাবশ্চ নিয়তং ভাবা-ভাবাৎ প্রজায়তে॥"

আদ্যাশক্তি-তত্ত্ব।

কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা॥
এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এই দশমহা-বিদ্যার মূল আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালিকা। শিব প্রোক্ত আদ্যাস্তোত্রে স্বয়ং শিব বলিতেছেন।

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতীত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বং অন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপাত্বং সর্ব্ব দেবময়ী তনুঃ॥

এই আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালিকা মূর্ত্তি সাধকের সম্মুখে নিত্যই প্রকাশমানা থাকেন। তবে বিশেষ ভাবে কোন্ কোন্ সময় প্রকাশ হইয়া ছিলেন, নিম্নে তাহাই লিখিত হইতেছে।

কালীমূর্ত্তির উৎপত্তি।

শপ্তসতী চণ্ডীতে উক্ত আছে, শুম্ভনিশুম্ভ-বধোদ্দেশে মহামায়া এই কালী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। তাহা চণ্ডীতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। চণ্ডী পাঠে সকলেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

বিশ্বামিত্র ঋষি যখন সকল দেবতার উপাসনা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না—তখন পুনরায় মহাযোগী মহেশ্বরকে তপস্যায় তুষ্ট করিলে, মহাদেব বলিলেন, "তুমি ভগবতীর একাক্ষরী মন্ত্র বিধিমত জপ কর, তাহা হইলেই অচিরে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অনন্তর বিশ্বামিত্র ঋষি যথাবিধি দেবীর একাক্ষরী মন্ত্র জপ করিলে, ভগবতী প্রসন্না হইয়া অবন্তী নগরে ব্রহ্মস্বরূপিণী এই দক্ষিণাকালীরূপে প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অভিলষিত ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া ছিলেন।

ত্রেতায় রঘুকুল-পুরোহিত বশিষ্টদেব মহাচীনাচার গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ হইলে, দেবী দক্ষিণা মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট প্রকাশিতা হইয়া ছিলেন। (আচার তত্ত্বে 'দক্ষিণা' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।)

মহামায়ার এই কালীমূর্ত্তি অষ্টবিধা। অষ্টরূপা-দেবী 'অষ্ট-কালী' রূপে প্রসিদ্ধা।

১। দক্ষিণাকালী, ২। সিদ্ধকালী, ৩। উগ্রকালী, ৪। গুহ্যকালী, ৫। ভদ্রকালী, ৬। শ্মশানকালী, ৭। মহাকালী ও ৮। চামুণ্ডাকালী। ইহাঁদের পৃথক পৃথক ধ্যান তন্ত্রে লিখিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাধকগণের মঙ্গলার্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালিকা-প্রকৃতির তন্ত্রোক্ত ধ্যান ও ধ্যান-রহস্য-সম্বন্ধে গুরু-উপদেশানুসারে সংক্ষেপে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতেছি।

আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালীকা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বহু জন্মের পুণ্যফলে শক্তি-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। শক্তিজ্ঞান ব্যতীত নির্ব্বাণ লাভ হয় না। 'নিরুত্তরতন্ত্রে' শিব সেই কথাই বলিয়াছেন।

"শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং ॥
বহুনা জন্মনামন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে।
শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি, নির্ব্বাণং নৈবজায়তে ॥
সা শক্তি দক্ষিণাকালী সিদ্ধবিদ্যা-স্বরূপিণী।
সিদ্ধ বিদ্যাসু সর্ব্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিপুমান ॥

সেই সিদ্ধবিদ্যা স্বরূপিণী দক্ষিণাকালী-প্রকৃতি সাধকের সাধনায় সিদ্ধি প্রদান করেন।

দক্ষিণাকালীকা ধ্যান।

করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং ॥
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণা ধোর্দ্ধ পানিকাং ॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাং ॥
কর্ণাবতাংসতানীত শবযুগ্মভয়ানকং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং ॥
শবানাংকরসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীংহসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাং ॥
ঘোর রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয় বাসিনীং।
বালার্কি মণ্ডলাকার লোচন ত্রি তয়ান্বিতাং ॥
দন্তুরাং দক্ষিণাব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং ॥
শিবাভির্ঘোর রাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং ॥
সুখ প্রসন্ন বদনাং স্মেরাননং সরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিদাং ॥

ইতি কালিকাতন্ত্র॥

ভাবার্থ :—মূলশক্তি দক্ষিণাকালিকাদেবী করাল-বদনা, ভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িতকেশা এবং চতুর্ভুজা। তাঁহার গলে মুণ্ডমালা এবং বামভাগের অধঃ হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও ঊর্দ্ধহস্তে খড়্গ, দক্ষিণ ভাগের ঊর্দ্ধ হস্তে অভয় ও অধঃ হস্তে বরপ্রদা মুদ্রা রহিয়াছে। দেবী গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী বা নগ্না। তাঁহার গলদেশে যে মুণ্ডমালা আছে তাহা হইতে রক্ত ধারা পড়িয়া সর্ব্বশরীর রঞ্জিত হইয়াছে এবং কর্ণদ্বয়ে দুইটী শবশিশু কর্ণাভরণরূপে শোভিত রহিয়াছে, তাহাতে দেবীর আকৃতি অতিশয় ভয়ানক হইয়াছে। দন্তশ্রেণী অতীব ভীষণ, স্তনদ্বয় স্থূল ও পয়োন্নিত। শব-হস্তগুলি কাঞ্চিরূপে কটিদেশে বিরাজমান রহিয়াছে

কালিকা দেবী হাস্যমুখী, তাঁহার ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয় হইতে রক্তধারা পতিত হইতেছে—তাহাতে তদীয় বদনমণ্ডল অত্যন্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দেবীর রব অতীব গভীর, তাঁহার আবাসস্থান শ্মশানভূমি এবং নেত্রত্রয় প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। দন্তশ্রেণী উন্নত ও বহির্গত, মুক্ত কেশপাশ দেবীর দক্ষিণ শার্শ্বব্যাপী। দেবী শব-রূপী শিবের উপর সংস্থিতা আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শিবাগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে এবং তিনি মহাকালের সহিত বিপরীত ভাবে রতিক্রিয়ায়, আসক্তা রহিয়াছেন, তাহাতে তদীয় মুখকমল সুখ-প্রসন্ন ও হাস্য যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বকামনা ও সমৃদ্ধি প্রদায়িণী দেবী কালিকার ধ্যান করিবে।

নিরুত্তরতন্ত্রে দেবীর ধ্যান নিম্নোক্ত প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

ধ্যায়েৎ কালীং করালাস্যাং পীণোন্নত পয়োধরাম্।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং ঘোর রাবাং চতুর্ভুজাম্ ॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ বামোর্দ্ধাধঃ করাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ পাণিকাম্ ॥
পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাম্ ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃত কাঞ্চীং হসন্মুখীং ॥
দিগাম্বরীং মুক্তকেশীং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্ ॥
মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং।
মদিরাঘুর্ণনয়নাম্ স্মেরানন সরোরুহাম্ ॥
অট্টহাস্যং মহারৌদ্রীং সর্ব্বানন্দকারিনীং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানলয়বাসিনীম্ ॥

ইহারও ভাবার্থ পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের ন্যায়। দেবীর এই গভীর রহস্যপূর্ণ ধ্যান যাহার মূল ও সাধারণ অর্থ বর্ণিত হইল, তাহার রহস্যতত্ত্ব অলোচনা করিবার পূর্ব্বে দুই একটী কথা বলিবার আছে।

সাধনার ক্রম-বিধান।

অল্পমতি, দ্বন্দ্বপরায়ণ, ব্রহ্মবিদ্বেষী এবং অদূরদর্শী মানব আর্য্যকে মূর্ত্তিপূজক বা পৌত্তলিক আদি নানা-বিধ বাক্যে আখ্যাত করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের প্রতি কোন দোষারোপ করিতে পারা যায় না। কারণ যে ব্যক্তির যেমন বুদ্ধি অথবা যিনি ভগবদ্তত্ত্ব বিষয়ে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি তাহাতেই পর্য্যাপ্ত ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সুতরাং সে বিষয় আলোচনা কালে তাঁহার বোধাতীত বিষয় তিনি কেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবেন? আজ কাল বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সাধনার প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি পণ্ডশ্রম বোধে পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সেই মনোবুদ্ধির অগোচর সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনা, তাঁহার ধ্যান বা ধারণা করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। ফলে, তাহাঁরা ভগবতামৃতের কোন আস্বাদই প্রাপ্ত হন না—কেবল চীৎকার করিয়া, নিজ বুদ্ধিমত্তা ও প্রাধান্য রক্ষা করিতে দেহপাত করেন এবং ক্রমাগত তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ ও মত খণ্ডনাদিই তাঁহাদের ভগবদ্তত্ত্বালোচনার সারাংশ রূপে পরিণত হইয়া পড়ে।

সকলেরই সাধ আমি "তাঁহারে" বুঝিব—সেই অনাদি ও অনন্ত শক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিব। কিন্তু সাধনামার্গে প্রবিষ্ট হইয়াই কে কবে তাঁহার অনুসন্ধান পাইয়াছেন? এই কারণ মহাজনবাক্যে উক্ত আছে—

"বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর"। বাস্তবিক বিশ্বাসই মানবের সর্ব্বপ্রথম অবলম্বন—বিশ্বাস হইতে ভক্তির আবেগ এবং ভক্তি হইতেই ভগবচ্ছক্তি-জ্ঞানের সামর্থ্য আইসে। মানব যে কোনও মার্গ অবলম্বন করিয়া এবং শাস্ত্রীয় শাসনে অনুশাসিত হইয়া কার্য্য করিলে সময়ে তাহার প্রকৃত ফল অবশ্যই উপলব্ধি হইবে। নতুবা কেবল সাম্প্রদায়িক নিন্দা-বাদে নিজ অনিষ্ট ব্যতীত অন্য কোন আশা নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। ভগবত্তত্ত্ব-রহস্য-কথা নিজ সুকৃতি, ক্রিয়া-সাধনা, সত্যনিষ্ঠা, ও উপযুক্ত গুরুর কৃপা ব্যতীত উপলব্ধ হইবার বিন্দুমাত্রও আশা নাই। বিশেষ যাহা কেবল মাত্র সাধনার সাহায্যে হৃদয় মধ্যে অনুভব করিতে হয়, যাহা অব্যক্ত, তাহা ব্যক্ত বা ভাষায় প্রকাশ হইবে কি করিয়া? তবে সে রহস্যের কিঞ্চিৎ আভাষমাত্র যাহা পরে প্রদত্ত হইবে। তাহাতে সত্যনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ হইতে পারে।

পরমা-প্রকৃতি-রহস্য যে সাধনার ধন এবং চপল-মতি মানবের দুর্ব্বোধ্য, তাহা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। উহা তার্কিকের তর্কের উপাদান নহে। ধীরচিত্তে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি সমাপন করিয়া আদ্যাশক্তির রহস্যমার্গে উপস্থিত হইতে হয়। সুতরাং এ গভীর রহস্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটী সহজ রহস্য উদ্ঘাটন না করিলে সাধারণের পক্ষে ইহা কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ সাধনার যে ক্রম-বিধান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে অতীব চমৎকার। পুষ্পচন্দনাদি লইয়া পঞ্চদেবতার পূজা ও তৎসহ আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ও অঙ্গন্যাস ইত্যাদি প্রাথমিক ক্রিয়া হইতে প্রাণায়ামাদি অপেক্ষা-কৃত কঠিন বিষয়গুলি সমস্তই গভীর বিজ্ঞানসম্মত ও অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-আলোকেও তাহার মর্ম্ম কথঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই আজ শত সহস্র পাশ্চাত্য-সাধকের সে বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমন কি অনেক বিষয় তাঁহারা তাঁহাদিগের অন্তর্ণিবিষ্ট করিয়া লইতেছেন। এ সকল সাধারণ নিত্যকর্ম্মের অভ্যাসও সাধনামার্গের সর্ব্বপ্রথম কর-ণীয় ও অত্যন্ত সহায়ক। সাধারণ মানব সকল শাস্ত্রের সকল রহস্য আয়ত্ত করিয়া কার্য্য করিতে অপা-রক হইবে বলিয়াই কতকগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য-ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিয়া পূজ্যপাদ পূর্ব্বা-চার্য্যগণ জীবের বিশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। নিত্যক্রিয়া-ফলে মানব উন্নতি লাভ করিলে, যোগাদি উচ্চতর সাধনার দ্বারা মানব ক্রমে ক্রিয়াতীত হইতে থাকেন। তখন আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল সম্পূর্ণ উপ-লব্ধ হয়, তখনই মানব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। গুরুকৃপায় সেই সময় বেদ ও তন্ত্র হইতে নিজ নিজ অধিকারানুরূপ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া সাধক শক্তিলাভ করত ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। যে সাধক স্থির ধীর ভাবে সেই সুগভীর ব্রহ্ম-সমুদ্রে যতই ডুবিতে পারেন, তিনি ততই অমূল্য ও অপরিসীম রত্নলাভ করিতে থাকেন। নতুবা বৃথা তর্ক বিতর্ক সেই সাধন-সমুদ্রের তরঙ্গমালারূপে মত সাধনাকাঙ্ক্ষীকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ফলে তাহার আর রত্নাহরণ হয় না। রত্ন গভীর জলধি-গর্ভেই নিহিত থাকে। সেই কারণ সনাতন সাধন-তত্ত্বে

সাধনার ক্রমবিধান বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; তাহা দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অবহেলা করিয়া একে-বারে কাহাকেও উচ্চ সাধনামার্গে প্রবেশাধিকার দেন নাই। গর্ভাধান, পুংসবন, হইতে জাতকর্ম্ম ক্রমে উপনয়নাদি দশবিধি সংস্কার, দুর্গোৎসব, দীপালি, রাস, দোল প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ নৈমিত্তিক-কর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই সকলের মধ্যে "দুর্গাপূজা উৎসবকে" বোধ হয় আমাদিগের দেশে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ-প্রদ অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিতে পারা যায়। এই দুর্গাপূজার এতাধিক উৎসব ও আনন্দ কেন এবং এ পূজার উদ্দেশ্যই বা কি? সে ভাব কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আদ্যারহস্য বোধ হয় কতক সুগম হইয়া যাইবে।

দুর্গাপূজা-রহস্য।

শারদীয়া দুর্গাপূজা হিন্দু মাত্রেরই করণীয়। ভার-তের এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে হিন্দু নামধারী শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব অথবা গাণপত্য যে কেহ হউক শারদীয়া-মহোৎসবে নবরাত্র, সপ্তরাত্র, অন্ততঃ ত্রিরাত্রও সেই মহামায়ার সপ্তশতী চণ্ডীর পূজা, আরাধনা বা উৎসবে যোগদান না করিয়া থাকেন। এই দুর্গতি-হারিণী দুর্গাপূজা সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থমাত্রেরই করণীয়। ইহাদ্বারা গৃহস্থের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হয় ও সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট হয়। রঘুকুলতিলক দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতায় রাবণবধোদ্দেশে অভিযান করিলে রণপ্রাঙ্গণে যখন মহাপরাক্রান্ত দশাননকে মহাশক্তি ক্রোড়ান্বিত বা মহাশক্তিসম্পন্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন—তখনই তিনি আর বৃথা কাল-বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় সেই অনন্ত শক্তির সঞ্চার বা সেই শক্তির সাধনাকল্পে মনোযোগী হইলেন, তিনি অকালে অর্থাৎ সেই অবস্থাতেই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে বসিলেন—দেবী, তাঁহার উৎকট সাধনা ও অকৃত্রিম ভক্তির পরীক্ষা করণোদ্দেশে তৎসঙ্কল্পিত অষ্টাধিক-শত নীলোৎপলের একটী কমল মায়াদ্বারা লুপ্ত করিলেন—তাহাতে শক্তি-সিদ্ধ রাঘবেন্দ্র ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত ও হতাশ হইয়া ধনুর্ব্বাণ-হস্তে নীলোৎপলনিভ নিজ দক্ষিণ নয়ন উৎপাটিত করিয়া যখন তাঁহার সঙ্কল্পিত পূজা পূর্ণ করিতে দৃঢ়ব্রত হইলেন—তখন দেবী আর অপ্রকটা থাকিতে পারিলেন না, রাবণকে মায়ামোহে আচ্ছন্ন করিয়া অকালে সেই নরনারায়ণ সমীপে স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। তদবধি অকালে শরৎ ঋতুতে দুর্গাদেবীর এ হেন পূজার উৎসব হইয়া থাকে।

যখন নারায়ণ স্বয়ং সেই শক্তির সাধনা করিয়া জগতে তাঁহার উদ্বোধন ও আবির্ভাব করিয়া গিয়াছেন, তখন তাহা কেবল সম্প্রদায় বিশেষেরই বা আরাধ্য বস্তু হইবে কেন? সেই কারণ সেই অতীত কাল হইতেই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকের মধ্যে দুর্গোৎ-সবের এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীসচ্চিদানন্দ।

সান্ত্বনা ।

—ঃ॥*॥ঃ—

তপ্ত হৃদয় স্নিগ্ধ সলিলে
সিক্ত করিয়া দাও,
চিন্তা অনলে দগ্ধ হইয়ে
যন্ত্রণা কেন পাও !

সে তো নাহি ভাবে তোমারে আপন
তব হৃদি ব্যথা বোঝেনা কেমন,

মমতা বিহীনা পাষাণী প্রতিমা—
কেন ফিরে তারে চাও ?
চিন্তা অনলে দগ্ধ হইয়ে
যন্ত্রণা কেন পাও ?

শুধু দেখা দিতে প্রকৃতির পথে
এসেছিল সে যে হেথা,
নিয়তির সাথে বহু দূরে গেছে
কেন ভাব তার কথা ?

এঁকোনা সে ছবি মানসে তোমার
সে নাহি আসিবে কেন তবে আর

শান্ত পরাণ শ্রান্ত করিয়া
ক্ষুব্ধ হইয়া রও,
তপ্ত হৃদয় স্নিগ্ধ সলিলে
সিক্ত কয়িয়া দাও।

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।

ত্রিরত্ন-বিজয়।

(১০০ পৃষ্ঠার পর)

ঈষৎও বিচলিত না হইয়া—কণ্ঠস্বর কোনরূপ বিকৃত না করিয়া রমণী বলিল ?—

"ভাবী ভারতসম্রাটকে কর্ত্তব্যের উপদেশ করিতে পারি, রাজকুমার ! এরূপ উচ্চবাসনা এ দীনা উপাসিকার হৃদয়ে এখনও জাগে নাই, ভগবান শাক্যসিংহ করুন—যেন তাহা কোন দিনও না জাগে। কিন্তু যুবরাজ ! তুমি যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিষয়ে এত অনভিজ্ঞ, তাহা জানিয়া এই উপাসিকার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে ! রাজকুমার !—সর্ব্বকামবিজয়ী ভগবান শাক্যসিংহের পবিত্র ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবার জন্য যে সংসার ছাড়িয়া সংঘে প্রবেশ করিয়াছে—সংসারে সর্ব্ব জীবেব দুঃখ মিটাইবার আশায় যে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদা উন্মুখ, তাহার পক্ষে এ সংসারে বিপদ্ বলিয়া ভয় পাইবার কোন বস্তুই নাই, যাঁহার হস্তে বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষা এবং অভ্যুদয়ের ভার সত্বরই ভগবান অর্পণ করিবেন, তাহাঁর পক্ষে ত্রিরত্নের প্রতি এরূপ বিশ্বাস হীনতা দেখিয়া আমি ব্যথিত হইলাম" এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী উপাসিকা তাহার সেই ঈষৎ রঞ্জিত বিশাল নয়ন দুইটী রাজকুমারের সেই জ্যোৎস্নাধবলিত বিস্ময়স্তিমিত সুবিশাল নেত্রদ্বয়ের উপর সন্নিবেশিত করিল—

"ক্ষমা করিও উপাসিকে—তোমার ন্যায় দৃষ্টান্ত এত দিন দেখি নাই বলিয়াই, আমার ত্রিরত্নের প্রতি যেমন বিশ্বাস হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই—আমি তোমার ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি !—

"তুমি কে এবং কেনই বা আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা শুনিবার জন্য আমি বড়ই ব্যগ্র হইয়াছি ! আমার এই ব্যগ্রতা অগ্রে নিবৃত্ত কর, তাহার পর—তোমার উপদেশ শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইব !"

এই বলিয়া কুমার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী উপাসিকার জ্যোতির্ম্ময় নয়নদ্বয় হইতে নিজের বিস্ময়বিহ্বল নেত্রদ্বয় পরিবর্ত্তিত করিয়া ভূমির দিকে অবনত করিলেন।

এবার রমণীর মুখে ঈষৎ হাস্য দেখা দিল, সে কহিল ;—"তাহাই হউক, কুমার তাহাই হউক, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, আমি অগ্রে আত্মপরিচয়ই দিব, কেন তোমাকে এখানে আনিবার জন্য এমন করিয়া বাঁশী বাজাইতেছিলাম, তাহাই অগ্রে বলিব, কিন্তু এখানে আমরা এ ভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেছি না, ঐ দেখ তোমার অনুচর নিম্নে দুইটী ঘোড়া বাঁধিয়া উপরে উঠিতেছে, তোমার সহিত নিভৃত না হইলে এ সকল কথা আমি বলিতে চাহি না, এবং বলাও শুভকর নহে, ঐ দেখ তোমার অনুচরদ্বয় আসিয়া পড়িল, আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না, চলিলাম, কাল যদি পার তবে আসিও, জয় বুদ্ধের জয় ধর্ম্মের জয় সঙ্ঘের," এই বলিয়া সেই উপাসিকা অতি সত্বর সেই মৃৎপর্ব্বতের পশ্চিম ধারে অগ্রসর হইল, সেই দিকের গাছের ঝোপগুলির মধ্যে হঠাৎ সে তখন কোথায় মিশিয়া গেল, সে অদৃশ্য হইলেপর কুমারের চমক ভাঙ্গিল, তিনি তখন তাড়াতাড়ি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন, এমন সময় তাহার অনুচর অশ্বারোহী তাঁহার নিকটে আসিয়া পৌছিল, তাঁহারা সকলেই সেই রমণীর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, যুবরাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া খুজিলেন, সেই ঝোপগুলি একটু বিস্তৃত ছিল, এবং তাহার নিম্ন হইতেই একটী বড় জঙ্গল দেখা যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া কুমার স্থির করিলেন যে, এই জঙ্গলের মধ্যে সেই স্ত্রী লোককে রাত্রিতে খুজিয়া বাহির করা একান্ত অসম্ভব। রমণীর সহিত যে তাহাঁর কোন প্রকার কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি অনুচরের নিকট প্রকাশ করিলেন না এবং তাহার অনুসন্ধান বিষয়ে রাত্রি প্রভাত হইলে কি করা কর্ত্তব্য সেই সম্বন্ধেও তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না, অনেকক্ষণ ধরিয়া খুজিবার পর শেষে নিরাশ হইয়া যুবরাজ সেই স্থান হইতে ফিরিতে বাধ্য হইলেন, তিনি যখন স্কন্ধাবারে ফিরিয়া আসিলেন, তখন নবোদিত অরুণরাগে পূর্ব্ব দিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। রমণী সম্বন্ধে কাহারও নিকট যেন কোন কথা প্রকাশিত না হইয়া এইরূপ আদেশ করিয়া তখন যুবরাজ অনুচরকে বিশ্রাম করিবার আদেশ দিয়া নিজে বিশ্রাম পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

পুনদর্শন।

পরদিন রাত্রিকালে ঠিক সেই সময়ে রাজকুমার অশোক একাকী অশ্বারোহণে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই মৃন্ময় পর্ব্বতের উপর সেই শরচ্চন্দ্রচন্দ্রিকা-ধৌত ধবল প্রস্তরময় বেদিকার উপর বসিয়া সেই রমণীও রাজকুমারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কুমারকে দেখিবামাত্র রমণী অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিল এবং কহিল।

"উপাসক তোমার সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীকতা প্রশংসনীয়, রাজকুমার তোমার অনিষ্ট করিবার জনা

গুপ্ত ঘাতকগণ সর্ব্বদাই ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে, এমন কি কল্য তুমি এখানে আসিয়াছিলে এবং আজ তুমি এখানে আসিতে পার, ইহাও তাহারা জানিয়াছে, সুতরাং তোমার এই স্থানে এই ভাবে অনেকক্ষণ থাকা অনিষ্টকর হইতে পারে, এই কারণে আমি অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি আমার সহিত আমাদের মঠে চল, সেই খানে আমাদের মঠস্বামিনী তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি বারাণসী হইতে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিয়াছেন, মহাস্থবির উপগুপ্ত তাঁহার নিকটে তোমাকে বলিবার জন্য কতকগুলি উপদেশ পাঠাইয়াছেন, চল কুমার আর বিলম্ব করিও না। এস্থান অধিকক্ষণ নিরাপদ্ থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না।"

বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর—প্রসাদ-কোমল কণ্ঠস্বরে তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি কুমারের হৃদয়ে গত কল্য হইতেই উদিত হইয়াছিল অদ্য পুনর্দর্শনে এবং অকপট ব্যবহারে তাহাঁর সেই প্রবৃত্তি আরও দৃঢ় হইল, ক্ষণকালের জন্য নানা প্রকার আশঙ্কার ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হইলেও তাহা দমন করিয়া প্রশান্ত চিত্তে ও সস্মিতবদনে তিনি সম্মতি প্রকাশ করিয়া তিনি সেই ভিক্ষুণীর অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভিক্ষুণী সেই মৃন্ময় পর্ব্বত হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল এবং সেই কলকলবাহী শোণভদ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নাধবলিত সৈকতের উপর দিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভিক্ষুণীর বয়স দেখিতে এখনও সপ্তদশ অতিক্রম করে নাই, বিলাসের কোন প্রকার বেশ বা সংস্কার সে দেহে কিছুমাত্রও লক্ষিত হয় না সত্য, কিন্তু প্রকৃতি যে সৌন্দর্য্যভার তাহার প্রত্যেক অঙ্গে পর্য্যাপ্তভাবে ঢালিয়া দিয়াছিল তাহা কখনও কোন দেহে কৃত্রিম বেশ ভূষা বা সংস্কারের কোন প্রকার অপেক্ষা করে না, শ্রাবণের উভয়কুল প্লাবী ভাগীরথীপ্রবাহের ন্যায় সৌন্দর্য্যভার সেই রমনীর প্রত্যেক অঙ্গে যেন উছলিয়া উঠিতেছিল, শৈবালসম্পর্কে কমলিনীর ন্যায়—কলঙ্কসংস্পর্শে সুধাংশুলেখার ন্যায় সন্ন্যাসিনীর সেই ভিক্ষুজনসুলভ বেশসম্পর্কে অনুপম শ্রীতির উৎপাদন করিতেছিল এ জীবনে কুমার অনেক বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন অসামান্য লাবণ্যবতীকে এত অল্পবয়সে পরিব্রাজিকার বেশে তিনি আর কখনও দেখেন নাই তাহাকে দেখিবার পর হইতেই কুমারের হৃদয় কেমন এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ময় আনন্দের ভাবে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বাস্তবিক সেই অপরূপ রূপবতীকে দেখিতে দেখিতে ক্রমেই আত্মহারা হইতেছিলেন, সেই রমনীর প্রত্যেক ক্রিয়া তাহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতেছিল, সে ভাব তাহাঁর কাছে সম্পূর্ণ রূপে নূতন এবং অনির্ব্বচনীয়। তরুণী পরিব্রাজিকা নীরবে আগে আগে যাইতেছিল, কুমারও নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে নীরবে যাইতেছিলেন, প্রায় দুই দণ্ডকাল এই ভাবে কাটিয়া গেল হঠাৎ সেই গভীর নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বৌদ্ধপরিব্রাজিকা গাহিতে আরম্ভ করিল, সে গানের স্বর বড় মধুর—বড় মর্ম্মস্পর্শী—একটী বিশাল শতদলের মধ্যে যদি এক সময়ে রাশি রাশি ভ্রমর ঝঙ্কার করিয়া উঠে, প্রভাতের মন্দসমীরহিল্লোলে সেই ঝঙ্কার যেমন কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করে, সেই পরিব্রাজিকার সঙ্গীত-স্বরলহরীও সেইরূপে কুমারের

বিস্ময়স্তিমিত-হৃদয়ে কাণের ভিতর দিয়া অমৃতধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল।

বৌদ্ধপরিব্রাজিকা গাহিতে লাগিল—

বন, কি বলে বুঝাব তারে আমারি মন-বেদনা,
না বুঝে সে আছে ভাল বুঝা শুধু বিড়ম্বনা।
প্রবাহে তৃণের ন্যায় জীবন বহিয়া যায়,
ভালবাসা সুখের আশা বাড়ায় শত লাঞ্ছনা;
খেতে পড়ুক ছাই মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তার মুখে হাসি দেখি সহিব সবযাতনা"—

গান শুনিয়া ত কুমার অবাক্, একি ব্যাপার! সর্ব্বস্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর মুখে এ কিরূপ গান। কি প্রতারণা না কুহকিনীর মায়া! কেমন একটা আশঙ্কার ভাবে তাহার চিত্ত একটু চঞ্চল হইল, তিনি বলিলেন্।

"বৃদ্ধোপাসিকে, এরূপ গান তোমার মুখে কেন?" রমণী কুমারের কথায় ফিরিয়া দাড়াইল, একবার তাহার সেই অনুসন্ধিৎসু বিশাল নয়নদ্বয়ের অমল ধবল-জ্যোৎস্নায় সেই শারদচান্দ্রিকা-ধৌত কুমারের সমুন্নত দেহযষ্টিকে আরও ধবলিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল।

"রাজকুমার! সন্ন্যাসিনী হইলেই যে হৃৎপিণ্ডটাকে ছিড়িয়া ফেলিতে হইবে, এমন উপদেশ আমি ত এখনও পাই নাই।"

"বুঝিলাম্ না, আত্ম বলিদান ছাড়া যে সন্ন্যাসিনী হওয়া যায়, তাহা আমার ধারণার অতীত"

"না রাজকুমার! আত্ম বলিদান দিতে কোন সন্ন্যাসীই কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু পরের কাতর প্রাণের ব্যথা স্মরণকরিয়া কাঁদিবার বিমল আনন্দ হইতে ভগবান্ শাক্যসিংহ তাহার সেবক সন্ন্যাসিকুলকে বঞ্চিত করিয়া যান্ নাই। সন্ন্যাসিনীর শেষ কথাটী শুনিয়া রাজকুমার কেমন একটু চিন্তিত হইলেন, সন্ন্যাসিনী তখন ফিরিয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিল, কুমার আবার খানিকক্ষণ তাহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন, খানিক পরে কুমার নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিলেন, তিনি বলিলেন্;—

"বুদ্ধোপাসিকে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অপরাধ ক্ষমা করিও, তুমি কি কখন পাটলিপুত্রের রাজান্তঃপুরে বাস করিতে? এবার সন্ন্যাসিনী আর পশ্চাতে না ফিরিয়াই উত্তর দিল, সে কহিল—"রাজকুমার, সন্ন্যাসিনীর পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করা বিধিবিরুদ্ধ।

"তাহাই হউক উপাসিকে, তোমার দুর্জ্ঞেয় সন্ন্যাস-নিয়ম আমি ভাঙ্গিতে চাহিনা, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বাধা থাকে ত তাহারও উত্তর শুনিতে চাহিনা; উপাসিকে, যাহার দুঃখে তোমার ন্যায় সন্ন্যাসিনীর হৃদয় কাঁদিতেছিল, তিনি কি এখনও তোমার সহবাসিনী।" সন্ন্যাসিনী এই প্রশ্নে যেন একটু বিচলিতা হইল, সে আবার ফিরিয়া তাহার সেই অনুসন্ধানপর বিশাল নয়নে বেশ অবধানের সহিত কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কুমারের মুখমণ্ডলে একটা গভীর চিন্তার ছায়া সেই শুভ্রচন্দ্রালোকে স্পষ্ট উপলক্ষিত হইতেছিল। একটু কম্পিত স্বরে সন্ন্যাসিনী উত্তর দিল।

"তিনি—তিনি—হাঁ যুবরাজ, তাহার সহিত অদ্য সায়ংকালে আমার দেখা হইয়াছিল।"

সন্ন্যাসিনী এই কথা বলিয়াই সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড সুধাধবল অট্টালিকার দিকে তাকাইয়া বলিল

"রাজকুমার, এই আমরা বিহারে পৌছিয়াছি, আপনি এ সম্মুখের চত্বরের উপর উপবেশন করুন, রাত্রিকালে এই ভিক্ষুণী-মঠের মধ্যে পুরুষের প্রবেশানুমতি নাই, আমি ভিতরে যাইয়া মঠবাসিনীকে জানাইতেছি, তাহার সহিত এইখানেই সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী যেমন দ্রুতপদে বিহারের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল, এমন সময় কুমার অতি দ্রুতপদে একেবারে সন্ন্যাসিনীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং আবেগ-কম্পিত-হস্তে অকস্মাৎ সন্ন্যাসিনীর হস্ত ধারণ করিয়া আবেগ-জড়িতস্বরে বলিলেন—

"সন্ন্যাসিনী, তুমি কে আমি জানিয়াছি—কুন্তলা, তুমি রাজকুমারীকে সঙ্গে করিয়া এ বিপদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছ কেন?—পাটলিপুত্রের রাজান্তঃপুরের বাস পরিত্যাগ করিয়া তোমরা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছ—"

লজ্জায় কুন্তলার মাথা হেঁট হইয়া পড়িল, তাহার মুখে আর কথা সরিল না, চক্ষুর জলে গণ্ডদেশ ভাসিতে লাগিল, তাহার এই অবস্থা দেখিয়া রাজকুমার তাহার হস্ত পরিত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন—"যাও কুন্তলে, মঠস্বামিনীর নিকট আমার আগমন সংবাদ দাও, তোমার এই ছদ্মবেশের কথা কি এ বিহারে সকলের জ্ঞাত আছে?"

'না কুমার, সকলে জানেন না, কিন্তু মঠস্বামিনী মাত্র ইহা জানিয়াছেন।"

"কে জানাইল?"

"আমিই জানাইয়াছি।"

'রাজকুমারী কি এই মঠেই আছেন?"

"আমি যাইবার পূর্ব্বক্ষণপর্য্যন্ত এই স্থানে ছিলেন, তাহা আমি জানি।"

"বেশ কথা, যাও মঠস্বামিনীকে আমার আগমনের কথা জানাও।" এই বলিয়া কুমার সেই মঠের চত্বরোপরি লিখিত একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর-বেদির উপর উপবেশন করিলেন। কুন্তলা তাহাকে অভিবাদন করিয়া মঠস্বামিনীকে কুমারের আগমনবার্ত্তা দিবার জন্য বিহারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ক্রমশঃ—

ব্রাহ্মণপণ্ডিত।

কৃষিকার্য্যে মূলধন।

যাঁহারা চাষ আবাদ সম্বন্ধে বড় একটা ভাবেন না, তাঁহাদিগের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে কৃষিকার্য্যে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ মূলধন আবশ্যক হয়। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে, সকলেরই কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে, বিশেষতঃ ভদ্রলোক কৃষি-ক্ষেত্রে অবতরণ করিলে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ লইয়া অবতরণ করা আবশ্যক। কারণ পেশাদার চাষীর ১০।১৫ টাকা আয় হইলে সংসার চলিতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের তাহাতে চলিবে না। যেখানে লাভের অনুপাত কম, সে স্থানে এক সঙ্গে অধিক জমি চাষ না করিলে ভদ্রলোকের ভরণপোষণোপযোগী লাভ দাঁড়ায় না। সুতরাং শিক্ষিতব্যক্তি যদি কৃষি কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে অধিক পরিমাণ জমি চাষ করিতে হয়। পক্ষান্তরে কোন জমির দ্বারা অধিক

লাভও পাওয়া যাইতে পারে। সেরূপ চাষকে (intensive cultivation) অথবা বিশেষ চাষ বলে। সহর অথবা কোন বড় গঞ্জের নিকট নিত্য-আবশ্যকীয় তরকারি প্রভৃতি উৎপাদন (Market Gardening) এই চাষের উদ্দেশ্য। অল্প পরিমাণ জমিতে বারমাস পর্য্যায়ক্রমে সময়োপযোগী ফসল উৎপাদন করিয়া সহর অথবা গঞ্জে সরবরাহ করিলে যথেষ্ট পরিমাণ লাভ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও যে কম মূলধন ফেলিতে হয় তাহা কেহ মনে করিবেন না। সাধারণ চাষে যে মূলধন আবশ্যক, এরূপ চাষে তাহার চতুর্গুণ মূলধন আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যাউক যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন অভাবে কোন দিকেই অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, সাধারণ কৃষকমণ্ডলী যৎকিঞ্চিৎ মূলধন লইয়াই কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে। কিন্তু সেটা নিতান্ত ভ্রম। তাহারা যৎসামান্য মূলধন লইয়া কার্য্য করে সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের যে কত ক্ষতি হয়, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন। কৃষক তাহার বহুপুরুষ-লব্ধ কার্য্যকরী জ্ঞান ও কৌশল লইয়া অনুকূল অবস্থায় কি মহান ফল লাভ করিতে পারিত! মূলধনের অভাবে তাহার সে জ্ঞান ও কৌশল স্ফূর্ত্তি পায় না।

এই সমুদয় হইতে অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন অভাবে কৃষিকার্য্যের বিকাশ পায় না। সাধারণ কৃষক অবশ্য সকল দেশেই অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থাপন্ন। আমাদের দেশে উহারা একেবারেই নিঃস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ তাঁহাদের কার্য্যকরী জ্ঞান আছে, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে। যদি ভদ্র ব্যক্তিগণ তাঁহাদের মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা তাহাদিগকে পরিচালনা করেন এবং সময়ে তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার উপযুক্ত মূলধন দেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইতে পারে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিৎ ৺নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার Handbook of Agriculture নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—"Capitalists and educated men can derive profit from agricultural pursuit by acting as middlemen—finding land, seed, manure and appliances for cultivators, and using their labour and their cattle and sharing with them the profits * * * By employment of capital, one can compete successfully with cultivators in such agricultural or rather industrial pursuits, as require large outlay at the start." (Handbook of Agriculture, Page 5) অর্থাৎ ধনী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ফোড়ের কার্য্য করিয়া কৃষি ব্যবসায় হইতে লাভ করিতে পারেন—তাঁহারা কৃষককে জমি, বীজ, সার ও যন্ত্রাদি দিয়া এবং তাঁহাদের শ্রম ও গবাদি ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের লাভের অংশীদার হইতে পারেন * * * যে সকল কৃষি অথবা শ্রমশিল্প ব্যবসায়ে প্রারম্ভের সময় অধিক পরিমাণ মূলধন প্রয়োগ আবশ্যক হয় সেরূপ ব্যবসায় মূলধন প্রয়োগ করিয়া যে কোন ব্যক্তি কৃষকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সুফল লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এইরূপ কৃষকের সহিত একযোগে কৃষিকার্য্য করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হয় নাই। স্থানে স্থানে ভদ্রলোকেরা নিজে নিজেই স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং কতিপয় স্থলে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া উক্ত কার্য্য লাভজনক নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে সমুদয় চাষী নিজের ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময় অসাধারণ শ্রম ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়া থাকে তাহারাই আবার ভদ্র ধনীর ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে গিয়া আলস্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সুতরাং তাহাদিগের নিকট কেবল অর্থ দিয়া শ্রম ক্রয় করিলে কিছু হইবে না। যদি তাহাদিগকে তাহাদিগের শ্রমের ফলের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জড়িত করিতে পারা যায় অর্থাৎ যদি তাহাদিগকে অংশীদার করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই তাহারা যত্নের সহিত কার্য্য করিবে এবং কৃষি ব্যবসায়ও লাভজনক হইবে।

আমাদের দেশে যে এখন যৌথ ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে ইহা কৃষককে মূলধন সরবরাহের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবশ্য যৌথ ঋণদান সমিতির সভ্যগণ পেশাদার কৃষক হওয়া আবশ্যক এবং এই সমিতির চরম উদ্দেশ্য যাহাতে কৃষকেরা উপযুক্ত সময়ে অর্থের সাহায্য পাইয়া উৎকৃষ্ট বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারে। ঋণদান সমিতিগুলি সরকারী। কিন্তু আমরা বেসরকারী ভাবেও অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারি। যদি দেশীয় ভদ্রব্যক্তিগণ স্বতন্ত্রভাবে অথবা সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষকের সহিত কার্য্য করেন তাহা হইলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়। বর্ত্তমান জগতে স্বতন্ত্র ভাবে ও সামান্য মাত্রায় কার্য্য করার সময় চলিয়া গিয়াছে। পাঁচজনে এক সঙ্গে জুটিয়া বৃহৎ মাত্রায় একটি কার্য্য করিলে যে দ্রব্য উৎপাদিত হইবে, তাহার মূল্য পাঁচজনে স্বতন্ত্রভাবে যদি সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতেন তদপেক্ষা যে কম হইবে তাহা স্থির নিশ্চয়। ৫০০ শত বিঘা জমি এক সঙ্গে চাষ করা ও ১০০ বিঘা করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ৫টি ক্ষেত্র হইতে ফসল উৎপাদন করা এ দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। ব্যয়, শ্রম ও পরিদর্শনের পরিমাণ প্রথমোক্ত ব্যাপারে যে কম হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যে সকল দেশে বৃহৎ বৃহৎ ধনকুবের বিদ্যমান সেখানে এক এক ব্যক্তিই ইচ্ছা করিলে অনেক জমি চাষ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা সেরূপ নয়, এখানে পাঁচ জনের পাঁচটি টাকা একত্র না করিলে বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপায় নাই। সুতরাং এতদ্দেশেই যৌথ কারবার অধিক প্রয়োজনীয়।

আমাদের দেশের ন্যায় ইউরোপেও কিছু কাল পূর্ব্বে অনেক দেশে এরূপ সময় আসিয়াছিল যে, তাহা আমাদিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কৃষি কার্য্যে লাভের মাত্রা ক্রমশঃ কম হইতেছিল এবং কৃষি-পদ্ধতি-ক্ষেত্রেও বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় উক্ত দেশসমূহ কৃষির উন্নতির জন্য কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার আলোচনা আমাদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে। ইউরোপের মধ্যে ইতালীর সহিত আমাদের দেশের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ধনে, মানে, জ্ঞানে সকল বিষয়েই এক্ষণে ইহা ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা হীনতর। সুতরাং এস্থলে ইতালীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত।

আমাদের দেশের ন্যায় ইতালীরও পূর্ব্ব গৌরব আজ কাল কেবল স্মৃতি মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেখানেও অধিকাংশ কৃষক সামান্য সামান্য জমি চাষ করিয়া থাকে। যিনি এক সঙ্গে ১০০০ কি ২০০০ বিঘা জমি চাষ করেন তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় চাষী। কৃষককুল সাধারণতঃ অজ্ঞ। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে চাষের পদ্ধতি অত্যন্তই খারাপ ছিল এবং কৃষি যন্ত্রাদিতেও রোমকদিগের সময় হইতে বড় বেশী উন্নতি হয় নাই। কিন্তু যখন নূতন যুগে নব প্রথার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা আরম্ভ হইল, তখন ইতালীর কৃষক জীবনসংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইল না। অসীম অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহের সহিত জগৎব্যাপী পরিবর্ত্তনের সহিত সেও তাহার কৃষি প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। নিজেকে সে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নতুবা কত কাল পূর্ব্বে সে প্রতিকূল অবস্থাস্রোতে ভাসিয়া যাইত।

কিন্তু কি প্রকারে ইতালীর কৃষক নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইল? কেবল সমবেত চেষ্টা, উদ্যম এবং অধ্যবসায়দ্বারা। নূতন বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালীতে যখন নূতন নূতন কৃষিযন্ত্র, রাসায়নিক সার, রোগ নিবারক ঔষধাদি আবশ্যক হইতে আরম্ভ হইল, তখন ইতালীর কৃষক দেখিল যে স্বতন্ত্র ভাবে এ সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গেলে অনেক ব্যয় বাড়ে অথচ দ্রব্যাদিও সেরূপ উচ্চ দরের হয় না। ইহা হইতে Farmers, Syndicate অথবা কৃষক সম্মীলনীর সৃষ্টি। ফ্রান্সে বহু কাল হইতে এইরূপ কৃষক সম্মিলনী স্থাপিত হইয়াছিল। ইতালী তাহারই অনুকরণ করিল এবং এই অনুকরণই তাহার বর্ত্তমান সৌভাগ্যের মূল। এই সময়ে কতকগুলি কৃষি-সমিতিও স্থাপিত হয়। কৃষি-সমিতির উদ্দেশ্য অনেকটা কৃষি বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচার। প্রথমে কৃষি সমিতির সহিত কৃষি-সম্মিলনী একত্র কার্য্য করিতে আরম্ভ করে ও গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য লয়। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল যে, গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যপ্রাপ্ত সম্মিলনীর উপর লোকের সেরূপ আস্থা থাকে না। সুতরাং উক্ত সম্মিলনীসমুদায় স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের দেশে এক একটি বিভাগের ন্যায় স্থান ব্যাপিয়া এক একটি সম্মিলনী আছে। ইহাদের সভ্য সংখ্যা ৩০০ হইতে ১২০০। সম্মিলনী গুলির সাধারণ উদ্দেশ্য ব্যবসায়, কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা বুঝিয়াছে যে, কৃষিজ্ঞান প্রচারই অধিক আবশ্যকীয় কার্য্য। কারণ কৃষক যদি অজ্ঞ হয় তাহা হইলে তাহাকে উৎকৃষ্ট সার, বীজ প্রভৃতি দিয়া কোন লাভ নাই। সেই জন্য তাহারা ভ্রমণকারী কৃষি-শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছে। ঐ সমস্ত শিক্ষক গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া কৃষকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন চিঠি পত্রাদি দ্বারা প্রশ্নের উত্তর, গোশালা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা, ক্ষেত্র পরিদর্শন—এ সকলও উক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর কার্য্য।

এই প্রকার কৃষি-সম্মিলনী কৃষকের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছে। কৃষক স্বয়ং সার, বীজ প্রভৃতি ক্রয় করিতে গেলে ব্যবসাদারগণ তাহাদিগকে প্রায়ই ঠকাইত। কিন্তু সম্মিলনীর হস্তে সমস্ত কৃষক ক্রয়ের ভার অর্পণ করায় সম্মিলনী সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন সম্মিলনী সমূহ কৃষককে কোন সার, বীজ অথবা যন্ত্রাদি সরবরাহ করার পূর্ব্বে তাহারা নিজ ব্যয়ে উক্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেই ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করেন।

সম্মিলনীসমূহের একমাত্র অসুবিধা মূলধন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের দেশের ন্যায় ইতালীর কৃষকও নিতান্ত নিঃস্ব। তাহারা অগ্রিম টাকা দিতে পারে না। সুতরাং সম্মিলনীও নগদ মূল্যে জিনিষ কিনিতে পারে না। সম্মিলনীর সভ্য সমূহ কেবল মাত্র ৬৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন এবং একজনকে অধিক সংখ্যক অংশ

ক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। এক একটি সম্মিলনীর মূলধন সাধারণতঃ ২২৫০০৲ টাকার অধিক হয় না। এরূপ অবস্থায় সম্মিলনীর সমূহের কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতালীর অনেক সহরে People's Bank নামক সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা কৃষকসম্মিলনীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এমন কি অনেক সময়েই জামিন না লইয়াই টাকা দিয়া থাকেন। সম্মিলনীগুলির কেবল দেখা আবশ্যক যে, যে সমুদয় কৃষক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে, তাহাদের দেনা শোধ করিবার সঙ্গতি আছে কি না? কিন্তু ইহা ব্যতীত আর কিছু সতর্কতা আবশ্যক হয় না। ইতালীর কৃষক ধর্ম্মভীরু। ক্ষেত্র হইতে ফসল উঠিলেই তাহারা দেনা মিটাইয়া দেয়।

ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের ন্যায় মূলধনবিহীন কৃষকগণের পক্ষে সম্মিলনী অশেষ মঙ্গলের আকর। এখনও এতদ্দেশে কৃত্রিম সারের প্রচলন হয় নাই এবং গোবর সারের ন্যায় সুলভ কৃত্রিম সার কত দিনে প্রস্তুত হইবে তাহাও বলা যায় না। কিন্তু উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষি যন্ত্রাদির অভাবে যে কৃষির কত ক্ষতি হইতেছে তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশ হইতেই ধান, ইক্ষু, আম্র প্রভৃতি অপর দেশে গিয়া যে উন্নত কৃষি প্রণালী প্রভাবে কত উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কৃষিকার্য্যের প্রতি অবহেলা। কারণ,—সকল দেশেই কৃষককুল অল্প বিস্তর অজ্ঞ। কেবলমাত্র পেশাদার কৃষকের উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে কোন স্থানে কৃষির উন্নতি হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। সকল দেশে সকল সময়েই শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে, তবে কৃষির উন্নতি হইয়াছে।

ইতালী দেশের কৃষি-সম্মিলনীসমূহের উল্লেখ করার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সমবেত চেষ্টায় কত দূর উন্নতি হইতে পারে তাহা প্রদর্শন। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন না হইলে কোন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। আমাদের কৃষকের তাহা নাই। সুতরাং তাহা সংগ্রহ করিবার ভার শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি মণ্ডলীকে লইতে হইবে। আর ইহা অপেক্ষা সমধিক গুরুতর কার্য্য কৃষি-জ্ঞান বিস্তার। বর্ত্তমান সময় দেশে অর্দ্ধ-সরকারী কয়েকটি কৃষিসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ সমিতি যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু এই সকল সমিতির কার্য্যপ্রণালী কিছু বিপরীত রকমের। ইংরাজি পত্রিকা দ্বারা চাষের উপদেশ, উপযুক্ত উপায়ে কৃষকের গৃহদ্বারে উন্নত কৃষি প্রণালী প্রদর্শন না করিয়া কেবল ইংরাজি বুলেটিন নামক শব্দভেদী বাণ প্রয়োগরূপ উপায়ে যুগযুগান্তর চেষ্টা করিলেও কৃষির উন্নতি হইবে না, আর যদি উন্নতি করিতে হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলেও চলিবে না। গ্রামের সমৃদ্ধিশালী জমিদার তাঁহার উদ্যানে অথবা ক্ষেত্রে উন্নত প্রণালীতে যে ফসল উৎপাদন করিবেন, তাহাতে সমস্ত গ্রামের লোক উন্নত প্রণালীর উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। অবশ্য গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা মৃত্তিকাতত্ত্ব, উন্নত চাষ-প্রণালী, উৎকৃষ্ট ফসল প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য করিবেন, কিন্তু দেশমধ্যে এই সমস্ত পরীক্ষার ফল প্রচার করিতে হইলে দেশের লোকেরই সাহায্য আবশ্যক। উন্নত কৃষি-প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য মূলধন, ভ্রমণকারী শিক্ষক, গ্রামে গ্রামে নব প্রথা প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য্য যত দিন অনুষ্ঠিত না হয় তত দিন আমাদের কৃষির অবস্থা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

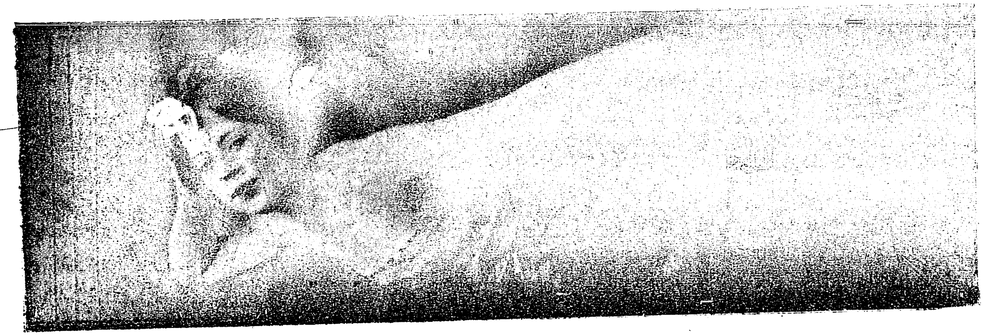

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড } সন ১৩১৫—চৈত্র। { ৭ম সংখ্যা।

তন্ত্র কি ?

(১৩৩ পৃষ্ঠার পর)

শোকতাপক্লিষ্ট সংসারের মানব সারাবৎসর সংসারের অদম্য তাড়নে তাড়িত হইয়া বৎসরের মধ্যে কয় দিবসমাত্র মহাশক্তির আরাধনা উৎসবে নবশক্তি সঞ্চারের অবসর পায়। যেমন গৃহস্থের বহুবিধ সামগ্রী গো-শকটে দূরস্থিত স্থানান্তরে পাঠাইতে হইলে, সামগ্রী-গুলি রজ্জুসহ শকটের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিতে হয়, কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে সেই রজ্জু যেমন সতত নাড়া চাড়ায় আপনাপনিই শিথিল হইয়া পড়ে, তখন সেই রজ্জু পুনরায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিবার আবশ্যক হয়—আধিব্যাধিগ্রস্ত দুর্ব্বলচিত্ত মানব তেমনি সংসারপথে নানা বাধাবিঘ্নসহ কর্ম্মরাশি পৃষ্ঠে লইয়া যাইতে যাইতে ধর্ম্মরজ্জুরূপ সেই ভগবদ্-লক্ষ্য-ভ্রষ্ট বা শিথিলভক্তি হইয়া পড়ে, তাই বৎসরের মধ্যে একবার সমবেত কণ্ঠে মা মা রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া, সেই দুর্ব্বল দেহে বলসঞ্চয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভগবদ্-বন্ধন দৃঢ়তর করিবার অবসর পায়।

এই দুর্গাপূজা সম্পূর্ণ রাজসিক উপাসনা। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু নরপতি, জমিদার বা অবস্থাপন্ন ক্ষমতাশালী গৃহস্থ-ব্যক্তিগণ শক্তি বা সামর্থ্য সাধনায় দুর্গাপূজা করিতেন। ইহা ভিখারী বা সন্ন্যাসীর উপাস্য নহে, বা সেরূপ ব্যক্তির দ্বারা ইহার সাধনা সম্ভবপরও নহে।

মহামায়া দুর্গার ধ্যান পাঠে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয়। যেন তিনি ধন-ধান্য-সম্পন্ন সংসারের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি বা সংসার-প্রকৃতির এক খানি প্রত্যক্ষ জীবন্ত চিত্র। এই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা ব্যাপারে সর্ব্ব-প্রথমে গণপতির পূজা করিতে হয়, ইনি সর্ব্বকার্য্যে

সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ভক্ত গৃহী সংসারের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভাশায় গণপতিকে আরাধনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে দৃঢ় আশা বা সিদ্ধিলাভের সংশয়বিহীন সঙ্কল্প না থাকিলে মানব সময়ে কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। তাহার পর লক্ষ্মী—গৃহস্থ গৃহের শ্রীসম্পাদনার্থে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের আরাধনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীর কৃপা-ব্যতীত সংসার অরণ্য, লোকসমাজে মানবকে অতি হেয় হইয়া পড়িতে হয়। সংসারে লক্ষ্মীর সমাদর সর্ব্বাগ্রে, ভাগ্যবান ঐশ্বর্য্যশালীর নিকট প্রায় সকলেই অবনত। অর্থে সকলেই বশীভূত হয়, সুতরাং শ্রীসম্পন্ন ধনীর দ্বারে প্রায় সকলকেই সতত আসিতে হয়। আর এক কথা—গৃহস্থের সঙ্কল্পিত কোন কার্য্যই ঐশ্বর্য্য ব্যতীত সুসম্পন্ন বা তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না, সেই কারণ লক্ষ্মীর আরাধনা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার সাধনায় গৃহীর দ্বিতীয় কার্য্য। তৎপরে জ্ঞান বা জ্ঞান-প্রদায়িনী সরস্বতীর আরাধনা—তিনি বাগ্দেবী, সাক্ষাৎ বুদ্ধি-বিদ্যা-স্বরূপিনী। তাঁহার কৃপা ব্যতীত সংসারে সদসৎ বিচার ও ভগবৎ বিদ্যা লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এই হেতু সেই "নিজ কর কমলো-ত্তল্লেখনী পুস্তক শ্রীঃ" সরস্বতীর আরাধনা দুর্গা-শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য তৃতীয় সাধনা। অনন্তর সুর-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিতে হইবে। সংসারী গৃহস্থের বল, বীর্য্য ও সাহস সঞ্চয় হওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা প্রতি পদ বিক্ষেপে তাহাকে নানা বাধা বিঘ্ন সহ্য করিতে হয়।

যখন সিদ্ধি, অর্থ, বিদ্যা ও সামর্থ্য ভক্তের করায়ত্ত হইল, তখনই তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকৃপায় দুর্গা-পূজায় অধিকারী হইলেন। তখনই সেই ঋপুদলের একত্র সমাবেশ প্রবৃত্তির আধার মহিষাসুরকে দেবীবাহন বিবেকরূপ মহা শক্তিসম্পন্ন সিংহদ্বারা আক্রান্ত করিলেন। সংসারী গৃহস্থের সুরপূজার সহিত অসুরপূজাও আবশ্যক, তাই মহিষাসুরের পূজা শক্তিশালী গৃহস্থের অবশ্য করণীয়। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ঋপুদলের এককালীন বিনাশ ত গৃহস্থের বাঞ্ছনীয় নহে। গৃহস্থের পক্ষে কাম ও ক্রোধাদি সকলেরই সেবা অল্লাধিক করিতে হয়। সময়ে কাম বা কামনা, ক্রোধ ও লোভাদির প্রকাশ অথবা তাহাদের সেবা না করিতে পারিলে, সংসারে মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি রক্ষা হয় না। তবে দেবী-কৃপায় শক্তি সম্পন্ন হইয়া সেই ঋপুদলকে সতত নিজ আয়ত্বমধ্যে রাখিতে হয়, যেন তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও গৃহস্থের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না পারে। ইহাই দুর্গাসাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য। সংসারে ধর্ম্মার্থ কাম এবং অন্তে মোক্ষ-প্রাপ্তিই দুর্গাসাধনা বা দুর্গাপূজা-রহস্য। দুর্গতি-নাশিনী মহাশক্তির সাধনা সেই কারণ গৃহীমাত্রেরই করণীয়।

যে মহাশক্তির অনুশাসনে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রধাবিত, সূর্য্য চন্দ্রে দীপ্তি প্রকাশিত, মেদিনী অনন্ত প্রসবিনী শক্তি সমন্বিত, সেই ব্রহ্ম পদবাচ্য মহাশক্তি কাহার না ধ্যেয়? ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি সহযোগে পূজাসনে বসিয়া সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ধ্যান না করিলেও, অলক্ষিতে সকলেই ত সেই মহামায়ায়ই সেবায় চির নিযুক্ত। সংসারের জীব এমন কে আছে, যাহার সঙ্কল্প বা আশা নাই এবং তাহার সিদ্ধি লাভের ইচ্ছা

নাই? সুতরাং মনের অগোচরে ত সেই সিদ্ধি শক্তির আরাধনা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য বা লক্ষ্মীর আরাধনা বা সেবা অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনের জন্য কি না করিতেছেন। তাহার পর বিদ্যুচ্ছক্তিলাভের জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য সকলই করিতেছেন। সাহস, সামর্থ্য বা বীর্য্য লাভের জন্য দিবারাত্র চেষ্টা বা তাহার আরাধনা হৃদয়মধ্যে বলবতী রহিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও বীর্য্য লাভের আশাই যে, যথাক্রমে গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্ত্তিকেয় পূজা, তাহা কি পুনরায় বলিতে হইবে? আবার এই সকল বিষয় আয়ত্ত হইলেও অসুরাচারী হইলে নিস্তার নাই, তখনই তাহার পতন অনিবার্য্য। ইহা অবধারিত সত্য। এই হেতু ভারতসন্তান যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও সাক্ষাৎ ভাবে সেই মহাশক্তির পূজা বা আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। সেই মহাশক্তি সাধনায় সামান্য ত্রুটী হইয়াছে বলিয়াই আজ আমরা সভ্য সমাজে এত হেয়, এত লাঞ্ছিত ও সংশয়-মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

মূর্ত্তিপূজক কে?

যে মূঢ় অন্ধ মহামায়ার এহেন মূর্ত্তি দেখিয়াও আমাদিগকে মূর্ত্তিপূজক অর্থে পৌত্তলিক বলিতে কুণ্ঠিত না হয়, তাহার ভগবচ্ছক্তি-জ্ঞান-লাভের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যে দৃঢ় চিত্তে বলিতে পারে—'আমি মূর্ত্তি পূজক নহি'—তাহাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করি—সে হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ হউক, অথবা মুসলমান, খ্রীষ্টান বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক, স্থির-চিত্তে নিজ বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া অপক্ষপাতে বলুক দেখি—তাহার হৃদয়ের সেই অতি নিভৃত প্রদেশে ভগবানের বা তাঁহার অংশস্বরূপে কোন ঐশ্বরিক শক্তির চিত্র বা মূর্ত্তি তিনি পোষণ করেন কি না? 'নিরুত্তরই' ইহার এক মাত্র উত্তর বলিয়া সাধকগণ বুঝিয়া লন, আর তখন বলেন 'মূর্ত্তি পূজক কে'?

কে জানে—আর্য্যের প্রায় সকল দেবতাই প্রফুল্ল কমলাসনে সমাসীন কেন? যে কমল কোমলতার আধার, একটী ক্ষুদ্র মক্ষিকা বসিলে যে কমলকোরক অবনত হইয়া যায়—সেই সুকোমল প্রফুল্ল সরোজই যখন দেবতার আসন, তখন কি বুঝিতে হইবে? আর্য্যের দেবতা কি পঞ্চভূতাত্মক জড়ের উপাদানে কল্পিত? ভ্রান্ত তর্কপর মানব! আর্য্যের দেব-কল্পনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পার নাই। তাহা সর্ব্বোন্নত আর্য্য-দর্শনের গভীর গবেষণা ও অদ্ভুত উদ্দেশ্যপূর্ণ অপূর্ব্ব ফল। আহা! সে দেব-মূর্ত্তিগুলির কোনই পরিমাণ নাই, বা তাহার ভূতাত্মক ঘনত্ব নাই। মুখে 'অবাঙ্মনসোগোচর' বলিতে সহজ হইলেও, তোমার অপুষ্ট ঐ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে একেবারে সে বিরাট ব্রহ্মের ধ্যান বা কল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব—সেই কারণ পূজ্যপাদ ঋষিগণ ভগবদ্ সাধনায় ঐ ক্রমোন্নত পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। যখন সাধনার ফলে হৃদয় দৃঢ়, মস্তিষ্ক সুপুষ্ট ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে, তখন ঘটে, পটে, প্রতিমা প্রকৃতিতে, তোমাতে আমাতে, সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে সেই অনাদি ও অনন্ত শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাইবে।

ব্রহ্মজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মের বিশ্লেষণ-কার্য্যে প্রকৃতই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যিনি যে বিষয়ে যত অধিক সংখ্যক সূক্ষ্ম পরমাণুর বা বিভাগের পরিচয় পাইবেন, তিনি যে, সেই বিষয়ে ততোধিক বিশেষজ্ঞ, তদ্বিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই—বিজ্ঞানবিদ্‌দিগেরই এই মত। উদাহরণস্বরূপ 'জল ও তুষারন্যায়ের' কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সগুণ সাকার দেবতা সান্ত ও সল্পস্থান ব্যাপী। জলধিজলের অন্ত কোথায় কে বলিবে, তাহাই বাষ্পাকারে সূক্ষ্মভাবে কোন্ অনন্ত পথে বিচরণ করিতেছে, সাধারণচক্ষে তাহার ঠিক উপলব্ধি হয় না—তাহা অদৃশ্য, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা আরও কঠিন। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বত্রই সেই জলীয় বাষ্প জীবের অলক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা চক্ষে দেখা যায় না—কিন্তু একটী পাত্রে বরফ রাখিলে পাত্রের বহির্গাত্রে জলকণা পরিলক্ষিত হয়। তাহা আর কিছুই নহে, তাহা ঐ বায়ুমণ্ডলস্থিত নিরাকার জলীয় বাষ্প সহসা শৈত্যসহযোগে জলকণা রূপে সাকারে পরিণত হইয়া যায় মাত্র। সমুদ্র নদী তড়াগাদি হইতে সমুত্থিত বাষ্পরাশিও সেইরূপ সময়ে শৈত্য-সহযোগে বারিধারা রূপে ধরায় পতিত হয়। আবার সেই জল অধিকতর শৈত্য সংস্পৃষ্ট হইলেই ক্রমে তুষার, করকা বা কঠিন বরফে পরিণত হইয়া থাকে। তখন উহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলা সাধ্যাধীন হইয়া পড়ে। ইহাকেই বাষ্পরাশির অতীব স্থূল ভাব বলা যায়। মানব আবশ্যক বোধে যখন যেরূপ প্রয়োজন তখন সেইরূপেই ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনন্ত ও অচিন্ত্য ব্রহ্মও সেইরূপ নিরাকার হইলেও আর্য্যগণ ব্রহ্ম-বিশ্লেষণাদি জ্ঞানের-দ্বারা তাঁহার মূল ত্রিশক্তি বা প্রায় সাকার ভাব, পরে ক্রমান্বয়ে তাঁহার তেত্রিশ কোটী অতি স্থূল শক্তির বিশ্লেষণাবিষ্কারে হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতার রূপ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা জীবের হিতার্থে যে শক্তি-দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে তাহাই তত্তৎ দেবতা বা দেবপূজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মৃত্তিকা, প্রস্তরে, কাষ্ঠ বা ঘটে যখন কোন দেব দেবীর মূর্ত্তিনির্ম্মাণ অথবা কল্পনা করা হয় এবং বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়, তখন কেহই সে মূর্ত্তিকে তখনই দেবতা বলিয়া ভক্তি বা শ্রদ্ধা করে না। প্রতিমা কিছু বর্দ্ধিতাকার হইলে প্রস্তুতকারক আবশ্যকবোধে সে সময় সেই মূর্ত্তির উপর পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা অথবা সঙ্কোচ বোধও করে না। এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তাহার পর যখন ভক্তিমান সাধক পূজা করিবার মানসে—বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভক্তি সহযোগে সিদ্ধমন্ত্রোচ্চারণাদি দ্বারা সাধনার বিধি অনুসারে সেই মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্মশক্তিস্থিত নিজ অভীপ্সিত শক্তির আবাহন করেন, তখনই সেই প্রতিমামূর্ত্তি ভক্তের আরাধ্য দেবতা রূপে পরিগণিত হন। পূজক তখন সেই সাকার সান্তমূর্ত্তির অন্তস্থিত নিরাকার অনন্ত ও অদৃশ্য মূর্ত্তির পূজা ও অর্চ্চনাদি করিয়া পূজান্তে আবার সেই আরাধিত দেবতাকে বিসর্জ্জন বা সেই ব্রহ্মশক্তিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। তদনন্তর প্রতিমাখানি অতল জলে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহাও সকলের সুপরিজ্ঞাত। এ প্রকার পূজাচরণ দ্বারা কি বুঝা যায়? আর্য্য সাধক যাঁহার পূজার্চ্চনা করিলেন, কোন সময়ে কেমন করিয়া কি আকারে আসিলেন এবং কেমন করিয়াই বা প্রায় সকলের অলক্ষে কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই ত তাহা দেখিতে পাইল না। সুতরাং বল দেখি, সেই পূজা আকারের না নিরাকারের—মূর্ত্তির না অমূর্ত্তির?

যট্-সংবাদ্ চণ্ডীর মধ্যে ও মহাশক্তির স্তবে যাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে তাহারও মর্ম্ম সম্পূর্ণ পূর্ব্বানুরূপ।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

জড় ও অজড় চেতন ও অচেতন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্বের মধ্যেই গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

যিনি সর্ব্বভূতেই চেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পদে বার বার প্রণাম করি।

পরমপূজনীয় গুরুমণ্ডলীর মধ্যে; জগজ্জননী ও জগদ্বিমোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তির ভিতরে; বিদ্যা, ক্ষমা, শান্তি, মোহ, নিদ্রা ও শ্রান্তি প্রভৃতি গুণরাশির মধ্যে এবং প্রত্যেক জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে যে অদ্বিতীয় পরমাশক্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন, তাহারই আরাধনা করিতে বেদাগমে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং সাধক দুর্গাপূজা-ব্যাপারে কোন্ মূর্ত্তির পূজা করিলেন, একবার চিন্তা কর দেখি।

ভ্রান্ত জীব! না জানিয়া কেবল ভ্রমবশে আর্য্যকে মূর্ত্তি-পূজার প্রবর্ত্তক বলিয়া নিন্দা করিও না। আর্য্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্ত্তিপূজক নহেন—যাঁহারা রহস্যজ্ঞানাভাবে মূর্ত্তিপূজার বৃথা নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারাই অলক্ষে প্রকৃত মূর্ত্তিপূজা করিয়া নিজ অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়।

মহর্ষি বেদব্যাস তাই বলিয়াছেন—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং যত্তীর্থ যাত্রাদিনা॥
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতং যন্ময়া।
ক্ষন্তব্যংজগদীশ বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥"

অর্থাৎ—"হে প্রভো, আপনি রূপবিহীন হইলেও আমি আপনার ধ্যান রচনা করিয়া রূপবিশিষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছি, আপনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও আমি মানবগণকে তীর্থযাত্রার উপদেশ দিয়া আপনার সর্ব্বব্যাপকতার অপলাপ করিয়াছি আর আপনি অবাঙ্মনসোগোচর হইলেও আপনার স্তব রচনা করিয়াছি—অতএব হে অখিলগুরো, আমার বিকলতা রূপ এই দোষত্রয় নিজগুণে ক্ষমা করুন।" সুতরাং বল দেখি—মূর্ত্তি-পূজক কে?

দক্ষিণাকালী-রহস্য।

এইবার পরমা প্রকৃতি দক্ষিণাকালীর রহস্য-কথা যাহা মানব-রসনায় যৎসামান্য প্রকাশ সম্ভবপর, তাহাই উক্ত হইতেছে।

শিববাক্যে উক্ত আছে:—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বতোজাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
মহদাদ্যাদনু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে তদধীন মিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যা নমোস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বংজানাসি জগৎসর্ব্বং ন ত্বাং জানাতিকশ্চন॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপাত্বং সর্ব্বদেবময়ীতনুঃ॥

ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্তুং বেদিতুমর্হতি ॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থে শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানা বিধস্তনুঃ ॥

অর্থাৎ—শ্রীসদাশিব স্বয়ং বলিতেছেন :—

প্রকৃতি বা একমাত্র পূর্ণশক্তি, তোমা হইতেই এই সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শিবে, তুমি জগজ্জননী। মহৎতত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদায় স্থাবর জঙ্গম পরিপূর্ণ অখণ্ড জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তোমা হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। তুমি সকলের আদ্যা আদিভূতা, সমুদায় বিদ্যা এবং আমরাও (অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। জগতের সকল বিষয়ই তুমি অবগত আছ কিন্তু মায়াবশে তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি কালী, তুমি তারা, দুর্গা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ও ধূমাবতী; তুমিই বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা; তুমিই অন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ও কমলালয়ালক্ষ্মী; তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ও সর্ব্বদেবময়ী; তুমি সূক্ষ্মা মূলা ব্যক্ত এবং অব্যক্ত স্বরূপিণী; তুমি নিরাকারা হইয়াও সাকারা, তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি উপাসক-দিগের কার্য্যের নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলের কারণ এবং দানবদল দলন, করিবার জন্য নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

সদাশিব নিজমুখে আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালিকার যে রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রে এবং বিশেষ সাধুমুখ-পরম্পরায় শ্রুতিরূপে বিরাজ করিতেছে। আদ্যা পরমব্রহ্মের পরমা প্রকৃতি অর্থাৎ মূলশক্তি, এই কারণ শিববাক্যে উক্ত আছে যে, "তুষ্টায়াংত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ" অর্থাৎ তুমি তুষ্ট হইলে সকলেরই পরিতোষ হয়। সাধক সেই ব্রহ্মময়ীর ধ্যান-কালে দেবীকে চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার বাম হস্তদ্বয়ের নিম্ন ও ঊর্দ্ধে যথাক্রমে সদ্যচ্ছিন্ন শির এবং রুধিরাক্ত খড়্গ বিরাজিত। পূর্ব্বে দুর্গা-রহস্যে গৃহস্থ ভক্ত যে মহিষাসুররূপী রিপুসমষ্টির পূজা করিয়াছেন, এক্ষণে সাধক উচ্চ সাধনাবস্থায় সেই রিপুসমষ্টির ছিন্নমুণ্ড দেবীর বামহস্তে উৎসর্গ করিলেন। সংসারে গৃহস্থাবস্থায় রিপুগণের যেরূপ সাময়িক ভাবে পূজা বা সেবা প্রয়োজন হইত, উচ্চ সাধনাবস্থায় সে সকলের আর আবশ্যকতা কি? সাধক যে এক্ষণে কামনাদি শূন্য হইয়া রিপুবিজয় করিতে বসিয়াছে। কালিকাপূজা এই কারণেই শাস্ত্রে অতি কঠিন ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ গৃহীর পক্ষে ইহা এক প্রকার অসম্ভব। সাধকগণ কঠোর তপস্যাদ্বারা তাহা সংসাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ভীষণ রিপুদলকে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই। প্রবৃত্তির জীবন্তমূর্ত্তি রিপুগণের ছিন্ন কণ্ঠ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তধারা পতিত হইতেছে, তাহা এক একটি ভয়াবহ বীজস্বরূপ, তাহাও অবসর পাইলে চেতনা লাভ করিয়া নূতন রিপুসমষ্টির সৃষ্টি করিতে পারে। কোন কোন সাধক সাধনার উচ্চ সোপানে উন্নীত হইয়াও অসাবধানতা ও কর্ম্মবসে সহসা কামাদির বসবর্ত্তী হইয়া সাধনভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। তাই নিবৃত্তি-রূপিণী অতি ভীষণ খড়্গ রক্তাক্ত অবস্থায় দেবীর ঊর্দ্ধ হস্তে এখনও পর্য্যন্ত বিরাজিত রহিয়াছে। সপ্তশতী চণ্ডীতে সেই কারণ রক্তবীজের ধ্বংসের কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। তাই দেবীর বামহস্তদ্বয়ে সাধ-

ককে সাবধান সূচক সাঙ্কেতিক কৃপাণ ও দোদুল্যমান ছিন্নমুণ্ড বিরাজিত। সাধক, অতি সাবধানে রিপু-বিজয় করিয়া সাধনার উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ কর। সাধকের মানসভূমিতে আর যেন ঐ রক্তবিন্দু স্পর্শ করিতে না পারে। মা সাধকবৎসলা তাই পূর্ব্ব হইতেই লোলজিহ্বায় সে রক্তবীজের রক্তবিন্দুসমূহ একেবারে লেহন করিয়া লইতেছেন। রিপুবিজয়কালে দেবীর এইরূপ ধ্যানই শিবোক্ত। সাধক দেবীকৃপায় এরূপ অদম্য রিপু-নাশ করিয়াও সশঙ্কিত অবস্থায় দেবীর কৃপাপ্রার্থী। মা অভয়া এই হেতু ঊর্দ্ধ দক্ষিণকরে ভক্ত সন্তানকে অভয়-হস্ত প্রদর্শন করাইতেছেন। আর ভক্তের ভাবনা কি? শক্তিময়ীর শক্তিকণা পাই-য়াই সাধক শাক্ত বীর হইয়াছেন। তখন তিনি মূলাধার হইতে মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া "আয় মা সাধন-সমরে" বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে সাধনসমরে আহ্বান করি-ছেন, ভক্ত তখন মাতৃস্নেহে অধীর হইয়া "ভক্তি বলে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী" বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আহা! মা আর কি থাকিতে পারেন—ভক্তের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া বরপ্রদা মা আমার নিম্ন দক্ষিণ করে বরপ্রদান করিতেছেন। ভক্ত, তুমিই ধন্য!

দেবীর কণ্ঠে রুধিরাক্ত মুণ্ডমালা দোদুল্যমান। মুণ্ড ধী-শক্তির আধার। মস্তিষ্কের বিকৃতিতে জ্ঞানের বিলোপ, আবার মস্তিষ্কের পুষ্টিতে জ্ঞানেয় বিকাশ হয়। এই জ্ঞানাধার মস্তিষ্ক অথবা মুণ্ডরূপী সাক্ষাৎ জ্ঞানে-রই মালা দেবীর কণ্ঠে বিভূষিত। অনন্ত জ্ঞানময়ী দেবীর মুণ্ডহার সংখ্যায় পঞ্চাশৎ। পূর্ব্বোধৃত 'নিরুত্তর তন্ত্রোক্ত' কালিকা-ধ্যানে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—'পঞ্চাশদ্বর্ণ মুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম"। অ-কারাদি স্বর ও ব্যঞ্জনজড়িত পঞ্চাশটী দেববর্ণই মুণ্ডমালার মুণ্ডস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞানাধার বা জ্ঞানপ্রকাশক। বেদাদি তন্ত্র অথবা সর্ব্বশাস্ত্রই এই পঞ্চাশৎ বর্ণে গঠিত অর্থাৎ লিখিত বা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত এক একটী বর্ণ জ্ঞানাধার, উহাই গ্রথিত হইয়া মালাকারে দেবীর গলে বিরাজিত। মা আমার সর্ব্বজ্ঞানময়ী! উহাদেরই রুধিরস্রোতে জগন্ময়ীর সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত অর্থাৎ জগতে জ্ঞানস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

দক্ষিণ কর ক্রিয়াশক্তির আধার এবং অবলম্বন। সেই ছিন্ন দক্ষিণ করসকল শক্তিময়ীর কটিদেশে কাঞ্চিরূপে আবৃত রহিয়াছে, অর্থাৎ মায়ের নরকর কটিবেড়া, কথায় বলে "বল্ বল্ বাহু বল" বা "বল্ বল্ কোমরের বল"! মা অনন্ত বলশালিনী, তাই জীবের অসংখ্য করে অবিরত বল প্রদান করিতেছেন। ভক্ত, সেই কারণ মা'র ধ্যান করিতে করিতে নরকর কটিবেড়া বলিয়া বিভোর হয়।

অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিঃস্বরূপ। দেবীর ধ্যানান্তরে লিখিত আছে,—

"বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতাননাং"

দেবীর নয়নত্রয়ে সেই অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র উদ্ভাষিত হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহারাই তাঁহার তিনটী নয়ন। পক্ষান্তরে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একত্রে ত্রিকাল দর্শন করিতেছেন বলিয়াও ত্রিকালদর্শিনী কালী, ত্রি-নয়নী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীসচ্চিদানন্দ।

—o—

বর্ণ-চিত্রণ।

(১১৪ পৃষ্ঠার প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম অধ্যায়।

চিত্রের শ্রেণী-বিভাগ।

প্রকৃতির বিশাল অঙ্গে, বিবিধ প্রত্যঙ্গে, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপে বিধাতার কত বিকাশ, কত বিকৃতি ও কত বিলয় হইতেছে, কবি বা শিল্পী সাময়িক ভাবে তাহাই নানা ছন্দে, নানা বর্ণে লিপি-বদ্ধ করিয়া মানবেতিহাসের অসংখ্য অঙ্গ পরিপুষ্ট করিতেছেন। যিনি যেমন সাধক, যাহার যাহাতে অভিরুচি, সেই বিষয়টীকেই তিনি আদর্শ করিয়া তাঁহার সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছেন। সেই সাধনার ফলে কালের অঙ্কে এক একটী অভিনব বিচিত্র চিহ্ন যাহা কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া রহিয়া যায়, তাহাই কবির অক্ষয়কীর্ত্তি কাব্যনিধি অথবা শিল্পীর অমূল্য কলারত্ন। যে শিল্পীর সেই সাধনালব্ধ যে প্রতিভা, যে বিষয়ের মধ্য দিয়া প্রতিভাত হয়, লোকে সেই বিষয়ক শিল্পী বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করে।

চিত্রশিল্পীর মধ্যে সেই সকল বিষয়ের পার্থক্য বিধায় তাঁহাদের বিভিন্ন শ্রেণী বিদ্যমান আছে। শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু সাধারণের তাহা অবগতি আবশ্যক, সেই কারণে নিম্নে চিত্রাবলীর একটী ধারাবাহিক শ্রেণী-বিভাগ প্রদত্ত হইতেছে।

১। পৌরাণিকচিত্র, পুরাণচিত্র বা পুরাচিত্র—জগতের সেই আদি যুগ হইতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল ও কোরাণাদি সর্ব্ব জাতীয় পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন্ কোন্ অংশ বা আখ্যানবিশেষ সংগ্রহ ও উপলক্ষ করিয়া শাস্ত্রোক্ত সেই অলৌকিক ও উন্নত দৈবভাব চিত্রপটে অদ্ভুত কল্পনা এবং কলা-কৌশলের সাহায্যে প্রতিফলিত করণের নাম পৌরাণিক চিত্র। পৃথিবীর বর্ত্তমান চিত্র-শিল্পী-সমাজের মধ্যে এইরূপ চিত্রকরণে সম্পূর্ণ পারদর্শী ব্যক্তি অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। জানি না, যদি এমন কোনও শিল্পী এখন থাকেন, তিনি প্রাচ্য বা প্রতীচ্য যে প্রদেশ-বাসীই হউন না কেন, তিনি বিশ্বের সকল শিল্পীর শিরোমণি; আর্য্যের বিশ্বকর্ম্মাপ্রতীম বহুশিল্পী এক দিন সেই দেব সম্মানে জগতের পূজা পাইয়াছেন। বিলুপ্ত ও বিক্ষিপ্ত আর্য্য-ইতিহাসের মধ্যে সেরূপ কত শত শিল্পীর নাম আছে, যাহা আমাদের অপরিজ্ঞাত হইলেও সময়ে হয় ত তাহার পুনঃপ্রকাশ হইবে। মধ্যে আর্য্যদিগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই সকল শিল্পীর গৌরবচিহ্নও কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগতে একবার কিছু দিনের জন্য সেরূপ শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই শিল্পকলা মানব-সমাজ এখনও প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছে, দেখিয়া বিমোহিত হইতেছে ও নিত্য অন্তরের সহিত তাঁহাদের পূজা করিতেছে। সেই কয়েকজন দৈবশক্তিসম্পন্ন শিল্পীর মধ্যে মহাত্মা র‍্যাফেল, গিডো, রুবেন্স ও লিব্রুণই প্রধান। ইংরাজী ভাষায় এরূপ শ্রেণীর চিত্রকর-রচিত চিত্রাবলীর নাম History Painting হিষ্টরীপেণ্টিং, কিন্তু উহার অনুবাদে ইতিহাস-চিত্র বলিলে প্রকৃত অর্থবোধ হয় না, বরং পুরাচিত্র বলিলে উহার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইতে পারে।

২। ইতিহাস চিত্র—ইহা বর্ত্তমান ও অব্যবহিত পূর্ব্ব কয়েক শতাব্দীর নৃপতি, তাঁহাদের রাজ্য, রাজধানী ও পল্লীর অধিবাসীসহ সাময়িক বিবিধ অবস্থা বোধক সাধারণ ভাবের—আনন্দপ্রদ পল্লীচিত্র, যাহার উপাদান প্রত্যক্ষভাবে এখনও সাধারণের নয়নগোচর হয়—যাহাতে শিল্পীকে আদর্শ ব্যতীত সম্পূর্ণ কল্পনার অনুসরণ করিতে হয় না—তাহাকেই ইতিহাস চিত্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। ইংরাজীতে এরূপ চিত্রকে Rural History Painting বলিয়া থাকে।

৩। প্রতিমূর্ত্তিচিত্র—আর্য্য অনার্য্য সকল সভ্য জাতীর মধ্যেই চিরকাল ইহার বহুল প্রচার আছে। এতদ্‌সম্বন্ধে এ স্থলে অধিক বলিবার কিছুই নাই। যে কোন মনুষ্যের অবিকল চিত্র অঙ্কিত হইলেই প্রতিমূর্ত্তি চিত্র বলিয়া অভিহিত হয়। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর চিত্রকে Portrait Painting বলিয়া থাকে। পুরাচিত্রের পরই ইহাকে উচ্চ অঙ্গের চিত্র-শিল্প বলিতে হইবে। আর্য্যের সেই আদিম যুগ হইতে ভারতে চিত্রশিল্পের এক প্রকার ধ্বংসের যুগ সেই মোসলমান নৃপতিবৃন্দের আধিপত্য সময়েও ইহার এককালীন বিনাশ হইতে পারে নাই। মোগল-সম্রাটদিগের রাজত্ব সময়েও ইহার যে যথেষ্ট প্রচলন ছিল, তত্তৎ সময়ের অঙ্কিত বহু চিত্র হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। এ পর্য্যন্ত সকল সভ্য দেশের বহু শিল্পীই ইহাতে বিশেষ কৃতিত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ জাতি ইহাতে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন।

৪। অদ্ভুতচিত্র।—ইহা প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণের আর এক অঙ্গ। ইহাতে কোনও ব্যক্তিবিশেষের চিত্র লিখিত হয় না। কৌতূহলপ্রদ, হাস্যোদ্দীপক অদ্ভুত ও বিচিত্র ভাব ইহাতে সন্নিবেশিত হয়। ভূত প্রেত পিশাচ আদির বিকট ও বিভৎস নৃত্য, ডাইন্-সম্প্রদায়ের নিশীথ-চাতর, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কৌশল ও বিবিধ অদ্ভুত দৃশ্যাবলী যে চিত্রে লিখিত হয় তাহারই নাম অদ্ভুত চিত্র। ইংরাজীতে তাহাকে The grotesque History Painting বলে।

৫। সমরচিত্র—যুদ্ধক্ষেত্রের বা সমর বিষয়ক যে কোনরূপ চিত্র। ইংরাজীতে ইহাকে Battle Pieces বলে।

৬। নৈসর্গিক চিত্র বা নিসর্গচিত্র (Landscape Painting) বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত সম্বলিত প্রকৃতির নানা ভাব যাহাতে লিখিত হয় তাহারই নাম নিসর্গচিত্র। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু শিল্পী এইরূপ চিত্রে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

৭। সাগরচিত্র (Sea-scape or Sea pieces) অপার সাগরের অনন্ত ভাবরাশি যে চিত্রে স্তরে স্তরে লিখিত হয় তাহাকেই সাগরচিত্র বলা যায়। এ সম্বন্ধে অধিক কথা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন পরে যথাসম্ভব বর্ণিত হইবে। তবে সংক্ষেপে বলিতে হইলে কখনও নীল গগনের কোলে নীল লবণাম্বু একের পর এক উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া বেলায় আসিয়া প্রতিহত হইতেছে, কখন গগনপটে বজ্রকরকাপরিশোভিত জলদরাজি ঘনঘটায় যেন অভিযানোদ্যত, জলধিও তদ্দর্শনে নিম্নে রোষে অধীরচিত্তে গভীর শব্দে তরঙ্গ তুলিয়া যেন বাহুস্ফোট করিতেছে, অবসর বুঝিয়া পবনদেব উভয় পক্ষকেই উত্তেজিত করিবার মানসে যেন প্রচণ্ডরূপে উপস্থিত হইয়াছে; সেই ভীষণ রণমধ্যে পতিত হইয়া অর্ণবাদি সামগ্রীনিচয় বিধ্বস্ত হইয়া

যাইতেছে, কখন বা শান্ত-শীতল-সমীর-সেবিত সাগর-বক্ষে ধীর বীচিমালা মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত তরণী পাইল তুলিয়া গমনাগমন করিতেছে, যেন নীল আকাশ-অঙ্কে দলবদ্ধ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, পার্শ্বে সাগরতটে বন্দররূপে জগজ্জননী লক্ষ্মী কমলাসন বিস্তৃত করিয়া আপনার অমল-শ্রীতে বিরাজিতা। সাগরের এই সকল বিচিত্র ভাবোদ্দীপক চিত্রে, ভেণ্ডারভেল্ড (Vendarvelde) ব্লোম (Blome) প্রভৃতি অনেকেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

৮। নিশাচিত্র—(Night Piece) শুভ্র-স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না-পুলকিত-রজনীর অথবা মেঘাচ্ছন্ন গভীর নিশীথিনীর বিবিধ দৃশ্যসমূহ; প্রদীপালোকে, প্রজ্বলিত চিতানলে বা কর্ম্মকারের আবর্ত্তনীস্থিত অগ্নির আলোকে উদ্ভাষিত নিকটস্থিত যে সকল দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; যে চিত্রে শিল্পী তাহাই যথাযথরূপে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হয় তাহারই নাম নিশাচিত্র।

৯। জীবচিত্র—(Living Animals) নানা জীব জন্তুর অবিকল প্রতিরূপ যাহাতে বিন্যস্ত হয়।

১০। পক্ষী-চিত্র—জীব জন্তুর ন্যায় নানাবিধ পক্ষীর যথাযথ চিত্র।

১১। রন্ধন-চিত্র—ইংরাজীতে ইহা Culinary Pieces বলিয়া পরিচিত। রন্ধনাদির উপযোগী নানা সামগ্রী বিশেষ, মৃত পক্ষী, মৃগ ও মৎস্যাদির চিত্র ইহার অন্তর্গত।

১২। ফল-চিত্র—(Fruit Pieces) নানাবিধ ফল যে চিত্রে অবিকল চিত্রিত হয়।

১৩। পুষ্প-চিত্র—(Flower Pieces) ইহা পূর্ব্বানুরূপ সকল চিত্রের ন্যায় নানাবিধ ফুলের চিত্র।

১৪। স্থাপত্য-চিত্র—(Pieces of Architecture) গৃহ, অট্টালিকা, মন্দির ও বিমানাদির চিত্র।

১৫। সঙ্গীতচিত্র—সঙ্গীত যন্ত্রাবলী ও তাহার আলাপনাদির চিত্র।

১৬। সন্নোন্নতচিত্র—ভাস্কর্য্যের অঙ্গ হইতে অল্পাধিক উন্নত মূর্ত্তির অনুকরণ চিত্র।

১৭। মৃগয়াচিত্র—মৃগয়া কালীন শিকারী অশ্ব, গজ, সারমেয় ও মৃগাদির নানা ভাবের চিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়া থাকে।

এই সপ্তদশ বিধ চিত্রের মধ্যে শিল্পী নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি, এবং সমাজের সাময়িক গতি অনুসারে যে কোনও চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। এই বিভাগ গুলি ব্যতীত চিত্রের আরও অনেক বিভাগ হয় ত হইতে পারে বা হইবে কিন্তু উহাদের সাধারণ চারিটি প্রধান বিভাগ ধরিলে সকল চিত্রই তাহার অন্তর্গত হইয়া যায়। প্রথম পুরাণচিত্র, History or subject Painting। দ্বিতীয়—প্রতিমূর্ত্তি চিত্র (Portrait Painting) তৃতীয়—নিসর্গচিত্র, (Land or sea-scape Painting) চতুর্থ—জড় চিত্র, (Still life Painting) এই চারিটিই প্রধান। ইহার মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তদশবিধ চিত্রই যেমন আসিয়া পড়ে। সেইরূপ প্রতিমূর্ত্তি ও নিসর্গচিত্র এই দুইটী সর্ব্বপ্রধান বিভাগে উহাদের শ্রেণীকে রক্ষা করা যাইতে পারে। শিল্পী স্ব স্ব অভ্যাস বলে ঐ সকল চিত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়া উক্ত বিভাগীয় চিত্রকররূপে জগতে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া যান।

এক্ষণে পরবর্ত্তী দুইটী অধ্যায়ে প্রতিমূর্ত্তি ও নিসর্গ চিত্রাঙ্কণের কয়েকটী অতি আবশ্যকীয় বিশেষ

নিয়মের কথা বলিয়া তাহার পর বর্ণ বিলেপনাদি চিত্রকলার কৌশল বিষয়ে আলোচনা করিব।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণ।

ভগবানের এই বিশ্বসংসারে পরস্পর দুইটী সমান আকৃতি বিশিষ্ট মানবমূর্ত্তি কেহ কখন দেখিতে পায় নাই, কখন যে দেখা যাইবে সে কথাও কেহ বলিতে পারেন নাই, বিশ্ব শিল্পীর এ কলাবৈচিত্র চিন্তা করা বোধ হয় মানবের সাধ্যায়ত্ত। যাহা হউক এই বিভিন্ন মূর্ত্তি সকলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র অর্থাৎ যে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির আলেখ্য অঙ্কিত হইতেছে, সম্পন্ন হইলে দেখিবা মাত্র ঠিক তাহার আকৃতি বলিয়াই সকলে চিনিতে পারে এইরূপ ভাবে চিত্রিত হইলেই যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি চিত্র হইল। সুতরাং যে কোনও মানবমূর্ত্তি চিত্রিত হইলেই প্রতিমূর্ত্তিচিত্র বলা হইবে। সাধারণের মধ্যে সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত আকৃতির স্বাতন্ত্রতাই প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণের প্রধানতম লক্ষ্য।

এই ব্যাপারে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে শিল্পীকে চারিটী বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ রক্ষা করিতে হইবে। সেই বিষয়-চতুষ্টয় সম্বন্ধে আমার শিক্ষক বলিতেন "There are four things to make a portrait perfect :—Air, attitude, dress and colours." অর্থাৎ কোন প্রতিমূর্ত্তি চিত্র সুসম্পন্ন করিতে হইলে ১ আস্যরেখা (air), ২ ভঙ্গিমা (attitude), ৩ পরিচ্ছদ (dress), ও ৪ বর্ণাবলী (colours) এই চারিটী বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আস্যরেখা (air),—মানবের আস্য বা মুখমণ্ডলের মধ্যে নাসিকা ও চক্ষুর পার্শ্ব, গণ্ড এবং ললাটস্থিত খাঁজ বা রেখাসমূহ, যাহাদের পরস্পর আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা ভয়, দুঃখ, হাসি ও আনন্দ আদি আন্তরিক ভাবনিচয় প্রকটিত হইয়া থাকে। মুখের আকার, গঠন, পরিমাণ ও কেশবিন্যাস প্রভৃতিও এই আস্যরেখা বা এয়ারের অন্তর্গত।

শিল্পীকে প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণের মধ্যে মানবের সমুদায় অন্তরের ভাব এই আস্যরেখা দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। যিনি চিত্রমধ্যে এই সকল ভাব ফুটাইতে পারেন তিনি ততই উচ্চ শ্রেণীর চিত্রশিল্পীরূপে পরিচিত হন। প্রস্ফুটিত এই সকল ভাবকে এক্সপ্রেসন্ (Expression) বলা যায়।

চিত্রকলার অন্তর্গত এই কার্য্য অভ্যাস করিতে হইলে, শিল্পীকে অতি যত্নসহকারে আনন-বিজ্ঞান (Physiognomy) আলোচনা করিতে হইবে। এবং তাহার প্রভাব আস্যরেখা সাহায্যে যথাযথরূপে চিত্রে বিন্যস্ত করিতে হইবে। প্রতিমূর্ত্তি চিত্রের মধ্যে উদ্ভাবনা অথবা কল্পনা বিশেষ সাহায্যে কিছুই করিবার নাই, সকলই প্রত্যক্ষ ক্রিয়াসিদ্ধ ব্যাপার মাত্র। এই বিষয়ে শিল্পীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অনেক সময় কোন কোন শিল্পী কল্পনা পথে এমনই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায় যে, প্রতিকৃতি চিত্রণ করিতেছেন কি অন্য কিছু করিতেছেন তাহা তাঁহাদের তখন স্মরণই থাকে না, এটী সম্পূর্ণ অদূরদর্শী শিল্পীর লক্ষণ সুতরাং শিল্পীকে এ বিষয়ে যথেষ্টরূপ সাবধান হওয়া

উচিৎ। কখন কখন শিল্পীর মনে এইরূপ ইচ্ছা বলবতী থাকে যে, এই চিত্রস্থিত প্রতিমূর্ত্তিতে আমি ঈষৎহাস্যভাব প্রদান করিব। কিন্তু বেশ বিবেচনা করত দেখা আবশ্যক যে, যে ব্যক্তির চিত্র হইতেছে বস্তুতপক্ষে তাঁহার মুখের সে ভাব স্বাভাবিক কি না। অর্থাৎ সদাই তাঁহার মুখে সেই ঈষদ্ধাস্যভাব দেখা যায় কি না। সকলের মুখের এক ভাব ত প্রায় দেখা যায় না। কেহ দেখা হইলেই হাসিয়া ফেলেন, হাসির কথা থাকুক বা না থাকুক, হয়ত কোনও গভীর বিষয়ে আলোচনা হইতেছে, কিন্তু সে ব্যক্তির মুখের প্রতি চাহিলেই তিনি অমনি হাসিয়া ফেলিবেন, তিনি যে ইচ্ছা করিয়া এরূপ হাসেন তাহা নহে, এটী তাঁহার স্বাভাবিক ভাব। এই হাসির সঙ্গেই হয়ত তাঁহার দুই গণ্ডে দুইটী সল্লগভীর চিহ্ন বা টোল পড়িয়া যাইবে, হয়ত তাঁহার নয়ন কোণ উভয় পার্শ্বে সামান্য কুঞ্চিত হইয়া যাইবে, হয়ত অধর ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত অথবা কুঞ্চিত হইবে; কাহারও বা হাসির সঙ্গে সঙ্গে দন্তমূল বা মাড়ী বাহির হইয়া যাইবে, এ সকল গুলিও তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব। এইরূপ কাহারও বা এমনই মুখভাব যে, হাসির কথা পড়িলেও তাঁহার মুখে হাসির অতি ক্ষীণ ছায়াও দেখা দিবে না, সদাই ধীর, স্থির, গম্ভীর অথচ তাহাতে ক্রোধ বা অমনোযোগীতারও কোন চিহ্ন প্রতিফলিত হয় না, মুখের এও এক ভাব! কোন কোনও ব্যক্তির মুখ যেন সদাই ভার, মুখ দেখিলেই বোধ হয় যেন বিরক্তির ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে, সুখ দুঃখ সকল সময়েই সেই একই ভাব, নয়ন উজ্জ্বল কঠোর, নাসিকারন্ধ্র বিস্তৃত, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, ললাটরেখা গভীর চিহ্নিত যেন ক্রোধের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। এইরূপ নানা মুখের নানা ভাব শিল্পীকে অতি সাবধানে পর্য্যালোচনা করিতে হইবে এবং যাঁহার যে ভাবটী স্বাভাবিক তাহাই চিত্রে বিন্যাস করিতে হইবে। কখন কখন শিল্পী এ সকল বিষয় চিন্তা না করিয়া চিত্র সুন্দর হইবে ভাবিয়া আপনার ইচ্ছামত কোনও ভাব প্রতিমূর্ত্তিতে প্রদান করেন, তাহার ফলে চিত্র দেখিয়া কাহার চিত্র তাহা চিনিতে পারা যায় না। অনেক সময়েই চিত্রের এই গোলযোগে শিল্পীকে বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। এতদ্ব্যতীত বহু অল্প শিক্ষিত শিল্পী চিত্রান্তর্গত সকল ভাবের সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না তাহাতেও চিত্রের নানা দোষ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি আস্যরেখা গুলির অবগতির জন্য উহার বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আনন বিজ্ঞান বা ফিসিয়গনমি শিক্ষা করা আবশ্যক। তাহা শিক্ষা না করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিলে শিল্পীর এমন ভ্রম হয় চিত্র এমন বিষম দোষে দুষ্ট হয় যে, শিক্ষিত সমাজে তাহা একেবারেই অমার্জ্জনীয়। আনন বিজ্ঞান আলোচনা করিলে জানা যায় যে, অন্তরের যে ভাবটী যখন মুখে প্রকাশ পায়, তখন মুখের স্থান বিশেষে যে তাহা ফুটিয়া উঠে এরূপ নহে অর্থাৎ মুখমণ্ডলের সর্ব্বাবয়বে অল্প বিস্তর তাহার আভাষ পরিলক্ষিত হয়। মানব হাসিলে কেবল যে তাহার দন্তই বাহির হইয়া পড়ে সূক্ষ্মদর্শীরা সে কথা বলেন না; তাঁহারা অধর, ওষ্ঠ, চক্ষু, নাসিকা, গণ্ড এমন কি কর্ণ ও কেশমূল পর্য্যন্ত সেই হাসির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে এরূপ প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং অদূরদর্শী শিল্পী প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণ কালে ওষ্ঠের পার্শ্বে হয় ত একটু হাসির ভাব

দেখিয়াছেন কিন্তু নয়নপ্রান্তে এক ম্লান ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, অথবা নয়ন প্রফুল্লতাব্যঞ্জক কিন্তু কপোল কালিমাময় ও বিশুষ্ক। চিত্রে এই অস্বাভাবিক ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, চিত্রকর আস্যরেখা দর্শনে প্রকৃত অন্ধ, আনন-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যাহাহউক শিক্ষার্থীর এ সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিক্ষার্থিগণের অবগতির জন্য আনন-বিজ্ঞানের সারাংশ আস্যরেখা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। সকল শিল্পীর সর্ব্বদা তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। চিত্রগত ব্যক্তির মুখমণ্ডলে যদ্যপি ঈষদ্ধাস্য-বিজড়িত আনন্দের ভাব প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার চক্ষুদ্বয় সামান্য কুঞ্চিত হইবে, নয়নপ্রান্তে তাহার অস্পষ্টরেখা দৃষ্ট হইবে, অধরৌষ্ঠ বিস্ফারিত হইবে, উহার উভয় পার্শ্ব নাসিকার দিকে আকুঞ্চিত হইবে, গণ্ডদেশ ঈষৎ গভীর হইবে, ভ্রূযুগল বিস্তৃত হইবে, মোটের উপর মুখমণ্ডলের পেশী (Muscle) সমূহের প্রত্যেকটীই উর্দ্ধদিকে আকুঞ্চিত হইবে। আবার শোক দুঃখ বা মুয়মাণ অবস্থায় উহার ঠিক বিপরীত আস্যরেখাগুলি পরিলক্ষিত হইবে, অর্থাৎ মুখমণ্ডলের প্রত্যেক পেশীই নিম্নদিকে কুঞ্চিত হইয়া আসিবে।

ভ্রূদ্বয়ের বিস্ফারণ বা উর্দ্ধদিকে আকুঞ্চন মুখের গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের পরিচায়ক এবং উহার কার্ম্মুকাকার বঙ্কিমভাব বিস্ময় বা আশ্চর্য্যের আস্যরেখা বলিয়া আনন-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মুখের সকল অংশেই ভাব বোধক পেশী সকল বিদ্যমান আছে; তাহাদের আকুঞ্চন বিকুঞ্চনে যে সকল রেখা উৎপন্ন হয়, তাহাতেই মনের ভাব মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এই রেখা গুলি স্পষ্ট ও অস্পষ্ট অসংখ্য বিভাগে বিভক্ত। অতি মনোযোগ সহকারে প্রত্যেক মুখের ভাবাবলী লক্ষ্য করিলে ক্রমে সেই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রেখাগুলি দর্শকের নয়ন আকর্ষণ করিতে পারে, শিল্পীর তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। সেই রেখা-সাহায্যে মানবের মনের ভাব ত সহজে অনুভূত হয়ই, তদ্ব্যতীত মানবের বয়স, অবস্থা, এমন কি কেবল চক্ষু দুইটী দেখিয়াই স্ত্রীলোকের মুখ কি পুরুষের মুখ তাহাও অবগত হইতে পারা যায়। শিক্ষার্থিগণ এই ইঙ্গিতমাত্র অবলম্বন করিয়া নিত্য অভ্যাস করিলেই ইহার মর্ম্ম ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবে। কারণ ইহা কেবল বহুদর্শিতা ও অনুভব-সিদ্ধ বিদ্যা, ইহার নির্দ্দিষ্ট সূত্র বলিয়া বুঝান বড়ই কঠিন। তবে সংক্ষেপে দুই একটী কথা নিম্নে লিখিত হইতেছে; তাহা পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গিত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী

সাফল্য।

১

ফুল ফুলের মতন আমার
শুভ্র জীবন খানি;
তোমারি পুণ্য পূজার থালায়
নিলে কি তুলিয়া রাণি?

বড় সাধ মোর ছিল মনে মনে
তোমার অতুল রাতুল-চরণে
অর্ঘ্য করিয়া সাজাতে যতনে
দিবগো গোপনে আনি'
ফুল্ল ফুলের মতন আমার
শুভ্র জীবন খানি!

২

সন্ধ্যা প্রভাত এল কতবার,
গেয়ে গেল কত পাখী,—
চিত্ত আমার আকুল উদাস,
শ্রান্ত তৃষিত আঁখি!
তুমি আসিলে না—চাহিলে না ফিরে—
শূন্য তরণী বাহি তীরে তীরে
কেবলি রেখেছি রোধি আঁখি-নীরে
মর্ম্ম বেদন ঢালি'!
সন্ধ্যা প্রভাত এল কতবার,
গেয়ে গেল কত পাখী!

৩

পূর্ণ চৌদিক আজি কি শোভায়
হর্ষে মগন বুক,—
কে জানিত আগে গুপ্ত এমন
মোর তরে এত সুখ!
স্বর্গ আর যে বুঝি না কোথায়,
মুগ্ধ মানব কেন মিছে তায়,
সেথা কি এমনি অমিয় বিকায়
হাসিভরা চাঁদ মুখ!
পূর্ণ চৌদিক আজি কি শোভায়
হর্ষে মগন বুক!

৪

স্নিগ্ধ সমীর ধীরে নিয়ে আসে
বার্ত্তা তোমার দেবি,
ধন্য আজিকে জীবন আমার
মন-সাধে তোমা সেবি'!
বিশ্বে কেবলি ছিল মোর আশা
তোমার করুণা, তব ভালবাসা,
মিটেছে, মিটেছে, মিটেছে সে তৃষা,
জ্বেলেছ দীপ্ত রবি!
স্নিগ্ধ সমীর ধীরে নিয়ে আসে
বার্ত্তা তোমার দেবি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ত্রিবর্ণ-চিত্র মুদ্রিত করণ।

(The Art of Three-colour Printing)

অধুনা মুদ্রণজগতে ত্রিবর্ণ চিত্রণ বস্তুতঃই এক নূতন যুগের আবির্ভাব করিয়াছে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই মুদ্রণশিল্পের যেরূপ উৎকর্ষ হইয়াছে, সেরূপ অন্য কোন শিল্পে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহার মূলীভূত প্রধান উপাদান আলোকচিত্রণের সবিশেষ উন্নতিতেই যে এরূপ মুদ্রণের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই আবশ্যকতা বা তাহার অভাবই যে ইহার উন্নতির একমাত্র সহায়ক সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই।

ত্রিবর্ণমুদ্রণ করিবার জন্য ব্লক (Block) বা চিত্রফলকের আবশ্যক। সাধারণ হাফটোন ব্লক হইতে

ত্রি-বর্ণ চিত্র।

যে সকল চিত্র মুদ্রিত হয়, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। আমাদের "শিল্প ও সাহিত্যে" এরূপ চিত্র প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই দুই এক খানি মুদ্রিত হয়। গত ফাল্গুন সংখ্যায় আমরা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি নামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের এক খানি সাধারণ হাফটোন চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি। তাহা ধীর ভাবে দেখিলে সকলেই হাফটোন চিত্রের বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবেন। এই চিত্র আলোক-চিত্রণ বা ফটোগ্রাফীর সাহায্যেই প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুতি প্রণালী নিতান্ত সহজ নহে। বিচক্ষণ আলোকচিত্রকর ব্যতীত এই কার্য্য সুন্দররূপে লোকে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন না। বিশেষ ইহার জন্য যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় তাহাও আলোকচিত্র অর্থাৎ আলোকচিত্রকের সাধারণ যন্ত্র নহে—তাহার যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে এবং তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। এক প্রস্থ হাফটোনের যন্ত্র ক্রয় করিতে ন্যূনকল্পে চারি পাঁচ সহস্র মুদ্রার আবশ্যক হয়। ত্রৈ-বর্ণিক হাফটোন প্রস্তুতের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি পূর্ব্বোল্লিখিত যন্ত্র হইতেও অধিক মূল্যবান এবং ইহার প্রস্তুতিপ্রণালী অপেক্ষাকৃত অধিকতর কঠিন, সুতরাং সে সকল বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা সহজ নহে। সময়ান্তরে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। একাল উহার মুদ্রণপ্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

প্রথমতঃ সাধারণ হাফটোন চিত্র মুদ্রিত করাও সকল মুদ্রাকরের সাধ্যাধীন নহে। ইচ্ছা করিলেই যে কেহ সাধারণ পুস্তকাদি মুদ্রণের ন্যায় এই চিত্র মুদ্রণ করিতে পারিবেন না। ইহা "ট্রিডিল মেসিন" নামক যন্ত্রেই সুন্দর মুদ্রিত হয়। কলিকাতার মুদ্রাকর মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত আছেন।

সাধারণ হাফটোন ব্লক বা চিত্রফলক যে ভাবে ট্রিডিল মেসিনে আবদ্ধ করিয়া মুদ্রিত করিতে হয়, ত্রিবর্ণ-চিত্র ফলকও ঠিক সেই ভাবেই মুদ্রিত হইয়া থাকে। তবে ইহার তিনটী বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিন খানি চিত্রফলক থাকে—তিনবার উপর্য্যুপরি মুদ্রিত করিলে তাহা সম্পন্ন হয়।

এই স্থানে বর্ণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা গৃহ প্রাঙ্গনে, পথে, ঘাটে সতত যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাতে অসংখ্য বর্ণের উপলব্ধি হইলেও উহার মূলীভূত তিনটী মাত্র বর্ণ আছে; যাহাকে মূল বর্ণ বলিয়া বিজ্ঞানবিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই মূল বর্ণ—রক্ত, পীত ও নীল। আমরা ত্রিপার্শ্ব বিশিষ্ট একটী ঝাড়ের কলমের মধ্য দিয়া বাহিরের যে কোন বস্তু অবলোকন করিলে ঐ মূল তিনটী বর্ণই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আকাশে রামধনুর মধ্যে আমরা অনেক সময় তাহার আভাষ অনুভব করি। সুতরাং বিজ্ঞানানুসারে শুভ্র সূর্য্যালোকের কোন বর্ণ নাই বা তাহা ঐ তিনবর্ণেরই সমাহার মাত্র। ঐ তিনটী বর্ণ উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া নানা বর্ণের বিকাশ করিয়া দেয়। যথা, রক্ত, পীত মিশ্রিত করিলে অরুণ বা কমলালেবু বর্ণ, পীত ও নীলের মিশ্রণে হরিৎ বা সবুজ বর্ণ এবং নীল ও লোহিত মিলিত হইলে পাটল বা বেগুণি বর্ণ এইরূপে পরস্পর দুইটী বা ততোধিক মিশ্র বর্ণের সম্মিলনে আবার অন্য বিবিধ বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ত্রিবর্ণ চিত্রের জন্য তিনটী ব্লক বা

চিত্র ফলকের আবশ্যক হয়। শিল্পী যে কোন রঞ্জিত চিত্র হইতে অভিনব কৌশলে সকল বর্ণের সার সেই তিনটী মূল বর্ণ পৃথক বিশ্লেষণ করিয়া এক একটী মূল বর্ণের জন্য এক এক খানি ফলক প্রস্তুত করিয়া দেন। মুদ্রাকর সেই চিত্রফলক তিন খানি সাধারণ হাফটোন চিত্র মুদ্রিত করিবার উপায়ে প্রথমে পীতবর্ণ, তাহার পর লোহিত, সর্ব্বশেষে নীল মুদ্রিত করেন। ইহার মুদ্রণ জন্য যে মসী বা ইঙ্ক (Ink) ব্যবহার হয় তাহাও স্বতন্ত্র, তাহাকে Three-colour Process Ink বলে। তাহার মূল্যও সাধারণতঃ অধিক অর্থাৎ প্রতি পাউণ্ড ৫।৬ টাকার কমে নহে। ইহা এরূপ সাবধানে মুদ্রিত করিতে হয় যে, প্রথমে পীতবর্ণ মুদ্রিত হইলে উহার উপরেই লোহিত বর্ণ মুদ্রিত করিতে হইবে, কিন্তু এমন ভাবে তাহা মুদ্রিত করা আবশ্যক যেন এক চুল মাত্রও তাহার এদিক ওদিক না হয়, দুইটী ঠিক উপরে উপরে, পড়া চাই। উহার অন্তর্গত উভয় বর্ণের রেখার মধ্যে পরস্পর মিল না হইলে উহার সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। এইবারে 'শিল্প ও সাহিত্যে' ত্রিবর্ণ-চিত্রের যে দুই খানি চিত্র দেওয়া গেল, তাহা মনোযোগ সহকারে দেখিলেই সকলে উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। প্রথম চিত্রে (১) পীত, (২) লোহিত, ও (৩) নীল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় চিত্রে প্রথমে (৪) ঐ পীতবর্ণ মুদ্রিত করিয়া উপরেই রক্তবর্ণ মুদ্রিত করা হইয়াছে ইহা উপর্য্যুপরি দুই বারের মুদ্রণ দ্বারা সম্পন্ন হইল। পরে (৫) প্রথমে পীত, তাহার উপর লোহিত, সর্ব্বশেষে নীল. যথাক্রমে এই তিনটী বর্ণ তিন বারে মুদ্রিত করিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, ঐ তিনটী বর্ণের পরস্পর সম্মিলন বা সমাহারে অরুণ, পাটল, ধূম্র আদি কত বিভিন্ন স্বাভাবিক বর্ণের বিকাশ হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রস্তরচিত্র বা লিথোগ্রাফের গর্ব্ব অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়াছে। লিথো চিত্রে এত দিন নানা বর্ণ বহু বার মুদ্রিত করিবার আবশ্যক হইত। অর্থাৎ মূল এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মিশ্রবর্ণের জন্যও স্বতন্ত্র প্রস্তরফলক প্রস্তুত করিতে হইত ও তাহা হইতে প্রত্যেক বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রণ প্রক্রিয়ার আবশ্যক হইত; কিন্তু এই ত্রিবর্ণ-চিত্রের আবিষ্কার ব্যাপারে সে পরিশ্রম ও ব্যয়ের লাঘব হইয়াছে। এই সংখ্যার চিত্র পত্র দুইটী অতি ব্যস্তভাবে মুদ্রিত হওয়ায় কোন কোনটি সেরূপ সুন্দর হয় নাই। কোন কোনটী পরস্পর বর্ণ-রেখা হইতে সামান্য বিচ্যুত হইয়াছে। বারান্তরে আমরা অন্যান্য ত্রিবর্ণ-চিত্র মুদ্রিত করিয়া 'শিল্প ও সাহিত্যের' পাঠকবর্গকে উপহার দিব। তাহাতে এই শিল্পের সৌন্দর্য্য সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। ব্লক তিনখানি অটো ফ্লোর‍্যাল কোম্পানির জন্য আমাদিগের স্কুল হইতেই সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

ত্রিরত্ন-বিজয়।

(১৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

রাজধানীর অবস্থা।

চল পাঠক, একবার পাটলীপুত্রে কি হইতেছে দেখা যাক্ :—

কুমার মহেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া. অশোক মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে রাজধানী অভিমুখে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া, শোণভদ্রের উত্তর পারে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছেন, এ সংবাদ পাটলীপুত্রে পৌঁছিবামাত্র নগরের অবস্থা বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। রাজকুমার অশোক সনাতন বেদোক্তমার্গ পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছেন বা শীঘ্রই করিবেন, বারাণসীতে বৌদ্ধভিক্ষুগণের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা যাতায়াত ও মন্ত্রণা—কর্ম্মী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি তাঁহার অনাস্থা—এই সকল ব্যাপার যতদূর সম্ভব অতিরঞ্জিত হইয়া পাটলীপুত্রের প্রত্যেক নাগরিকের মুখে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পাটলীপুত্রে এখনও বৌদ্ধবিহার বা সঙ্ঘারাম প্রকাশ্য ভাবে স্থাপিত হয় নাই সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ধনী বণিকই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উদারতা অকপট নীতির প্রতি মনে মনে নিতান্ত অনুরক্ত। এক পাটলীপুত্র ছাড়া সে সময়, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান নগরে সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ধনী বৈশ্যগণ প্রকাশ্যভাবে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন, মথুরা, বারাণসী, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ ও বৈশালী প্রভৃতি বাণিজ্যপ্রধান নগরে বড় বড় বৌদ্ধ বিহার এবং সঙ্ঘারামের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণের অসাধারণ আত্মত্যাগ অসামান্য পরোপচিকীর্ষা অগাধ জ্ঞানবিভব ও অলৌকিক বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া জনসাধারণ ক্রমেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতেছিল। ভারতের ধনী বণিকসম্প্রদায় চিরদিনই দানধর্ম্মে জগতে অতুলনীয়, তাঁহাদের মুক্তহস্ততার প্রসাদে ভারতের চারিদিকেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দিন দিন যেন নূতন বলে জাগিয়া উঠিতেছিল, পাটলীপুত্র ভারতের একচ্ছত্রী হিন্দু নরপতির রাজধানী—এখানে কিন্তু ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত প্রভাববশতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকিলেও লোকে মনের মত করিয়া উহার প্রতি আদর দেখাইতে পারিত না। ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে রাজার আদেশ হইল যে, পাটলীপুত্রে কোন বৌদ্ধবিহার বা সঙ্ঘারাম স্থাপিত হইতে পারিবে না, বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে শাস্তি হইবে—নির্ব্বাসন, রাজপথে প্রকাশ্য ভাবে জনতা করিয়া ত্রিরত্নের জয়ধ্বনি করিলে—দুই বৎসর কঠোর কারাবাস ইত্যাদি নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণগণ-পরিচালিত মন্ত্রিসভা রাজধানীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল, এই সকল কঠোর নিয়ম বা নির্য্যাতনের যাহা অবশ্যম্ভাবি ফল—তাহা পাটলীপুত্রে না হইবে কেন? লোকে প্রকাশ্য ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলেও তাহাদের মনে মনে সেই নবোদিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আস্থা দিন দিন আরও বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অনেক আস্থাবান্ যুবক প্রকাশ্যভাবে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নির্ব্বাসন বা কারাগারকে গৌরবের পথ বলিয়া অবলম্বন করিল। অনেকে রাজধানীতে বাস উঠাইয়া দিল, ফল হইল বাণিজ্যের অধোগতি ও রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ আরও কঠোর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। বিপন্নের পরিত্রাণার্থ অর্থ ব্যয় করিতে বাধা দিয়া, জ্যোতিষ্টোম সৌত্রামণী ও বাজপেয় প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য ও হিংসাবহুল বৈদিককর্ম্মগুলি যাহাতে অধিকভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার জন্য ব্রাহ্মণগণ অত্যধিক প্রযত্ন করিতে লাগিলেন। দেশে কোথায় অজন্মা হইয়া দুর্ভিক্ষ হইল

তাহার খোঁজ নাই, প্রতীকারের জন্য বিশেষ চেষ্টাও নাই, মহামারীতে এক একটা নগর জন শূন্য হইতেছিল তাহার দমনের জন্য কাহারও আগ্রহ ছিল না—কেবল যজ্ঞ কর—রাশি রাশি পশুহত্যা কর—আর অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া ধুমরাশির পবিত্র গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত কর, তাহা হইলেই তোমার পরলোক হস্তগত, এই জন্ম কিসের জন্য? পরলোকে কিসে স্বর্গ হয়, তাহার উপায়টুকু সঞ্চয় করিবার জন্যই ত এই মনুষ্যজন্ম। এই ভাবে হিংসাবহুল বৈদিক ধর্ম্ম জোর করিয়া প্রবর্ত্তিত করাই তখন ব্রাহ্মণ-পরিচালিত রাজবংশের একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার ফলে রাজার প্রধান কার্য্য প্রজারঞ্জন এক প্রকার লুপ্ত হইয়া আসিল। বিম্বসারের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণগণ নূতন সম্রাট সুষীমকে একেবারে পাইয়া বসিলেন। কিসে বৈদিকধর্ম্ম দেশে আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়,—তাহাই রাজার প্রথম কর্ত্তব্য—ইহাই তাহারা নব সম্রাটকে চক্রান্ত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সম্রাট একেবারে ব্রাহ্মণগণের হস্তগত হইয়া পড়িলেন। প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির পদ হইতে আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য যাবতীয় উচ্চ পদে নিয়োগ, তাহা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণগণেরই হস্তগত হইয়া পড়িল। অমুক নাস্তিক, কারণ, উহার গৃহে জ্যোতিষ্টোম হয় না, সুতরাং উহাকে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিতেই হইবে, অমুক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি মনে মনে আস্থাবান্, সুতরাং উহাকে এত বড় রাজকার্য্যে নিয়োগ করিলে যজ্ঞ-পুরুষ অসন্তুষ্ট হইবেন, এই প্রকার উপদেশের প্রভাবে কত প্রাচীন সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী অকস্মাৎ কর্ম্মচ্যুত হইলেন, কত প্রথিতকর্ম্মা ব্যক্তির রাজকার্য্যে নিয়োগের পথ একেবারে রুদ্ধ হইল তাহার ইয়ত্তা রহিল না।

এই প্রকার একদেশদর্শিনীতির প্রসারে রাজকার্য্যে অধিকাংশ খোসামুদে অযোগ্য ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ ক্ষমতা পাইতে লাগিল, এইরূপ অযথা নিয়োগের অবশ্যম্ভাবি ফলে প্রজাপুঞ্জের মধ্যে রাজপুরুষকৃত অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, আর অসন্তোষের বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এই প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে যখন রাজধানীর নিরীহ প্রজাবর্গ ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছিল সেই সময় একদিন নগরে প্রচার হইল যে—রাজকুমার অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সসৈন্যে পাটলীপুত্রের অভিমুখে যাত্রা করিয়া শোণভদ্রের উত্তর তটে সেনা নিবেশ স্থাপন করিয়া, সুযোগ বুঝিয়া শোণভদ্র পার হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ক্রমশঃ—

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

শ্মশান-ধর্ম্ম।

মৃত্যুর পূর্ব্বে, প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে, বিবাহ যেমন একটি প্রধান ধর্ম্মক্রিয়া বলিয়া গণ্য হয়, মৃত্যুর পরে শবদাহন তেমনি একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হইলে তাহার সদ্গতি হয় না, ইহা শাস্ত্রকর্ত্তা মহর্ষি মহোদয়গণের উক্তি। সমাজ, সমাধি ও দাহ, এই তিন প্রকারে হিন্দুর মৃত দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া থাকে। পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত পুরুষগণসম্বন্ধে

কেহ কেহ তাঁহাদের মরণের পরে পার্থিব শরীরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবার আদেশ না দিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার আদেশ দেন, ইহাঁদের মৃতদেহ যে স্থলে প্রোথিত হয়, তাহার নাম "সমাজ"; কোন কোন বৈষ্ণব ও ভক্তের শব, শ্মশানে দগ্ধ হইয়া যাইলে, আত্মীয় অথবা শিষ্যগণ শ্মশানভস্ম আনিয়া স্থানান্তরে প্রোথিত করিয়া দেন, এরূপ পবিত্র স্থানকেও সমাজ বলা হইয়া থাকে। যাঁহার শব, অগ্নিতে স্পর্শ না করাইয়া অবিকৃতাবস্থায় মাটিতে পুতিয়া দেওয়া হয়, সেই সাধুর দেহকে 'সমাধিস্থ' করা হইল, এইরূপ বলা কথিত হইয়া থাকে। যাহাদের মৃত শরীর শ্মশানে দাহ হইয়া থাকে তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নাম "দাহন" বা শ্মশান-ধর্ম্ম। "সমাধি" ও "সমাজ" শ্রেণীস্থ শবের সংখ্যা অল্প, অধিকাংশ লোকের শব শ্মশানে দাহ হইয়া ভস্ম হইয়া যায়। হিন্দুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কেবল শাস্ত্র বিধি বা সামাজিক বিধি নহে, পরন্তু ইহা পরম ধর্ম্মক্রিয়া বলিয়া গণ্য। মৃত ব্যক্তির শব দাহনে পরলোকগত পুরুষের যেমন সদ্গতি হয়, শ্মশানে যাঁহারা শবকে বহন করিয়া লইয়া যান অথবা দাহ সম্পর্কে কোন প্রকারে সহায়তা করেন, তাঁহারাও পরম পুণ্য লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; এই জন্য শাস্ত্রে ইহা শ্মশান-ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়ম ও মন্ত্রগুলি অভ্যাস করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কোনও হিন্দু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারেন। শবদাহন ক্রিয়া "মড়াপোড়া" (মড়ুইপোড়া) ব্রাহ্মণের যে নিতান্ত আবশ্যক, শাস্ত্রকর্ত্তারা এরূপ বিধান দেন নাই, সুতরাং যে কেহ মন্ত্র ও নিয়মগুলি শিক্ষা করিয়া যথারীতি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারেন। অনেক স্থলে বিদেশে বা দুর্বিপাকে ব্রাহ্মণ অভাবে সেই পবিত্র শ্মশানধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না। সেই কারণ নিম্নে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি বিবৃত হইল।

মৃত শরীরকে স্নাত করাইয়া, বস্ত্রান্তর দ্বারায় আচ্ছাদনপূর্ব্বক অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ কুশোপরি শয়ন করাইবে। শবের মস্তক দক্ষিণদিকাভিমুখে থাকা আবশ্যক। অনন্তর দেহে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিবে—

গয়াদীনি চ তীর্থানি যে ক পুণ্যা শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাঃ।
কৌশিকীং চন্দ্রভাগঞ্চ সর্ব্ব পাপ প্রণাশিনীং।
ভদ্রাব কাশ্যাং গণ্ডক্যাং সরযুং পণসাস্তথা।
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থ পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরং তথা।

এই মন্ত্র পাঠের পরে শবোপরি চন্দন মাখাইয়া দিবে। মৃত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ জাতীয় হয়েন, তাহা হইলে উপবীত পরাইয়া দেওয়া উচিত। তদনন্তর কর্ণ, চক্ষু, মুখ, নাসিকা ও ওষ্ঠে সুবর্ণ বা কাংস্য স্পর্শ করাইয়া শবকে বস্ত্রান্তরদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক শ্মশানে লইয়া যাইবে। শ্মশানাভিমুখে যাইবার সময় ভূমিতলে শবকে মধ্যে মধ্যে নামাইয়া রাখা অকর্ত্তব্য, কিন্তু বাহকেরা যদি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভূমির উপরে শবকে নামাইয়া রাখিলে পাঁচ গণ্ডা কড়ি ঐ স্থানে ফেলিয়া দিবে। এইরূপে যতবার নামাইবে ততবার পাঁচগণ্ডা কড়ি ফেলিতে হইবে। শ্মশানে, শব লইয়া পৌঁছিলে, শবকে স্নান করাইতে হয়, কিন্তু পূর্ব্বে যদি মৃত দেহ স্নাত হইয়া থাকে, তাহা

হইলে আর স্নানের আবশ্যক নাই, স্নাত না হইয়া থাকিলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। দাহ-স্থানের কিয়দংশ গোময়লিপ্ত করিয়া পিণ্ড রাখিবে, তাহার পরে জানু পাতিয়া বসিয়া—

"অপহৃত সুরা রক্ষাংসি বেদি সদ্"

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক চতুষ্কোণ রেখা আঁকিবে। অনন্তর কুশাসন বিস্তৃত করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রে প্রেতের আবাহন করিতে হয়।

এহি প্রেতঃ সৌম্যগম্ভীরেভিঃ পথিভি
পূর্ব্বিনেভিঃ দেহস্মভ্যং দ্রবিলেহ
ভদ্রং রয়িঞ্চণঃ সর্ব্ববীরং নিমচ্ছ।

আবাহন শেষ হইলে কুশোপরি তিল দিয়া বাম হস্তে কুশমূল গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে সতিল জলগণ্ডুষ লইয়া কুশের উপর প্রক্ষেপ করিবে। তাহার পরে নীচের লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জল দান করিবে।

"অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্নবনে নিক্ষ্ব॥"

অনন্তর দক্ষিণ হস্তে পিণ্ড লইয়া বাম হস্তে আম-পাত্রে সতিল জল করিয়া পিণ্ডদান করিবে।

"অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্নে তত্তে
অন্নমুপ তিষ্ঠতাং" ইতি।

কুশোপরি পিণ্ড দিয়া হস্তক্ষালন জল উক্ত মন্ত্র পড়িয়া পিণ্ডোপরি দিবে। গন্ধাদিও দিবে, ইহার মন্ত্র নাই। সামবেদী ভিন্ন অন্য বেদীদিগের পূর্ব্বোক্ত আবাহন নাই। পুত্রাদিরা স্নান করতঃ কাষ্ঠসমূহে চিতা রচনা করিয়া বস্ত্রদ্বয় সহিত কাষ্ঠোপরি শবকে শয়ন করাইবে। সামবেদীয়েরা পুরুষকে উপুড় ও স্ত্রীকে চিৎ করাইবে; কিন্তু দক্ষিণ শিরা করিবে। অন্য বেদীয়েরা কেবল উত্তর শিরে শয়ন করাইবে, এই মাত্র প্রভেদ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলদগ্নি গ্রহণ করিবে।

"দেবাশ্চাগ্নি মুখাঃ সর্ব্বে এনং দহন্তু।"

এই মন্ত্র পড়িয়া প্রদক্ষিণ করতঃ দক্ষিণ মুখ হইয়া শিরস্থানে অগ্নি প্রদান করিবে।

"কৃত্বাতু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতবাপ্য জানতা।
মৃত্যুকাল বশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতং।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ সগচ্ছতু॥"

অনন্তর দাহাবসানে, দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ চিতাগ্নিতে সাতখানি ছোট ছোট কাঠ চিতায় ফেলিয়া দিয়া চিতাকে প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পরে এই মন্ত্র পড়িয়া কুঠারাদি দ্বারা একবার চিতাস্থ প্রজ্বলিত কাষ্ঠের উপর আঘাত করিবে যথাঃ—ক্রব্যাদায় নমস্তভং"

অনন্তর অগ্নিকে বাম করিয়া নদ্যাদিতে স্নানার্থ গমন করিবে। পুনর্ব্বার চিতাকে আর দেখিবে না। দাহ শেষ হইলে দাহকর্ত্তা সপ্তকুম্ভ জল এবং অন্য দাহকেরা এক এক কুম্ভ জল সেচন করিয়া চিতার উপর পূর্ণ কলসী রাখিয়া কুঠারাঘাত পূর্ব্বক স্নানে গমন করিবে। শব সম্বন্ধীয় বস্ত্রাদি শ্মশানরক্ষী চণ্ডালদিগকে দিবে। কদাচ উলঙ্গ শব দাহ করিবে না।

যদি সূতিকা কি রজস্বলা স্ত্রী মৃতা হয়, তবে পঞ্চগব্য, জলে কুম্ভপূর্ণ করিয়া, এই মন্ত্র পাঠে স্নান করাইয়া দাহ করিতে হইবে।

আপোহিষ্ঠা ময়ো ভূবঃ স্নান
উর্জ্জে দধাতনঃ মহেরনায় চক্ষুষে ইতি।

ঐ মন্ত্রের পরে গায়ত্রী উচ্চারণ করিবার বিধি আছে, তাহার পরে দাহ করিতে হয়।

যে কোন শব হউক, দাহ হইয়া গেলে, দাহকর্ত্তা ও সঙ্গিগণকে স্নান করিতে হইবে। স্নানের পরে এক অঞ্জলি জল লইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে শুদ্ধ হয়।

অর্পণঃ শুসোকদয়ঃ। অমুক গোত্রং প্রেতং অমুক (নাম) তর্পয়ামি। তত্তিলোকদকং তৃপ্তস্য।

অনন্তর গৃহে গমন করিবে। দিনে দাহ হইলে সূর্য্যাস্তের পরে গৃহে যাইবে, রাত্রিতে দাহ হইলে সূর্য্যোদয়ের পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিও। অগ্নি, লৌহ, ঘৃত, তণ্ডুল অথবা নিম্বপত্র স্পর্শ করিতে হয়। মৃত ব্যক্তির অস্থি যদি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবার হয় তাহা হইলে উত্তরমুখে আচমন করতঃ কুশবারি লইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথাঃ—

অদ্যেত্যাদি অমুকেমাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ
অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ এতদস্থি
সমসংখ্যক বর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গাধিকরণঞ্চ
মহীয় মাণত্বকামঃ অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ
এতানি অস্থিখণ্ডাণি গাঙ্গয়াং প্রক্ষেপাণীতি।

পঞ্চগব্যে অস্থিকে অভিষিক্ত করতঃ সুবর্ণ মধু দুগ্ধ ও তিল সংযুক্ত মৃত্তিকামধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়া এই মন্ত্র পড়িয়া জলে নামিবে, যথাঃ—"নমোধর্ম্ম রাজায়"।

অনন্তর এই মন্ত্র পড়িয়া জলে নিক্ষেপ করিবে; যথাঃ—

"সমে প্রীতৌ ভবতু"

পরে সূর্য্য দর্শন পূর্ব্বক দক্ষিণান্ত করিবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সমালোচনা।

বিজ্ঞানদর্পণ:—১ম বর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুনের—১ম দুই সংখ্যা পাইয়াছি। কাগজখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "উদ্দেশ্য" প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে, "অনুসন্ধিৎসু ভারতবাসী আমাদের এই পত্রিকা পাঠে হয়ত আরও শত শত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন এবং প্রকৃতি পরিব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ জীবনের আরও অচিন্তনীয় মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।" ইহাই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যে মহৎ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বিজ্ঞান উন্নত হইলে "ধর্ম্মপ্রণালী বিজ্ঞান পরিমার্জ্জিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে," এবং বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে এখনও ভারতবর্ষের পল্লীর ব্রাহ্মণেরা "সূর্য্যকে ভগবানের আসনে বসাইয়া বিশ্বস্রষ্টার অপমান করিতেছেন" এই গুলিতে যেন পরিচালকবৃন্দের সুচিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব কিয়ৎপরিমাণে সূচিত হইতেছে। বিশেষ যে সকল সত্য পূর্ব্বাচার্য্য আর্য্য-ঋষিগণের প্রভূত গবেষণাসিদ্ধ, যাহার বিরুদ্ধে এমন কিছু নূতন সত্য এ পর্য্যন্ত কেহ উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই, তখন সেই বিজ্ঞানমূলক ভারতের সমুন্নত দর্শনের উপর কটাক্ষ করা বোধ হয় সঙ্গত হয় নাই। প্রবন্ধগুলির মধ্যে "এলুমিনিয়ম ধাতু ও তাহার প্রয়োজনীয়তা (মাঘ); ও "আবাদ" (ফাল্গুন) এই দুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। "জীবনীশক্তির মৌলিক উপাদান" ও "রেডিয়াম" প্রবন্ধদ্বয় বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। "শিলাবৃষ্টি নিবারণ ব্যোমযান"—একটি বৈজ্ঞানিক চুটকী।

মোট কথা, বিজ্ঞান-দর্পণে যে যে আদর্শ প্রতিবিম্বিত হইবে, সেগুলি সুন্দর ও সুস্পষ্ট হইলেই দর্পণের সার্থকতা। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ বাঙ্গলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সহজসাধ্য বিষয় নহে, বিশেষতঃ পারিভাষিক শব্দের জন্য সময় সময় লেখককে যে কি পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সুতরাং বিজ্ঞান-দর্পণের পরিচালকবর্গ যে দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার বিষয়ে তাঁহারা সামান্য দৃষ্টি রাখিলে বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষা চিরদিন তাঁহাদিগের নিকট ঋণী থাকিবে। আমরা একটীমাত্র শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করিলাম। সেটী "আলোক চিত্র," ইহার অর্থ আমাদের মনে হয় 'Photograph', কিন্তু তাহার প্রস্তুতি-প্রণালীকে "আলোক চিত্রণ" বা Photography বলিলে সঙ্গত হয় না কি? আশা করি আমাদের নূতন সহযোগী এ সকল বিষয়ে সামান্য লক্ষ্য রাখিবেন। আমরা বিজ্ঞান-দর্পণের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ভারতী—ফাল্গুন ১৩১৫। কতকগুলি সুপাঠ্য ও সুচিন্তিত প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। "স্বপ্নকন্যা" ও "যৌবন উৎসব" এ দু'টি গল্প;—বেশ সুন্দর! যৌবন উৎসব গল্পের শেষের লাইনটী "প্রণয়ের উৎস হইতে অল্পই পান করা উচিৎ—বেশী পান করা ঠিক নহে" এ কথাটির সত্য বোধ হয় সকলেরই (যিনি পান করিয়াছেন, যিনি পান করিতেছেন, এবং যাঁহারা পান করিবার বাসনা রাখেন) গ্রহণ করা উচিত। "ঋতুর কথা" স্ত্রীপাঠ্য প্রবন্ধ, বেশ মৌলিকতা আছে। "তরুসংহ" ঐতিহাসিক চিত্র। "তুই ইচ্ছা" ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ মাঘোৎসবে পঠিত। "স্পষ্ট-কথা" এ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ থাকিলেও ইহা যে, শুধু শিল্প-কলাবিদের উপর কটাক্ষ নহে, তাহা বলা যাইতে পারে; আজ কালকার বিকৃতরুচি বৈদেশিক চাল চলন অনিচিকির্ষু, সকলেরই কিছু কিছু ভাবিবার কথা ইহাতে আছে। প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও গুরুত্ব আছে। বিলাতি জাহাজ—ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক লিখিত। যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি হইয়াছে। "হিন্দু মুসলমানের রাজনীতিক স্বার্থ" এটি রাজনীতিক প্রবন্ধ। "চয়ন"—কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনীতিক প্রবন্ধের সমষ্টি। "নিষ্ফল" কবিতাটি "কবি-সমাধি" বেশ। কবিতাটিও ভাল।

সনাতন সাধনতত্ত্ব।

বা

তন্ত্র কি?

পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। শিল্প ও সাহিত্যের পাঠকবর্গকে এ পুস্তকের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। ইহা শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামীর সেই "তন্ত্র কি" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ মাত্র। যাঁহারা ইহা একত্রে সম্পূর্ণ পাঠ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা সত্বর গ্রহণ করুন। ইহাতে স্বনামপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ, মহাশয় লিখিত ভূমিকা সন্নিবেশিত হইতেছে এবং আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালিকার এক খানি সুন্দর হাফটোন চিত্র প্রদত্ত হইবে। বিলাতিবৎ সুন্দর বাঁধাই এই পুস্তকের মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শিল্প ও সাহিত্য কার্য্যালয়,
ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, বহুবাজার, কলিকাতা।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

The Indian Art School, Bowbazar, Calcutta.

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড | সন ১৩১৩—বৈশাখ। | ৮ম সংখ্যা।

লালকুয়ার।

বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর এক সর্ব্বব্যাপী অরাজকতার মধ্যে জাহান্দার সাহ দাক্ষিণাত্যের প্রবল-পরাক্রান্ত সুবাদার জুলফিকার খাঁ সাহায্যে মোগল-সিংহাসন অধিকার করিলেন। জুলফিকার খাঁর পিতা আমাদ খাঁ বাদসার অনুগ্রহে অথবা পুত্রের ক্ষমতা প্রভাবে উকীল-ই-মুৎলক বা সম্রাটের প্রতিনিধি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। জুলফিকার স্বয়ং রাজধানীতে থাকিয়া প্রতিনিধি দায়ুদ খাঁ দ্বারা দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে লাগিলেন।

জাহান্দার সাহের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও বিলাসপটু আর কেহ দিল্লী-সিংহাসনে বোধ হয় আরোহণ করেন নাই। তিনি দিবা রাত্রি 'লালকুয়ার' নাম্নী এক উপপত্নীর সহিত কালাতিপাত করিতেন এবং লালকুয়ারের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। সম্রাট এই লালকুয়ারকে 'ইম্‌তিয়াজ মহালবেগম' বা অন্তঃপুরের রাণী এই সম্মানীয় উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং বাদসাহ নিজে যেরূপ ছত্রধারী হইয়া গমনাগমন করিতেন, লালকুয়ারও তদ্রূপ আড়ম্বরের সহিত হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণের অনুমতি প্রাপ্ত হইল। দিন দিন বাদসার অনুগ্রহ লালকুয়ারের প্রতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লালকুয়ারের ভ্রাতা খোসাল খাঁকে বাদসাহ সপ্তহাজারী পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠতাত নীজামত খাঁ পঞ্চহাজারী হইলেন। বাদসাহ ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া একবারবাদের শাসনকর্ত্তার পদে খোসাল খাঁকে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া সনন্দ দস্তখত করিয়া মোহরাঙ্কিত করিবা

জন্য উজীর জুলফিকার খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। সনন্দ দৃষ্টে মোহরাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে, উজীর নিজের নজর স্বরূপ ৫০০০ হাজার সেতার ও ৭০০০ হাজার জয়ঢাক খোসাল খাঁর নিকট চাহিয়া পাঠাইলেন। খোসাল খাঁ এরূপ বিদ্রূপে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার ভগিনীর দ্বারা সম্রাটকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। উজীরের কৃপায়ই সম্রাট সিংহাসন-লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস না করায়, সময়ান্তরে উজীরকে এইরূপ বিদ্রূপের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর জুলফিকার খাঁ গম্ভীর ভাবেই উত্তর করিলেন যে, "ইহাতে লেষমাত্রও বিদ্রূপ নাই;" এবং কারণ স্বরূপ বলিলেন যে, "বাদসাহের সকল আমীর-ওমরাহ বা শাসনকর্ত্তাগণ বংশপরম্পরাক্রমে এই সমস্ত পদ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে নর্ত্তক, বাদক ও নর্ত্তকীগণ চিরন্তন প্রথানুসারে কেবলমাত্র পারিতোষিকই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যদি এই নর্ত্তক নর্ত্তকীগণকেই কেবল এইক্ষণ আমীর ওমরাহের পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বাদসাহের আমীর ওমরাহগণ অন্নাভাবে মারা যাইবে। উজীর আরও বলিলেন, যে "বাদসাহ অবশ্যই ইহা ইচ্ছা করেন না; সুতরাং বংশ পরম্পরাগত যাঁহারা এই সমস্ত উচ্চ পদ দখল করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সহিত এই নূতন দলের পদ পরিবর্ত্তন করা হউক এবং এই উদ্দেশ্যেই আমি পুরাতন আমীর ওমরাহদিগের মধ্যে বিতরণার্থ এই নূতন দলের নিকট ৫০৪০ হাজার সেতার ও ৭০০০ হাজার জয়ঢাক উজীরের মর্য্যাদা স্বরূপ দাবী করিয়াছিলাম।" ইহার উপরে আর কথা চলে না, সুতরাং খোসাল খাঁর আর পদোন্নতি হইল না।*

যাহা হউক, খোসাল খাঁ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত না হইলেও তাঁহার ও লালকুয়ারের ক্ষমতা অপ্রতিহত রহিল। কিন্তু সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এক অতর্কিত ঘটনায় এই ক্ষমতা আবার কিছু বাধা প্রাপ্ত হইল।

জাহান্দর সাহার বাদসাহ হইবার বহু পূর্ব্বে যখন লালকুয়ার দিল্লীর এক সামান্য নর্ত্তকীরূপে জীবনাতিপাত করিত, তখন জোহারা নাম্নী এক সবজীবিক্রেত্রীর সহিত সে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিল। লালকুয়ারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জোহারারও উন্নতি ও পদমর্য্যাদা হইয়াছিল। সুসজ্জিতা এক কুলকীর উপর আরোহণ করিয়া এবং বহু অনুচর পরিবেষ্টিতা হইয়া জোহারা রাজধানী পরিভ্রমণ করিত। লালকুয়ারের সখ্যতা ও অনুগ্রহের বলে, জোহারা অন্তঃপুর পর্য্যন্ত গতিবিধির অনুমতি পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঔদ্ধত্যও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ঔদ্ধত্য প্রায়ই সাংক্রামিক, সুতরাং জোহারার অনুচরবর্গও দিল্লী সহরে কাহাকেও আমলে আনিত না। ঘটনাচক্রে এক দিন চিনক্লিজ খাঁন † নিজ অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া কোন কার্য্য বশতঃ রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই দিন জোহারাও অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিতা হইয়া লালকুয়ারের সন্দর্শনে যাত্রা করিয়াছিল। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া চিনক্লিজ খাঁন তাঁহার অনুচরবর্গকে পাশ কাটাইয়া যাইতে আদেশ করিলেন কিন্তু এই সময়ে জোহারার কুনকীর চিনক্লিজ খাঁয়ের হস্তীর সন্নিকট হইবামাত্র হাওদার উপরিস্থিত পর্দ্দা সরাইয়া চিনক্লিজ খাঁকে সম্বোধন করিয়া গর্ব্বিত ভাবে জোহারা বলিয়া উঠিল 'চিনক্লিজ খাঁ! তুই—নিশ্চয়ই কোন অন্ধ পিতার পুত্র"। আকস্মিক এই প্রকার ঘোরতর অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া খাঁসাহেব তাঁহার ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। ক্রোধ প্রশমিত না করিয়া তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে ইসারা করিলেন। ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহার পার্শ্বচরগণ জোহারার অনুচরবর্গকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিতাড়িত করিয়া জোহারাকে কুনকীর উপর হইতে টানিয়া আনিয়া যদৃচ্ছাভাবে কিল, চড় ও লাথী প্রয়োগে তাহার অবিমৃশ্যকারিতার ফল ভোগ করাইতে লাগিল। নিমেষমধ্যে এই ঘটনা হইয়া গেল। পরক্ষণেই চিনক্লিজ খাঁর চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উজীর জুলফিকার খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আমূল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

জুলফিকার খাঁ অবিবেচক ছিলেন না। তিনি চিনক্লিজখাঁর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই বাদসাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে "বাদসাহের প্রভু-ভক্ত আমীর ওমরাহদিগের সম্মান সকলেরই সমান এবং চিনক্লিজ খাঁর কার্য্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং এ বিষয়ে আমিও তিনি একমত।"

জোহারা ইতিমধ্যে লালকুয়ারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিয়া এবং রাজান্তঃপুরের বহির্ভাগে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিল। লালকুয়ার ও সহযোগিনীর দুঃখে নিশ্চিতা ছিল না। বাদসাহকে সবিশেষ রূপেই উত্তেজিত করিতে লাগিল কিন্তু পরক্ষণেই উজীরের ঐ পত্র বাদসাহ সমীপে পৌছাতে লালকুয়ার বা জোহারার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না।

লালকুয়ারের উপযুক্ত ভ্রাতাও, এই সময়ে ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল। এই সময়, সে একটী সুন্দরী ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিবাহিতা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়। এই যুবতীর স্বামী, জুলফিকার খাঁর শরণাপন্ন হওয়াতে, উজীর তখনই তাঁহার অনুচর বর্গকে খোসাল খাঁকে জীবিত বা মৃত যে অবস্থায়ই হৌক, তাঁহার নিকটে আনয়নের আদেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য লালকুয়ার ও তাহার আত্মীয়গণের প্রতি কাহার সুদৃষ্টি ছিল না; সুতরাং আদেশ যথোপযুক্ত ভাবেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। খোসল খাঁ উজীরের নিকট আনীত হইলে, তিনি আরও কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া, সেলিমগড়ের দুর্গে খোসল খাঁকে আজীবন কারারুদ্ধ থাকিবার ব্যবস্থা ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ দেন। তৎক্ষণাৎ সে আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

শেষ জীবনে জাহান্দার সাহ বিষয় কার্য্য কিছুই

* "It was a five time for ministree and singers and all the tribes of dancers and actors. There seemed to be likelihood that Kazis would turn toss pots and Muftls become tiplers."..... Khafi Khan.

† চিনক্লিজ খাঁন মহা সম্ভ্রান্ত এবং স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। তিনি আরংজীবের সেনাপতি ছিলেন কিন্তু উক্ত বাদসাহের মৃত্যুর পর রাজকার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেখিতেন না; তিনি লালকুয়ারের প্রেমে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফেরোকসের তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। অকর্ম্মণ্য ভূপতির পক্ষে কেবল মাত্র জুলফিকার খাঁ রহিলেন। এলাহাবাদের পার্শ-দেশে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। লালকুয়ার সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার হস্তিনী ভয় পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে, জাহান্দারও সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হন এবং লালকুয়ারকে সঙ্গে করিয়া এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে পৌছিয়া তিনি তাঁহার শ্মশ্রু ক্ষৌরী করিয়া, হিন্দুর বেশে লালকুয়ারকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন, কিন্তু পৌছিবামাত্র আমাদ খাঁ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন।

ফেরোকসের সিংহাসন লাভ করিয়াই জাহান্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন; আদেশও প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পর আর আমরা লালকুয়ারের দেখা পাই নাই। দিল্লীর তৎকালীন অবস্থা দেখাইবার জন্যই আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি; আশাকরি আমাদের সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই।

শ্রীযোগেন্দ্র সোমদ্দার।
এফ, আর, এচ্, এস্, (লণ্ডন)।

বসন্ত।

হে সুন্দর, অন্তরের বসন্ত আমার!
চির বিরহের ব্যথা ঘুচায়ে হিয়ার
তুমি কি এসেছ আজি অম্বরে ভূতলে
ব্যাপ্ত করি আপনার? ওই পুষ্পে ফলে
কিশলয়ে, রবি-চন্দ্র-গ্রহ-তারকায়,
অশ্রান্ত বিহঙ্গ-গীতে, তটিনী মালায়,
মলয়ের ফুল্লোচ্ছ্বাসে, প্রীতি-প্রেম তব
আমারে করিতে নাথ, তৃপ্ত অভিনব
দিয়েছ কি মুক্ত করে? চারি দিক হতে
আমি আজি লভিতেছি মোর সারা চিতে
তব স্নিগ্ধ পরশন! ওগো প্রিয়তম,
মুছিনু নয়ন; জীবন যৌবন মম
এনে দিনু অর্ঘ্য রূপে, লহ তুমি তুলি'
সুমধুর মৃদু হাস্যে বারেক আকুলি'!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ভাস্কর্য্য।

(১২৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

ধনুকের বাণকে শাস্ত্রকার ইষু বলিয়াছেন। ইহা ৪০০ শত হস্ত দূরের বস্তু ভেদ করিতে পারিত। ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থিগণ প্রথমে ১৬০ হস্ত অন্তরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাই বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিত, ইহাই তখন উত্তম সাধনা বলিয়া পরিগণিত ছিল, ১২০ হাত দূরের বস্তু ভেদ করা মধ্যম সাধনা এবং ৬৪ হাত দূরের লক্ষ্যভেদ অধম সাধনা। এদ্ব্যতীত যে বীর ক্রমাগত ৪০০ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বিশ্রাম করিতেন তিনি উত্তম ধনুর্দ্ধারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, যিনি ৩০০ বার বাণ নিক্ষেপ করিয়া পরে বিশ্রাম করিতেন তিনি মধ্যম

এবং যিনি ২০০ বার বাণ ত্যাগ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তিনি অধম ধনুর্দ্ধারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নিজের বাহুবলে চারিশত হস্ত দুর হইতে ক্রমান্বয়ে চারিশত বার লক্ষ্যভেদ করা যে, কত বড় কঠিন কার্য্য, তাহা এখন চিন্তা করিতেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ের কোনও বীর সাধারণ বন্দুকেও বোধ হয় একাধিক্রমে চারি শত বার গুলি-নিক্ষেপ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ঋগ্বেদে সেই ধনু আকর্ষণ করিবার বিস্তৃত বিধান লিখিত আছে—আকর্ণসন্ধানে অর্থাৎ নিজ কর্ণ পর্য্যন্ত জ্যা টানিয়া বাণ নিক্ষেপ করিবে। রামায়ণ ও মহাভারত আদির মধ্যেও তাহা বর্ণিত আছে। শাঁচীর ভাস্করশিল্পের মধ্যে তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ভারতবর্ষে নহে—প্রাচীন ইজিপ্ত ও গ্রীশ আদি দেশেও সেই একই নিয়ম সে কালে প্রচলিত ছিল।

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই যে, আর্য্যগণ লোহের ব্যবহার জানিতেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তীরের ফলকে ও শস্ত্র-আয়ুধ প্রস্তুতে তাহা চিরকালই ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। তীরের লৌহনির্ম্মিত ফলাগুলি সে কালে নানা আকারে গঠিত হইত। সেই আকারগত পার্থক্য কেবল যে, তাহার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি-কল্পনায় নির্ণিত হইত, তাহা নহে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্যই তখন তাহার ব্যবস্থা ছিল, শাস্ত্র-সমূহমধ্যে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়:—

"আরামুখেন কবচং অর্দ্ধচন্দ্রেন মস্তকম্।
আরামুখেন বৈ চর্ম্ম ক্ষুরপ্রেণ চ কার্ম্মুকম্।
ভল্লেন হৃদয়ং বেধ্য দ্বিভল্লেন গুণঃশরা।
লৌহঞ্চ কাকতুণ্ডেন বেধ্যং ত্র্যঙ্গুলসম্মিতম্॥
অন্যতে গোপুচ্ছ কৈ জ্ঞেয়ং ... ... ।
মুখে চ লৌহকণ্ঠেন বিধ্যমঙ্গুলসম্মিতম্॥"

আরামুখ নামক ফলকসংযুক্ত তীরদ্বারা কবচ অর্থাৎ বর্ম্ম বা সাজোয়া ভেদ করা যায়। আরা শব্দে ডাঃ রামদাস সেন লিখিয়া গিয়াছেন "চর্ম্ম-ভেদক সূক্ষ্মাগ্র শলাকাকার যন্ত্র। 'টেকো' ইতি ভাষা।" কিন্তু আরা প্রকৃত পক্ষে শলা বা টেকোর অনুরূপ যন্ত্র নহে আরা অর্থে করাত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত ভাষায় করাতের প্রতিশব্দ আরা বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। আরা অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, অভিধানেও আরা অর্থে করাত লিখিত আছে। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে আরামুখী বা করাতমুখী ফলকগুলি শত্রুমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা প্রবল বেগে উভয় পার্শ্বস্থ করাতের দ্বারা বর্ম্মের লৌহতন্তু ভেদ করিয়া শত্রুর দেহবিদ্ধ করে। সুতরাং তাহার আকার কেবল সূক্ষ্মমুখী নহে, তাহার উভয় পার্শ্বে এই

চিত্রের অনুরূপ করাতের মত বা বিচালিকাটা বঁটির অনুরূপ দাঁত কাটা থাকিত। চর্ম্ম বা ঢাল বিদ্ধ করিতেও এই আরামুখ বাণের প্রয়োগ হইত। অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা আততায়ীর মস্তক ছেদিত হইত। বোধ হয় তাহার আকার উপরিপ্রদত্ত ২য় চিত্রের মতই হইবে। ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রে শত্রুর কার্ম্মুক বা ধনু ছেদিত হইত। বোধ হয় এই ফলকের উভয় পার্শ্ব ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণভাবে শাণিত হইত। হৃদয় বিদ্ধ করিতে ভল্ল নামক বাণ প্রশস্ত, ধনুকের

দেখিতেন না, তিনি লালকুয়ারের প্রেমে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফেরোকসের তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। অকর্ম্মণ্য ভূপতির পক্ষে কেবল মাত্র জুলফিকার খাঁ রহিলেন। এলাহাবাদের পার্শ-দেশে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। লালকুয়ার সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার হস্তিনী ভয় পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে, জাহান্দারও সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হন এবং লালকুয়ারকে সঙ্গে করিয়া এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে পৌছিয়া তিনি তাঁহার শ্মশ্রু ক্ষৌরী করিয়া, হিন্দুর বেশে লালকুয়ারকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন, কিন্তু পৌছিবামাত্র আমাদ খাঁ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন।

ফেরোকসের সিংহাসন লাভ করিয়াই জাহান্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন; আদেশও প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পর আর আমরা লালকুয়ারের দেখা পাই নাই। দিল্লীর তৎকালীন অবস্থা দেখাইবার জন্যই আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি; আশাকরি আমাদের সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই।

শ্রীযোগেন্দ্র সোমদ্দার।
এফ, আর, এচ্, এস্, (লণ্ডন)।

বসন্ত।

হে সুন্দর, অন্তরের বসন্ত আমার!
চির বিরহের ব্যথা ঘুচায়ে হিয়ার
তুমি কি এসেছ আজ অম্বরে ভূতলে
ব্যাপ্ত করি আপনায়? ওই পুষ্পে ফলে
কিশলয়ে, রবি-চন্দ্র-গ্রহ-তারকায়,
অশ্রান্ত বিহঙ্গ-গীতে, তটিনী মালায়,
মলয়ের ফুল্লোচ্ছ্বাসে, প্রীতি-প্রেম তব
আমারে করিতে নাথ, তৃপ্ত অভিনব
দিয়েছ কি মুক্ত করে? চারি দিক হতে
আমি আজি লভিতেছি মোর সারা চিতে
তব স্নিগ্ধ পরশন! ওগো প্রিয়তম,
মুছিনু নয়ন; জীবন যৌবন মম
এনে দিনু অর্ঘ্য রূপে, লহ তুমি তুলি'
সুমধুর মৃদু হাস্যে বারেক আকুলি'!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ভাস্কর্য্য।

(১২৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

ধুনুকের বাণকে শাস্ত্রকার ইষু বলিয়াছেন। ইহা ৪০০ শত হস্ত দূরের বস্তু ভেদ করিতে পারিত। ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থিগণ প্রথমে ১৬০ হস্ত অন্তরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাই বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিত, ইহাই তখন উত্তম সাধনা বলিয়া পরিগণিত ছিল, ১২০ হাত দূরের বস্তু ভেদ করা মধ্যম সাধনা এবং ৬৪ হাত দূরের লক্ষ্যভেদ অধম সাধনা। এতদ্ব্যতীত যে বীর ক্রমাগত ৪০০ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বিশ্রাম করিতেন তিনি উত্তম ধনুর্দ্ধারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, যিনি ৩০০ বার বাণ নিক্ষেপ করিয়া পরে বিশ্রাম করিতেন তিনি মধ্যম

এবং যিনি ২০০ বার বাণ ত্যাগ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তিনি অধম ধনুর্দ্ধারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নিজের বাহুবলে চারিশত হস্ত দূর হইতে ক্রমান্বয়ে চারিশত বার লক্ষ্যভেদ করা যে, কত বড় কঠিন কার্য্য, তাহা এখন চিন্তা করিতেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ের কোনও বীর সাধারণ বন্দুকেও বোধ হয় একাধিক্রমে চারি শত বার গুলি-নিক্ষেপ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ঋগ্বেদে সেই ধনু আকর্ষণ করিবার বিস্তৃত বিধান লিখিত আছে— আকর্ণসন্ধানে অর্থাৎ নিজ কর্ণ পর্য্যন্ত জ্যা টানিয়া বাণ নিক্ষেপ করিবে। রামায়ণ ও মহাভারত আদির মধ্যেও তাহা বর্ণিত আছে। শাঁচীর ভাস্করশিল্পের মধ্যে তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ভারতবর্ষে নহে—প্রাচীন ইজিপ্ত ও গ্রীশ আদি দেশেও সেই একই নিয়ম সে কালে প্রচলিত ছিল।

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই যে, আর্য্যগণ লৌহের ব্যবহার জানিতেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তীরের ফলকে ও শস্ত্র-আয়ুধ প্রস্তুতে তাহা চিরকালই ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। তীরের লৌহনির্ম্মিত ফলাগুলি সে কালে নানা আকারে গঠিত হইত। সেই আকারগত পার্থক্য কেবল যে, তাহার সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি-কল্পনায় নির্ণীত হইত, তাহা নহে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্যই তখন তাহার ব্যবস্থা ছিল, শাস্ত্র-সমূহমধ্যে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়:—

"আরামুখেন কবচং অর্দ্ধচন্দ্রেন মস্তকম্।
আরামুখেন বৈ চর্ম্ম ক্ষুরপ্রেণ চ কার্ম্মুকম্।
ভল্লেন হৃদয়ং বেধ্য দ্বিভল্লেন গুণঃশরা।
লৌহঞ্চ কাকতুণ্ডেণ বেধ্যং ত্র্যঙ্গুলসম্মিতম্॥
অন্যতে গোপুচ্ছ কৈ জ্ঞেয়ং ... ... ।
মুখে চ লৌহকণ্ঠেন বিধ্যমঙ্গুলসম্মিতম্॥"

আরামুখ নামক ফলকসংযুক্ত তীরদ্বারা কবচ অর্থাৎ বর্ম্ম বা সাজোয়া ভেদ করা যায়। আরা শব্দে ডাঃ রামদাস সেন লিখিয়া গিয়াছেন "চর্ম্ম-ভেদক সূক্ষ্মাগ্র শলাকাকার যন্ত্র। 'টেকো' ইতি ভাষা।" কিন্তু আরা প্রকৃত পক্ষে শলা বা টেকোর অনুরূপ যন্ত্র নহে আরা অর্থে করাত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত ভাষায় করাতের প্রতিশব্দ আরা বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। আরা অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, অভিধানেও আরা অর্থে করাত লিখিত আছে। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে আরামুখী বা করাতমুখী ফলকগুলি শত্রুমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা প্রবল বেগে উভয় পার্শ্বস্থ করাতের দ্বারা বর্ম্মের লৌহতন্তু ভেদ করিয়া শত্রুর দেহবিদ্ধ করে। সুতরাং তাহার আকার কেবল সূক্ষ্মমুখী নহে, তাহার উভয় পার্শ্বে এই

চিত্রের অনুরূপ করাতের মত বা বিচালিকাটা বঁটির অনুরূপ দাঁত কাটা থাকিত। চর্ম্ম বা ঢাল বিদ্ধ করিতেও এই আরামুখ বাণের প্রয়োগ হইত। অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা আততায়ীর মস্তক ছেদিত হইত। বোধ হয় তাহার আকার উপরিপ্রদত্ত ২য় চিত্রের মতই হইবে। ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রে শত্রুর কার্ম্মুক বা ধনু ছেদিত হইত। বোধ হয় এই ফলকের উভয় পার্শ্ব ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণভাবে শাণিত হইত। হৃদয় বিদ্ধ করিতে ভল্ল নামক বাণ প্রশস্ত, ধনুকের

গুণ কাটিতে দ্বিভল্ল ফলক, কাকতুণ্ড অর্থাৎ কাক চঞ্চুর ন্যায় চারি শিরাবিশিষ্ট বাণের দ্বারা তিন অঙ্গুলি পরিমিত লৌহও বিদ্ধ করিতে পারা যাইত, গোপুচ্ছ নামক তীরের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধিত হইত এবং লৌহ কন্টকমুখী বাণের দ্বারা অঙ্গুলিপরিমাণ বিদ্ধ করিতে পারা যাইত।

'বাণাধার' বা 'তূণীর' সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইহা ফাঁপা বাঁশ, বেত অথবা চেঁচাড়ি দিয়া বুনিয়া সাধারণ তূণ প্রস্তুত হইত। কোন কোনও স্থলে ধাতুময় তূণেরও উল্লেখ আছে। ঋগ্‌বেদে সুবর্ণতূণীরের কথা লিখিত আছে। বোধ হয় তাহা ঐশ্বর্য্যশালী বা নরপতিগণের ব্যবহারের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইবে।

নানা শাস্ত্রে এবং ভাস্কর্য্যের মধ্যে দেখা যায় যে, উহা বীরের পশ্চাতে বা পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ স্কন্ধের নিকট হইতে বাম বাহুর নিম্নপর্য্যন্ত বাঁকাভাবে রাখিয়া তদ্‌সংলগ্ন রজ্জুদ্বারা সম্মুখে বক্ষের উপর বাঁধিতে হইত, অর্থাৎ যাহাতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অতি সহজেই তূণস্থিত বাণ বাহির করিতে পারা যায়, এইরূপ ভাবেই তাহা বাঁধা হইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে আয়ুধগুলি নিক্ষেপ করিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহারই নাম অস্ত্র। ধনু সেই অস্ত্রসমূহমধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট। এই ধনুর দ্বারা শর, তীর বা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়। পূর্ব্বকথিত শর-নির্ম্মিত বাণ সাধারণ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কঠিন প্রচণ্ড বাণ 'নারাচ' ও 'নালীক'। এ সম্বন্ধেও দুই চারি কথা এখানে সংক্ষেপে বলা বিধেয়। যে বাণগুলি শরের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাবয়বে লৌহ নির্ম্মিত, তাহারই নাম নারাচ।

"সর্ব্বলৌহাস্তু যে বাণা নারাচাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

ইহার মূলদেশে সাধারণ বাণের ন্যায় চারিটি পালকের পরিবর্ত্তে পাঁচটী স্থূল ও দীর্ঘ পালক সমান্তরে আবিদ্ধ করা হইত। এই নারাচ পরিচালনা যে সে বীরের কর্ম্ম নহে, ইহা আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন।

নালীক বা অগ্নিবাণ বা আগ্নেয়অস্ত্র ইহা উচ্চ স্থান, দুর্গ বা দূর হইতে যুদ্ধ করিবার সময় প্রযুক্ত হইত। শাস্ত্রে ইহার তিনটী নাম আছে, যথা—নাল, নালীক বা নালিকা। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ও মহাভারতের মধ্যেও নানা স্থানে নালীকের উল্লেখ আছে। "বৈশম্পায়ন নীতিপ্রকাশিকা" যাহা ডাক্তার ওপের মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নালিকাস্ত্রের বিবরণ প্রদান করিতে যত্ন করিতেছি।

"নালিকা ঋজুদেহাস্যাৎ তন্বঙ্গী মধ্যরন্ধ্রিকা।
মর্ম্মচ্ছেদকরী নীলা দ্রৌণী চাপ সরেরিণী॥ ইত্যাদি—"

ইহার দেহ সরল সরু এবং মধ্যে নলের ন্যায় রন্ধ্র আছে। ইহার বর্ণ নীল কৃষ্ণবর্ণ ইহা হইতে অয়ঃকণ অর্থাৎ ছররা বা গুলিকা দ্রোণচাপদ্বারা সবেগে বহির্গত হইয়া শত্রুপক্ষের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া থাকে। ইহা উঠাইয়া নালিকাস্থিত তিলবিন্দু বা মক্ষিকার সহিত লক্ষ্য স্থির করতঃ প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা বন্দুকেরই অনুরূপ। আর্য্যগণই বন্দুক ও কামান অস্ত্রের আবিষ্কারক, ইহা পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলীও এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন। সার্ঙ্গধর এবং শুক্রাচার্য্যও নালীকাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বৈদিক নাম "সূর্ম্মী"। সে কালে অসুরেরা সূর্ম্মী লইয়া যুদ্ধ করিতেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে (১।৪।৬।৭) সূর্ম্মী শব্দ আছে। উহার ভাষ্যে ভট্টভাস্কর ও সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা দেখিলে তাহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, এই লৌহময়ী সূর্ম্মী বা ভূণা, যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র, তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন, যাহা বহির্গত হয় তাহাও জলন্ত। অসুরগণ এই অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে দেখিয়া দেবতারাও শতঘ্নী-বজ্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদ্বারা এককালে শতশত বিনষ্ট হইত। অথর্ব্ববেদে (১।১৯৬।৩।৪) সীসক দ্বারা শত্রু বিনাশের কথা আছে। লৌহনির্ম্মিত ভূণার মধ্য হইতে এই সীসা বা ছররা নিক্ষিপ্ত হইত।

এই আগ্নেয় অস্ত্র সেকালে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে দুই প্রকার প্রচলিত ছিল।

নালীকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।
ভির্য্যগূর্দ্ধ ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥

পঞ্চবিতস্তি পরিমাণ লৌহের নল, তাহার মূলে তির্য্যক্‌ভাবে একটী ছিদ্র আছে। মূল হইতে অগ্রভাগে লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য তিল, বিন্দু বা মাছি আছে। মধ্যে অগ্নিচূর্ণ বা বারুদে পূর্ণ করিতে হয়, আঘাত পাইবামাত্র সেই বারুদ প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রস্তরখণ্ডযুক্ত জ্বলন্ত গোলক তাহার মধ্য হইতে বহির্গত হইত। পূর্ব্বে পাথরের উপর বালুকা ও সীসক সহযোগে এবং লৌহনির্ম্মিত গোলকও প্রস্তুত হইত। সগর্ভ বা ফাঁপা এবং নির্গর্ভ বা নিরেট এই দুই প্রকার গোলারই ব্যবহার ছিল। সগর্ভের মধ্যে আবার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিকা পূর্ণ করা হইত। তাহা শত্রুমধ্যে বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। ক্ষুদ্র নালীকের ছিদ্র প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ হইত।

উহাতে কাষ্ঠের বুর বা বাট দেওয়া থাকিত, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ উহা হস্তে লইয়াই যুদ্ধ করিতেন।

বৃহন্নালীক অস্ত্রের বর্ণনায় লিখিত আছে, উহার মূলদেশে বুর বা কাষ্ঠের বাঁট নাই। শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা তাহা বাহিত হইত। উহার নল যত স্থূল হইত, উহার গর্ভ বা ছিদ্র যত মোটা হইত এবং উহার গোলা নালীকের উপযোগী করিয়া যত বড় হইত, ততই উহা দূরভেদী হইত। উহার মধ্যে প্রথমে যথোপযুক্ত অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ পূর্ণ করিয়া দণ্ডের দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতে হইত, অনন্তর গোলা প্রদান করিয়া কর্ণ প্রদেশে বারুদ দিয়া প্রজ্বলিত করিলেই কামান দাগা হইত।

অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ প্রস্তুত সম্বন্ধে সোরা, গন্ধক, আকন্দ কিম্বা সিজের কয়লা প্রভৃতি নানা দাহ্য পদার্থ সহযোগে তাহা প্রস্তুত হইত, ধনুর্ব্বেদে পরিমাণাদি সহ তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকতর নরশোণিতপিপাসু কূট-যুদ্ধাচারী সমুন্নত সভ্যজাতিরা তাহার যে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজন বিদিত; সুতরাংসে সকলের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি। রামায়ণ উত্তর কাণ্ডে রাবণের দিগ্বিজয় উপলক্ষে, মহাভারতের বনপর্ব্বে হিরণ্যপুর ধ্বংসপ্রকরণে ও আদিপর্ব্বে নালিকাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সে কালে বীরমণ্ডলী কপট-যুদ্ধ কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সুতরাং ভীষণ নালিকাস্ত্র-প্রয়োগদ্বারা শত্রু-বিজয় তখন বীরোচিত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না। ব্যাসশিষ্য ত্রিকালদর্শী বৈশম্পায়ন ঋষি স্ব-সঙ্কলিত ধনুর্ব্বেদের

পঞ্চম অধ্যায়ে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল। "হে মহারাজ জনমেজয়! কলিকালের পৌরুষহীন অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময়ে মদ্যুক্ত গুলিকা নিক্ষেপ যন্ত্র, প্রস্তর ক্ষেপক যন্ত্র এবং অপরাপর কৃত্রিম যন্ত্র-সকল কূটযুদ্ধের উপকরণ স্বরূপ হইবে। যতই অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, ততই লোক কূটযুদ্ধ ও তদুপযুক্ত প্রকরণের আশ্রয় লইবে।" তাঁহারা সেই সুদূর অতীত যুগ হইতেই ভবিষ্যতের এই বীভৎসচিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক অধুনা শিক্ষিত ও সভ্যাভিমান-গর্ব্বিত-জাতির মধ্যে নিত্য কত নূতন নূতন শতঘ্নী কেন, কত সহস্রঘ্নী বা লক্ষঘ্নী অস্ত্রেরও আবিষ্কার হইতেছে। প্রাচীনযুগে আর্য্যদিগের মধ্যে এরূপ কূটযুদ্ধ প্রচলিত না থাকায়, নালিকাস্ত্র এক প্রকার পরিত্যক্তই ছিল। কেবল দুর্গের মস্তকে, রথের ভিত্তিতে, বৃহন্নালীকসকল রক্ষিত হইত। রামায়ণে, রাবণের দুর্গ বর্ণনায়, মহাভারতে, ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকার দুর্গবর্ণনায় তাহার উল্লেখ আছে। মহাভারতোক্ত বায়ুস্ফোট ও তুলাগুড়াদি শব্দ সম্ভবতঃ কামানেরই নামান্তর মাত্র হইবে। ভাস্কর্য্যমধ্যে তাহার প্রত্যক্ষ আদর্শ সম্বন্ধে ডাক্তার ওপের তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধের মধ্যে ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষ্য বা লক্ষ্য-অনুশীলনসম্বন্ধেও শাস্ত্রে অনেক কথা লিখিত আছে। লক্ষ্যের পরিমাণ, চিত্রবেধিকা অর্থাৎ চাঁদমারি, চিত্রবেধিত্ব, শব্দবেধিতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ ও ব্যবস্থা আছে, সে সকলের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অস্ত্র এবং শস্ত্র দ্বিবিধ। আয়ুধের নালীক ও ধনুরাদি অস্ত্রশ্রেণীরই অন্তর্গত। এইবার শস্ত্রসম্বন্ধে শাস্ত্র এবং ভাস্কর্য্য হইতে যতদূর অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিব।

শস্ত্র-শ্রেণীর আয়ুধের মধ্যে লগুড়, শেল, বল্লম, চক্র, ত্রিশূল ও খড়্গ আদি বহু যন্ত্রের যেমন যথেষ্ট উল্লেখ শাস্ত্র-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যেও সেইরূপ তাহাদের নানা আদর্শ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমেই লগুড় অর্থাৎ লাঠি। আমি ইতিপূর্ব্বে অস্ত্রের প্রাচীন যুগনির্ণয়কালে লগুড়কেই ঐতিহাসিক প্রথম অস্ত্র বলিয়াছি। বাস্তবিক লগুড় সাধারণের সহজলভ্য জগতের আদি শস্ত্র। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ইহার পাদদেশ সূক্ষ্ম অর্থাৎ সরু এবং মস্তক স্থূল, অগ্রভাগটী লৌহদ্বারা আবদ্ধ, বেশ মজবুত, দীর্ঘে দুই হস্ত পরিমিত হইবে। কখন কখনও লগুড়ের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় হইত, এরূপও উল্লেখ আছে। উত্থান, পাতন, পেষণ ও পোথন লগুড়ের এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার কথা ধনুর্ব্বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

শেল, শূল, বল্লম ও প্রাস নামক অস্ত্রগুলি প্রায় একরূপ। "প্রাসাস্ত্রস্তু চতুর্হস্তোদণ্ডবৃদ্ধঃ ক্ষুরাননঃ" প্রাস অস্ত্র চারি হাত লম্বা, বংশ দণ্ডের উপর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বিশিষ্ট কৃষ্ণলৌহ অথবা তাম্রনির্ম্মিত ফলক আবদ্ধ থাকিত। উপরের ভারের সমতা রক্ষার জন্য দণ্ডের নিম্নে একটী লৌহগোলক সংবিদ্ধ থাকিত। কখনও বংশ দণ্ডের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ লৌহময় শূল বা বল্লম-সদৃশ অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উহার ফলক সম্বন্ধে ভাস্কর্য্যমধ্যে বিবিধ আকার এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। শাঁচীর ভাস্কর্য্যমধ্যে এই প্রকার

ফলকবিশিষ্ট একটী সুন্দর বল্লমের আদর্শ আছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মধ্যেও ইহার বহু আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থলেই সংগৃহীত প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্র-মধ্যে তাম্রফলক বিশিষ্ট বল্লমও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

তন্ত্র কি?

(১৪৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

দেবী শবরূপা মহাকাল বা শিবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা রহিয়াছেন। গুণাতীত পরম পুরুষ বা পরব্রহ্ম ক্রিয়াশূন্য, সুতরাং শবরূপে শায়িত এবং তদীয় আদ্যা-শক্তি বা মূলপ্রকৃতি তাঁহার হৃদয়োপরে দক্ষিণাকালী ত্রিধাশক্তি রূপে গুণময়ী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্যে নিরতা রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিণী জগজ্জননী কালী মহাকালের* সহিত বিপরীতভাবে রতিক্রিয়াসক্তা রহিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মের ত্রিধা-শক্তিসম্পন্না।

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরীব্রাহ্মীতু বৈষ্ণবী।
ত্রিধাশক্তি স্থিতা লোকে তৎপরে জ্যোতিরোমিতি॥

ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তিতে যথাক্রমে মহা-সরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী এবং ইহাঁদের পুং-মিথুন যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাসরস্বতী বা ব্রাহ্মী, মহালক্ষ্মী বা বৈষ্ণবী এবং মহাকালী বা গৌরী অথবা মাহেশ্বরী। ইহাঁদের ক্রিয়া যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকরণ। আদ্যা-শক্তি বা মূলা প্রকৃতি একাধারে ত্রিগুণাত্মিকা প্রণবস্বরূপিণী†। সৃষ্ট্যাদি রহস্যতত্ত্বে আদ্যা যখন নির্গুণা, তখন তিনি তুরীয়ভাবে সচ্চিদানন্দময়ী, আবার সগুণে তিনিই মহাদক্ষিণকালিকা, তাঁহার এই গুণত্রয়ের স্বাতন্ত্র, অবস্থায় রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে প্রলয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেবী দক্ষিণকালিকা তখন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বা শবরূপী শিবের সহিত বিপরীত-ভাবে রতি-ক্রিয়ায় আসক্তা হইয়া ব্রাহ্মী-শক্তিতে সৃষ্টিনিরতা রহিয়াছেন। সাধক সেই ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিণী বিশ্বযোনিপীঠ পূজা করিয়া থাকেন। মহাদেব শিবলিঙ্গ একাধারে শিবশক্তিস্বরূপিণী, এই হেতু সংসারে গৌরীপট্ট সম্বলিত শিবলিঙ্গ মহাদেব-পূজার এত প্রশস্ত ব্যবস্থা আছে। পুরুষ ও প্রকৃতি সহযোগে ব্রাহ্মীশক্তিসাহায্যে জীবের উৎপত্তি হয়। জীব জন্তু, বৃক্ষ লতা, কীট পতঙ্গ, জড় অজড় সকলেই সেই সৃষ্টিতত্ত্বের অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীন। ফলের ক্ষুদ্র বীজটী কোন উত্তম স্থানে তুলিয়া রাখিলে তাহা অঙ্কুরিত হইবে না। উপযুক্ত রস বা রজঃ সংযোগ হইলেই সে বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্ভূত হইবে। এই হেতু দেবী স্বীয় ব্রাহ্মী-শক্তিতে রজোগুণাত্মিকা হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে শক্তি সহযোগে সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব গভীর ও গুপ্ত রহস্যান্তর্ভূত রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

---

* মহাকাল শিব শক্তি রহস্য দেখ।

† গায়ত্রীরহস্যে ত্রয়ীশক্তির বিস্তৃত রহস্য দেখিতে পাইবে।

বাস্তবিক সৃষ্টি-রহস্য বা তাহার প্রথম বিকাশ কেহই দেখিতে পায় না।

গৌরীপট্ট সম্বলিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা-কালে পূজক শিবলিঙ্গোপরি শ্বেতচন্দন ও পিনেটে রক্তচন্দন ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই শ্বেতচন্দনই সৃষ্টিতত্ত্বে বীর্য্য এবং রক্তচন্দন রজঃরূপে কল্পিত হইয়াছে মাত্র। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্ট মিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্ব্ব কারণ কারণম্॥

মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ তোমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে, সর্ব্ব কারণের কারণ পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। তুমিই তাঁহার ইচ্ছাদি মাত্র অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছ।

তন্ত্রান্তরে শঙ্কর বলিতেছেন :—

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিম্ নতু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো নসংশয়॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাম্ নতু বিষ্ণু কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণু প্রেতো নসংশয়॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসম্ নতু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো নসংশয়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্ব কার্য্যাক্ষমা ধ্রুবম্॥

বাস্তবিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সকলেই জড়বৎ নিশ্চল, তুমিই একমাত্র প্রকৃতি, সকলের সহিত শক্তিসমন্বিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও গ্রাস করিতেছ। ইহার গুহ্যতরতত্ত্ব আর ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব—তাহা সাধনালব্ধ—তাহা সদ্‌গুরুর নিকট জ্ঞেয়।

ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিণী পীনোন্নত পয়োধরা জগজ্জননী মহামায়া ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াই কি নিশ্চিন্ত আছেন? তাঁহার বৈষ্ণবীশক্তিতে ত্রিজগৎ পালনোদ্দেশে বক্ষে অফুরন্ত পয়ঃ লইয়া সন্তানকে (জীবকে) স্তন্য পান করাইতেছেন। সত্ত্বগুণে দেবী বিষ্ণুতে বৈষ্ণবীশক্তি-সমন্বিতা হইয়া জগতের প্রত্যেক শক্তিস্বরূপিণী জননীহৃদয়ে সে অমৃত পয়োধারার প্রবাহ প্রদান করিয়াছেন। জীব কবে ভূমিষ্ঠ হইবে—মা জগদ্ধাত্রী নিজ পালনীশক্তির সাহায্যে পূর্ব্ব হইতেই প্রতি মাতৃ-স্তনে জীবের পবিত্র আহার দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। সাধক দেবীহৃদয়ে সেই বৈষ্ণবীশক্তির অনির্ব্বচনীয় করুণার প্রথম আস্বাদ পাইয়াই শক্তি-সঞ্চার করিয়া থাকেন।

করালবদনা কালী তমোগুণান্বিতা গৌরী বা মাহেশ্বরীশক্তিতে সংহাররূপিণী। সদাশিব কালিকা-স্তোত্রে বলিয়াছেন "গুণাতীত গুণময়ী প্রলয়কালে একমাত্র তুমিই তমোরূপে বিরাজিতা ছিলে, তোমার সে রূপ সাধারণের বাক্য ও মনের অগোচর"।

'কালী' এই শব্দ উচ্চারণ হইবামাত্র অনাদি ও অনন্ত মহা 'কালই' বুঝায়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-রূপী মহা 'কালই' মহাকালী রূপে সাধকের ধ্যেয়। জগদ্‌সংহারক মহাকাল তোমারই রূপ মাত্র। এই মহাকাল চির কাল ধরিয়া সর্ব্ব জীবকে কলন বা কালগ্রস্থ অর্থাৎ গ্রাস করিতেছেন, সেই কারণ মহা-কাল নামে তিনি কীর্ত্তিত। আবার মহাকালকে তুমিই গ্রাস কর, এই হেতু তোমার নাম করালবদনা কালিকা। সেই অনাদি কাল হইতে কালসংহারিণী কালীর করাল বদনের মধ্যে নিত্য কত কি যে নিক্ষিপ্ত হইতেছে তাহা কে বলিবে! ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে

আজ পর্য্যন্ত কত জীব জন্তু, বৃক্ষ লতা, ধনী ভিখারী, সাধু অসাধু, সেই করাল গ্রাসের মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার উদরসাৎ হইয়াছে! কত স্বর্গাদি ত্রিলোক-বিজয়ী সুরভীতি-উৎপাদনকারী মহাপরাক্রান্ত অসুর-দল দুদিনের তরে পিপীলিকাসদৃশ পক্ষ বিস্তার করিয়া সেই মহাকালীর জঠরাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। শুম্ভ নিশুম্ভাদি দিগ্বিজয়ী দৈত্যগণ কত শতসহস্র অক্ষৌহিণী সেনা ও গজ রথাদি সহ তাঁহার ভয়ঙ্কর দন্তপুংক্তির মধ্যে চিরদিনের তরে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। মহাতেজ ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ ত্রিভুবন বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিলে, জগদ্‌প্রতিপালক বিষ্ণু নিজ অংশে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সংহাররূপিণী কালিকা-শক্তির সহায়-তায় তাঁহার ধ্বংস করিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দেবী কালগ্রাসী। এই সংহারশক্তি তাঁহার করাল বদনে সাক্ষাৎভাবে মূর্ত্তিমান। সাধক এই সংহার-শক্তির শক্তিকণা সংসারের প্রত্যেক জীবের বদনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। জীবের সমস্ত দেহভারের পরিমাণে তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, কত শতসহস্র গুণ অধিক সামগ্রী জীব তাহার জীবদ্দশার মধ্যে ঐ ক্ষুদ্র বদন দিয়া উদরসাৎ করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র-আদর্শে শক্তিময়ীর কণামাত্র শক্তিতে তাহা প্রকাশমান। যতক্ষণ জীবের জীবত্ব আছে—উদর আছে—গ্রাস করিতে বদন আছে—ততক্ষণ আদ্যাশক্তির সংহারক্রিয়া জীবের মুখমণ্ডলে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত, তাহাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, পাপ নাই; মহামায়ার অদম্য শক্তি তাহাতে নিহিত ও প্রকা-শিত! ক্ষুদ্র কীট দেখিলেই তদপেক্ষা কোন বৃহৎ জীব অমনি তাহাকে গ্রাস করিবে, পরে তাহাকেও কোনও বৃহত্তর জীবে গ্রাস করিবে, এইরূপে পর পর বৃহত্তম বলশালী জীব দুর্ব্বল জীবের সংহার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাই সাত্ত্বিকভাবে "অহিংসা পরমো-ধর্ম্ম" হইলেও প্রাকৃতিক ভাবে হিংসাই জীবের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক জীব জীবকে যে, স্ব-ইচ্ছায় হিংসা করিতে পারে না, তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতায় অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া-ছেন। জগতের সংহার কর্ম্ম তাই মায়ের করালবদনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভয়ঙ্করাকৃতি আলুলায়িতকেশা দেবীর বর্ণ মেঘের ন্যায় প্রগাঢ় শ্যামবর্ণ বা কাল। দেবী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণ বর্ণের অন্য নাম কালী। আলোক বা সপ্তবর্ণের অভাব হইলেই অন্ধকার হয়—অন্ধকারের বর্ণ নাই বা অন্ধকার হইলেই কৃষ্ণবর্ণ। সর্ব্ববর্ণ বিলোপকারী কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্ববর্ণাতীত—সেই কারণ সকল বর্ণই কৃষ্ণবর্ণ বা মসিবর্ণে বিলীন হইয়া যায়। নানা বর্ণে চিত্রিত প্রকৃতি চিত্রের উপর গাঢ় মসিবর্ণ লেপন করিলে সেই ক্ষুদ্র অবয়বেও কালির করাল-বদনের আভাস কথঞ্চিৎ প্রতীয়মান হয়। এই কালীই কালিকার রূপ বা বর্ণ, ইনিই অন্ধকাররূপে নিজ আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশদাম বিস্তৃত করিয়া রাত্রি কালে জগৎকে গ্রাস করেন। ক্ষণিক করাল গ্রাসের মধ্যে থাকিয়া জগতের জীব কিয়ৎক্ষণের জন্য মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে—তখন জগৎ আংশিক ভাবে যেন মহা-শ্মশানে পরিণত হয়। ঘোর অমানিশার গাঢ় অন্ধকার মধ্যে সেভাব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তখন জগতের জীব প্রায় সকলেই শবরূপে পরিণত হয়, এবং মধ্যে মধ্যে শিবাগণের তীব্র চীৎকার রবে মহাশ্মশানের ভীষণতা অধিকতর বৃদ্ধি করিতে থাকে।

ভয়াদি অষ্টপাশ মোচন করিবার উদ্দেশে মহা-অমানিশাই কালীসাধনার প্রশস্ত সময় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যখন সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ ও স্থির—কেবল অবিরত শব্দে জগতে প্রণব-শব্দ উচ্চারিত হইতেছে। (সাধারণের কর্ণে যাহা নিশার গভীরতা ব্যঞ্জক শাঁ শাঁ শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সাধকের কর্ণে তাহাই প্রণবশব্দে প্রতিধ্বনিত করে।) যখন সম্মুখস্থ কোন পদার্থই মানবচক্ষে আর দৃষ্ট হয় না, এমন কি নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সেই কালীর করাল বর্ণে বা অন্ধকারে বিলুপ্ত প্রায়—কেবল চৈতন্যরূপী "অহম্" জ্ঞানটী বর্ত্তমান বা উপলব্ধ হয়, তখনই সাধক সেই মহা-মুহূর্ত্তে 'তত্ত্বমসি' সাধনায় অর্থাৎ সেই মহা-শক্তিতে নিজ অহম্-জ্ঞান-শক্তিও লয় করিয়া সান্দ্রানন্দ লাভ করিবার জন্য একাগ্রমনে নিযুক্ত হন।

সাধক এই আদ্যাশক্তি দক্ষিণকালিকা-সাধনাকালে দেবীর পূর্ণ অঙ্গে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ যথাক্রমে তিনটী স্তর বা শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

মূলা প্রকৃতির নিম্ন অঙ্গে, প্রথম স্তরে, যোনিপীঠে দেবী ব্রাহ্মীশক্তি স্বরূপা—সৃষ্টি-নিরতা; মধ্য অঙ্গে, মধ্য বা দ্বিতীয় স্তরে, পীনোন্নত পয়োধরে বৈষ্ণবীশক্তি স্বরূপা—পালনরতা; ঊর্দ্ধ অঙ্গে, ঊর্দ্ধ বা উচ্চ স্তরে, করালবদনে মাহেশ্বরীশক্তি স্বরূপা—সংহার-তৎপরা। সাধকের হৃদয়ে তাহাই প্রথমে প্রবৃত্তি, পরে স্থিতি, তৎপরে নিবৃত্তি রূপে বিরাজমানা। দেবী একাধারে ত্রি-শক্তিস্বরূপিণী, ত্র্যক্ষরী অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রণব বা ব্রাহ্মণের নিত্য আরাধ্যা পূর্ণ গায়ত্রীরূপিণী। এই হেতু কালিকাস্তোত্রে স্বয়ং শিবই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমরা তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি।

গায়ত্রী রহস্য।

সাবিত্রী-গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যা আরাধনা ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্ম। ইহা বেদের আদেশ। এই ত্রিসন্ধ্যার তিন প্রকার ধ্যান বেদ ও আগমে বর্ণিত আছে। তাহা ব্রাহ্মণ ও সাধকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত, সে মূল শব্দগুলির এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাতঃসন্ধ্যায় দেবী সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মীরূপে জগতে নিত্য নব নব প্রবৃত্তির বিকাশ করিতেছেন। মহাশক্তির প্রকৃষ্ট বিকাশ সূর্য্যমণ্ডলেই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া বেদাগমে তন্মধ্যেই দেবীর ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে।

সূর্য্যমণ্ডল অরুণ সারথিদ্বারা পরিচালিত সপ্ত অশ্ব যুক্ত রথে বিচরণ করেন—সনাতন শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সৌর-রথ সপ্তঅশ্ব-দ্বারা কিরূপে পরিচালিত, রহস্য বুঝিতে পারিলে তাহার তাৎপর্য্য অতি সহজেই উপলব্ধ হয়। সূর্য্য-কিরণ বিশ্লেষণদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়—উহা রক্ত, নীল ও পীত এই তিনটী মূল বর্ণের সমষ্টি মাত্র। ইহাদের পরস্পর মিলনদ্বারা যথাক্রমে ১ম, (রক্ত ও পীতের সম্মিলনে) অরুণ বা কমলালেবু বর্ণ; ২য়, (রক্ত ও নীলের সংমিশ্রণে) পাটল বা বেগুনি বর্ণ; ৩য়, (পীত ও নীলের মিলনে) হরিৎ বা সবুজ বর্ণ; ৪র্থ, (পরস্পরের বিকৃত মিলনে) ধুসর বা কৃষ্ণনীল; এই চারিটী মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত তিনটী মূলবর্ণ ও চারিটী মিশ্রবর্ণ একত্রে সপ্তবর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে। এই সপ্তবর্ণই সূর্য্যের সপ্ত-হয়। শাস্ত্রে এইরূপ সপ্তবর্ণ বিশিষ্ট সপ্ত অশ্বের বর্ণনা আছে। এই সপ্ত অশ্ব বা বর্ণ সূর্য্যকিরণ হইতে বিকাশ হইয়া

থাকে, আকাশে রামধনু উঠিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য উদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রভাতে, আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই তাঁহার প্রভাত আলোক দেখিতে পাই, এই আলোকই সপ্তবর্ণ বিশিষ্ট তাঁহার রথের অশ্ব সপ্তকের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। ইহার পর তাঁহার সারথী অরুণদেব যেন সেই সপ্ত-অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া তদীয় দিব্য অরুণ বর্ণে আকাশ-পথ উদ্ভাসিত করিতে থাকেন, তদনন্তর শুভ্র সৌররথে সাবিতাদেবতা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে গগণমণ্ডলে বিরাজিত হইয়া ত্রিলোকে পরমানন্দ প্রদান করেন। প্রভাতে তাঁহার মূর্ত্তি রক্তবর্ণ। ভগবতী প্রাতর্গায়ত্রী সাবিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মী-মূর্ত্তিতে রক্তবর্ণে বিরাজিতা। রক্ত অর্থে স্ত্রী-রজঃ বুঝায়—ইহা ঘোর লোহিত বর্ণ। ইহাই প্রথম মূল বর্ণ। এই রক্ত বা মূলশক্তি উত্তেজক অথবা প্রবৃত্তি-প্রদায়ক। সূর্য্যের উত্তেজনা বা তাপ-শক্তি তাঁহার রক্তবর্ণ রশ্মিগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকেও উহাঁর ঐ রক্ত রশ্মিগুলিকেই উত্তাপক (Heating Rays) বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। জীবের হৃদয়ে কোন ভাবের উত্তেজনা হইলেই জীবের ভাবপ্রকাশক স্থান ও পেশীসমূহ লোহিতাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। সে উত্তেজনার অবস্থায় জীবের নাসিকা, কর্ণ ও গণ্ডস্থল উষ্ণ ও লোহিতাভ হইয়া যায়। অগ্নিমধ্যস্থ উষ্ণতর স্থান ঘোর লোহিত বর্ণ। কোন দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিলে লোহিত হইয়া যায়, ইংরাজী ভাষায় তাহাকে 'Red-hot' বলে। সূর্য্যের সেই উত্তেজক শক্তি লোহিতবর্ণ হইতে জাত। জগতে রক্ত বা রজঃ অথবা রসের সাহায্যে সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বীজই রজঃ বা রস সংযুক্ত না হইলে আদৌ অঙ্কুরিত হইবে না। পক্ষান্তরে সূর্য্যের প্রাতঃ-রশ্মি যেস্থানে ভাল পতিত না হয়, সে স্থানে বৃক্ষ লতাদিও ভাল জন্মে না। সুতরাং এই রক্ত বা রজঃ হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মযোনি আদ্যার আদি রজঃ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মীশক্তি রজঃ রূপে রজোগুণান্বিত হইয়া রক্তবর্ণে প্রাত্যহিন জগতে নূতন নূতন প্রবৃত্তির সৃষ্টি করিতেছেন। বেদ ও আগম তাই ব্রহ্মের সৃষ্টি বা প্রবৃত্তি-শাক্ত ব্রহ্মাণী রক্তবর্ণা, সূর্য্যমণ্ডলাভ্যন্তরে অবস্থিতা বলিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃকালে ব্রাহ্মীর এইরূপই ধ্যান করিয়া থাকেন।

বেদাগম বিহিত ব্রহ্মের পালনীশক্তি বৈষ্ণবী। ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাকালে দেবী গায়ত্রীকে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিতা, দ্বিতীয়া বা মধ্যশক্তি নীলবর্ণা বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন। জগতের যাহা কিছু পুষ্টি ক্রিয়া তাহা সবিতাদেবতার এই নীলশক্তি বা রশ্মীগুলির দ্বারা সংসাধিত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-তত্ত্বে সূর্য্যের এই নীল-রশ্মীগুলিকে (Actining Rays) রাসায়নিক ক্রিয়াবান বা ক্রিয়ক-রশ্মি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহাই হউক আমাদিগের এই মধ্য বা পালনীশক্তি নীলবর্ণা, বৈষ্ণবীরূপা, স্থিতি বা পুষ্টিশক্তিসম্পন্না, সত্বগুণান্বিতা সুতরাং তিনি পালনতৎপরা। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে এই ভাবেই ধ্যান করিয়া থাকেন।

সায়াহ্নে দেবী তৃতীয়া বা শেষশক্তি পীতবর্ণা, গৌরীরূপা, সবিত্রীমণ্ডল-সংস্থিতা, বেদ ও তন্ত্রাদিতে এইরূপ বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণগণ সায়ং-সন্ধ্যাকালে দেবীর ঐরূপই ধ্যান করিয়া থাকেন। পীতবর্ণ সংহারক, তমোগুণাত্মক ও নিবৃত্তিভাবব্যঞ্জক। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণজাল যে সংহারক-শক্তি-সম্পন্ন তাহা বোধ হয় সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারিবেন, কারণ সায়ংকালের রৌদ্র প্রাতঃকালের ন্যায় উত্তেজনা বা প্রবৃত্তি প্রদায়ক নহে। পতনোন্মুখ রৌদ্রের তেজ অল্প হইলেও তাহা যেন কেমন এক প্রকার তীব্র ও তৃপ্তিবিহীন, সেই রৌদ্রে অধিকক্ষণ বিচরণ করিলে শরীর যেন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। যে ভূমিতে কেবল মাত্র সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সূর্য্যকিরণ পতিত হয় তথায় উদ্ভিদাদিও ভালরূপ জন্মে না। এ সকল কথা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত, দিবসের সেই অবসানসময়ে পরমারাধ্য সবিতা-দেবতা পীতবর্ণে জগততৃপ্তিপ্রদ সেই নিজ তেজরাসি জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে নিত্য কিয়ৎক্ষণের জন্য পুনরায় আকর্ষণ করিয়া লন। তাঁহার সেই আকর্ষণীশক্তি সংহাররূপিণী। পক্ষান্তরে পীতবর্ণ জ্যোতিঃপ্রকাশক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানতত্ত্ববিদগণ সূর্য্যের ঐ পীতরশ্মিগুলিকে (Illuminating rays) প্রকাশক রশ্মি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সাধকের প্রবৃত্তি বা স্থিতির প্রখর তেজের সংহার বা নিবৃত্তি হইলেই জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানপ্রকাশক মাহেশ্বরী বা গৌরীশক্তির সায়ংকালিন ঐরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন।

রক্ত, নীল ও পীত এই মূল ত্রিবর্ণে যথাক্রমে রজঃ = প্রবৃত্তি, সত্ত্ব = স্থিতি এবং তমঃ = নিবৃত্তি শক্তি বিরাজিত। সাধারণ ব্রাহ্মণমাত্রেই ব্রহ্মের এই ত্রিশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং যথাক্রমে ব্রহ্মময়ী দক্ষিণাকালিকার ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও গৌরী শক্তিত্রয়, ইহাঁদের ক্রিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বা লয় করণ। এক্ষণে তন্ত্রেও শ্রীদেবাদিদেব সেই কথাই বলিতেছেন যে :—

"ভূঃ কারঞ্চ তু ভূর্লোকো ভুবর্লোক ভুবস্তথা।
স্বঃ কারঃ সুরলোকশ্চ গায়ত্র্যাঃ স্থান নির্ণয়ঃ ॥
ইচ্ছাশক্তিশ্চ ভূকারঃ ক্রিয়াশক্তিভুর্বস্তথা।
স্বঃ কারঃ জ্ঞানশক্তিশ্চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ রূপকঃ ॥
মূল পদ্মঞ্চ ভূর্লোকো বিশুদ্ধঞ্চ ভুবস্তথা।
সুরলোকঃ সহস্রারো গায়ত্রী স্থান নির্ণয়ঃ ॥"

অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রস্থিত ভূঃ কার, ভূ-তত্ত্ব বা পৃথিতত্ত্ব, সাধনাপথে মূলাধার-চক্র, আবার জগন্মাতার নিম্নস্তরে ব্রাহ্মী বা ইচ্ছাশক্তি—মহাযোনিপীঠে সৃষ্টিতত্ত্ব। ভুবঃ—ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষতত্ত্ব, সাধনাপথে বিশুদ্ধচক্র, আর মহাশক্তির মধ্যস্তরে পীনোন্নত পয়োধরে বৈষ্ণবী বা ক্রিয়াশক্তি পালন বা স্থিতিতত্ত্ব। সঃ কার সুরলোক বা স্বর্গতত্ত্ব, সাধনাপথে সহস্রারনির্দ্দিষ্ট চক্রে, এবং আদ্যাশক্তির ঊর্দ্ধ বা উচ্চস্তরে গৌরী বা জ্ঞানশক্তি সংহার বা লয়তত্ত্ব। ইহাই বেদমাতা গায়ত্রীর স্বরূপ ও স্থান-রহস্য। ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীর ঐ তিন রূপ সাধনা করিয়া থাকেন। ক্রমে সাধনমার্গে উচ্চতর সোপানে অগ্রসর হইলে, সাধক চতুর্থ বা নিশা-সন্ধ্যার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই নিশাসন্ধ্যার বিষয় ব্রাহ্মণ-সমাজ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা সাধনমার্গের কথা বলিয়া এবং সম্পূর্ণ শিক্ষার অভাবে তাহা একেবারে লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন রাত্রি ও দিবার প্রথম মিলন বা সন্ধিসময়ে অর্থাৎ প্রভাতকালে প্রাতঃসন্ধ্যা; প্রাতঃ ও সায়ং ইহার মধ্যবর্ত্তী দ্বিতীয় সন্ধি বা দিবসের মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা; দিবস ও রাত্রির পুনর্মিলনে বা তৃতীয় সন্ধি-সময়ে সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা, সেইরূপ সায়ংকাল ও প্রাতঃকালের মধ্যবর্ত্তী চতুর্থ সন্ধিসময়ে অর্থাৎ মধ্য রাত্রিতে বা নিশাকালে বেদাগমোক্ত নিশা-সন্ধ্যার ব্যবস্থা সাধকগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকালপর্য্যন্ত সমস্ত দিবাভাগে বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর ত্রিশক্তির আরাধনা পৃথক পৃথক ভাবে করিয়া রাত্রি ভাগের মধ্যে বা নিশা-সন্ধ্যা সময়ে সেই ত্রিশক্তির সমন্বয়ে একাধারে পূর্ণ গায়ত্রী-শক্তি-সাধনাই সাধকগণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়, সেই কারণ তাহা সাধকমণ্ডলীমধ্যেই চিরদিন সম্পূর্ণ গুপ্ত ভাবে সংরক্ষিত হইয়া আছে।

শিব-প্রকৃতি-রহস্য।

ওঁ শিব মঙ্গলময় শুভ্রজ্যোতিঃস্বরূপ মহাকাল, ইনি কালসংহারক, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রেই বিদিত আছে। জীবমাত্রেই যেমন দিবানিশার মধ্যে যথাক্রমে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে দেবতাদিগেরও সেইরূপই তিনটী অবস্থার কথা উল্লেখ আছে, তবে সে অবস্থার সময় বা তাহাদের দিবানিশার পরিমাণ আমাদিগের অপেক্ষা বহু দীর্ঘ্যকালব্যাপী সে কথাও অনেকে অবগত আছেন। আমরা পৃথিবীর জীব, আমাদিগের এই সামান্য অবস্থা হইতেই ক্রমে দেবতাদিগের অবস্থা উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রথমে আমাদিগের দিবাভাগ বা জাগ্রতকাল এ সময় আমরা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকি না, সকলেই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইয়া থাকি, পুনরায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নিশাসমাগমে পৃথিবী ঘোর তমসায় আবৃত হইতে না হইতেই আমরা (জীবসমূহ) সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে, কুটীরে অথবা কুলায় অর্থাৎ আপন আপন আবাসে পুনরাগমন করিয়া অবস্থান করি। ক্রমে নিদ্রার আবেশে প্রথমে কিয়ৎক্ষণ সমস্ত দিবা বা কর্ম্মকালের অবস্থা চিন্তা করি। নিদ্রিত হইলেও সে চিন্তা চিত্ত হইতে একেবারে বিচ্যুত হয় না, দেহ ক্রিয়াশূন্য হইলেও চিত্ত তখনও ক্রিয়া করিতে থাকে। তাহাই আমাদিগের স্বপ্নাবস্থা। গভীর মধ্যনিশায় সে অবস্থাও অতীত হয়, তখন চিত্তও কিয়ৎকালের জন্য যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বা ক্রিয়াশূন্য হয়, তাহাই আমাদিগের সম্পূর্ণ নিদ্রাভাব, সুষুপ্ত বা শবাবস্থা। জগৎ যেন তখন আংশিকভাবে শ্মশানরূপে পরিণত হয়। জীব জন্তু, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, জড় অজড় প্রভৃতি প্রায় সকলেই নিত্য এই তিন অবস্থা যথাক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, পুনরায় নিশাশেষে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে আবার স্বপ্নাবস্থা হয়। জগৎও সেই একই অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীন হইয়া যেন জাগ্রত নিদ্রিত ও সুষুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমাদের ভূ-লোকে যেমন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত-

কালানুসারে দিবা রাত্রি হয়; ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ-লোকে বা পিতৃলোকে আমাদিগের পূর্ণ এক মাসের সমষ্টির ব্যবধানে একটীমাত্র দিবা রাত্রি ভোগ করেন, মাসের কৃষ্ণপক্ষের সমষ্টি তাঁহাদের একটী দিবাভাগ এবং শুক্লপক্ষের সমষ্টি তাহাদের একটী রাত্রিভাগ। আমাদিগেব কৃষ্ণপক্ষে তাঁহাদের দিবা বা জাগ্রত অবস্থা, সেই কারণ শ্রাদ্ধাদি ও তর্পণক্রিয়া কৃষ্ণপক্ষেই প্রশস্ত। আমাদিগের শুক্লপক্ষে তাঁহাদের স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা। চন্দ্রলোকই পিতৃলোকের স্থান। সে স্থানে আমাদিগের ন্যায় রক্ত-মাংসময় জীব নাই, আত্মীক বা সূক্ষ্ম-দেহধারী পিতৃগণে পূর্ণ। আমাদিগের পূর্ণ ১৫ দিনে চন্দ্রলোকের একটী দিবস ও মাসের অবশিষ্ট ১৫টী দিবারাত্রে চন্দ্রলোকের একটী রাত্রি হয়। এই রূপ আমাদিগের ৩৬৫ দিবা রাত্রে বা দ্বাদশ মাসে অথবা পিতৃ বা চন্দ্রলোকের দ্বাদশটী দিবা রাত্রে স্বঃ, সুরলোক, স্বর্গ বা দেবলোকের একটীমাত্র দিবা রাত্রি হয়, অর্থাৎ আমাদিগের অবিশ্রান্ত ছয় মাস ইন্দ্র, চন্দ্র ও বরুণাদি দেবতাদিগের একটী দিবাভাগ এবং ঐরূপ ছয় মাস তাঁহাদের রাত্রিভাগ। আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদেরও দিবা ও রাত্রি ভাগ এই কালের মধ্যে তাঁহারা যথাক্রমে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কাল ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর মেরু (ইহা আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীয় উত্তর মেরু নহে এই জগন্মণ্ডলের উত্তর মেরু) সুর বা দেবলোক বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলেরও উত্তর মেরুতে ক্রমাগত ছয় মাসকাল সূর্য্যোদয় হয়, সে ছয় মাসের মধ্যে তথায় সূর্য্যের আদৌ অস্ত নাই এবং অবশিষ্ট ছয় মাস কাল আবার সেই ভাবে সূর্য্যাস্ত বা সম্পূর্ণ অন্ধকারময় থাকে। এইরূপ ব্রহ্মার দিবস, বিষ্ণুর দিবস, শিবের দিবস উত্তরোত্তর দীর্ঘকাল ব্যাপী, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং সে সকল কথা বলিয়া অধিক সময় অতিবাহিত করিব না; এক্ষণে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদিগের সুষুপ্তির সময় যেমন অতি সামান্য তাহার গভীরতাও তেমনি অতি অল্পক্ষণ-স্থায়ী কিন্তু দেবতা বা ব্রহ্মাদির সুষুপ্তিকাল যেমন দীর্ঘকালব্যাপী তাঁহাদের সুষুপ্তির গভীরতাও তেমনই অচিন্তনীয়, তাহা পুরাণাদিতেও বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। কখন কখন ব্রহ্মা বা নারায়ণের নিদ্রা বা সুষুপ্তির সময় অসুরগণের উৎপাতে ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইলে দেবতাগণ কতবিধ উপায়ে তাঁহাদের নিদ্রা অপনোদনের চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের জাগ্রত করিয়া অসুর বিধ্বংস করতঃ পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি স্থাপন করেন। সেই সুষুপ্তির সময়েই ব্রহ্মাণ্ডের এক একটী খণ্ড-প্রলয়ের সময় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তাহাকেই আমাদিগের মন্বন্তর বা প্রলয়সময় বলিয়া থাকি। এই ভাবে নির্দ্দিষ্ট মন্বন্তরের পর মন্বন্তর গত হইলে কল্পান্তর বা যাহা মহাপ্রলয় হইয়া থাকে, সেই সময়েই মহাকালের সুষুপ্তি অবস্থা, সেই কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলসহ মহা-শক্তিতে, আবার সেই মহাশক্তিও মহাকাল বা শিবে তুরীয়ভাবে মিলিত বা লয় হইয়া যান। ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মচিতারূপ ব্রহ্মাগ্নি তখন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল কি এক অচিন্ত্য ও অব্যক্ত মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাহা আর এ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ভাবিতে পারা যায় না। সেই শ্মশানাবশিষ্ট

সেই শ্মশানাবশিষ্ট ভস্মস্তূপে মহাকাল তখন নিজ অঙ্গ বিভূষিত করিয়া পুনরায় নূতন কল্পের সৃষ্টি করিতে কল্পনা করেন।

ক্রমশঃ—
শ্রীসচ্চিদানন্দ।

ত্রিরত্ন বিজয়।

(১৬০ পৃষ্ঠার প্রকাশিতের পর)

সমরসজ্জা।

রাজধানীর এত নিকটে মহতী সেনা লইয়া, কুমার অশোক এবং মহেন্দ্রের অবস্থিতির কথা নগরে প্রচারিত হওয়াতে নানা কারণে নগরের শান্তিরক্ষা ক্রমে দুষ্কর হইয়া উঠিল।

প্রতিদিন একটা না একটা নূতন নূতন রকমের ভয়াজনক বার্ত্তা সহরে প্রচারিত হইতে লাগিল, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী এবং বুদ্ধোপাসকগণ ঐ সকল সংবাদে দিন দিন কেমন এক উৎসাহ লাভ করিতেছিল, তাহাদের দলও যেন প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। কুমার অশোকের অশ্বারোহী সৈন্য অত্যন্ত শিক্ষিত এবং বড় সাহসী, তাহাদের সহিত রাজধানীর সেনাদল যুদ্ধে পারিয়া উঠিবে না, কারণ রাজধানীতে সৈন্যগণের মধ্যে শিক্ষা বা শৃঙ্খলা একপ্রকার ছিল না বলিলেও চলে। সমরসচিবের পিতা বৈশালীতে বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষুবেশে দিন যাপন করেন, এই জন্য সেনাপতি সর্ব্বমিত্রের সহিত তাহাঁর বড় একটা মিল নাই। সর্ব্বমিত্র—জাতিতে ব্রাহ্মণ, সুতরাং নবোদিত বৌদ্ধধর্ম্ম—বা সেই ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান জনসমূহের প্রতি নিতান্ত বিরূপ, এই কারণে সমরসচিবের সহিত প্রধান সেনাপতির মতের ঐক্য হইতেছে না। সমর-সচিবের মত যে, রাজধানীতেই কুমার অশোকের অপেক্ষা করা উচিত, কারণ রাজধানীতে শান্তি রক্ষার ভার অল্প সেনার উপর দিয়া সকল সেনা লইয়া অগ্রসর হইলে, নানাবিধ ষড়্‌যন্ত্রের ফলে রাজধানীতে বিপ্লব হইতে পারে, যদি বিপ্লবকারীগণ কৃতকার্য্য হয় তাহা হইলে বিষম বিপদ্, যে সেনাদল লইয়া তাহাঁরা যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন, তাহা সম্মুখ এবং পশ্চাৎ এই উভয়দিক হইতে তাহা হইলে আক্রান্ত হইবে, আর সেইরূপ অবস্থা যদি ঘটে, তাহা হইলে—সাম্রাজ্য রক্ষা সুকঠিন হইয়া উঠিবে, অপর দিকে সেনাপতির মত এই যে, অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিবার সংকল্প যদি পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলে শত্রুগণ এবং রাজধানীস্থ সকল ব্যক্তিই বুঝিবে যে সম্রাট ভয় পাইয়াছেন, এই প্রকার ধারণার অবশ্যম্ভাবি ফল—রাজধানীর মধ্যে গোলমাল—বিপ্লব প্রভৃতি, এই প্রকার শত্রুগণ পরিপূরিত নগরে থাকিয়া শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধ করাও এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ, এরূপ অবস্থায় রাজধানীর সকল কথাই শত্রুগণ জানিতে পারিবে, আমরা অথচ তাহাদের গতি-বিধি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না, সুতরাং নগরে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অপেক্ষা করাতে অধিক লাভের সম্ভাবনা কোথায়?—এই প্রকার নানা মতদ্বৈধ উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে সেনাপতির মতই গৃহীত হইল—নূতন সম্রাট্ সুষীম পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতি এবং কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সম্মুখ যুদ্ধের জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

সমর-সচিব এবং কোষ-সচিব—প্রতাপবর্দ্ধন এবং রাধগুপ্ত এই উভয়ের উপরই রাজধানী রক্ষার ভার অর্পিত হইল। অন্তঃপুর রক্ষার ভার স্বয়ং মহারাজ্ঞী সুপ্রিয়া গ্রহণ করিলেন। এইরূপে রাজধানীর রক্ষার বিধান করিয়া—নূতন সম্রাট সুসীম বিদ্রোহী ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন; সপ্তাহের মধ্যে রাজসেনা শোণের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। এই খানে আবার মন্ত্রণার মতদ্বৈধ হইল, সেনাপতির ইচ্ছা শোণ পার হইয়া রাজকীয় সেনা অগ্রেই শত্রু সেনাকে আক্রমণ করে, সম্রাটের তাহা অভিমত হইল না, তাঁহার বিবেচনায় শোণের দক্ষিণ পারে যেখানে তাহাঁর শিবির স্থাপিত হইয়াছিল, সে স্থানটী স্বভাবতঃ দুরাক্রমণীয় সুতরাং সেই স্থানে শত্রু সেনা যদি তাহাঁকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাঁর পক্ষেই সুবিধায় সম্ভাবনা, এই প্রকার মন্ত্রণার অদ্বৈধ্যনিবন্ধন রাজকীয় সেনা শিবির-সন্নিবেশ পূর্ব্বক বসিয়াই রহিল, শোণের দুই পারে দুইটী মহতী সেনা যেন স্পন্দহীন নিশ্চেষ্ট, কেহ কাহাকে আক্রমণ করিতে চাহে না—উভয় পক্ষের চর উভয় পক্ষের শিবিরে গুপ্তবেশে প্রবেশ করিয়া উভয় পক্ষের রহস্য উদ্ঘাটনের উপায় খুঁজিতেছিল, এই পর পার হইতে সৈন্য আসিতেছে—এইবার যুদ্ধ অনিবার্য্য, এই প্রকার জনরব প্রায় প্রত্যহই উঠিতে লাগিল, ক্রমে ঐ সকল জনরবের উপর সকলের আস্থা কমিয়া গেল, উৎসাহী সেনাপতিগণ ক্রমেই যুদ্ধ বিষয়ে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

বিচিত্র ষড়যন্ত্র।

চল পাঠক, আর একবার রাজধানীর সংবাদ লওয়া যাক্। বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজকীয় সেনা এক মাস হইল রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছে, নগরের চারিদিকেই বৃহৎ ও সমুচ্চ প্রাচীর, তাহার নিম্নে তিন দিকে গভীর খাত, পূর্ব্বভাগে গভীর তরঙ্গ সঙ্কুল ভাগীরথীই পরিখার কার্য্য করিতেছে, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই সহস্র পদাতি নগর রক্ষার জন্য প্রাচীরের বহির্ভাগে পরিখার তটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া আছে। বাহির হইতে নগর প্রবেশ করিবার জন্য সর্ব্বসমেত ষোলটী প্রকাণ্ডাকার তোরণ ছিল, দিবসে দুই দণ্ডের পর ঐ সকল তোরণের কপাট উন্মুক্ত হইত, আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ সকল কপাট বন্ধ হইত। রাত্রিকালে বাহির হইতে বা নগরে প্রবেশ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না, প্রত্যেক তোরণে সকল সময়ের জন্য আট জন করিয়া সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিত। কোন বৈদেশিক ব্যক্তির পক্ষে দিবাভাগে নগর প্রবেশ অত্যন্ত দুরূহ ছিল, কারণ অমাত্য রাধগুপ্তের অনুমতি পত্র ব্যতীত বৈদেশিকের পক্ষে নগর প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে—অমাত্য রাধগুপ্ত একাকী শয়ন-কক্ষে বসিয়া আছেন। নগর রক্ষার ভার তাঁহার উপর যে দিন হইতে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতে তিনি বাহিরের বাটীতেই রাত্রি যাপন করেন, কখন্ কোন্ গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইবে? অন্তঃপুরে থাকিলে সকল ব্যক্তির সহিত সকল সময় সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত সুবিধাজনক নহে, এই কারণেই তিনি এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন—বাহিরের দ্বারে

একজন মাত্র সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিতেছে। বিস্তৃত কক্ষের মধ্যে একটী বৃহৎ পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া অমাত্য রাধগুপ্ত একাকী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। হঠাৎ বাহিরে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল, বোধ হইল যেন একজন অশ্বারোহী অতি বেগের সহিত অশ্ব চালাইয়া—তাঁহারই বাটীর অভিমুখে আসিতেছে। একটু উদ্‌গ্রীব হইয়া অমাত্য ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য উৎসুকভাব প্রকাশ করিলেন, অল্পক্ষণ পরেই প্রতীহারী গৃহে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জানাইল যে, রাজগৃহ তোরণ হইতে একজন অশ্বারোহী আসিয়াছে, বিশেষ কার্য্যবিধায় সে এক্ষণই অমাত্যের দর্শন প্রার্থনা করিতেছে।

অমাত্যের আজ্ঞানুসারে সেই অশ্বারোহী তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং অভিবাদন করিয়া তাহাঁর হস্তে এক খানি মুদ্রাঙ্কিত পত্র প্রদান করিল। অমাত্য সেই পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। পত্রখানি এইরূপে লিখিত হইয়াছিল যে—

মহামান্য কোষসচিব মহোদয়েষু—

সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদং—

মহোদয়!—

নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় এই অসময়ে আপনার শান্তিভঙ্গ করিতে সাহসী হইতেছি, ক্ষমা করিবেন।

রাজগৃহ তোরণের বহির্ভাগে একটী অসামান্য রূপবতী বৃদ্ধোপাসিকা এই রাত্রিতেই নগর প্রবেশপূর্ব্বক মহাশয়ের দর্শনপ্রার্থিনী—অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলাম, কিছুতেই প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাহে না, বলিতেছে—রাজকীয় বিশেষ কার্য্যের জন্য মহাশয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার এখনই অত্যাবশ্যক, দাসের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে লিখিত আদেশ প্রদানে অনুগ্রহ করিবেন ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

একান্ত বশম্বদ,

শ্রীকণ্ঠীবর বর্ম্মণঃ।

পত্রখানি পড়িয়া অমাত্য একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই আগন্তুক অশ্বারোহীর দিকে চাহিলেন, অশ্বারোহী মস্তক অবনত করিয়া বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিয়া কহিল, "অমাত্য, এ দাসের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ করিবার কারণ নাই, সেনাপতির অঙ্গুরীয়—এই দেখুন—আমার হস্তে দিয়াছেন, ইহা দেখাইয়া শ্রীচরণ সমীপে আমাকে তিনি এই প্রকার নিবেদন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন বোধ করিলে, কোন লিখিত পত্র না দিয়া আপনার মৌখিক আদেশও আমাকে নিঃসন্দেহে জানাইতে পারেন, তাহাতে কোন প্রকার রহস্যভেদের সম্ভাবনা নাই।"

অশ্বারোহীর কথা শুনিয়া অমাত্য রাধগুপ্তের অধরে একটু হাসি দেখা দিল, আর একবার তাহাঁর সেই অনুসন্ধানপর নয়নদ্বয় অশ্বারোহীর বদনের উপর সন্নিবেশিত করিয়া তিনি বলিলেন "আচ্ছা তাহাই ভাল, তুমি আমার আদেশে তোমাদের সেনাপতিকে জানাও যে, সেই বৃদ্ধোপাসিকাকে একটী শিবিকার উপর আরোহণ করাইয়া অবিলম্বে আমার নিকটে যেন লইয়া আসা হয়, শিবিকার সঙ্গে সেনাপতি রক্ষকরূপে স্বয়ং যেন আমার গৃহে আসেন; আরও একটি কথা, আসিবার সময় শিবিকাবাহকগণ যেন তাহাদের অভ্যাসানুসারে কোন প্রকার শব্দ না করে, দেখ—সাবধান, নগরের মধ্যে কোন ব্যক্তিও

যেন সেই বৃদ্ধোপাসিকাকে দেখিতে না পায়, এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।”

‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া সেই অশ্বারোহী প্রতীহারীর সহিত অমাত্যের শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করিল। অমাত্য সেই বিশাল শয়নকক্ষে সেই বিস্তৃত দুগ্ধফেননিভ বিশদ শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া আবার গাঢ়চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ক্রমশঃ—

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

—০—

প্রস্তর-চিত্রণ।

THE ART OF LITHOGRAPHY.

—০—

(১৮ পৃষ্ঠার প্রকাশিতাংশের পর)

যন্ত্র।

যে সকল যন্ত্র প্রস্তর-চিত্রে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। পেন্সিলের হোল্ডার বা খাপ। ইহা ধাতু নির্ম্মিত বা কোন ভারি পদার্থে নির্ম্মিত হইলে, সূক্ষ্ম কার্য্যে বিশেষ অসুবিধা হয়। সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য হাঁসের পালক, পর বা (Quill) একটী কাষ্ঠ খণ্ডে (Pen-Holder) পরাইয়া তাহার মধ্যে পেন্সিল বা চক্ (Chalk) দিয়া চিত্র করিলে সুবিধা হইবে। সচরাচর ইহাই নিয়ম। ব্যক্তিগত অভ্যাসে যাহার যে প্রকারে সুবিধা হয় তাহাও করিতে পারেন।

২। সূচী (Etching needle) প্রস্তরের দাগ উঠাইবার জন্য এই সূচীযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। প্রস্তরের উপরের কৃষ্ণবর্ণ দাগ এই সূচীর আঘাৎদ্বারা বা ‘ঠুক্‌রাইয়া’ উঠাইতে হয়। এই যন্ত্র কেবল গেণ্ড বা দানাকরা প্রস্তরে (Grained Stone) ব্যবহৃত হয়। পালিশ করা (Polished Stone) প্রস্তরে ইহার ব্যবহার হয় না। এই যন্ত্র সর্ব্বদা সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে প্রস্তরের দাগ না উঠিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন দাগ পড়িতে পারে।

৩। ছুরী বা চাঁচিবার ছুরী (Scraper) ইহা এক প্রকার দুই মুখা ছুরী। ইহার দুই পার্শ্বই খরধার যুক্ত। এক পার্শ্বে খরধার হইলেও চলিতে পারে। ইহা দ্বারা প্রস্তরের উপরে অঙ্কিত চিত্রের উজ্জ্বল আলোকাংশ স্পষ্টতর করিবার জন্য চিত্রের উপযুক্ত নির্দ্দিষ্ট অংশ চাঁচিয়া লইতে হয়।

৪। কলম—কালী দ্বারা প্রস্তরের উপর রেখা চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, লৌহ লেখনী (Steel-pen) বা সেব্‌ল জাতীয় নকুলের লোম দ্বারা প্রস্তুত তুলিকার (Sable-hair brush) ব্যবহার হইয়া থাকে। কেহ কেহ হংসের বা অপর পক্ষীর পালক দ্বারা প্রস্তুত কলমের দ্বারাও চিত্র করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম অগ্রভাগ যুক্ত (সরু) তুলিকা প্রস্তুত করিতে হইলে একটী মোটা তুলীর (Seble-hair brush) চারি পার্শ্বের লোম, কাটিয়া মধ্যভাগের কেবল দুই চারিগাছি রাখিলে চলিতে পারে। মোটা কার্য্যের জন্য স্থূল তুলিকা ব্যবহার হইতে পারিবে। লোহার কলম (Steel-pen) ব্যবহার করিতে হইলে একটু নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের জন্য কালীও আবশ্যক মত গাঢ় বা পাতলা করিতে হইবে। তুলিদ্বারা কালী ব্যবহার

করিতে হইলে এক টুকরা শীশার পাত (২ বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ) ব্যবহার করিলে ভাল হয়। শীঘ্র শীঘ্র তুলির কালী শুষ্ক হইলে উক্ত শীশাখণ্ডের উপর এক ফোটা কালী বিস্তার করিয়া আবশ্যকমত তুলিকায় পুনঃ পুনঃ কালী পূর্ণ করিতে হইবে।

৫। কম্পাস ও রেখাযন্ত্র (Bow-pen and drawing-pen) সরল রেখা বা অপর কোন জ্যামিতিক চিত্র প্রস্তরে অঙ্কিত করিতে হইলে ঐ কম্পাস বা রেখাযন্ত্রের দ্বারা অঙ্কিক করিতে হইবে। সুতরাং এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার প্রস্তর-চিত্রকরের পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।

এই সকল যন্ত্র ব্যতীত আরও কোন কোন যন্ত্র সময়ে সময়ে ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইবে। তাহাদের বিবরণ যথা সময়ে প্রকাশ করা হইবে।

চিত্র করিবার সময় প্রস্তরের উপর হস্ত রক্ষা করিবার বিধি।

কোন কোন চিত্রকর হস্তের নিম্নে কাগজ রক্ষা করিয়া প্রস্তরোপরি চিত্র অঙ্কিত করেন। এরূপ নিয়মে প্রস্তরের উপর হস্ত স্থাপন করা বিধেয় নহে। কারণ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেন্সিলের (Chalk) গুঁড়া হস্তের ভারে কাগজে সংলগ্ন হইয়া প্রস্তরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থানান্তরিত হয় এবং চিত্রের যে সকল অংশ আলোকময় (Lighted) থাকে, তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন উৎপাদন করে বা অপর কোন অংশে অনাবশ্যক চিহ্নসকলদ্বারা চিত্রের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করে। এই সকল দোষ চিত্র অঙ্কন করিবার সময় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু চিত্র মুদ্রিত হইলে প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত কাগজের ঘর্ষণ দ্বারাও প্রস্তর চিত্রের নানা দোষ উৎপন্ন হয়। এজন্য প্রস্তরের উপর চিত্র করিবার সময় এক প্রকার কাষ্ঠময় যন্ত্র (ইংরাজিতে Bridge বা সেতু কহে) ব্যবহার হয়। ইহা একটী মূল্যবান যন্ত্র, এ কারণ ইহার পরিবর্ত্তে প্রস্তরের উভয় পার্শ্বে প্রস্তর অপেক্ষা কিছু উচ্চতর দুইটী কাষ্ঠখণ্ড স্থাপন করিয়া এবং উহাদের উপর আর একখণ্ড দীর্ঘ পাতলা তক্তা রাখিয়া, তাহারই উপর হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক চিত্র অঙ্কিত করা কর্ত্তব্য। দেখিতে হইবে যে, পাতলা তক্তাটী যেন কোন প্রকারে প্রস্তরে স্পর্শ করিতে না পারে। সর্ব্বদা ইহা যেন প্রস্তরের সহিত কিছু ব্যবধানে উপরেই অবস্থান করে। এইরূপ যন্ত্র ব্যবহার করিলে প্রস্তর-চিত্রের কোন ক্ষতি হইতে পারিবে না। যখন প্রস্তরে চিত্র করা হইবে না বা উহার কার্য্য বন্ধ থাকিবে, সে সময় যেন প্রস্তরকে উত্তমরূপে কাগজদ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয় কারণ বায়ুর সহিত বহুবিধ ধূলি ময়লা সদাই উড়িতেছে, প্রস্তরোপরে তাহা যেন কোনরূপ পড়িতে না পারে।

চিত্র করিবার পূর্ব্বে প্রস্তর পরিষ্কার করিবার নিয়ম।

প্রস্তর গ্রেণ (Grain) করিবার পরে কিছু কিছু ধূলা বা বালি (বালুকা) প্রস্তর গাত্রে সংলগ্ন থাকে, এ জন্য প্রস্তরে চিত্র করিবার পূর্ব্বে প্রস্তরের উপরিভাগ বিশেষরূপে পরিষ্কার না করিলে ধূলার উপর চিত্র করিতে হয়। ধূলার উপর চিত্র করিলে চিত্র প্রস্তরে ভালরূপ সংলগ্ন হয় না এবং ভালরূপ উহার

ছাপাও হয় না। এ জন্য চিত্র করিবার পূর্ব্বে প্রস্তরকে পরিস্কার জল দ্বারা ধৌত করিবে, কিম্বা পরিষ্কার ফ্লানেল কাপড়দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। এইরূপে পরিষ্কার করা হইলে প্রস্তরের উপরিভাগ চওড়া কোমল লোমযুক্ত তূলিদ্বারা ঝাড়িয়া লইবে। প্রস্তর উত্তমরূপ শুষ্ক না হইলে চিত্র করিবে না। উপরোক্ত নিয়ম কেবল গ্রেণকৃত (Grained) প্রস্তরের জন্য। পালিশকৃত (Polished stone) প্রস্তরের পক্ষে এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ নহে। কেবলমাত্র একটী কোমল তূলিকা দ্বারা প্রস্তর ঝাড়িয়া লইলেই এরূপ প্রস্তরের কার্য্য সুন্দর সম্পন্ন হইবে।

চিত্র করিবার সময় প্রস্তর পরিষ্কার রাখিবার নিয়ম।

প্রস্তরে চিত্র করিবার সময়েও প্রস্তর পরিষ্কার আছে কি না, সদাসর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রস্তরগাত্রে ধূলা বা পেন্সিলের (Chalk) গুড়া প্রভৃতি থাকিলে তৎক্ষণাৎ প্রস্তর হইতে তাহা অপসারিত করিতে হইবে। উক্ত কার্য্যের জন্য উষ্ট্র লোম (Camel hair) দ্বারা প্রস্তুত বা ব্যাজার (Badger hair) লোমে প্রস্তুত তুলিকা ব্যবহার করিবে। প্রস্তরের উপরিভাগ কেবল তুলিকা দ্বারাই পরিষ্কার করিবে। ফুৎকারদ্বারা কখন প্রস্তরকে পরিষ্কার করিবে না। ফুৎকারদ্বারা পরিষ্কার করিলে উহার সহিত লালা ক্ষরিত হইয়া চিত্রকে দূষিত করে। প্রস্তরের উপর হাঁচি কিম্বা কাশিও বিশেষ দোষাবহ।

শ্রীসত্য প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

মহাজন বন্ধু—৮ম খণ্ড ১১।১২ সংখ্যা ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৫। ইহাতে "মোমের ব্যবসায়" শীর্ষক একটী উৎকৃষ্ট বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। বাস্তবিকই এদেশে মোমের ব্যবসায় ফাঁদিতে পারিলে বহুলোকের জীবিকার যে পন্থা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মোমও এদেশে যথেষ্ট জন্মে। আমরা আশা করি উদ্যমশীল ধনী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এ দিকে শীঘ্রই আকৃষ্ট হইবে। "ঘোরতর স্বদেশী" প্রবন্ধে লেখক এক দল স্বদেশী লোককে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ হয়ত যথাযোগ্য উত্তর দিবেন, আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকায় এ বিষয়ের আলোচনার স্থান নাই, তবে একটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে, আর ওরূপ কটু কঠোর সমালোচনায় কালক্ষেপ না করিয়া, 'মহাজনবন্ধু' মহাজন সুলভ বন্ধুভাবে সকল সহিয়া কেবল যাহাতে স্বদেশের ও স্বদেশীর কল্যাণ হয়, সেই বিষয়ে যথাপূর্ব্ব সদুপদেশ প্রদান করিলেই ভাল হয়।

জগজ্যোতি ঃ—বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র ১৩১৫ সালের চৈত্র সংখ্যা পাইয়াছি। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণের পাঠ্য ও জ্ঞাতব্য বহুবিধ কথাই আছে। কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসঙ্ঘ সভায় বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম নেতা শ্রমণ পুন্নানন্দ স্বামী যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "কালের কাল" ও "উদারতা" কবিতাদ্বয় বেশ হইয়াছে।

পল্লীচিত্র—১৩১৫ ফাল্গুন সংখ্যা। ইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ "কবিবর নবীনচন্দ্র।" এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী পল্লীচিত্র ইহাতে আছে। "আমাদের অবস্থা" প্রবন্ধটি সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের লেখা। তিনি ঐ প্রবন্ধে একটি কথা বেশ বলিয়াছেন—"বিলাসে বিনাশ, সন্ন্যাসে বিকাশ।" তবে দুঃখের বিষয় আজকাল কেহই এ কথা শুনিতে বড় একটা প্রস্তুত নহেন। "শান্তি" গল্পটী সম্পাদকের লিখিত। গল্পটীতে নূতনত্ব আছে।

ভারত মহিলা ঃ—হহিলা পরিচালিত—মাসিক পত্রিকা ১৩১৫ চৈত্র সংখ্যা পাইয়াছি। ইহাতে স্ত্রীলোক লিখিত ও স্ত্রীলোকদিগের সুপাঠ্য কয়েকটি প্রবন্ধ দেখিলাম। দুই খানি হাফটোন ছবিও আছে। লেখার পারিপাট্য ও অন্যান্য বিষয়ে ইহাকে এক খানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা বলা যায়। প্রবন্ধ গুলির মধ্যে "বাসবদত্তা" যদিও পুরুষের লেখা প্রবন্ধ তথাপি স্ত্রীপাঠ্য ও স্ত্রীলোকের শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নাই। "সয়তানের শোক"—"Sorrows of Satan" মোর করেলি—এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত উপন্যাস ও আলোচনা, কাহার লেখা তাহা প্রকাশ নাই, তবে বোধ হয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইবে। স্ত্রীলোকের রচিত পুস্তকের আলোচনা বলিয়া বোধ হয় ভারত মহিলার অঙ্গে স্থান দেওয়া হইয়াছে, নচেৎ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। কবিরত্ন নবীনচন্দ্র শীর্ষক মহারাজ মুণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর এক প্রবন্ধ দেখিলাম। প্রবন্ধ সুলিখিত ও সুচিন্তিত। এই প্রবন্ধ ঢাকার কবিবরের স্মৃতসভায় পঠিত হইয়াছিল। আশা করি অতঃপর ভারত মহিলার মধ্যে স্ত্রীলোকের সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ ও উপদেশ ভূরি ভূরি দেখিতে পাইব। আমাদের মনে হয় তাহা হইলে ভারতমহিলা নামের সম্পূর্ণ স্বার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে।

প্রবাসী—বৈশাখ ১৩১৬। প্রবাসীর সম্বন্ধে কোনও নূতন কথা বলিবার কিছুই নাই। তবে নামটা আজকাল যেন একটু বেসুরে বাজিতেছে। "প্রবাসী" এই কথা একটু দূরত্ব জ্ঞাপন করে, তবে তাহাতে নিজ বাসের উপর যে অনুরাগের অভাব তাহা মনে হয় না, বরং প্রবাসীর নিজ বাসে অনুরাগ অনেক বেশী হয় শুনা গিয়াছে।

প্রবন্ধ গুলির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকায় স্থান কোথায়? সংক্ষেপে সব কথা বলাও ভাল নয়, তাই রীতিমত আলোচনা করিতে আমাদের সময় ও সাহসে কুলায় না। তবে প্রবন্ধগুলির এক প্রকার উল্লেখ করা যাইতেছে মাত্র।

'গোরা' ক্রমশঃ চলিতেছে, শেষ না হইলে কোনও কথা বলা চলে না। 'জ্যোতিষের রহস্য' এ প্রবন্ধটীর রহস্য উদ্ঘাটন করিতে আমরা পারিলাম না। কয়েকটী 'চক্রাবিষ্ট' দেখিয়া অগত্যা এ প্রবন্ধ বন্ধ করিতে হইল। বোধ হইতেছে এ প্রবন্ধের পাঠক, সমালোচক ও প্রকাশক সকলেই চক্রাবিষ্ট তবে লেখক মহাশয় নন্ এই যা রক্ষা। 'প্রত্যাবর্ত্তন' এই গল্পটী প্রভাত বাবুর লেখা, সুতরাং ইহার প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রকার গল্পকে প্রথম শ্রেণীর গল্প ধরা উচিৎ এবং এই প্রকারের গল্প যে সকল মাসিকে যত অধিক বাহির হয়, সে সকল মাসিকের গৌরব যে ততই বর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

'সহজ শোভন' কষ্ট কল্পিত জাতীয় ভাব, এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য কি বুঝা গেল না, তবে এটি যে অত্যন্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ নয়, ইহাও স্থূলদৃষ্টি সমালোচকের পক্ষে অনেক সুবিধার কথা—'বৃহৎ বৃহৎ অকেজো বাক্যাড়ম্বরে পুঁথি পুরাইতে হইল না।" 'বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি ও দর্শনীয় স্থান সমূহ' একটি সচিত্র ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। 'ভারতবর্ষ ও আমেরিকার রেলগাড়ী কৌতূহলোদ্দীপক সচিত্র প্রবন্ধ অনেকেরই ভাল লাগিবে।' "অবণীন্দ্রনাথের চিত্রের সৌন্দর্য্য কোথায়"—প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি, এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত চিত্রখানি প্রবাসীত এই সংখ্যায় প্রকাশ হওয়া উচিৎ ছিল। নচেৎ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকেই এই ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন "সত্য সত্যই সীতার ঐরূপ সুন্দর চিত্র দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই!" প্রবন্ধলেখক তারাপ্রসন্ন বাবুকে আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থনের উদ্যম ও ঐকান্তিকতার জন্য ধন্যবাদ দিই, কিন্তু চিত্রের সম্বন্ধে সময়ান্তরে অনেক কথা বলিবার বাসনা রহিল, কারণ সে আলোচনা এ প্রবন্ধের অঙ্গীভূত হইবার কথা নয়। 'যুমিয়া জাতি' গবেষণা মূলক আখ্যান। "কলঙ্ক ভঞ্জন"—প্রবন্ধে লেখক প্রিয় সুরেন্দ্রের কলঙ্ক মোচন করিয়া ভালই করিলেন, তবে বেচারি লক্ষণ সেনকে পরিত্রাণ করা হইল না—এই যা দুঃখ! গুরু উৎসাহ দিয়া শিষ্যকে বলিতেছেন 'তুমি যদি ঐতিহাসিক faltএর উপর আস্থা স্থাপন করিতে, তবে এই সুন্দর ছবিটি তোমার আকাঁ হইত না', সুতরাং সুরেন্দ্রবাবু ছবি আঁকাতে যে বিশেষ উপকার হইয়াছে এবং সুরেন্দ্রবাবুর প্রতিভা পথ ফুলের ন্যায় যে তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা জানিয়া পাঠক, সম্পাদক ও আলোচক নিরস্ত থাকিবেন সন্দেহ নাই! এক্ষেত্রেও দুঃখের কথা এই যে, ছবি খানি সঙ্গে সঙ্গে নাই। সত্যপ্রসন্ন সিংহ S. P. Sinhর জীবনের ও পরিচায়ক চিত্র পাঠ করিয়া সকলেই সুখী হইবেন। ইহাতেও কয়েকখানি ছবি আছে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী সমালোচনা, চিত্রপরিচয় সংকলন 'শীর্ষক' প্রবন্ধাদি; যথারীতি বাহির হইয়াছে।

——(*)——

চিত্র-পরিচয়।

এই সংখ্যায় স্বনামধন্য মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের একখানি প্রতিমূর্ত্তি চিত্র প্রদত্ত হইল। আজকাল সাধারণ হাফটোন চিত্র প্রায় সকল পত্রিকাতেই মুদ্রিত হয়, সুতরাং তাহা পাঠকবর্গের অপরিচিত নহে। বিশেষ শিল্প ও সাহিত্যেরও প্রতি সংখ্যায় দুইখানি করিয়া হাফটোন চিত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু মহাত্মা সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের এই চিত্রখানি সে শ্রেণীর নহে। ইহাকে মেজোগ্রাফ্ (Metzograph) চিত্র বলে। ইহার বিশেষত্ব সাধারণ প্রেসেই অক্ষরের সহিত হাফটোনের ন্যায় ছাপা হয়, অথচ লিথোগ্রাফের অনুরূপ দানা বিশিষ্ট (Grained) মুদ্রিত হয়। সহসা দেখিলে লিথোচিত্র বলিয়াই ভ্রম হয়। পাঠকগণ সামান্য লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য।
শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত।
মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা।

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড | সন ১৩১৬—জ্যৈষ্ঠ। | ৯ম সংখ্যা।

তন্ত্র কি ?

(১৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

জাগ্রত ও স্বপ্ন সকলেরই কার্য্য বা কর্ম্মাবস্থা, ইহা ব্রহ্মের ব্যক্তশক্তি, এবং সুষুপ্তি কারণাবস্থা বা ব্রহ্মের অব্যক্তশক্তি। কারণ না থাকিলে কার্য্য অসম্ভব। সুষুপ্তি অবস্থায় অলক্ষ্যভাবে সেই কর্ম্ম-সমূহের কারণরূপে অব্যক্তশক্তি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যথাযোগ্য নব নব কল্পনার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। তখন হইতে আবার সর্ব্ব কারণের কারণ ওঁ জ্যোতিঃ-স্বরূপমধ্যে অব্যক্ত প্রকৃতি কারণশক্তি ব্যক্ত বা ত্রিধা-শক্তিরূপে প্রকটা বা আবির্ভূতা হইয়া নূতন ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন, আবার এক নূতন মনু বা মন্বন্তর এবং প্রত্যেক মন্বন্তরের অন্তরমধ্যে আবার সেই সত্য ত্রেতাদি যুগকাল অতিবাহিত হইতে থাকে। যাহারা বলেন, আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস নাই বা ইতিহাসে কালনির্ণয় নাই, তাহারা ভ্রান্ত, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রের কোন তত্ত্বই রাখেন না। এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্কল্প-মন্ত্রে, কল্পান্তর হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন্ কল্পের কোন্ মনুর অধিকার কালে, কোন্ যুগের কত বর্ষ, কত দিন, কত প্রহর, দণ্ড ও পল অন্তে, কোন কর্ম্ম আরম্ভ হইল, তাহার উল্লেখ হইয়া থাকে। এখনও পঞ্জিকা-কারগণ প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রতি বৎসর পঞ্জিকার প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক সেই মহা-কল্পান্তেই মহাকাল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল একবার কলন্ বা গ্রাস করিয়া থাকেন। সেই মহা-কলন্সময়ে আপামর সকলেই তাঁহাতে লয় হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারই অনুকল্পে

আমাদের বর্ষশেষে চৈত্র-সংক্রান্তিতে আমরা চড়ক-সন্ন্যাস ব্রত করিয়া থাকি। সেই সন্ন্যাস ব্রতে জাতি-ভেদ থাকে না, তখন সন্ন্যাসাবস্থায় ব্রাহ্মণেতর সকলেই শিবগোত্র-সমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থাৎ সেই মহাকল্পের মহা-প্রলয় দিবসে সকলেই মহাসন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, তখন নূতন সৃষ্টি রহিত হইয়া যাইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, তখন সকলেই মহাকালে বিলীন হইবার উপ-যুক্ত হইবে। ইতিপূর্ব্বে সে কথা বলিয়াছি। মহা-কাল বা শিব—হরগৌরী বা শিবদুর্গার শিব নহেন বা গৌরীপট্টসম্বলিত শিবলিঙ্গও নহেন, তখন তিনি অনাদি বৃদ্ধশিব বাণলিঙ্গ বা বুড়াশিব বলিয়া উক্ত হন। অর্থাৎ শিবের সংযুক্তশক্তি গৌরীপট্টও তখন শিবে তুরীয়ভাবে লয় হইয়া গিয়াছেন। সেই কারণ গৌরীপট্টসম্বলিত শিবের নিকট চড়ক-সন্ন্যাস বা গাজন-উৎসব হয় না ; অর্থাৎ কেবল অনাদি লিঙ্গ-পিণ্ডমাত্র বা শিবের শেষ চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। এ কথা এখনও অনেকে জানেন। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, ক্রমে যুগ, মহাযুগ ও কল্পে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন দিন সেই মহা-কালে কালও বিলীন হইবে, সেই কল্পদণ্ড ও তাহাতে চক্রাকারে পরিভ্রমণেরই অনুকল্পে বৎসরান্তে এই চড়ক উৎসব হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরশেষে সেই সুদূর ভবিষ্যতের শেষ দিনের কথা স্মরণ করিয়া জীব-জগৎ উচ্ছৃঙ্খল পাপপ্রবৃত্তি হইতে সাবধান হও, ইহাই মঙ্গলময় শঙ্করের ইঙ্গিৎ মাত্র। আহা ! আর্য্য-শাস্ত্রের কি গভীর দূরদৃষ্টি—ভাবিলে বাস্তবিকই চমৎ-কৃত হইতে হয় !

আর্য্য-ঋষিগণ সেই মহাকালের রূপ-কল্পনায় তাঁহার মহাসুষুপ্তি সময়ের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শব-রূপের ধ্যান করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ ত্রি-বর্ণের অতীত পারদোপম শ্বেত-শাশ্বতবর্ণ, অঙ্গে কত শত-সহস্র মহাপ্রলয়ের শেষ-চিহ্ন ভস্ম বা বিভূতিতে নিত্য পরিশোভিত, নির্লিপ্ত বা সন্ন্যাসের শেষ ভাব, জটাজুট রুণ্ডমালা সমন্বিত, যাহা সাধকের চরম লক্ষ্যের বিষয়ী-ভূত। তিনি দিগম্বর, সে বিরাট দেহের আবরক বস্ত্রের কল্পনা কি মানব-মস্তিষ্কে স্থান পাইতে পারে ? তিনি ত্রিকালদর্শী মহাকাল, তাই তাঁহার ত্রি-নয়ন সাধকের ধ্যেয়। মহাশঙ্খ বা অস্থিমালা তাহাও মহাশ্মশানের নিত্য নিদর্শন ; হস্তে ত্রিশূল, ত্রি-গুণাত্মক ব্রহ্মের তিনটী বিভিন্ন গুণ বা শক্তির সমীকরণমাত্র, বর্ণাতীত বা নির্বর্ণ শুভ্রবর্ণে সূর্য্যালোকে প্রকাশ। কিন্তু আলোক ত স্বয়ং প্রকাশমান নহে—ছায়া যে তাহার অংশস্বরূপা। আলোক যেখানে বর্ত্তমান, ছায়াও যে তাহারই পার্শ্ব অবস্থিত। আলোক—পুরুষ, ছায়া—স্ত্রী। আলোক ও ছায়া ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। ছায়া না থাকিলে কোন বস্তুই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত না, অথবা আলোকের উপলব্ধিও হইত না। যাহার প্রধান বিভূতি লইয়া সূর্য্যদেব জগতে প্রকাশমান, সেই অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ত্রি-গুণাত্মক হইয়া গুণাতীত বা নির্গুণ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। আদ্যাশক্তি তাঁহারই ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তি-স্বরূপা ছায়ারূপে তাঁহার বিভূতি বা বক্ষের উপর থাকিয়া তাঁহারই গুণ-প্রকাশক। সাধক পূর্ব্বোক্ত তুরীয় বা নিশা-সন্ধ্যার অধিকার পাইলে—ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মকে নির্গুণভাবে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বা শবরূপী শীবস্বরূপে দর্শন করেন। এই হেতু স্বয়ম্ভূ শিব ত্রি-বর্ণের অতীত বা রক্ত নীল ও পীত মূল ত্রি-বর্ণের সমাহারে বর্ণাতীত নির্বর্ণ বা সূর্য্যা-

লোক-সম রজত-গিরিনিভ পারদোপম শ্বেতশাশ্বতবর্ণ। অথবা ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও গৌরীশক্তির সমাহারে বিলীন হইয়া নির্শক্তি বা শবরূপী মহাকাল অর্থাৎ জ্যোতিঃ-স্বরূপ। তাঁহার ছায়ারূপা পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি শ্যামবর্ণা, তাঁহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িতা হইয়া তাঁহার হৃদয়োপরি সংস্থিতা রহিয়াছেন। ইনিই সাকারে আদ্যাশক্তি দক্ষিণকালিকা মূলা প্রকৃতি এবং নিরাকারে তুরীয়া-স্বরূপিণী।

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্রে শিব বলিতেছেন :—

"অকারঃ সাত্ত্বিকোজ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ।
মকার স্তামসঃ প্রোক্ত স্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে॥"

অকার সত্ত্বগুণাত্মক বৈষ্ণবী, উকার রজঃগুণাত্মক ব্রাহ্মী এবং মকার তমগুণাত্মক মাহেশ্বরী বা গৌরী, এবং এই তিনের সমাহারে ওঁকার বা প্রণব-স্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি অথবা তুরীয়া বলিয়া উক্তা হন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—

ইচ্ছা ক্রিয়া তথাজ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মীতু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তি স্থিতালোকে তৎপরে জ্যোতিরোমিতি॥

অর্থাৎ পরমা প্রকৃতির প্রত্যক্ষ গুণত্রয় পর্য্যন্ত প্রকৃতি, তাহার পর জ্যোতিস্বরূপ ওঁ প্রণব, বাক্য ও মানব মনের অগোচর সিদ্ধ সাধকের পরম নিত্য ধন।

ব্রহ্মসাধনায় সাধকের ধ্যেয় কি ?

সাধক সাধনার সকল সময়েই শরীরী—পঞ্চ-ভূতাত্মক ক্ষুদ্র মানবরূপে ক্ষুদ্র আধার-স্বরূপ মাত্রা সে আধারে ব্রহ্মময়ীর অনাদি ও অনন্ত রূপ—যাহা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুর সহিত সূক্ষ্ম ও বিরাট ভাবে সম্মিলিত বা বিজোড়িত, সে অসীম রূপ ধারণা করিবার ক্ষমতা কোথায় ? সে মহাশক্তির একটী রশ্মী-রেখাও যে, জীবের ধারণা করিবার শক্তি নাই। ক্ষুদ্র মানব পৃথিবীর কোন্ সূক্ষ্মতম পরমাণু পরিমিত স্থানে বসিয়া নিজ বুদ্ধির গর্ব্ব করিতেছে, তাহা ভাবিলেও লোক পাগল হইয়া যাইবে। সেই ক্ষুদ্রাপেক্ষা অতি ক্ষুদ্রতম স্থান আমরা যথায় অবস্থান করিতেছি, তাহা ভূমণ্ডলের কোন্ কোণে—তাহার তুলনায় সমগ্র ভূমণ্ডল—প্রকাণ্ড, সে কত প্রকাণ্ড, সূর্য্যাদি গ্রহমণ্ডল সমন্বিত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় আবার কত শত ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়া তাহার অনন্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ! তাহারই প্রতি পরমাণু হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্তে যাঁহার অবস্থিতি সেই অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্মের ধ্যান বা ধারণা এই ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ের কোন স্থানে কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে। সাক্ষাৎ তেজতত্ত্ব অর্জ্জুনও তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট বিষ্ণুরূপ দেখিয়াই কম্পান্বিত কলেবরে বলিয়া ছিলেন :—

"* * * দৃষ্টালোকাঃ প্রবথিতাস্তমাহং ॥২৩"
"* * * দৃষ্টাহিত্বাং প্রবথিতাস্তবাত্মা।
ধৃতিংনবিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪"

তাহার পরই আবার বলিয়াছেন :—

"* * * নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং ॥৩১"
(গীতা—একাদশ অধ্যায়)।

পরিশেষে বহু স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন প্রভু, তোমার এ সুদুর্দ্দর্শরূপ দেখিবার শক্তি আমার নাই। অর্জ্জুন তখনও ত মানব, মানবীয় শক্তির অনুরূপ ধারণাশক্তি লইয়া বর্ত্তমান ? যে পাত্রের যেরূপ পরিসর, তাহাতে তদপেক্ষা অধিক সামগ্রী রাখিলেই ত পড়িয়া যাইবে ? এ ক্ষুদ্র হৃদয়াধারে সে অনন্ত ব্রহ্ম-মহাসমুদ্র ধারণা করিবার স্থান আদৌ নাই, সাধক সেই কারণ

গুণাতীত তুরীয়া-শক্তির আরধনা করিবার জন্যও গুণময়ী ত্রি-গুণাত্মিকা মহাশক্তির সাকার আরাধনা করিয়া থাকেন। সাধনার উচ্চ সমাধি-অবস্থায় যখন সাধক জলকণারূপে মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া যান—তখনই অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় তুরীয়ভাবে সাধকের তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সচ্চিদানন্দ লাভ হইয়া থাকে। ইহাই জীবের জীবনমুক্তি।

শ্রীসদাশিব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, গুণাতীত ব্রহ্মের গুণময়ী আদ্যাশক্তির আরাধনা ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই। জলমধ্যে পতিত হইলে যেমন জীব সেই জল অবলম্বন ও পরিহার সহযোগে সন্তরণদ্বারা তীরে উঠিতে পারে, অন্যথা ডুবিয়া মরে; ভবসমুদ্রে জলরূপ এই গুণরাশির মধ্যে পতিত হইয়া জীব তেমনি করিয়া উঠিতে সমর্থ হয়। সেই গুণই অবলম্বন এবং তাহার পরিহার দ্বারা সাধন-সন্তরণযোগে গুণমুক্ত হইতে পারে। সেই কারণ নির্গুণ সাধনার জন্য সগুণসাধনাই সনাতন-শাস্ত্রের বিধি। মানব যে মাটীতে পড়ে তাহাই ধরিয়া উঠিতে যত্ন করে। বাস্তবিক সগুণ সাধনা ব্যতীত অন্য কোন রূপে ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যখন সাধক সাধনামার্গের মহাপূর্ণদীক্ষার পর "সোহং" জ্ঞান উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তখনই নির্গুণ ব্রহ্মের কিয়ৎপরিমাণ আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সাধকচূড়ামণি রামপ্রসাদ তাই ভাবোন্মাদে গাহিয়াছিলেন,—"ওরে যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, শেষে লয় হয়ে যায় মিশায় জলে।" এই কারণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপানস্বরূপ আদ্যা-আরাধণাই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়। মানব যতই ভক্তিমান, নিষ্ঠাবান বা সাধনাতৎপর হউন না কেন, ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত মুক্ত হইতে পারিবে না। সেই কারণ ব্রাহ্মণদিগের গায়ত্রী-রূপিণী শক্তিত্রয় সমন্বিত ব্রহ্মময়ীর আরাধনা সমাধি লাভের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। সর্ব্ব-বর্ণগুরু ব্রাহ্মণদিগের গায়ত্রী আরাধনা অলঙ্ঘনীয় নিত্যকর্ম্ম বলিয়া বেদাগমের কঠিন শাসন। তবে সে অবস্থা পাইবার জন্য প্রত্যেককেই ধীর সোপানাবলম্বনে আরোহণ করিতে হইবে। সামান্য নিত্যকর্ম্মও সাধকের পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সকল কর্ম্মই সেই উচ্চতম ব্রাহ্মণ্য বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ক্রমোন্নত সোপান।

সাধক জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে সেই বাঞ্ছিত উন্নতি-লাভ করিয়া থাকেন। কে যে কত শতসহস্র যুগ যুগান্তর ধরিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করতঃ সাধনা করিয়া আসিতেছে তাহা কে বলিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য প্রদেশের সাধকমণ্ডলীমধ্যে যে বিদ্যায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে—সেই সম্মোহন বিদ্যায় অভিজ্ঞ বা আত্মীকতত্ত্ববিদ্ (মিস্‌ম্যারাইজ ও হিপনটিক্ আদি বিদ্যায় পারদর্শী) ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছেন কিন্তু তাঁহারা এখনও জন্মান্তর মানেন না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তদপেক্ষা উন্নততর বিষয় তাহাঁদের বোধাতীত অথবা ধারণাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা আত্মীকতত্ত্ব লইয়া যেরূপ বৃথা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া যদ্যপি তদ্‌সহ গুরুমুখাগত হইয়া উচ্চ সাধনামার্গে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সময়ে জন্মান্তর-রহস্য তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা আত্মিকতত্ত্ব লইয়া যেরূপ বৃথা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া যদ্যপি তৎসহ গুরুমুখাগত হইয়া উচ্চ সাধনা-মার্গে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সময়ে জন্মান্তর-রহস্য তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সিদ্ধ সাধকগণ মৃতব্যক্তির আত্মা-আনয়নাদি সম্মোহন বিদ্যার সকল তত্ত্বই অবগত আছেন, এমন কি তাঁহারা জীবন্ত ব্যক্তির বা নিজ-আত্মারও পরিচালনাকরিতে পারেন। তবে কৌতুকরূপে পরীক্ষা বা অন্য ব্যক্তিকে তাহা দেখাইবার জন্য কোন কিছুই করিবেন না, ইহাতে সাধকের সাধনার হানী হইয়া থাকে। সুতরাং সমাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্দিহান হইও না—জন্মান্তর সাধনার ক্রমোন্নত পথ বলিয়া জানিবে।

যাহা হউক সাধক—ব্রহ্মার আরাধনায় ব্রহ্মালোক, বিষ্ণুর আরাধনায় বিষ্ণুলোক বা গোলক, শিব-আরাধনায় শিবলোক বা কৈলাস লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকাম আরাধনায় সাধক সিদ্ধ হইয়া স্বঃ বা স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু উচ্চাবস্থায় নিষ্কাম আরাধনায় ত্রি-লোকের অতীত ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। অনন্তর ষড়রিপু ও অষ্টপাশ মোচন হইলে, জীব শিবত্ব বা নির্গুণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। সনাতন নিষ্কাম সাধনামার্গ অবলম্বনব্যতীত জীব সেই বাঞ্ছিত পদ লাভ করিতে পারে না। তবে জীব সাধনার অতি নিম্ন স্তর হইতে যাহারই সাধনা করুন না কেন, ফলে সেই ব্রহ্মেরই সাধনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়। যেমন আলোক নিজে প্রকাশমান নহে, ছায়া তাহার অংশ স্বরূপ, সুতরাং আলোক সে হিসাবে নিরাকার; যখন সেই আলোক, জগতের প্রতি পরমাণুতে ছায়ামণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, তখনই যেমন তাহার আকার উপলব্ধ হয়, তেমনই ব্রহ্ম নিরাকার হইলেও সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুতে প্রকৃতি-যুক্ত হইলে তাহার আকার পরিব্যাপ্ত ও পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিববাক্যে তাই উক্ত আছে যে,—

একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি
বিশ্বার্চ্চ্যা তদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্॥

* * * *

সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ সএব সৎকৌলো জীবন্মুক্ত ন সংশয়ঃ॥

এক মাত্র পরব্রহ্ম জগন্মণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব জগন্মণ্ডলের অন্তর্গত কোন বস্তুরই পূজা করিলে সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হইবে। কারণ কোন বস্তুইত ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যিনি সমুদায় বস্তুতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মতেই সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান অবলোকন করেন, তিনিই সৎকৌল ও জীবন্মুক্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবেই হইল, উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ বা মুক্তিলাভ শিবপ্রোক্ত কৌলধর্ম্মেই নিহিত আছে। সদাশিব তাই বলিয়াছেন,—নিবিড় জলদাবৃত মহা-অমানিশার ঘোর সান্দ্রান্ধকার যাহার পূজার সময়, নরকঙ্কাল-শবমুণ্ড-পরিবৃত শিবা-শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ শ্মশান যাহার পূজার আসন—কর্ণভেদী ভয়ঙ্কর অশনি-নির্ঘোষ যাহার পূজার বাদ্য—'তত্ত্বমসি' যাহার মহাবাক্য—মহাশক্তি যাহার ধ্যেয়, তাহার আবার চিন্তা কি? আসক্তি বিরক্তি বর্জ্জিত নিষ্কাম কৌলের আবার ভাবনা কি? সসাগরা

ধরার রাজদণ্ডও যে, তাহার নিকট ধেনুদণ্ডের ন্যায় হেয়। ব্রহ্মজ্ঞ কৌলের পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিবর্জ্জন উভয়ই যে সমান কথা। "ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ কৌলস্য ত্যাগানুষ্ঠানয়ো সমম্।"

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ
ব্রহ্মণাহুতাম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং
ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥

ওঁ তৎসৎ ওঁ।

সচ্চিদানন্দ।

—— ০ ——

জীবন।

রাত পোহালো দিনের আলো
ডুবলো গগন-গায়।
নদীর খর স্রোতের মত
ক্ষুদ্র পরাণ ধায় ॥

দিনেক তরে হৃদয়-দ্বারে,
জ্ঞানের ঘণ্টা বাজ্‌লো না রে;
শ্মশান মত হৃদয় খানা
চালিয়ে কে নে' যায়।
নিরাশ ভরে উদাস হয়ে
জীবন জেগে রয় ॥

মর্ত্ত-সুখের আশার আশা,
নিজের স্বার্থ, রূপের তৃষা,
ধন গরিমা মোহয় পড়ে
জীবন হল সায়।
তুমি ই' ত দেব এ সব দিয়ে
ভুলিয়েছ আমায় ॥

আপন-তত্ত্ব, সাধন শিক্ষা,
আঁধার পথে গুরুর দীক্ষা,
ভূ-লোক আদি সপ্ত স্বরগ
এ সব কথা হায়।
অন্ধজনের জগত দেখা—
বুঝবো কিবা তায় ॥

তোমার দয়া ঘট্‌লে পরে,
এ সব তত্ত্ব আপনি ঝরে,
এক নিমেষে সকল তথ্য
বুঝতে পারা যায়।
তাইতে প্রভু, প্রাণটা যেন
তোমায় শুধু চায় ॥

আমার শক্তি তোমার হাতে,
যাওয়া আসা তোমার পথে,
তোমার কৃপা মিল্‌বে কবে
হে দেব দয়াময়।
দীনের দিন, দিন যে গেল—
জীবন বয়ে যায় ॥

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবাদ।

—***—

বারিধিমেখলা-মেদিনীমধ্যে পবিত্র ভারতভূমি প্রকৃতিসুন্দরীর লীলা-নিকেতন, ভারত প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া যে প্রদেশে যে ভাবে বিরাজিতা, এই পুণ্য ভারতবর্ষেও সেই রূপ, সেই দৃশ্য, সেই ভাবসমষ্টিতে বিরাজমানা। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ সর্ব্ববিধ দৃশ্য, সৃষ্টির সেই আদিকাল হইতেই নিখিলরস-বিলাসিনী জীব-হৃদয়বিনোদিনী ভারতভূমির অঙ্কাধিষ্ঠিত মানবসমাজের নয়ন-মন-রঞ্জন করিয়া আসিতেছে। "আয়ুর্ব্বেদ" সেই ভারতের একটী উজ্জ্বলতম অমূল্য রত্ন। আয়ুর্ব্বেদে জগৎ-গঠয়িতার একটী শ্রেষ্ঠ রচনা-কৌশল দেদীপ্যমান। মানববৃন্দ এই কলেবর ধারণ করিয়া শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিকশক্তি-সহকারে, কত যে অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা মনে করিলে বাস্তবিক বিমোহিত হইতে হয়। দেহই, সেই শক্তির আধার—সেই বিবিধ লীলারস-ব্যঞ্জক জ্ঞানময় পুরুষের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র ও রত্নময়-কোষ। এই দেহের সুস্থতাই যে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের প্রধান হেতু, তাহা "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামা-রোগ্যং মূলমুত্তমং"। এই সিদ্ধ বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব যাহাতে আরোগ্যলাভ এবং আয়ুঃবৃদ্ধি হয়, তাহাতে বিশেষ যত্নবান, এবং যে শাস্ত্রে তদ্বিষয়ক সদুপদেশসমূহ বিদ্যমান আছে তাহার অবগতি মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। ঋষিগণ, সেই শাস্ত্রের আয়ুর্ব্বেদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতং ॥"
মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে ॥"

চঃ সূঃ ১ম অঃ।

হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ, দুঃখায়ুঃ ভেদে আয়ু চতুর্ব্বিধ। যে শাস্ত্রে সেই চতুর্ব্বিধ আয়ুর হিতাহিত, পরিমাণ ও অপ্রমাণ (মানঞ্চ = মানং আয়ুষঃ পরিমাণং চকারাদমুক্তমপ্যায়ুষোঽপ্রমাণং ইতি জল্প কল্পতরু।) বর্ণিত আছে তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। অপিচ—

"আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে ॥"

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির নিদান (আদি কারণ) ও প্রশমনোপায় এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া থাকেন।

কথিত আছে—একদা পণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ শরীরি-দিগের বিঘ্নভূত, তপঃ, উপবাস, অধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যের হানিকারক রোগসমূহ উৎপন্ন হইতে দেখিয়া দেবতাত্মা হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সমবেত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূল মুত্তমং।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্যচ ॥"

চঃ সূঃ ১ম অঃ।

আরোগ্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফললাভের প্রধান উপায়; রোগসমূহ সেই ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের অপহন্তা ও জীবনের নাশক।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহারা ভরদ্বাজ মুনিকে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করেন।

"কঃ সহস্রাক্ষাভবনং গচ্ছেৎ প্রষ্টুং শচীপতিং।
অহমর্থে নিযুজ্যেয়মত্রেতি প্রথমং বচঃ।
ভরদ্বাজো হব্রবী ওস্মাৎদৃষিভিঃ স নিয়োজিতঃ॥"
চঃ সূঃ ১ম অঃ।

অনন্তর মুনি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধ জ্ঞান বিশিষ্ট, স্বস্থ ও আতুরের উৎকৃষ্ট মার্গোপদেশক, শাশ্বত, পুণ্যজনক আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসিলে বরেণ্য পুনর্ব্বসু প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা করেন, পরে সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মবুদ্ধি মুনি পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশাদি শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। এইরূপে জগতে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হয়।

যে আত্মজ্ঞানে সমস্ত জ্ঞানের পরিসমাপ্তি এবং যে আত্মজ্ঞান সমগ্র বেদের পরাকাষ্ঠা, আয়ুর্ব্বেদও সেই আত্মজ্ঞান লাভেরই মূলীভূত উপায়। এই হেতু চরকাচার্য্য মহর্ষি পুনর্ব্বসু আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধেয় দ্বিজ শব্দ অপেক্ষা সম্মানভূত "ত্রিজ" শব্দাভিধানে অভিহিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা বেদাদি জানেন তাঁহারা দ্বিজ, কিন্তু যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ জানেন তাঁহারা "ত্রিজ" নামে খ্যাত।

ঋগ্বেদাদি অপর শাস্ত্র প্রায় পরকাল লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু ইহকাল, পরকাল, উভয়কাল লক্ষ্য করিয়া আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি।

আয়ুর্ব্বেদাবতারণায় মহর্ষি বলিয়াছেন—
"তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদ বিদাংমতঃ।
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরু ভয়োর্হিতঃ॥"
চঃ সূঃ ১ম অঃ।

এই পুণ্যতম আয়ুর্ব্বেদ বেদজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকর্ত্তৃক পূজিত। যে হেতু মনুষ্যসমূহের ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের হিতসাধক বিষয়সমূহ ইহাতে কথিত আছে।

ইতঃপূর্ব্বে হিতাহিতাদি ভেদে আয়ু চতুর্ব্বিধ বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই আয়ু কি? তাহা না জানিলে আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। সেই হেতু এক্ষণে আয়ু কি? তাহাই বলা যাইতেছে।

"শরীরেন্দ্রিয় সত্ত্বাত্ম সংযোগোধারি জীবিতম্।
নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে॥"
চঃ সূঃ ১ম অঃ।

চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয় শরীর, ইন্দ্রিয়, সত্ব (মন) ও আত্মা (চেতনা ধাতু) ইহাদের সংযোগই আয়ু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্ম (পরস্পরকে) ধারণ করে বলিয়া ধারি, প্রাণাদির ধারক বলিয়া জীবিত, শরীরের ক্ষণিকত্ব হেতু প্রতিক্ষণ গমনশীল বলিয়া নিত্যগ ও পূর্ব্বাবস্থান ত্যাগ পূর্ব্বক অনুরূপে উত্তরকালে পরাবস্থানকে আশ্রয় করে বলিয়া অনুবন্ধ—এই কয়টী আয়ুর পর্য্যায়শব্দ।

এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন কি, তাহা জানা আবশ্যক।

ধাতু সাম্যরক্ষণ ও বিষম ধাতুর ধাতু সাম্য করণই আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন।

যে হেতু—

"বিকারো ধাতু বৈষম্যং ধাতু সাম্যমরোগিতা"

ধাতুর অর্থাৎ বাত পিত্তাদির ন্যূনাধিক্য ভাব—বিকার (ব্যাধি); এবং উহার সাম্য—অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থান আরোগ্য।

ধাতু সাম্যরক্ষণ ও বিষম ধাতুর ধাতু সাম্য করণের যে কয়েকটী কারণ মহর্ষি চরকাচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীঅমূল্য চন্দ্র বৈদ্যরত্ন।

বর্ণ-চিত্রণ।

(১৫৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

মনুষ্যের মুখাকৃতি মধ্যে ভ্রূযুগলের নিম্নে (পার্শ্বস্থ

চিত্রের অনুরূপ) একটী সরলরেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার দুই প্রান্ত হইতে আর দুইটী সরলরেখা চিবুক পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে, তাহাতে যে ত্রিভুজ ক্ষেত্র অঙ্কিত হয়, তাহার অন্তর্গত চারিটী স্থান অর্থাৎ ভ্রূ, চক্ষু, নাসিকা ও অধরোষ্ঠই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাব-বিকাশের সম্পূর্ণ আধার স্থান।

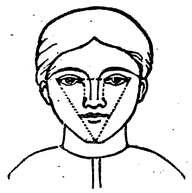

এই চারিটী স্থানের মধ্যে আবার নয়নের ভিতর দিকের কোণগুলি, ওষ্ঠ এবং অধরের বাহিরের কোণসমূহ এবং ভ্রূদ্বয়ই প্রধান। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নয়নের মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি অদ্ভুত এবং অনন্ত, এমনকি মুখের ভাষাও ইহার নিকট যেন সঙ্কুচিত। প্রকৃতপক্ষে মানব যখন ভাষা বলিতে অপারগ, যখন বাকশক্তির আদৌ বিকাশ হয় না, সেই শৈশব-সময়ে, অথবা যৌবনের চাঞ্চল্য-বিজড়িত প্রগাঢ় দাম্পত্য-প্রেমের প্রথম-প্রেমবিনিময়ে যখন অফুরন্ত ভাষার তরঙ্গ মন্দীভূত হইয়া অন্তরেই লয় হইবার উপক্রম হয়, চিত্তের সে অদম্য আবেগ যখন ভাষায় ফুটাইতে শতচেষ্টা করিলেও একটী অক্ষরেও সে ভাবের অভিব্যক্তি হয় না, কিম্বা যখন মুমূর্ষু-বৃদ্ধ জীবনের শেষ শয্যায় শায়িত হইয়া বাকশক্তি-বিরহিত-অবস্থায় পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় স্বজনের শত শত প্রশ্নের একটীও উত্তর দিতে অসমর্থ, হস্ত পদাদি পর্য্যন্ত যখন পরিচালনে একেবারে অপারগ, সমস্তই অসাড় ও নিস্পন্দপ্রায়, তখন মানবের সেই ক্ষুদ্র ক্ষীণ নয়ন-প্রান্তে নিরব-ভাষায় কত কথাই যে প্রকাশ পায়, কত অজস্র ভাবের তরঙ্গ যে তাহাতে উঠিতে থাকে, তাহা যে দেখিয়াছে সেই তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে—সে ভাব ভাষায় বুঝান অসম্ভব। শিল্পীকে নয়নের সেই নিরব-ভাষা অতি যত্নসহকারে শিক্ষা করিতে হয়, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় বা নয়নস্থিত সেই রেখাক্ষরে শিল্পীকে পরিচিত হইতে হয়, নয়নের কোন্ অংশ কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে কোন্ ভাব প্রকাশ করে, অতি সূক্ষ্মভাবে তাহার আলোচনা করিতে হয়।

দর্শনমাত্রেই মানব মানবকে চিনিতে পারে, পরস্পর ভাবের আদান প্রদানদ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার তাৎকালিক আভাষ উপলব্ধি করে, যে যন্ত্রের সাহায্যে এই ভাব মানবের হৃদয়গত হয়, তাহারই নাম নয়ন। সাক্ষাৎমাত্রেই এক ব্যক্তি যেমন অন্যের নয়নের উপর নয়ন অর্পিত করে অমনি পরস্পরের পরিচয় হয়। মানব সে সময় আর কিছুই দেখে না, সেই অল্পক্ষণের মধ্যে আর কিছু দেখিবার অবসরও পায় না, অথচ পরস্পরকে চিনিতে পারে, সুতরাং নয়নই মনুষ্য-চিনিবার প্রধান যন্ত্র। সকলের নয়নরেখা দেখিতে প্রায় একরূপ হইলেও, কি যে এক বিশেষত্ব পরস্পরের নয়নমধ্যে বিভিন্নতা বা প্রত্যেকের পার্থক্য প্রতিপাদন করে, তাহা শিল্পীর গভীর অনুশীলনের সামগ্রী। পূর্ব্বে বলিয়াছি নয়নের ভিতরের সীমারেখাস্থিত কোণগুলিই মানবের নানা অবস্থার পরিচায়ক। বস্তুতঃ শৈশব

হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ঐ ভিতরের রেখার সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তনে বয়স ও অবস্থার নানা ভাব প্রকাশিত হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের সেই সীমা রেখার ক্রিয়া এবং পুষ্টি সম্পূর্ণ বা সমাপ্ত হয়, যৌবনের পূর্ণ-বিকাশ হয়; অনন্তর নয়নের বহির্রেখা এবং বাহিরের কোণে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। এই সকল পরিবর্ত্তন এত সূক্ষ্মভাবে সংসাধিত হইতে থাকে যে, সাধারণ মানব তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেই পারে না। নিত্য সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচালনদ্বারা তাহা কেবলমাত্র শিল্পীরই আয়ত্বাধীন হয়। নর নারীর চক্ষের পার্থক্য সম্বন্ধেও সেইরূপ অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, সাধারণতঃ বীরত্ব এবং বিজ্ঞতা ব্যঞ্জক তীব্রনয়ন পুরুষ-আকৃতির পরিচায়ক, কিন্তু উজ্জ্বল, কমনীয় স্নিগ্ধ ও আবেগ-উদ্দীপক নয়ন স্ত্রী-ভাবের বিকাশ করিয়া দেয়। ইহার সূক্ষ্মতর তত্ত্ব শিল্পীর বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্মদর্শিতার উপরেই নির্ভর করে। শিল্পীকে অতি যত্নসহকারে প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে এই সকল রেখাতত্ত্বে লক্ষ্য রাখিয়া আস্যরেখা বা এয়ার্স বিন্যাস করিতে হয়। এ শক্তি আয়ত্ব করিবার একটী অতি সহজ উপায় আছে,—শিক্ষার্থীকে নিত্য নানা মুখ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া মনে মনে প্রশ্ন করিতে হইবে, 'কোন্ মুখের কোন্ স্থলে কোন্ কোন্ পেশীর সাহায্যে ভাবসকল প্রকাশিত হয়'; পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবার পর, মনই তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিবে। তখন শিল্পী কখনও নয়নপ্রান্তে, কখন কখনও ভ্রূযুগলের মধ্যে কখন বা গণ্ডে দুই চারিটী Stroke ষ্ট্রোক বা তুলিকাঘাতদ্বারা অনায়াসে সেই অভিলষিত ভাবের বিকাশ করিতে সমর্থ হইবে।

বালক বালিকা, যুবক, যুবতী, কিম্বা বৃদ্ধ বৃদ্ধার চিত্র-অঙ্কণ-কালে এই সকল আস্যরেখা বা এয়ারর্স কখন স্বল্প গভীর কখনও বা সুগভীর ভাবে চিত্রিত করিতে হয়, তাহাতেই এক প্রকার বয়সের পার্থক্য অনুভূত হয়। এই ভাব চিত্রে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত করিতে হইলে আদর্শ ব্যক্তির চিত্র-গ্রহণ-সময়ে তাঁহার মুখমণ্ডলে অতি সাবধানে বৈজ্ঞানিক নিয়মে আলোক-বিন্যাস করিতে হইবে। সেই বিজ্ঞানাংশও শিক্ষার্থীর শিক্ষার বিষয়ীভূত। "চিত্র-বিজ্ঞানোক্ত" পারিপ্রেক্ষিতিক-আলোক-প্রতিফলন অংশে তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থলে সংক্ষেপেই তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি। কোনও ব্যক্তির চিত্র গ্রহণকালে যে কোন স্থানে তাঁহাকে বসাইয়া তাঁহার চিত্র লওয়া বিধেয় নহে। এমন কি 'আলোক-চিত্র' বা ফটোগ্রাফ পর্য্যন্তও উত্তোলনকালে উপযুক্ত আলোকে আদর্শ ব্যক্তিকে না বসাইলে তাহার সুস্পষ্ট চিত্র হইবে না। এ কথা "আলোক-চিত্রণ" নামক গ্রন্থেও বলিয়াছি। প্রতিমূর্ত্তি-চিত্র গ্রহনোপযোগী আলোক-গৃহ (Light-room) ব্যতীত যেমন উৎকৃষ্ট আলোক-চিত্র (Photograph) হইতে পারে না, প্রাকৃতিক বর্ণ-চিত্রণ সময়েও সেইরূপ আলোক গৃহ বা যে কোন গৃহের অনাবশ্যক দ্বার ও জানালাগুলি বন্ধ করিয়া এক পার্শ্ব হইতে এমন কৌশলে আলোক গ্রহণ করিতে হয়, যাহাতে আদর্শের মুখমণ্ডলে তাঁহার বয়স এবং অবস্থানুযায়ী শিল্পীর অভিলষিত আলোক-স্রোত নিপতিত হয়। আলোকের এই গতির অংশ পরিমাণ (Digrees) আছে। যখন আদর্শব্যক্তির বাম কিম্বা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আলোক আসিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল আলোকিত

করে, তখন দেখিতে হইবে সেই আলোক-রশ্মিগুলির কত অংশ সেই মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সে আলোক যত অংশেরই হউক না কেন, দ্বার বা জানালার পরদাগুলির সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ নর নারীর মুখের উপর ৪৫° অংশ আলোক ফেলিতে হইবে। তাহা হইলেই যৌবন-সময়ের চিত্র বেশ প্রস্ফুটিত হইবে। বৃদ্ধের মুখের উপর অবস্থানুসারে যথাক্রমে ৪৫° অংশ অপেক্ষা অধিক ৮০° অংশ পর্য্যন্ত আলোক প্রদান করিলে, অর্থাৎ আদর্শের অপেক্ষাকৃত পার্শ্বদেশ হইতে আলোক দিলে, আস্যরেখাগুলি অধিকতর স্পষ্ট ও গভীর দেখাইবে, চিত্রে তাহাই যথাযথ চিত্রিত হইলে বয়স অধিক বোধ হইবে। বালকের বা শিশুর চিত্র অঙ্কনকালে আলোকরশ্মি ৩৫° হইতে ৪০° অংশের মধ্যে অর্থাৎ যুবার চিত্রের জন্য আদর্শের যতদূর পার্শ্ব হইতে আলোক লওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা সম্মুখ হইতে আলোক লইতে হইবে। তাহা দ্বারা মুখের খাঁজ-খোঁজগুলি অর্থাৎ আস্যরেখাসমূহ সেরূপ গভীর দেখাইবে না, সুতরাং প্রকৃত বয়স্থানুরূপই হইবে। এ বিধির অন্যথা হইলে অর্থাৎ যুবক যুবতীর চিত্রগ্রহণকালে পূর্ব্ব কথিত অপেক্ষা অধিক পার্শ্ব হইতে অর্থাৎ ৪৫° অংশেরও উপর আলোক দিলে, সেই যৌবন-সুলভ সুন্দর সুগোল নিটোল মুখে নাসিকা ও চক্ষের পার্শ্বে বৃদ্ধের ন্যায় নানা খাঁজবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইবে এবং চিত্রে তাহা উত্তোলিত হইলে আদর্শ অপেক্ষা অধিক বয়সের চিত্র বলিয়া বোধ হইবে। এইরূপ বৃদ্ধের মুখের উপর যুবা বা শিশুর চিত্রোপযোগী আলোক দিলে সেই গভীর আস্যরেখা সেরূপ স্পষ্ট দেখা যাইবে না, তাহাতে মুখ অপেক্ষাকৃত সুগোল ও সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে। সুতরাং শিল্পীর এই আস্যরেখা অঙ্কন উপলক্ষে আলোকের ঐ বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শিল্পীর সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি, ইহারও উপদেশ প্রদান করিবে।

ভঙ্গিমা (Attitude or Postures) ইহা শিল্পীর প্রতিমূর্ত্তিচিত্রণে আস্যরেখার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় লক্ষের বিষয়ীভূত। ইহাদ্বারা চিত্রগত ব্যক্তির অবস্থা, রুচি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট আভাস প্রতিফলিত হয়, সুতরাং অতিশয় মনোযোগ সহকারেই শিল্পীকে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ ও যুবার অবস্থা ভেদে ভঙ্গিমার বহু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তির গ্রীবা ও মস্তক তাহার বৃদ্ধত্বহেতু সাধারণতঃ সম্মুখদিকে যে পরিমাণে নত হইয়া পড়ে, দেহভারে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের সকল অংশই যেমন শিথীল হইয়া যায়, যুবা ব্যক্তির সেরূপ কখনই হয় না; যুবার সেই উৎসাহপূর্ণ উন্নত বক্ষে, ফুটনোন্মুখ প্রতিভামণ্ডিত মুখমণ্ডলে, আভ্যন্তরীক তেজ ও যৌবন-মদের জ্বলন্ত-চিত্র সকল-অঙ্গেই যেন প্রতিভাত হইতে থাকে। আবার বৃদ্ধের বহুদর্শিতালব্ধ বিবিধ বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানগর্ব্বের গভীর গাম্ভীর্য্য, সর্ব্বোপরি তাহার সেই অপ্রতিহত কর্ত্তৃত্ব ও মহত্বের ভাব, যুবার যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্য ও অদূরদর্শিতার তুলনায়, বৃদ্ধের নানা অঙ্গে তাহা যেন দৃঢ়তররূপে পরিস্ফুট হয়। অন্যদিকে কোমলাঙ্গী কামিনীর লজ্জাবনত স্নিগ্ধ-মধুর-মোহিনী ভাব, সেই নানাবিধ রমণীয় অঙ্গ-ভঙ্গীতে রমণীর দেহযষ্টিমধ্যে কেমন সুচারুরূপে তাহা আপনাপনি পরিব্যক্ত হইয়া পড়ে। প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণ-

কালে কোন মূর্ত্তিকে কি ভাবে বা ভঙ্গিমায় চিত্রস্থ করিতে হইবে, শিল্পীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বিচার ও বিবেচনা করা আবশ্যক। এই ভঙ্গিমার বিষয়-সকল সাধারণতঃ দ্বিবিধ—প্রথম গতিশীল, দ্বিতীয় বিরামশীল। বিরাম ভাবই প্রায় সকল-স্থানে সকল-প্রতিমূর্ত্তিতেই প্রযোজ্য, কিন্তু গতিশীল ভাব কেবলমাত্র যুবক যুবতীর চিত্রের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী এবং তাহাতেই সে ভাব অতি সুন্দর দেখায়। এই বিরাম ও গতিশীল ভঙ্গিমা-সম্বন্ধে সামান্য স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক, নতুবা সাধারণে ইহার অর্থ ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। প্রতিমূর্ত্তি-চিত্রণে বিরামশীল ভাব অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্য-অবস্থায় চুপ্‌টী করিয়া বসিয়া থাকা। এরূপ ভাবের চিত্রিতমূর্ত্তি দেখিলেই মনে হয় যে, সে ব্যক্তির চিত্র গ্রহণসময়ে তাহার অন্য কোনই কার্য্য ছিল না, কেবল চিত্র-উত্তোলনকারী-শিল্পীর নিকট নিজ চিত্রের আদর্শ প্রদানজন্যই তিনি স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। অঙ্গভঙ্গি বা দেহপরিচালনার কোনও ভাব নাই, বস্ত্র পরিচ্ছদও যথাস্থানে এমনভাবে সুসাবধানে সজ্জিত বা সংরক্ষিত, যাহাতে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুন্দর দেখায়, এমন কি সিঁথির এক পার্শ্বের একগাছি কেশও অন্যদিকে অসাবধানে যাইয়া পড়ে নাই; মোটের উপর যাঁহার চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহাকে যেন পূর্ব্বেই ছবির মত সাজাইয়া লওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তি-চিত্রেই এই ভাবের ভঙ্গিমা প্রদত্ত হয়। কারণ গতিশীল-ভাব সকল মূর্ত্তিতে প্রদান করা নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তাহা সম্পন্ন করিতে শিল্পীকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিতে হয়, শিল্প-কলাতেও বিশেষ পারদর্শী হইতে হয়। বিরামশীল ভাবের চিত্রেও বহুদর্শ আবশ্যক ও উপযুক্ত বোধকরিলে গতিশীল যৎসামান্য বিকাশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্র পার্শ্ব বা ক্ষেত্রপৃষ্ঠে (Background এ) গৃহস্থি কক্ষান্তর্গতের সাজসজ্জা-পূর্ণ চিত্রাদি না থাকিলে কেশ ও পরিচ্ছদাদিতে উন্মুক্ত বায়ুর গতি তাহার আন্দোলন-ভাব প্রদানদ্বারাও সামান্য ভাবের বিকাশ করেন। প্রকৃত গতিশীল ভ ইহাই নহে, তাহা এক কথায় বলিতে হইলে, চিত্রগত প্রতিমূর্ত্তির ভাষাস্বরূপ বা তাহার ব্যক্তির তাৎকালিক মনোভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই সেই চিত্রের গতিশীল ভাব। মূর্ত্তির অবস্থা ও প্রকৃতিবিষয়ে সামঞ্জস্য রাখি সকল ভাবের বিন্যাস করিতে হয়। উদাহর দুই একটী কথা বলিলেই ইহার উদ্দেশ্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রায়ই দেখা যা অনেক ব্যক্তি আছেন—যাঁহাদের স্বভাব যেন বিরক্ত হইয়া আছে, সামান্য লোক জনে বাক্যালাপ করিতেও যেন তাঁহারা আপনাদের বিবেচনা করেন, দুই এক কথাতেই তাঁহা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া নিজ মহত্ত্ব ও গর্ব্ব প্রকাশ করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই অব হৃষ্টপুষ্ট না হইলেও গর্ব্বে সদাই যেন তাঁহা স্ফীত হইয়া আছে, দৃষ্টি স্বাভাবিক ঊর্দ্ধদিকে, সেই মদ-মাহাত্ম্যে ঈষৎ বঙ্কিম-ভাবযুক্ত; বা আবার ঠিক ইহার বিপরীত ভাব, সদা দেহ শঙ্কবিজড়িত, অতি ধীর স্থির ও নিরী কাহারও সহিত কথাটি বলিতেও তাহাদের

কুলায় না—দৃষ্টি স্বাভাবিক নিম্ন দিকে, গ্রীবা সম্মুখাবনত—এইরূপ নানা প্রকৃতির নানা লোক; কেহ বা দাঁড়াইলেই বাম বা দক্ষিণ পদের উপর এমনভাবে ভর দিয়া থাকেন, যাহাতে তাহার দেহখানি যেন ত্রিভঙ্গ বলিয়াই বোধ হয়, কেহ বা সরল ভাবে দাঁড়াইতেই পারেন না, কুব্জপৃষ্ঠ না হইলেও কোমর বাঁকিয়া যেন সম্মুখ দিকে কুঁজা হইয়া আছে, কেহ বা কাহারও সহিত আলাপ করিতে হইলেই নিজের দুই খানি হস্ত পরস্পর মর্দ্দন করিতে থাকেন, কেহ বা কোমরে হাত দিয়া, না হয় বক্ষে বা জামার বোতামটি ধরিয়া কথা কহেন, এইরূপ নানা লোকের নানা স্বাভাবিক ভাব বা ভঙ্গিতে লক্ষ্য করিয়া সেই সকল ভঙ্গিমা যথাসম্ভব-রূপ বজায় রাখিয়া প্রতিমূর্ত্তিতে তাহাদের কোন কর্ম্মের অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পর অবস্থা সন্নিবেশ করণকেই প্রতিমূর্ত্তির গতিশীল ভঙ্গিমা বলা যাইতে পারে। বহুদর্শী শিল্পী চিত্রগত ব্যক্তির প্রকৃতিগত ভাব তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা ও অনুধাবনান্তর যথাযোগ্য ভাবে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন; অর্থাৎ এমন ভাবে চিত্রগত প্রতিমূর্ত্তিতে সেই স্বাভাবিক ভঙ্গিমা প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে দর্শনমাত্রেই তাহা দেখিয়া দর্শকের কৌতূহল পরিতৃপ্তি হইতে পারে! মোটের উপর যে কোন প্রতিমূর্ত্তি-চিত্র হউক না কেন, তাহার অঙ্গ-বিন্যাসে এমন একটী কর্ম্মের ভাব চিত্রিত করা আবশ্যক যাহাতে সেই ব্যক্তির জীবিকা, অবস্থা ও মনোভাব পর্য্যন্ত ফুটিয়া বাহির হয়। যেমন কোনও শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, সে অবস্থায় তাঁহাকে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় বসাইয়া সম্মুখে বা হস্তে কোন পুঁথি দিয়া এমনভাবে তাঁহার চিত্র গ্রহণ করিতে হইবে, যেন তিনি কোনও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন বা শিষ্যকে পাঠ দিতেছেন ইত্যাদি বলিয়া বোধ হয়। কবি, দার্শনিক, জ্যোতির্ব্বিদ্ বা গণিদ্বিদ্-গণকেও, সম্মুখে ঐরূপ পুস্তকাদি রাখিয়া হস্তে লেখনী ধারণ করাইয়া অথবা অন্য কোনরূপে এমন ভাবে অবস্থান করাইতে হইবে, যেন তাঁহারা কোনও গভীর তত্ত্ব-মীমাংসায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। এইরূপে বক্তা, চিকিৎসক, সঙ্গীতবিদ্, ব্যবহারজীবী, যোগী, সন্ন্যাসী, সাধক প্রভৃতির চিত্র, তাঁহাদের স্ব স্ব ব্যবসা ও প্রকৃতিগত সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গিমাসহ চিত্রিত করিতে পারিলেই প্রতিমূর্ত্তি-চিত্র প্রকৃত গতিশাল ভাববোধক হইবে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদেও এইরূপ ভঙ্গিমার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা আবশ্যক। মোটের উপর যে কোনও প্রতিমূর্ত্তি এমন করিয়া চিত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে চিত্রগত ব্যক্তির ভঙ্গিমা দেখিয়া তাহার আন্তরিকভাব চিন্তা করিবার জন্য দর্শকের কৌতূহল হয়। স্ত্রীমূর্ত্তিসম্বন্ধে চিত্রে যে ভঙ্গিমাই প্রদত্ত হউক না কেন—তাহাতে কেবল একটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রফুল্লতা বা গাম্ভীর্য্যের মধ্যে কোন্ ভঙ্গিমাটী প্রয়োগ করিলে সে রমণীমূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত সুন্দরী বলিয়া বোধ হয়। শিল্পী তাহা বেশ বিবেচনা করিয়া চিত্রে এই দুইটীর কোনও একটী যথোপযুক্ত ভাব প্রদান করিবেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

——(০)——

আহ্বান।

—***—

আর কিছু ন'য়—
দেবী তুমি—ভক্ত আমি! পূর্ণিমা নিশায়—
যে দেখেছে বারিধির তরঙ্গ লীলায়;
চাহিয়া আকাশ পানে, উদ্বেলিত অভিমানে,
কি গর্জ্জনে—আলাপনে—সিন্ধু জেগে রয়—
সেই জানে কি বেদনা বাজিছে সেথায়।

আজন্মের রুদ্ধ এই হৃদয়-মন্দির।
অস্ফুট কলিকা প্রাণে, পরিমল প্রতিক্ষণে,
যেমনি বিকাশ আশে বিহ্বল অস্থির।
তেমনি এ হৃদিপুরে, শতযুগ জন্ম ধরে—
যে ভাব-লভেছে জন্ম; তব দরশনে
আজি তাহা মুক্ত ব্যাপ্ত পুলক-কম্পনে।
এস দেবি সিন্ধু বক্ষে চন্দ্রিমার হাসি,
গর্জ্জনে নাচিবে মুক্ত নীল অম্বুরাশি।

(২)

এস তুমি পুষ্পচ্যুত সৌরভ প্রতিমা
আজি মম হৃদয়-বেলায়,
চিরদিন চিররাত্রি দীর্ঘ পথ পানে
চেয়ে আছি তোমারি আশায়।
কত রাত্রি লুকায়েছে দিবসের কোলে
দিন গেছে সন্ধ্যায় মিশিয়া—
চির-নির্নিমেষ-নেত্র ক্লান্ত হ'য়ে আসে
মুদে আসে ব্যথিত হইয়া।
কত ফুল ঝরে গেছে প্রভাতে ফুটিয়া
পরিমল তাহার সৌরভ—
পবন লইয়া গেছে তোমারি লাগিয়া;
আঁখি মুদি করি অনুভব
সর্ব্বাঙ্গে পরশ তব, স্মৃতিটি তোমার—
ঘেরি আছে সদাই আমায়—
আবাহন করি তাই এস দেবী এস—
আজি মম হৃদয়-বেলায়।

(৩)

এতদিন কোথা ছিলে অনন্ত বিশ্বের মাঝে
কোন কক্ষে ছিলে নিদ্রাগত?
ডাকিতেছি চিরদিন—সে আহ্বান গাহিতেছে—
নদী সিন্ধু ধারা শত শত।
পুলকে নক্ষত্র মাঝে যে আলোক কাঁপিতেছে
তারি মাঝে আমারি আহ্বান,
তোমার বক্ষের মাঝে যে শোণিত সদা নাচে
তাহে মোর লেখা আছে গান।
ভুবন ভরিয়া যত আকর্ষণ বিকর্ষণ,
তারি মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে আছি,
নিশ্বাসে মলয় হ'য়ে—দিনে রবি রাতে শশী—
অন্তরে বাহিরে ডাকিতেছি—
"জেগে উঠ জেগে উঠ—আর ওগো ঘুমাওনা—
একবার আঁখি পদ্ম মেলি—
দেখ চেয়ে বেলা যায়, তুমি বিনা কে আমায়"—
কে দেবে গো পর পারে তুলি।
তাই আমি ডাকিয়াছি দিবসের নীশিথের
মুহূর্ত্তের প্রত্যেক কম্পনে,
এতকাল পরে কিগো ভাঙ্গিয়াছে ঘুম তব
এতদিনে পড়েছে কি মনে?

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা।*

(১)

নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষায়—ভাষা।

আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় "উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা।" উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা কথাটী পাড়িলে, নিম্ন শিক্ষায় বঙ্গভাষার দুরবস্থার কথাটী স্বতঃই পারি-পার্শ্বিকভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়;—ম্যাকৃমিলান কোম্পানির বঙ্গসাহিত্যের কথা মনে পড়ে, আরও কত কথা মনে আসে। সে সব কথার আলোচনায় বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য ও অধিকার নাই, তা স্বীকার করি; কিন্তু একেবারে প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করি না।

উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গের নানা উপভাষা-দ্বারা গ্রন্থ রচিত হইয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, কর্জ্জন-প্রস্তাবিত এবম্বিধ মত বিধিবদ্ধ হইয়া, কার্য্যতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, আমি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কিন্তু যদি বস্তুতঃই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে সে শুভসংবাদ শুনিবার জন্য আমার অধম কর্ণ-যুগলের বিশেষ আগ্রহ নাই। তবে এই মাত্র বলিতে চাই,—রাজকীয় ব্যবস্থা দ্বারা দেশ বিভক্ত হইলে, যেমন জাতীয় জীবনের অঙ্গচ্ছেদ ঘটে, তেমনি ভাষা নানা উপভাষা দ্বারা বিভক্ত হইলে, জাতীয় জীবন ও জাতীয় ভাষা উভয়েরই অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। কারণ অতি সুস্পষ্ট, তাই এই। যেখানে ভাষার সমতা বা সৌসাদৃশ্য থাকে, সেখানে ভাবেরও সমতা বা সৌসাদৃশ্য থাকে। ভাবের সমতায় মহানুভূতির আধিক্য ঘটে। সুতরাং জাতীয় ভাষা, জাতীয় জীবনে সহানুভূতি ও ঐক্য আনিয়া দেয়, ইহা স্বাভাবিক। লিখিত ভাষাই সকল দেশের জাতীয় ভাষা। কথিত ভাষা ভিন্ন হইলেও, সকল জাতির জাতীয় লিখিত ভাষা এক। কিন্তু এ সব অবান্তর কথায় আমাদের প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন আছে। আমি আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিতে চাই যে, উল্লিখিত উপভাষা রচিত গ্রন্থদ্বারা গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার বঙ্গভাষাকে শৃঙ্খলিত করিতে প্রয়াসী হ'ন নাই। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য ও ভাবী মঙ্গলের কারণ। অর্থাৎ এফ্.এ ও বি.এ পরীক্ষার জন্য, এমন কি তন্নিম্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যও যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক বর্ত্তমানে পরিগৃহীত হইতেছে, তাহা সাধারণ বাঙ্গালী জাতির লিখিত ভাষা; উহাই তাহাদের জাতীয় ভাষা। কিন্তু বর্দ্ধমানবাসী উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্র যে জাতীয়-ভাষায় শিক্ষা লাভ করিবে, চট্টগ্রাম-বাসী ছাত্রকেও সেই ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চশিক্ষার স্তরে আরোহণ করিতে হইবে, যদি এমন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবেই অধিকতর মঙ্গল ও আনন্দের কারণ। উদার বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যাপারে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া কোনও ভেদ জ্ঞান স্থান-লাভ করিবে, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ মাতৃভাষাই যখন অবশ্য-শিক্ষনীয় বা Compulsory হইয়াছে, তখন বঙ্গ দ্বিধা বিভক্ত হইলেও, বাঙ্গালী-মাত্রেরই একই জাতীয় ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে হইবে, ইহাই সম্ভবপর। কি ঘটিবে, ভবিষ্যৎ বলিতে

* সাহিত্যসম্মিলনের ৭ম মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

পারে। এখনও উভয় বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় একই আছে। তবে ভবিষ্যতের কথা তুলিলাম কেন? তাহাই বলিব।

চট্টগ্রামের কথিত ভাষা ও বর্দ্ধমানের কথিত ভাষা এক নহে। এক হইতেও পারে না। জল বায়ুর পার্থক্য প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণেই হউক, অথবা বিধাতার বিধানেই হউক, দেশ ভেদ বা স্থান ভেদে ভাষার ভেদ জন্মে। ভেদ, সমবেদনা কমাইয়া আনে—ভেদ, একত্ব ভাঙ্গিয়া দেয়—ভেদ, একত্ব গঠনে অন্তরায় রূপে দণ্ডায়মান হয়। মনুষ্য মাত্রেই ভেদ আছে; তা' মানি। কিন্তু, স্বার্থ-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, জাতি-ভেদ ও ভাষা-ভেদ প্রভৃতি ভেদের মধ্যে স্বার্থ-ভেদ ও ভাষা-ভেদই একত্ব সম্পাদনের গুরুতর অন্তরায়, ইহাই আমার বিশ্বাস। যখন চট্টগ্রামের ও বর্দ্ধমানের উভয়ের স্বার্থ ও ভাষা এক হইয়া যায়, তখনই উভয়ের মধ্যে একত্ব বাঁধিয়া যায়। অন্যথা বুঝি অসম্ভব। সুতরাং বাঙ্গালীকে যদি একটী জাতি-রূপে থাড়া করা প্রয়োজনীয় হয়, তবে বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের স্বার্থ ও লিখিত ভাষা অন্ততঃ এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জানি না পরিণামে বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির উপর কি পরিমাণে কারুণ্য প্রদর্শনে সম্মত হইবেন।

মানুষে মানুষে যেমন ভেদ আছে, তেমনি সৌসা-দৃশ্যও আছে। কোথাও বা সৌসাদৃশ্য সামান্য বা অতি সামান্য, কোথাও বা অত্যন্ত অধিক। বর্দ্ধমানের ভাষা, চট্টগ্রামের ভাষা, মান্দ্রাজের ভাষা ও প্যারিসের ভাষা তুলনা করুন। দেখিবেন বর্দ্ধমানের ভাষার সহিত চট্টগ্রামের ভাষার সৌসাদৃশ্য যত বেশী, অন্য কোনওটীর সহিত তত নহে; দেখিবেন সৌসাদৃশ্য ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, তৎপরে অতি সামান্য রেখামাত্রে পরিণত হইতেছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, চট্টগ্রাম বর্দ্ধমানের ঘনিষ্ঠতম এবং মান্দ্রাজ তাহার ঘনিষ্ঠতর প্রতিবেশী। এ ক্ষেত্রে যদি বর্দ্ধমান চট্ট-গ্রামকে এক জাতীয় করিয়া লইতে পারে, তবে বর্দ্ধমান মহৎ, যদি মান্দ্রাজকে স্বজাতীয় করিতে পারে, তবে বর্দ্ধমান মহত্তর, যদি প্যারিসকে স্বজাতীয় করিতে পারে, তবে সে মহত্তম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বার্থ ও লিখিত ভাষার একত্ব না থাকিলে, উল্লিখিত কোনও মহত্বের সম্ভাবনা থাকে না।

তা'ই করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের লিখিত ভাষা অর্থাৎ জাতীয় ভাষা এক হইবে ত? যে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র, যে মধুসূদন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর আমাদের ঘরে উচ্চ শিক্ষার অমৃতধারা বর্ষণ করেন, চট্টগ্রামবাসীর ঘরে তেমনি করিবেন ত? যদি তাহা হয়, তবে কতই না আনন্দের কথা! একই সাগর তটে আমরা বাস করি, আমরা একই সাগর হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ ক'রব, একই পর্ব্বত-নিঃসৃতা পূতহৃদয়া ঊর্ম্মি-বিলাস-চঞ্চলা শোভাময়ী তরঙ্গিণীকূলে আমাদের দেশ শস্য-শ্যামলা, আমরা একই মহাহৃদয়-নিঃসৃতা ভাষা-তরঙ্গিণীর দ্বারা আমাদের হৃদয়কে শস্য-শ্যামল শান্তির রাজ্যে পরিণত করিব। বড়ই আনন্দের কথা!

উচ্চ শিক্ষায় বঙ্গভাষার আদরে আনন্দ।

কিন্তু আমরা বলিতেছিলাম, উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা। কতটুকু স্থানের আয়তনের উপর বঙ্গভাষার আধিপত্য থাকিবে, [illegible] আলোচনা করিলাম। অতঃপর আমরা দেখাইব যে বর্ত্তমান বঙ্গভাষা উচ্চশিক্ষার অঙ্গে সংযোজিত হইয়া আমাদিগকে কি পরিমাণে গৌরবান্বিত ও আনন্দিত করিয়াছে।

যাহা ছিল না, তাহাই পাইয়াছি বলিয়া কি এত আনন্দ?—তা' নয়। আমাদের এমন অনেক পদার্থ থাকে না, যাহা পাইলে হয়ত আমরা আনন্দিত হই না। আমার কন্যা সন্তান ছিল না, আজ আমার একটী কন্যা জন্মিয়াছে, সহসা এ সংবাদ পাইলে হয়ত আমি আনন্দিত হই না! অন্ততঃ বর্ত্তমান বঙ্গবাসী হয়ত এ সংবাদে আনন্দিত হয় না। আমা-দের দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না, আজ সহসা দুর্ভিক্ষ আসিল, তাহাতে কই আমরা ত আনন্দিত হই না! কথাটী তা নয়। যাহা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বা আকাঙ্ক্ষণীয় ছিল, আজ সহসা তাহাকে পাইয়াছি বলিয়াই আমাদের এত আনন্দ। যাঁহাদের হৃদয় ছিল, বুদ্ধি ছিল, তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন, যাঁহারা হৃদয়হীন নির্ব্বোধ তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয় ছিল—সেই পদার্থটী আজ আমরা পাইয়াছি, তাই আমাদের এত আনন্দ। আজ যদি বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে এ আনন্দ তাঁহারই লেখনীতে যথা-যথ অঙ্কিত হইতে পারিত। তিনিই প্রথমে যে কথা অনুভব করিয়াছিলেন, যে আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারই হৃদয় প্রথমে স্পন্দিত হইয়াছিল, আজ সেই পদার্থ বঙ্গদেশ পাইয়াছে, ইহাতে যে কত আনন্দ, ইহা সেই অমর কবি-হৃদয়ই লতিব্যক্ত করিতে সমর্থ।

কিন্তু আমরাও স্বতঃ [illegible] যাছি। বাঙ্গালীর ছেলে সেন্ট-জেভিয়ার [illegible] পড়িয়া হ্যাট কোট আঁটিয়া সাহেব সাজিয়া [illegible] ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, সে ভয়ও আমাদের কাটিয়া গেল। বাঙ্গালীর ছেলে জাতীয় ভাষার অমৃত নদীতে অবগাহন করিয়া, পূতহৃদয়ে স্বদেশের ও স্ব-সমাজের মঙ্গল চিন্তা করিবে, এ চিন্তা আমাদের মনে কত আশা কত উদ্দীপনা আনিয়া দেয়, তাহা অনুভবের বিষয়, বুঝাইবার নহে।

(৩)

এ আনন্দের পার্শ্বে বিষাদ কেন?

আনন্দের অনেক কারণ আছে, সে কথা পরে বলিব। কিন্তু এত আনন্দের পার্শ্বে পাশাপাশি এত বিষাদ আসিয়া দাঁড়াইল কেন? তাহাই দেখা যাউক।

কথা হইতেছিল, উচ্চশিক্ষায় বঙ্গ-ভাষা। ভাষা বলিতে কেবল মাত্র সাহিত্যকে বুঝাইতে পারে না। ভাষার রাজ্যে সাহিত্য একটী প্রদেশ মাত্র। ভাষার রাজ্যে গণিত-বিজ্ঞান, ন্যায়-দর্শন, কলা ও ভৈষজ্যতত্ত্ব ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ প্রদেশ আছে। এই সকল প্রদেশে বঙ্গভাষার আধিপত্য কতটুকু, তাহাই একবার বিচার করিয়া দেখিব।

বঙ্গভাষা ইংরাজী ভাষার ন্যায় গৌরবময়ী সম্রাজ্ঞী নহে। সসাগরা ধরিত্রীর মধ্যে সাহিত্যখণ্ডে তাহার স্বকীয় কিঞ্চিৎ সম্পদ আছে, তা' মানি; কিন্তু বিজ্ঞান দর্শন গণিত প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশে তাহার নিজের বুঝি কিছুই নাই। সুতরাং উচ্চশিক্ষার পক্ষে তাহার

পারে। এখনও উভয় বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় একই আছে। তবে ভবিষ্যতের কথা তুলিলাম কেন? তাহাই বলিব।

চট্টগ্রামের কথিত ভাষা ও বর্দ্ধমানের কথিত ভাষা এক নহে। এক হইতেও পারে না। জল বায়ুর পার্থক্য প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণেই হউক, অথবা বিধাতার বিধানেই হউক, দেশ ভেদ বা স্থান ভেদে ভাষার ভেদ জন্মে। ভেদ, সমবেদনা কমাইয়া আনে—ভেদ, একত্ব ভাঙ্গিয়া দেয়—ভেদ, একত্ব গঠনে অন্তরার রূপে দণ্ডায়মান হয়। মনুষ্য মাত্রেই ভেদ আছে; তা' মানি। কিন্তু, স্বার্থ-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, জাতি-ভেদ ও ভাষা-ভেদ প্রভৃতি ভেদের মধ্যে স্বার্থ-ভেদ ও ভাষা-ভেদই একত্ব সম্পাদনের গুরুতর অন্তরায়, ইহাই আমার বিশ্বাস। যখন চট্টগ্রামের ও বর্দ্ধমানের উভয়ের স্বার্থ ও ভাষা এক হইয়া যায়, তখনই উভয়ের মধ্যে একত্ব বাঁধিয়া যায়। অন্যথা বুঝি অসম্ভব। সুতরাং বাঙ্গালীকে যদি একটী জাতি-রূপে খাড়া করা প্রয়োজনীয় হয়, তবে বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের স্বার্থ ও লিখিত ভাষা অন্ততঃ এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জানি না পরিণামে বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির উপর কি পরিমাণে কারুণ্য প্রদর্শনে সম্মত হইবেন।

মানুষে মানুষে যেমন ভেদ আছে, তেমনি সৌসাদৃশ্যও আছে। কোথাও বা সৌসাদৃশ্য সামান্য বা অতি সামান্য, কোথাও বা অত্যন্ত অধিক। বর্দ্ধমানের ভাষা, চট্টগ্রামের ভাষা, মান্দ্রাজের ভাষা ও প্যারিসের ভাষা তুলনা করুন। দেখিবেন বর্দ্ধমানের ভাষার সহিত চট্টগ্রামের ভাষার সৌসাদৃশ্য যত বেশী, অন্য কোনওটীর সহিত তত নহে; দেখিবেন সৌসাদৃশ্য ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, তৎপরে অতি সামান্য রেখামাত্রে পরিণত হইতেছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, চট্টগ্রাম বর্দ্ধমানের ঘনিষ্ঠতম এবং মান্দ্রাজ তাহার ঘনিষ্ঠতর প্রতিবেশী। এ ক্ষেত্রে যদি বর্দ্ধমান চট্টগ্রামকে এক জাতীয় করিয়া লইতে পারে, তবে বর্দ্ধমান মহৎ, যদি মান্দ্রাজকে স্বজাতীয় করিতে পারে, তবে বর্দ্ধমান মহত্তর, যদি প্যারিসকে স্বজাতীয় করিতে পারে, তবে সে মহত্তম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বার্থ ও লিখিত ভাষার একত্ব না থাকিলে, উল্লিখিত কোনও মহত্ত্বের সম্ভাবনা থাকে না।

তা'ই করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের লিখিত ভাষা অর্থাৎ জাতীয় ভাষা এক হইবে ত? যে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র যে মধুসূদন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর আমাদের ঘরে উচ্চ শিক্ষার অমৃতধারা বর্ষণ করেন, চট্টগ্রামবাসীর ঘরে তেমনি করিবেন ত? যদি তাহা হয়, তবে কতই না আনন্দের কথা! একই সাগর তটে আমরা বাস করি, আমরা একই সাগর হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিব, একই পর্ব্বত-নিঃসৃতা পূতহৃদয়া ঊর্ম্মি-বিলাস-চঞ্চলা শোভাময়ী তরঙ্গিণীকুলে আমাদের দেশ শস্য-শ্যামলা, আমরা একই মহাহৃদয়-নিঃসৃতা ভাষা-তরঙ্গিণীর দ্বারা আমাদের হৃদয়কে শস্য-শ্যামল শান্তির রাজ্যে পরিণত করিব। বড়ই আনন্দের কথা!

উচ্চ শিক্ষায় বঙ্গভাষার আদরে আনন্দ।

কিন্তু আমরা বলিতেছিলাম, উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা কতটুকু স্থানের আয়তনের উপর বঙ্গভাষার আধিপত্য

থাকিবে, বা থাকা উচিত, এতক্ষণ আমরা তাহারই আলোচনা করিলাম। অতঃপর আমরা দেখাইব যে বর্ত্তমান বঙ্গভাষা উচ্চশিক্ষার অঙ্গে সংযোজিত হইয়া আমাদিগকে কি পরিমাণে গৌরবান্বিত ও আনন্দিত করিয়াছে।

যাহা ছিল না, তাহাই পাইয়াছি বলিয়া কি এত আনন্দ?—তা' নয়। আমাদের এমন অনেক পদার্থ থাকে না, যাহা পাইলে হয়ত আমরা আনন্দিত হই না। আমার কন্যা সন্তান ছিল না, আজ আমার একটী কন্যা জন্মিয়াছে, সহসা এ সংবাদ পাইলে হয়ত আমি আনন্দিত হই না! অন্ততঃ বর্ত্তমান বঙ্গবাসী হয়ত এ সংবাদে আনন্দিত হয় না। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না, আজ সহসা দুর্ভিক্ষ আসিল, তাহাতে কই আমরা ত আনন্দিত হই না! কথাটী তা নয়। যাহা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বা আকাঙ্ক্ষণীয় ছিল, আজ সহসা তাহাকে পাইয়াছি বলিয়াই আমাদের এত আনন্দ। যাঁহাদের হৃদয় ছিল, বুদ্ধি ছিল, তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন, যাঁহারা হৃদয়হীন নির্ব্বোধ তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয় ছিল—সেই পদার্থটী আজ আমরা পাইয়াছি, তাই আমাদের এত আনন্দ। আজ যদি বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে এ আনন্দ তাঁহারই লেখনীতে যথাযথ অঙ্কিত হইতে পারিত। তিনিই প্রথমে যে কথা অনুভব করিয়াছিলেন, যে আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারই হৃদয় প্রথমে স্পন্দিত হইয়াছিল, আজ সেই পদার্থ বঙ্গদেশ পাইয়াছে, ইহাতে যে কত আনন্দ, ইহা সেই অমর কবি-হৃদয়ই অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ।

কিন্তু আমরাও বস্তুতঃ আজ বড় আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালীর ছেলে সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজে পড়িয়া হ্যাট কোট আঁটিয়া সাহেব সাজিয়া ফিরিঙ্গী ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, সে ভয়ও আমাদের কাটিয়া গেল। বাঙ্গালীর ছেলে জাতীয় ভাষার অমৃত নদীতে অবগাহন করিয়া, পূতহৃদয়ে স্বদেশের ও স্ব সমাজের মঙ্গল চিন্তা করিবে, এ চিন্তা আমাদের মনে কত আশা কত উদ্দীপনা আনিয়া দেয়, তাহা অনুভবের বিষয়, বুঝাইবার নহে।

(৩)

এ আনন্দের পার্শ্বে বিষাদ কেন?

আনন্দের অনেক কারণ আছে, সে কথা পরে বলিব। কিন্তু এত আনন্দের পার্শ্বে পাশাপাশি এত বিষাদ আসিয়া দাঁড়াইল কেন? তাহাই দেখা যাউক।

কথা হইতেছিল, উচ্চশিক্ষায় বঙ্গ-ভাষা। ভাষা বলিতে কেবল মাত্র সাহিত্যকে বুঝাইতে পারে না। ভাষার রাজ্যে সাহিত্য একটী প্রদেশ মাত্র। ভাষার রাজ্যে গণিত-বিজ্ঞান, ন্যায়-দর্শন, কলা ও ভৈষজ্যতত্ত্ব ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ প্রদেশ আছে। এই সকল প্রদেশে বঙ্গভাষার আধিপত্য কতটুকু, তাহাই একবার বিচার করিয়া দেখিব।

বঙ্গভাষা ইংরাজী ভাষার ন্যায় গৌরবময়ী সম্রাজ্ঞী নহে। সসাগরা ধরিত্রীর মধ্যে সাহিত্যখণ্ডে তাহার স্বকীয় কিঞ্চিৎ সম্পদ আছে, তা' মানি; কিন্তু বিজ্ঞান দর্শন গণিত প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশে তাহার নিজস্ব বুঝি কিছুই নাই। সুতরাং উচ্চশিক্ষার পক্ষে তাহার

সাহিত্য-সম্পদ ব্যতীত অন্য কোনও এমন সম্পদ্ নাই যদ্দ্বারা ছাত্রগণের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতে পারে—যদ্দ্বারা ছাত্রগণ উপযুক্ত আহার্য্য পাইয়া মানুষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইংরাজের নিম্ন ও উচ্চ উভয় শিক্ষারই জন্য ইংরাজী ভাষা পর্য্যাপ্ত। সভ্যদেশমাত্রেই স্বকীয় জাতীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা পাইতে পারে। যে দেশ স্বকীয় জাতীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা পাইতে পারে না, সে দেশ সভ্যপদ-বাচ্য, ইহা আমার মনে হয় না। তবে, হয় বাঙ্গালী জাতি সভ্য নহে, অথবা বাঙ্গালী একটী জাতি নহে—তাহাদের জাতীয় জীবন এখনও গঠিত হয় নাই!

আমার মনে হয়, বস্তুতঃই তাই। যদি বাঙ্গালী একটী জাতি হইত, তবে অবশ্যই তাহার একটা সর্ব্বাঙ্গপূর্ণা জাতীয় ভাষার * অস্তিত্বের প্রমাণ থাকিত! অবজ্ঞাতা অনন্যশরণা দীনা-হীনা বালিকার ন্যায় আমাদের বঙ্গভাষা, গঙ্গার বদ্বীপ-প্রাঙ্গনে নীলাম্বু উপসাগরতটে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র ঐশ্বর্য্য লইয়া দিন কাটাইতেছিল; তার পর শুভক্ষণে ইংরাজের আগমনের পর অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের হস্তে অনুকূল অনুবাদ-আদার্য্যের প্রভাবে ধীরে ধীরে মর্ম্মাবগুণ্ঠন পরিহার করিয়া আপনার অবয়ব প্রকটিত করিতেছিল; তার পর মাইকেল, দীনবন্ধু ও নবীন প্রভৃতির স্বাবলম্বন-শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইতেছিল। তার পর—কি বলিব? হর্ষ ও বিষাদের যুগপৎ অভিঘাতে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া আইসে!—তার পর, বঙ্গের কৃতি-সন্তান অমর-কবি বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে সেই অবজ্ঞাতা শীর্ণা বালিকা আজ ভারতবক্ষে আপন মহিমাময়ী লাবণ্যময়ী যৌবনমূর্ত্তি প্রকটিতা করিয়া স্মিত মুখে দণ্ডায়মানা! ভারতের অন্যান্য ভাষা, এমন কি ইংরাজী ও জারমান্ ভাষাও বুঝি তৎপ্রতি লালসার নেত্র নিপাতিত করিয়া চাহিয়া আছে। কিন্তু যৌবন-সৌন্দর্য্য এখনও কূলে কূলে পূর্ণ হয় নাই—বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গপুষ্টি এখনও সাধিত হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বকীয় প্রতিভা বলে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ও সমাজতত্ত্বে, উপন্যাসে ও রাজনীতিতে ইতিহাসে ও প্রত্নতত্ত্বে নানা প্রদেশে বঙ্গভাষার রাজ্য বিস্তার করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, এমন এক দিন আসিতে পারে, যখন ভাষার সমগ্র রাজ্যেই বঙ্গভাষা স্বকীয় স্বতন্ত্র সম্পদ্ লাভ করিতে সমর্থা হইবে। কিন্তু কোন্ দূর ভবিষ্যতে কোন্ কৃতিসন্তান আসিয়া বঙ্গভাষাকে সে সব সম্পদ্ প্রদান করিবেন, তদ্বিষয়ে হতভাগ্য আমরা, আমাদের দূরদর্শনশক্তি আমাদিগকে কোনও তথ্য আনিয়া প্রদান করে না। তাইত বলিতেছিলাম, উচ্চশিক্ষার পক্ষে বঙ্গভাষার শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ্ কতটুকু? অতি ক্ষুদ্র না হইলেও, সে শক্তি-সামর্থ্য বা সম্পদ্ নগণ্য বলিয়াই গণ্য হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা একটী জাতির উচ্চশিক্ষার উপযোগী জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। তবে "উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা" এমন প্রবন্ধের অবতারণা কেন? বর্ত্তমানে যাহার সম্ভাবনা নাই, এবং যাহার ভবিষ্য-সম্ভাবনাও মনশ্চক্ষুর অন্তরাল স্থানে ভবিতব্যের তামসকুক্ষি-নিহিত, তাহা লইয়া মস্তকান্দোলনে কি ফল?

* বাঙ্গালী বহু দিনের একটী প্রাচীন জাতি। বাঙ্গলার সুন্দর উন্নত অক্ষরসমূহই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে অন্য কথা আছে। বাঙ্গলা বা তদ্‌সম পদবী বিশিষ্ট কোন প্রাদেশিক ভাষাই কোনকালে সমগ্র ভারতের বা সাহিত্যের ভাষা ছিল না। চিরদিনই সাহিত্যের জন্য সংস্কৃত বা দেব-ভাষা সর্ব্ব প্রদেশেই নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই কারণ হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্য প্রতিম মনীষিগণ অতি সহজেই স্ব স্ব ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিঃ সাঃ সং।

(৪)

বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধির উপায়।

বস্তুতঃ, কথাটা তাহা নহে। বর্ত্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার অঙ্গে জাতীয় ভাষা কোন্ অংশে কত পরিমাণে বা কি ভাবে স্থান পাইয়াছে, তাহাই বোধ হয় আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যদি তাই হয়; তবে সে আলোচনাতেও আমাদের বিষাদ বই আনন্দ নাই, নৈরাশ্য বই আশার কারণ নাই। বঙ্গভাষার শ্রীসম্পদের সর্ব্বাঙ্গ-পুষ্টি দূরের কথা, অনেকাংশেই তাহা এখনও অপূর্ণ, সে ভাবে ভাষার এখনও কৈশোর যুগ অতীত হয় নাই, বলিতে পারা যায়। সাহিত্যাংশে বঙ্গভাষা কিঞ্চিৎ পরিপুষ্ট হইলেও, তাহাও সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববাসীর বিস্ময়োৎপাদিনী আকাঙ্ক্ষণীয়া সামগ্রী হয় নাই। ইংরাজী সাহিত্য-রাজ্যে যত চিত্তবিমোহিনী সামগ্রী-সম্ভার সম্ভব, বঙ্গসাহিত্যে তাহার শতাংশও বুঝি সম্ভবে না। তার পর, ইংরাজী সাহিত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এখন অনেকটা নিরাপদ অপরিবর্ত্তনীয়তার মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে, কিন্তু বঙ্গের জাতীয় ভাষা কেবল পরিবর্ত্তনের প্রথম স্তরের অগ্নি-পরীক্ষা অতিক্রম করিতেছে বলিয়াই মনে হয়। কত যুগ-যুগান্তর কত অগ্নি-পরীক্ষা ইহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তবে ইহার জগন্মান্য সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হওয়া সম্ভব।

যদি তাহাই হয়, যদি বঙ্গ সাহিত্য এখনও এত অপূর্ণ, যদি তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য এখনও বহু প্রতিভাবান্ বঙ্গ সন্তানের যুগযুগান্তর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তবে উচ্চশিক্ষায় এমন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল কেন? কথাটী ভাঙ্গিয়া বলি। নিয়ম হইয়াছে, এণ্ট্রান্স, এফ্,এ ও বি,এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ১ম ভাষা, ২য় ভাষা সংস্কৃত স্বেচ্ছাধীন (Optional) প্রত্যুতঃ বাঙ্গলা অবশ্য-শিক্ষণীয় (Compulsory) ভাষা। যদি বস্তুতঃই এবাম্বিধ নিয়ম বিধিবদ্ধ বা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের এক পক্ষে যেমন গৌরব, অপর পক্ষে তেমনি চরম দুর্ভাগ্য!—কেন, তাহাই বলিব।

মানুষের ভাষা সাধারণতঃ দুই প্রকারে পুষ্টিলাভ করে। প্রথম, মৌলিক গবেষণা বা Originality; দ্বিতীয়, চৌর্য্য। এই চৌর্য্য আবার দ্বিবিধ। ১ম, প্রত্যক্ষ চৌর্য্য বা অনুবাদ; ২য়, পরোক্ষ চৌর্য্য—কখনও ভাবের ঘরে কখনও ভাষার ঘরে। বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের সমস্ত বঙ্গীয় লেখক উল্লিখিত প্রকারে বঙ্গভাষাকে পুষ্ট ও উন্নত করিয়াছেন। সব দেশের ভাষাই উল্লিখিত প্রকারে উন্নত হইয়া থাকে। ইংরাজও মৌলিক গবেষণা ও চৌর্য্য দ্বারা আপনার ভাষা সাজাইয়াছে। এ চৌর্য্যের প্রকৃত নাম চৌর্য্য না দিয়া, অনুকরণ বা অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে। কারণ চৌর্য্য দ্বারা একজনের সম্পত্তি অপরের হস্তগত হয়, তদ্দ্বারা একজন ক্ষতিগ্রস্ত অপরে লাভবান্ হয়, কিন্তু ভাষার

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চৌর্য্য দ্বারা কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বাঙ্গালী ইংরাজের সেক্ষপীয়ার মিল্টন, মিল স্পেন্সার, ক্যালকুলাস্ বা অ্যাষ্ট্রোনমি অনুবাদ করিয়া লইলে ইংরাজের কিছু ক্ষতি হয় না, প্রত্যুতঃ বাঙ্গালীর যথেষ্ট লাভ; সুতরাং ইহাকে চৌর্য্য নামে অভিহিত করা সঙ্গত হয় না। ইংরাজও গেটে ও প্লেটোর গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া লয়, সংস্কৃত শকুন্তলা ও বাঙ্গলা বৃষবৃক্ষ অনুবাদ করিয়া আপনার ভাষার আগার পূর্ণ করে। এই প্রকারেই ইংরাজ ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশের গ্রন্থগুলি আপনার ভাষার অস্থিমজ্জার সহিত মিলিত করিয়া লইয়া, আজ ইংরাজী ভাষাকে সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে এক মহিমাময়ী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান করিয়াছে। কে জানে, বঙ্গের জাতীয় ভাষার এমন এক দিন আসিবে কি না! কিন্তু হায়, তৃষিত পান্থ মরীচিকার জলে অবগাহন করিতে পারে, তথাপি এ আশার বুঝি তৃপ্তি নাই।

(৫)

সংস্কৃত ভাষা বঙ্গভাষার কে?

কিন্তু, কি যে বলিতেছিলাম! আমরা বলিতেছিলাম, উচ্চশিক্ষার পক্ষে ২য় ভাষা সংস্কৃতকে অবহেলা করিয়া বাঙ্গলাকে এত বেশী সম্মান দেওয়া জাতীয় সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য-লক্ষণ। ২য় ভাষা কেবল সংস্কৃত রাখিলে বরং বিশেষ দুর্ভাগ্য বা ক্ষতি নাই, কিন্তু কেবল মাত্র বাঙ্গলা রাখিলে বিশেষ ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের কারণ। কেন, তাহাই বলিব।

মানুষের মৌলিক গবেষণারও বহিঃপ্রকাশ, কোনও ভাষা দ্বারাই হইয়া থাকে—শব্দ-যোজনা-দ্বারাই সম্পাদিত হয়।' কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা শব্দ পাইয়াছে কোথা হইতে? সংস্কৃত ভাষাই বঙ্গভাষার শব্দের আকর, সে কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। আমরা অনেক সময় ইংরাজী সাহিত্যের ভাবের ঘরে চুরি করিয়া সংস্কৃত শব্দের বঙ্গ ভাষানুরূপ যোজনা দ্বারা তাহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকে, অনেক সময় সংস্কৃত সাহিত্যেরও ভাবের ঘরে চুরি করিয়া বঙ্গভাষার অস্থিমজ্জার পরিপুষ্টি সাধন করি। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতির অনুবাদ কার্য্যে পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হয়; বাঙ্গলার যে পরিভাষা সংস্কৃতই বহুল পরিমাণে যোগাইতে সমর্থ। সুতরাং যতদিন বঙ্গভাষা সর্ব্ব শব্দের আকর হইয়া না উঠে, ততদিন সংস্কৃত ভাষা নানা কারণেই আমাদের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। সংস্কৃত-জ্ঞান ভিন্ন বর্ত্তমান অপূর্ণ বঙ্গভাষার পূর্ণতা-গঠন অসম্ভব। উদাহরণ স্থলে কেবল সাহিত্য সম্বন্ধেই দেখুন। ইংরাজী ও ল্যাটিন সাহিত্য-প্রিয় মধুসূদনকেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া মেঘনাদ-বধ রচনা করিতে হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই সংস্কৃত ভাষাতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সুতরাং এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইল যে, বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বঙ্গীয় লেখকের সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করা প্রয়োজনীয় হয়, অন্ততঃ এখনও বহুকাল প্রয়োজনীয় থাকিবে। সুতরাং অতঃপর যাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যমাত্র দ্বারা উচ্চশিক্ষায় পাস পাইবেন, তন্মধ্যে কেহ প্রতিভাবান্ থাকিলেও, তদ্দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্টির আশা সুদূর পরাহত।

(৬)

বঙ্গভাষায় সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা।

তবে এক সম্প্রদায় বলিতে পারেন, অনুবাদ ইংরাজী-বহুল করিয়া রাখ;—ইঁহাদের মতে 'Nation' কে নেশন্ করিয়াই রাখ। ইঁহারা আরও বলেন, বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল করিয়া জটিল করিও না, উহাতে গ্রাম্য ভাষা ও চলিত ভাষা যত পার প্রবিষ্ট করাও। আমরা ইঁহাদের দলকে দূর হইতে নমস্কার করি।

বাঙ্গলাকে সংস্কৃত-বহুল করায়, লাভ আছে। লাভ সামান্য নহে—যথেষ্ট। আজ যে বাঙ্গলা-ভাষা বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা, কালক্রমে তাহা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষায় পরিণত হইতে পারে। হিন্দী-দ্বারা এ কার্য্য কত দূর সিদ্ধ হইবে, তাহা আমার ক্ষীণ বুদ্ধির বহির্ভূত। আমি এমনও শুনিয়াছি, মহারাষ্ট্র বা পঞ্জাবের সংস্কৃত-অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা ভাষা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমি দেখিয়াছি, মান্দ্রাজ ও বম্বের কোনও কোনও গ্রাজুয়েট, বঙ্কিম বাবুর অসাধারণ কবিত্ব ও দার্শনিক জ্ঞানের সুখ্যাতি শুনিয়া, বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া, বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়াছেন। সহজলভ্য মধুচক্র স্বদেশে থাকিতে, কেহ হিংস্র-সঙ্কুল দূর-কানন-অভিমুখে অগ্রসর হয় না;—এই ভারতবর্ষেরই বঙ্গ ভাষা সর্ব্ব রত্নের আধারীভূতা হইলে, ভবিষ্যৎ-যুগে ভারতের লোক, পাশ্চাত্য জগতের ভাষার প্রতি জ্ঞানের আশায় সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিপাতিত করিবে, এমন দুরাশা আমার নাই!

কল্পনার দূরবীক্ষণ লইয়া, হে পাঠকমণ্ডলি, সে গৌরবের দিন নিরীক্ষণ করুন! প্রাণের ভিতর যে প্রাণ থাকে, তাহা আনন্দে নাচিয়া উঠে, হৃদয়ে শান্তির মরা-গাঙ্গে প্রফুল্লতার লহরী ছুটে, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা নব বলে উদ্দীপ্ত হয়! আর তার পর? যদি এই অধম বাঙ্গালী জাতির জাতীয় ভাষা কোনও দিন ধরিত্রী-খণ্ডের সর্ব্বজাতীয় লোকের আদরের সামগ্রী হয়,—তবে? তবে কি বলিব? অসম্ভব, সাধনায় সম্ভব হয়; অসম্ভব, কঠোর অধ্যবসায়ের কাছে মস্তক অবনত করে। সৌরজগতের পরিণাম-গণনা অধ্যবসায়শীল বিজ্ঞানবিদের নিকট সম্ভবপর হয়, অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাড়িত-বার্ত্তাবহ দ্বারা সংযোজিত করা সম্ভবপর হইয়াছিল, মাত্র চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া গহ্বর-সঙ্কুল দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস্-মালার তুষারাবৃত সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম পার হইয়া অষ্ট্রিয়ার সার্দ্ধৈক লক্ষ সৈন্যকে ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধে পরাভূত করা, নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল;—অসম্ভব, প্রতিভাশালী অধ্যবসায়ের নিকট কোন্ দিন পরাভূত হয় নাই? তবে, অসম্ভব বলিয়া নিরুদ্যম থাকিবার হেতু কি? এই অবজ্ঞাতা দীনা ক্ষীণা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান কৈশোর-লাবণ্য দেখিয়া, কে অবিশ্বাস করিতে পারে যে, এই ভাষার মহিমাময়ী যৌবন-মাধুরী-পূর্ণা সম্রাজ্ঞী-মূর্ত্তির দিকে জগৎ এক দিন বিস্ময়-বিস্ফারিত আকাঙ্ক্ষার নেত্র পাতিত করিবে? ইংলণ্ডে এলিজাবেথান যুগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিল যে, ইংরাজ জাতির ভাষা তিন চার শতাব্দীর মধ্যে ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে?

(৭)

বর্ত্তমান কর্ত্তব্য।

তাই বলি, আমাদিগকে মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, অনুবাদ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে; পর-দেশের ভাবের ঘরে চোর হইয়া প্রবেশ করিতে হইবে; যাহা পাইব, তাহা সংস্কৃত ভাষায় মার্জ্জিত করিয়া, তদ্দ্বারা আমাদের জাতীয় ভাষার অস্থি-মজ্জা গঠন করিয়া, তাহার উপর রং ফলাইয়া এবং অলঙ্কার পরাইয়া এই দীনা বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিমোহিনী করিয়া সাজাইতে হইবে। তৎপক্ষে উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা কি আমাদের অনুকূল হইবে? কখনই নয় বলিয়াই আমার মনে হয়। আমার মনে হয় কেবলমাত্র বাঙ্গলা শিখিয়া কেহ মাইকেল, নবীন বা বঙ্কিমচন্দ্র হইতে পারে না; তেমন গ্রন্থকার নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সংস্কৃত-শিক্ষার দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছি। সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও বঙ্গভাষা যতদূর সম্ভব, সংস্কৃত শব্দ-বহুল হওয়া প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত ভাষার অভ্যন্তর দিয়া বঙ্গভাষাকে প্রবাহিত না করিলে, তাহা কদাপি ভারতবাসীর জাতীয় ভাষা রূপে পরিগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহাতে লাভ কি?—এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়াছি। যখন সমগ্র ভারত একই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবে, তখনই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও একতার বন্ধন দৃঢ়তর হইবে, তখনই ভারতে একটী মহা জাতির সূত্রপাত হইবে; তৎপূর্ব্বে সে আশা দুরাশা মাত্র।

অতঃপর পাঠকমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—তবে আমি কি চাই? আমি কি বাঙ্গলা সাহিত্যকে একেবারে উঠাইয়া দিতে বলিব? কদাপি নয়। আমি বলি, উভয়ই রাখ; বাঙ্গলা সাহিত্যের পাঠ্য গ্রন্থ কমাইয়া তৎস্থানে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত সাহিত্য রাখিয়া দাও। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা পাশাপাশি রাখ। বাঙ্গলার গ্রন্থ সংখ্যা যত পার কমাইয়া দাও। সংস্কৃত জানিলে বাঙ্গলা শিখিতে বিলম্ব হইবে না, কিন্তু বাঙ্গলা জানিলে সংস্কৃত শিক্ষা তত সহজ নহে।

তবে যখন এমন দিন আসিবে, যখন মুসলমান ছাত্রগণকেও ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িবার জন্য আরবী বা পারশী পড়িতে হইবে না, অর্থাৎ যখন আরবী পারশী সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রভৃতি সমস্ত ভাষার পদার্থসম্ভার বঙ্গ ভাষার অস্থিমজ্জারূপে গঠিত হইবে, তখন আমি বঙ্গের মুসলমান বা হিন্দু ছাত্রগণকে আর উল্লিখিত ভাষাগুলি অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিব না। পরন্তু বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষাকেও অবশ্যশিক্ষণীয় রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য ছিল।

(৮)

ধন্যবাদ ও বিষাদের কারণান্তর।

তথাপি গবর্ণমেণ্টকে আজ ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। উচ্চশিক্ষায় বঙ্গভাষা যে ভাবেই পরিগৃহীত হউক না কেন, উহা দ্বারা যে আজ বঙ্গের জাতীয় ভাষা গৌরবান্বিতা, এবং উহা যে বঙ্গের জাতীয়তা বৃদ্ধির বহুল পরিমাণে উপযোগী, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত

পদার্থ, তাহা গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া আজ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, এতদপেক্ষা সুখের কথা, এতদপেক্ষা ধন্যবাদের কারণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু তথাপি মন অতৃপ্তি ও অশান্তি লইয়া এখনও কাঁদিতে চায় কেন? সংস্কৃতকে অনাদর করিয়া, বাঙ্গলাকে আধিপত্য দানই বুঝি আমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ নহে। আমাদের সন্দেহ আছে, বুঝি বি এস্ সি ও এম্, এ ক্লাশে বাঙ্গলা বা সংস্কৃত কিছুই স্থান পায় নাই। যে সব গ্রন্থগুলির অনুবাদ আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সব গ্রন্থের ছাত্রেরা বাঙ্গলা বা সংস্কৃত কিছুই ভালরূপ শিখিবে না, ইহা একটী আশঙ্কার কথা!

শিক্ষা স্থূলতঃ দ্বিবিধ:—ঐহিক ও আধ্যাত্মিক। ঐহিক শিক্ষা অর্থকরী ও ব্যবসায়াত্মিকা, ইহা নানা বিভাগে বিভক্ত; ঐহিক শিক্ষা দ্বারা ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে, মানুষ সভ্যপদবাচ্য হইয়া অপরের উপর প্রভুত্ব করে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা, নীতির কথা ধর্ম্মের কথা ঈশ্বরের কথা পরলোকের কথা,—নানা কথা আমাদের হৃদয়ের দ্বারে বহন করে, নানা সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব আনিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করে। এই বাস্তব জগতে বাস্তবতা বা ঐহিকতা চাই, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতা দ্বারা মানুষ পূর্ণ হয় না—মানুষ এ সংসারে দাঁড়াইতে পারে না। তবে যে দিন পৃথিবীর স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঋষি হইয়া দাঁড়াইবে, সে দিনের কথা স্বতন্ত্র।

আমি বলিতেছিলাম, ভারতের কোমল মাটীতে কাব্য ও দর্শন সহজেই ফুটিয়া উঠে। সুতরাং কাব্য ও দর্শনের অনুবাদে তত মনঃসংযোগ কর আর নাই কর, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বোধ করি না। প্রত্যুতঃ শিল্প-কলা, গণিত-বিজ্ঞান, অর্থনীতি-সমাজনীতি, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি ঐহিক শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ গুলি যত সত্বর পার অনুবাদ করিয়া লইয়া বঙ্গ-ভাষার শ্রীসম্পদ্ বৃদ্ধি কর।* আজ আমি মর্ম্মবেদনার নিবেদনে বিশেষ সুযোগ পাইয়াছি। আমি বলিতে চাই—একটী অনুবাদ-কার্য্যালয় সত্বরই স্থাপিত হউক। ন্যূন পক্ষে এক লক্ষ মুদ্রায় আমার বিশ্বাস বর্ত্তমানে উক্ত কার্য্যালয় চলিতে পারে। স্বদেশ-হিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মুদ্রৈক মাত্র চাঁদারূপে অর্পণ করিলে আমার বিশ্বাস এই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। যদি বাঙ্গালীর জাতীয়তা গঠনে আমাদের অভিলাষ থাকে, তবে বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষাকে তদুপযুক্ত করিয়া গঠন করিবার এই উত্তম সর্ব্বপ্রথমেই বাঞ্ছনীয়। ভাষাই জাতীয়তা ও জাতীয় উন্নতির পরিমাপক ও পরিচায়ক। আজ যে ইংরাজ জাতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি বলিয়া পরিচিত, ইংরাজের অমূল্য রত্নরাজিপূর্ণ ভাষাভাণ্ডার তাহার সাক্ষ্য।

তা'ই আজ বলিতে চাই, হে বঙ্গীয় ভ্রাতৃবৃন্দ—হিন্দু হও, মুসলমান হও, তোমাদের জাতীয় ভাষা এক। আজ অনুবাদ কার্য্যের মহাসাধনায় সকলে

* এ স্থলে আমাদিগের 'সাহিত্য সম্মিলনের' সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে তৎপ্রণীত চিত্র-বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কলাবিজ্ঞানের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

যাঁহারা চিকিৎসাবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান গণিত-রসায়ন প্রভৃতি নানা বিভাগে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমরা প্রসঙ্গতঃ তাঁহাদের নিকটও চির-কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমাদের আশা আছে বঙ্গভাষাও চিরদিন তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিবে।

মিলিত হও। যদিও তোমরা এতকাল কেবল ইংরাজের কদাচারেরই অনুকরণ করিয়া আসিয়াছ, আজ অনুরোধ—তোমরা একবার ইংরাজের মহত্ত্বের অনুকরণ কর,—পর-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া ইংরাজ তাহার জাতীয় ভাষা-ভাণ্ডার কেমন করিয়া সাজাইয়াছে, সেদিকে নেত্রপাত কর,—তোমরা বাঙ্গালী জাতির জাতীয়তা সাধন কর।

উপসংহার।

আমি অনুবাদ-কার্য্যোপলক্ষে আর একটী কথা বলিতে চাই। যে দেশের যে ভাষা, সেই ভাষার শিক্ষালাভ যত অল্পায়াস-সাধ্য ও অল্পকাল-সাপেক্ষ, বিজাতীয় ভাষায় কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। বিজাতীয় ভাষা আয়ত্ত করা ও তদ্দ্বারা উচ্চশিক্ষালাভ, যে কিরূপে বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য ও দৈহিক স্বাস্থ্য ধ্বংস করিতেছে—কিরূপে বাঙ্গালীর শিক্ষিত জগৎকে অস্থি-কঙ্কাল ও ব্যাধি-সার করিয়া তুলিতেছে—কিরূপে তাহাদের জীবনীশক্তির অপচয় করিতেছে, তাহা যাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিয়াছেন। চাকরির জন্য ইংরাজী শিক্ষা প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের চরম লক্ষ্য চাকরি নহে—মনুষ্যত্ব। তবে আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। অনুবাদ-কার্য্যেরদ্বারা গন্তব্য-পথ প্রশস্ত কর। দেশের শিক্ষা যাহাতে বিনা বিপ্লবে দেশের হাতে আসিতে পারে, যাহাতে বাঙ্গালী মনুষ্য বলিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, তাহার সদুপায় বিধান কর।

আহা! আজই যদি উল্লিখিত অনুবাদকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, তবে হয়ত কাল দেখিব, এই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতটে জাতীয় ভাষার বিরাট সারস্বত-কুঞ্জে রাজ-ভাষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিতরিত হইতেছে;—তখন দেখিব উচ্চশিক্ষায় কেবল জাতীয় সাহিত্যমাত্র পরিগৃহীত নহে, শিল্পকলা গণিত-বিজ্ঞান ভূতত্ত্ব-প্রত্নতত্ত্ব সমস্ত বিষয়েরই জাতীয় ভাষায় শিক্ষাদান কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। কল্পনার চক্ষে সে দিন দেখিয়া আজ পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হই! আর তারপর-হয়ত শতাব্দী পরে দেখিতে পাই—কেবল এই ভাগীরথীতটে বাঙ্গলার ছাত্র নহে, সুদূর পশ্চিমে পঞ্জাবের শতদ্রু তটে, সুদূর দক্ষিণে গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী নর্ম্মদা ও তাপ্তীরতটে পবিত্র সারস্বতকুঞ্জে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ ছাত্রগণ রাজভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষাতেই হয়ত উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে। এইখানে কল্পনার চক্ষে আনন্দের অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। সে আনন্দের তুলনা নাই—পার নাই—অন্ত নাই। ভগবন্, বঙ্গের ভাগ্যে সে আনন্দ লিখিয়াছ কি?

শ্রীক্ষিতিনাথ দাস।

সনাতন সাধনতত্ত্ব।

বা

তন্ত্র-রহস্য—

পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামীর সেই "তন্ত্র কি" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের একত্র সমাবেশমাত্র। যাঁহারা ইহা একত্র সম্পূর্ণ পাঠ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা সত্বর গ্রহণ করুন। ইহাতে আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালিকার এক খানি সুন্দর রঞ্জিত হাফটোন চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। স্বর্ণাক্ষর-লিখিত বিলাতিবৎ সুন্দর বাঁধাই—মূল্য ৸০ আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

'শিল্প ও সাহিত্য' কার্য্যালয়, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, বহুবাজার, কলিকাতা।

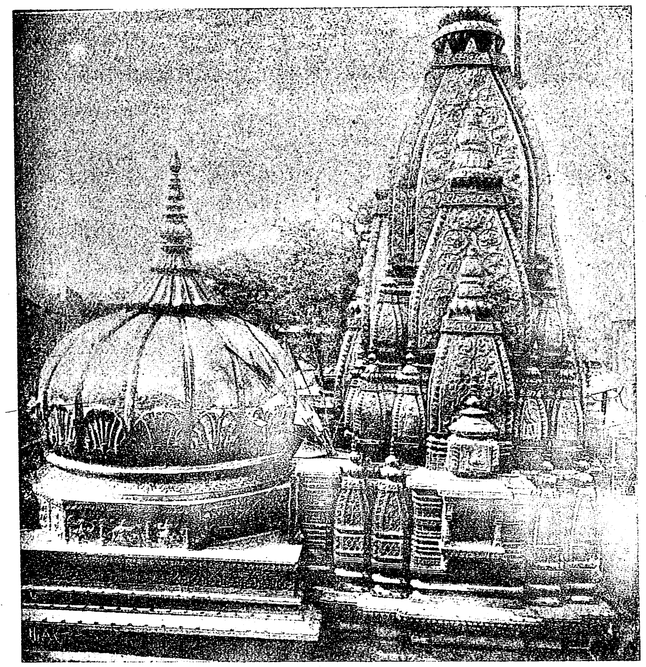

কাশী—বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD:
243-1, Upper Circular Road,

শিল্প ও সাহিত্য।

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড } সন ১৩১৬—আষাঢ়। { ১০ম সংখ্যা

কাশীধাম।

কাশীধাম আর্য্যের অতি প্রাচীন, পবিত্র ও মহা-পুণ্য তীর্থ। আর্য্যসন্তান এ দুর্দ্দিনেও ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, বিধি-নিয়ম সর্ব্ব কর্ম্মে পতিত হইয়াও কাশীর সেই মহামহিমান্বিত চিরশান্তিপ্রদ সুশীতল-বাসিনী-গঙ্গা, সেই পবিত্র মহাতীর্থ মণিকর্ণিকা-দশাশ্বমেধ, সেই ত্রিভুবন-বিশ্রুত সত্যনিষ্ঠ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহাশ্মশান, বাল্মীকি ব্যাস বুদ্ধ শঙ্কর প্রভৃতির সেই অলৌকিক সাধন-সামর্থ্য, যাহা কাশীর প্রতি অণু পরমাণুর সহিত বিজড়িত, যাহা জগতের সকল জাতির ইতিহাসেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তাহার মাহাত্ম্য ও মায়া, চিত্ত হইতে এখনও তাঁহারা বিচ্যুত করিতে পারেন নাই ; তাই এখনও যাঁহার ধমনীতে আর্য্য-শোণিত অতি ক্ষীণভাবেও প্রবাহিত আছে, তাঁহার হৃদয় জীবনে একবার মাত্র কাশীদর্শন ও অন্তে কাশীতল-বাসিনী গঙ্গার পবিত্র সলিলে দেহ বিসর্জ্জন করিতে অভিলাষ করে ; তাই এখনও ভারতের প্রান্ত-চতুষ্টয়ের প্রত্যেক প্রদেশ, প্রতি পল্লী, প্রতি গৃহ হইতে দলে দলে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া কাশীবাস করিতেছে ও কাশীদর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এমন পবিত্র তীর্থ জগতে আর বুঝি নাই! কেবল সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী হিন্দুদিগেরই যে ইহা প্রধানতম-তীর্থ, তাহা নহে, ইহা এসিয়া মহাপ্রদেশ বা প্রাচ্যভূখণ্ডের একমাত্র মহাতীর্থ বলিয়া জগত-প্রসিদ্ধ। চীন, জাপান, তীব্বত, সিংহল প্রভৃতিবাসী পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও সেইরূপ বরেণ্য ও অত্যন্ত আকাঙ্খার স্থান। মহামুনি শাক্যসিংহ ধর্ম্ম ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে তাঁহার সুপবিত্র মত এই স্থান হইতেই

প্রথম প্রচার করেন। কাশীর প্রাচীনত্ব ও তাহার চিরপ্রতিষ্ঠিত একছত্র-ধর্ম্ম-সিংহাসন সম্পর্কীয় নানা প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, সে সকলের বিস্তৃত উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি না। তবে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত আভাষ সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

কাশী কতদিনের?

কাশী কতদিনের; এই প্রশ্ন লইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রদেশের কত পুরাতত্ত্ববিদ্ কত কথাই যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি আর্য্যবংশ-সম্ভূত, বেদাদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাহাকে এই অনাদি-লিঙ্গরূপী বিশ্বেশ্বরের অতি প্রীতিপদ কৈলাসসম আদি তীর্থ এই 'কাশীধাম' য়ে কতদিনের, তাহা আর বলিতে হইবে না—কত সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, কত কল্প কত মহাকল্প যে, ভাগীরথীর ঐ কল-কল-প্রবাহিত তরঙ্গমালার ন্যায় কাশীর পবিত্র বক্ষ বিধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার কত যুগ-যুগান্তর ঠিক এইরূপ ভাবেই প্রবাহিত হইবে, কে তাহার গণনা করিবে? সেই অনাদি ও অনন্ত কালভৈরবই কোতোয়ালরূপে কাশীর চির-শান্তপ্রদ অন্নপূর্ণার সিংহদ্বারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার গণনা করিবেন। এ সংবাদ তোমার আমার রাখিবার সাধ্য নাই, সামর্থ্যও নাই। আবার যাহাদের এ বিশ্বাস নাই, জগতের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই যাঁহারা খৃষ্ট জন্মের দুই পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বলিয়া স্থির করেন, তাঁহারাও কাশীর জন্ম-কাল অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পণ্ডিতবর রেভাঃ ডাঃ এম, এ, শেরিং 'বেনারস-লণ্ডন-মিশনারী-সোসাইটীর' আচার্য্যরূপে বহুকাল কাশীবাস করিয়া সন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে "The Sacred City of the Hindus" নামক যে সুবৃহৎ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি কাশীর প্রাচীনত্ব বিষয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "কাশী-বা বেনারসের পূর্ব্ব-ইতিহাস সুদূর অতীতের ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন, হিন্দুদিগের এই পবিত্র সহর অবিরোধ গভীর পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত। যখন আর্য্যগণ উত্তর ভারতের নানাস্থানে অতি ধীরে ধীরে আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ছিলেন, বোধ হয় তখনই তাঁহা-দিগের দ্বারা এই কাশী সহরেরও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। দুর্ভেদ্য কুহেলিকাচ্ছন্ন বা ঘনঘোর মেঘমালায় সমাবৃতবৎ বৈদিককাল বা আর্য্য-ইতিহাসের মধ্য দিয়া কাশীর সেই পুরাতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্তই দুরূহ। সে যাহা হউক ইহা যে আর্য্যদিগের আর্য্য নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থানরূপে পরিগণিত হইয়া ছল, তাহা প্রাচীন আর্য্য-শাস্ত্রাদি আলোচনায় সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"এই প্রাচীন সহর 'বেনারস' বহু পুরাতত্ত্বের আধার, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সময় সময় নানা দৈব ও রাষ্ট্রীয় দুর্ঘটনায় ইহার বহু প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতল অতীতের কোলে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! তবে শাক্যমুনি হইতে ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বেশ জানিতে পারা যায়।"

"পঞ্চবিংশতি-শতাব্দি-পূর্ব্বে যখন অসিরীয়, কালদীয়, বাবেলন্, ট্রয় ও মিসর সবে মাত্র আপন আপন নবোত্থিত প্রভাব প্রকাশ করিতেছিল, যখন রোম, গ্রীস প্রভৃতি তাহাদের জরায়ু-শয্যায় শায়িত, তাহাদের নাম গন্ধও কেহ যখন জানিতে পারে নাই, সেই প্রাচীনযুগে কাশীনগরী আপন বিদ্যা ও বৈভবে অতি প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি সগর্ব্ব অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া নিজ পুরাতত্ত্বের পরিচয় দিতে ছিল।* এত-দ্বাতীত কালের এই বিষম ঘাত-প্রতিঘাতে কত দেশ, কত জনপদ, কত জাতি কয়েক শতাব্দীর জন্য উত্থিত হইয়া আবার কোথায় অতীতের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাদের চিহ্ন মাত্রও নাই; কিন্তু কাশীর—সেই একই ভাব চিরদিন সমান ভাবেই বিরাজিত, কাশীর ভাগ্যসূর্য্য কোন কালেই অস্ত হয় নাই, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বংশ-পরম্পরায় তাহা চলিয়া আসিতেছে, কাশীনগরী ভারতের অধিশ্বরীরূপে চিরদিন নিজ সমান আধিপত্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে, কাশী যেমন পুরাতন তেমনি চির নূতন।"

পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মহাত্মা কেন্ সাহেবও তাঁহার 'Picturesque India' নামক গ্রন্থের ৩০২ ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "আর্য্যদিগের ভারতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বেনারস বা কাশীর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। কাশী জগতের অতি প্রাচীন সহর।"

শাক্যসিংহ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গয়ার নিকট-বর্ত্তী বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্বলাভ করনান্তর খৃঃ পূর্ব্ব ছয়শত শতাব্দীতে আত্মমত প্রচারোদ্দেশ্য ভারতের বিধি-নিয়ম ও ধর্ম্মচক্র-পরিচালক কাশীর সিদ্ধ-সাধু ও বিদ্যামণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হন ও প্রাচীন প্রচলিত মতের খণ্ডণ করিয়া নিজমতের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন। মহামুনি বুদ্ধদেব তখন বেশ বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে, যদ্যপি কাশীর মধ্যে একবার তাঁহার মত কিয়ৎ পরিমানেও প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করা অতি সহজ-সাধ্য হইয়া যাইবে। এইরূপ ভাব কেবল যে তিনিই পোষণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, জগতের যে কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ভুক্ত জনসমূহ এখনও পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচারীমণ্ডলীর পার্শ্বেই সেইভাবে দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব অভিমত প্রচার করিয়া থাকেন। এই কারণেই হিন্দুর মন্দিরের পার্শ্বে জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মোসলমান দিগের মন্দির বা মঠ, গীর্জা ও মশ্‌জিদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে। এইভাবেই শাক্তের প্রতি বৈষ্ণবের নিন্দাবাদ, বৈষ্ণবের উপর শৈবের শ্লেষোক্তি প্রভৃতি শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক ভগবান বুদ্ধ যখন আর্য্যের আচার-ভ্রষ্টতা দেখিয়া কাতর হই-লেন, তখনই সাময়িক ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের বিধি-নিয়ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই প্রচার-কার্য্য কাশী হইতেই আরম্ভ হওয়ায় কাশীর সহিত তাঁহার ঐতিহাসিক জীবন জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মহাত্মা 'কেন্' বলিয়াছেন কাশী হইতে ভগবান বুদ্ধের যে পবিত্র মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাধিক মনুষ্য-সমাজের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

'ফা-হিয়েন' ও 'হিউয়েন্থ-সাং' প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-চীন-পর্য্যটকদ্বয় খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৭ম শতাব্দীতে ভারতের

* যজুর্ব্বেদের 'শতপথ ব্রাহ্মণ' ও 'কৌষীতকী ব্রাহ্মণ' উপনিষদেও কাশী একটী বিস্তৃত জনপদ ও যজ্ঞভূমি বলিয়া বর্ণিতহইয়াছে।

বৌদ্ধতীর্থসমূহ পর্য্যটন করিতে আগমন করেন। তাঁহাদের লিপিবদ্ধ বর্ণনাবলী হইতে জানিতে পারাযায় যে, তৎকালে কাশীধাম ভারতের একটী প্রধান রাজ্য-রূপে পরিগণিত ছিল। তখন তাহার পরিধি প্রায় ছয়শত সাতষট্টী মাইল ছিল। সেই বিস্তৃত রাজ্যের পশ্চিম পার্শ্বে গঙ্গার নিকটেই কাশীরাজ্যের রাজধানী দীর্ঘে প্রায় তিন মাইলের উপর এবং প্রস্থে এক মাইল অনুমান হইবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহার আনুসঙ্গিক বহুজনাকীর্ণ অন্যান্য বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলিও সংবদ্ধ ছিল। এখানের জনমণ্ডলী যেমন ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, তাঁহাদের গৃহাদি যেরূপ বহু দুর্লভ ও মহামূল্য সামগ্রীনিচয়ে সুশোভিত ও গৌরবান্বিত ছিল, তাঁহারাও সেইরূপ সুসভ্য, ভদ্র, অমায়িক ও মার্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, বিশেষ যাঁহারা বিদ্যানুশীলনে জীবন আতবাহিত করিতেন, তাঁহাদের সৌজন্য ও মহানুভবতা বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়। কাশী রাজ্যের অধিবাসীমধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং অতি অল্পসংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এস্থানের জল-বায়ু প্রীতিপ্রদ, প্রচুর শস্য-সম্ভার, ফল-ফুল ও শাক-সব্জীতে সকল ক্ষেত্রই যেন সমাচ্ছাদিত। এখানে ত্রিশটী বৌদ্ধবিহার বা মঠ প্রায় তিন সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুগণে পরিপূর্ণ ছিল, এবং শতাধিক হিন্দু মন্দির ও মঠে প্রায় দশ সহস্র সাধুসন্ন্যাসী পূজারী ও তাহাদের শিষ্য ও সেবক বাস করিত। এই মন্দিরশতকের মধ্যে বারানসীর মধ্যে মাত্র কুড়িটী এবং অবশিষ্ট নিকটস্থ গ্রামের অন্তর্গত ছিল।*

মহানুভব হিউয়েন্থ-সাংএর এই বর্ণনা হইতে প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীপূর্ব্বে কাশীর কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইল।

বর্ত্তমান সময়েও কাশীর অবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সৌন্দর্য্য-সমন্বিত। এখনও গঙ্গাবক্ষ হইতে দেখিলে কাশীনগরী প্রকৃতই যেন মর্ত্তে স্বর্গপুরী বলিয়া মনে হয়! "মিঃ মেকলেও" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "বাস্তবিক কাশী সর্ব্ব বিষয়েই এসিয়া খণ্ডের মধ্যে একটী প্রধান উল্লেখযোগ্য স্থান।" (Macauley on Warren Hastings.)

ডাঃ প্রাইম, একজন আমেরিকান পর্য্যটক কাশী দর্শন করিয়া বিমোহিত চিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "আমি অনেক স্থান দেখিয়াছি, ভারতের দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরও দেখিয়াছি, কিন্তু কাশীর সেই ধারাবাহিক সৌন্দর্য্যরাশী দর্শনে হৃদয়ে কি যে এক অভিনব ভাব ও কল্পনার স্রোত প্রবাহিত করে, তাহা বাস্তবিক আমার বর্ণনাতীত। সেই সমুচ্চ মন্দির চূড়া, সেই গগনস্পর্শী মিনারেট, সেই অগণ্য সোপানশ্রেণী-পরিশোভিত-গঙ্গাতট, সেই সংকীর্ণ পথের উভয় পার্শ্বে পঞ্চতল ষড়তল বিশিষ্ট অসংখ্য সৌধরাজি, আবার সেই সোপান ও পথগুলি সততই কেমন অদ্ভুৎ জনতাপূর্ণ তাহার মধ্যে মধ্যে ভীষণদর্শন বিশ্বনাথের শাঁড় ও অন্নপূর্ণার গাভীগুলি কেমন গম্ভীর ভাবে বিচরণ করিতেছে, কাহারও প্রতি যেন ভ্রূক্ষেপ নাই, চারি-

* Narrative of Fa-Hian, concerning his visit to Benares and Saranath. Extracted from the Foe Kaue Ki, by M. M. Remusat, Klaproth and Landresse. Paris 1836 Ch. XXXIV., pp. 304, 305. And Narrative of Hiouen-thsang. Translated by Dr. Shering from the "memoites surles coutrees Occidentales de Hiouen-thsang" of M. Stanislas Julien, translator of the original Chinese Work. Vol. I, pp. 353-376.

দিকে অগণ্য বানর অসঙ্কোচে লাফালাফি করিতেছে, যাত্রীর বস্ত্র ধরিয়া খাবার চাহিতেছে, বিস্তৃত পথে উট্ হাতি এক্কাগাড়ী নিরন্তর গমনাগমন করিতেছে, এই সকল প্রাচ্য-প্রদেশ-সুলভ দৃশ্যাবলী কাশীতে যেন একাধারে সন্নিবেশিত। যখন আমি নৌকারোহণে গঙ্গার বক্ষ হইতে ঘাটগুলি ও হিন্দু-স্থাপত্যের অদ্ভুত কলা-কৌশল লক্ষ্য করিতেছিলাম, বলিতে কি—তখন আমার মনে হইতেছিল, আমি বুঝি কোনও স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" (Benares Guide Book PP. 14-15.)

ডাঃ প্রাইম, মিঃ মেকলে, ডাঃ সেরিং মহানুভব হিউয়েন্থ-সাং ও ফা-হিয়েন প্রভৃতির আধুনিক ও প্রাচীন কাশীর বর্ণনা হইতে কাশীর বিদ্যা ও বৈভব সম্বন্ধে যেমন বিবিধ বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ কাশীর বর্ত্তমান ও প্রাচীন সহর সম্বন্ধেও এক নূতন কথা জানিতে পারা গিয়াছে, যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। এখন আমরা যে স্থানে সহরের এই গৌরবময় বিকাশ দেখিতেছি, প্রাচীন সময়ে ঠিক এই স্থানেই কাশীরাজ্যের রাজধানী বা সহর প্রতিষ্ঠিত ছিল না—পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের বর্ণনা ও বংশপরম্পরায় কাশীর অধিবাসী অনেক বৃদ্ধের মুখেও এখনও তাহা শুনিতে পাওয়া যায়।

কাশীরাজ্যের রাজধানী।

প্রাচীনকালে কাশীরাজ্যের রাজধানী বা সহর এবং কাশীতীর্থ উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। রাজধানী ও তীর্থের এইরূপ পৃথক স্থান-নির্ব্বাচন আর্য্য-ঋষিদিগের যে প্রকৃতই দূরদর্শিতার পরিচায়ক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যেও গ্রাম ও নগর আদি প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে সে বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। 'মানসার' প্রভৃতি স্থাপত্য-বেদানুমোদিত গ্রন্থা-দির মধ্যেও সে কথা স্পষ্ট লিখিত আছে। যাহা-হউক কাশীসহর সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাশীর সেই প্রাচীন সহর বর্ত্তমানের এই সহর হইতে অনুমান দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। আমরা এক্ষণে যাহাকে কাশী, বারাণসী অথবা বেনারস একই স্থান বলিয়া বুঝিয়া থাকি, সেকালে ঠিক তাহা ছিল না। তখন কাশীরাজ্য ও তাহার রাজধানী বর্ত্তমান সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এবং কাশীক্ষেত্র বা বারানসী পরস্পর পৃথক বলিয়া পরিচিত ছিল।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ফা-হিয়ান ও হিউয়েন্থ-সাং চীন পর্য্যটকদ্বয়ের কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। প্রথম ব্যক্তি ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশী পরিদর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যাহাকে জেলা বেনারস (Dist. Benares) রূপে বিভাগ করিয়াছেন। পূর্ব্বে প্রায় তাহাই কাশীরাজ্য-রূপে পরিচিত ছিল, এবং সেই বিভাগের অধীশ্বর তখন কাশীরাজ নামে বিদিত হইতেন, মহাভারতাদি পাঠেও সে কথা অবগত হওয়া যায়। গীতার মধ্যেও সকলে দেখিতে পাইবেন যে, কুরুক্ষেত্রের মহারণে বীর্য্যবান

কাশীরাজ পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশীরাজ সেকালে মহারাজ অফ্ বেনারস বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। এক্ষণে আমরা যাহাকে কাশীরাজ বলিয়া অভিবাদন করি বস্তুতঃ তিনি কাশীরাজ নহেন, তিনি মহারাজ অফ বেনারস, কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত বারানসীরাজও তাঁহাকে বলিতে পারা যায় না. কারণ বারানসীর মধ্যে অতি অল্পস্থানই তাঁহার জমীদারীর অধীন। তিনি এক্ষণে জেলা বেনারসের অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রামের জমীদার মাত্র, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপাপাত্র খেতাবী মহারাজ, তবে নানা কারণে, বিশেষ বারানসী-তীর্থের সম্মানেই অন্যান্য খেতাবী মহারাজ অপেক্ষা ইহাঁর সম্মান আছে।

বহু পূর্ব্বযুগে অন্ততঃ মহাভারতের যুগেও কাশী-রাজ্যের কতদূর বিস্তৃতি ছিল, ঠিক জানিতে পারা না যাইলেও পূর্ব্বোক্ত চীন-পর্য্যটকদ্বয়ের বর্ণনা হইতে কাশীরাজ্যের পরিধি যে ৬৬৭ মাইল ছিল এবং তাহার রাজধানী বা সহর অনুমান তিন চারি মাইলমাত্র ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইংরাজ-চিহ্নিত জেলা বেনারেস, অধুনা ইউনাইটেড-প্রভিন্সের অন্তর্গত। ইহার উত্তরসীমা জোনপুর জেলা এবং গোমতী নদী, দক্ষিণে মির্জাপুর জেলা এবং কর্ম্মনাশা নদী যাহা বঙ্গ-বিভাগের অন্তর্গত আরা এবং সাহাবাদ জেলা হইতে ইহাকে পৃথক করিতেছে, পূর্ব্বে গাজীপুর জেলা এবং পশ্চিম সীমা এলাহাবাদ ও মির্জাপুর জেলা। এই নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের পরিমাণ সম্ভবতঃ অধিক ছিল, কারণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেকালের পরিমাণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিমান হইতে অনেক বড় ছিল, কিন্তু সেকালের রাজধানী অপেক্ষা বর্ত্তমানের কাশীসহর যে, অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তাহা পূর্ব্বলিখিত পরিমাণ হইতেই জানিতে পারা যায়। এক্ষণে সেই প্রাচীন সহরের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

ফা-হিয়েন সারনাথের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, কাশী সহরের অনুমান দুই মাইলের মধ্যেই উত্তর পশ্চিম কোণে সেই স্তূপ অবস্থিত, এবং হিউয়েন্থ-সাং বলিয়াছেন, কাশীরাজ্যের রাজধানী হইতে কিছু কম দুই মাইলের মধ্যে উত্তর পূর্ব্বদিকে সেই স্তূপ ও মন্দির দেখিয়াছি। এক ব্যক্তি সহরেব উত্তর পশ্চিম এবং অন্য ব্যক্তি সহরের উত্তর পূর্ব্ব বলিয়াছেন; যিনি উত্তর পশ্চিম বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রায় সার্দ্ধদুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি আসিয়াছিলেন, তখন সহর সারনাথ স্তূপের পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—এক্ষনে যথায় রাজঘাট বা কাশী-ষ্টেসন হইয়াছে, সেইস্থান হইতে বরুণার ধারে ধারেই তখন সহর ছিল। কর্ণেল উইলফোর্ডও বলিয়াছেন "the old city of Benares, north of the river Buruna," বরুণার উভয় পার্শ্বেই প্রাচীন সহর অবস্থিত ছিল। (Asiatic Researches, vol. IIX., P. 199.) এখনও দেখিতে পাওয়া যায় বর্ত্তমান সহর হইতে সারনাথের দিকে সকল পথ-ঘাটই প্রাচীন সহর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক-প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। খুবই সম্ভব ফা-হিয়েনের পরিদর্শনের পর—আড়াই শত বৎসরের মধ্যে কোনও দৈব দুর্ঘটনা দ্বারাই হউক বা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দিগের মধ্যে বিরোধ হইয়াই হউক সহরের পূর্ব্ব অংশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

তাহার পর ক্রমে পশ্চিমদিকে নূতন সহরের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। যে সময় হিউয়েন্থ-সাং আসিয়াছিলেন, তিনি সেই নব প্রতিষ্ঠিত সহরই তখন দেখিয়া থাকিবেন এবং সেই কারণ তাহারই উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সারনাথের স্তূপ ও সঙ্ঘারামের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে, বানার নামক একজন মহা প্রতাপান্বিত রাজা কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, (Benares Illustrated.) কেহ কেহ বলেন তাঁহারই নামানুসারে কাশী রাজধানীর নাম 'বানারস' হইয়াছে। সে যাহা হউক তাহার সময়েও যে, সহর রাজঘাট হইতে বরুণার ধারেই ছিল, কাশীর বহু প্রাচীন অধিবাসীর বংশধরের মুখে এ কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। হোসেন-নিজামীর ইতিহাস হইতেও জানিতে পারা যায় যে, ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জয়চাঁদ কাশীর অধীশ্বর ছিলেন, (Murrey's Hand-Book, Bengal. P. 204) তাঁহার দুর্গও রাজঘাটের নিকট ছিল এবং সেই কারণ গঙ্গার ঐ ঘাটটী এখনও রাজ-ঘাট বলিয়া পরিচিত। সেই অট্টালিকা ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা ও ইষ্টক-স্তূপ এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে নিঃসন্দেহেই জানা যাইতেছে যে, রাজঘাট হইতে বরুণার ধারেধারেই কখন পূর্ব্বে এবং কখন বা পশ্চিমে সেই সহর অবস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত আর এক কথা আছে, তাহাতেও সহর যে, ঐ দিকেই ছিল তাহা প্রমাণিত হইবে।

বুদ্ধদেব যখন ভারতের প্রচলিত-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় মত প্রচার করিবার মানসে গয়া হইতে এস্থানে উপস্থিত হন, তখন তিনি যে, সহর ছাড়িয়া বা ভারতের ধর্ম্মচক্র-পরিচালক কাশী-বাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সম্মুখীন না হইয়া দূরে নির্জ্জন পল্লীর মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে তাঁহার গয়া পরিত্যাগ করিবারই বা আবশ্যকতা ছিল কি? তিনি যে, কাশী সহরের অন্তর্গত অথবা তাহারই প্রান্তভাগে নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও বরুণার উত্তর অংশে কাশী রাজ্যের রাজধানী বর্ত্তমান ছিল। এই আধুনিক সহর, বিশ্বনাথের রাজধানী পঞ্চক্রোশী-বারাণসী, তখন নির্জ্জন বা কেবলমাত্র সাধু-সন্ন্যাসী-সেবিত তপোবন-স্বরূপ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞভূমি ও তীর্থরাজরূপে বিরাজিত ছিল। আশ্রম-পীড়াকর ও তপোবিঘ্নকর সহরের সে অবিরাম কোলাহল এখানে আদৌ প্রবেশ করিত না। কাশীরাজ্যের অধিরাজগণও মুনি ঋষি-দিগের শান্তিতে সাধন ভজন করিতে দিবার জন্যই সততঃ দূরে সহর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন। কেবল বিশ্বনাথ-দর্শনাভিলাষী যাত্রীগণ সময় সময় বারাণসী মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বনাথ দর্শন ও সাধুদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন।

এতদ্ব্যতীত যে কোনও প্রাচীন সহর, নগর বা গ্রাম দেখিলেও এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কোন স্থলেই শ্মশান-স্থান গ্রামের মধ্যস্থলে বা তাহার অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট নাই। সকল স্থলেই গ্রাম হইতে বহুদূরে কোন নির্জ্জন নদীতটে অথবা বিশাল প্রান্তরপ্রান্তে শ্মশান দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মহাশ্মশান

মণিকর্ণিকা কিম্বা হরিশ্চন্দ্র-ঘাট কখনই সহরের অন্তর্গত ছিল না। বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গৃহিত হরিশ্চন্দ্র-ঘাটের চিত্র দেখিয়াছি, পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে স্বচক্ষে হরিশ্চন্দ্র-ঘাট দেখিয়াছি, নিকটে তেমন কোনও বাসভবন ছিল না, তখনও শ্মশানের গাম্ভীর্য্য ও ভীষণতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যেই গঙ্গাতীরে দক্ষিণাভিমুখে অসিসঙ্গম-সমীপে এত দ্রুত ঘন-পল্লীরূপে লোকের বসবাস হইতেছে যে, কাশীর ভূমি কলিকাতার ন্যায় দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক এই শ্মশানদ্বয় দেখিয়াও বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এইস্থানে কখনই কোন গৃহী লোক স্ত্রী পুত্র কলত্রাদি লইয়া বাস করিতেন না। বিশেষ শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে যে, বিশ্বনাথের অন্তর্গৃহীক যাত্রার মধ্যে বাস করিতে নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা সত্বেও আজকাল অন্তর্গৃহীর মধ্যেই লোকের বসবাস অধিক—এখন সকলেরই সাধ বিশ্বনাথের নিকট, গঙ্গার নিকট একটী বাড়ী পাইলেই ভাল হয়, তাহা হইলে নিত্য গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন হয়। এই উদ্দেশেই ক্রমে বিশ্বনাথ-সমীপবর্ত্তী স্থানসকল জনতাপূর্ণ হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। এখন কাশীবাসী জনগণ প্রকৃত কাশীর আদিম অধিবাসী নহেন সকলেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে আগমন করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। এবং এক এক প্রান্তীয় হিন্দু পরস্পর আত্মীয়তা-সূত্রে এক এক মহল্লা বা পল্লী করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালীরা বাঙ্গালী টোলা, নেপালীসকল নেপালীখাপরা ও রামঘাট, পাঞ্জাবীরা লহরীটোলা, মহারাষ্ট্রী পঞ্চগঙ্গা ও রামঘাট, মাদ্রাজীরা কেদারঘাট প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই সকল স্থানে এখন প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন আমরা পল্লীবাসী সেই সেই প্রদেশেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যাহা হউক অন্তর্গৃহীকও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকল হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন সময়ে সহর এ স্থানে ছিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গমাতা।

রাগিণী ঝিঁঝিট একতালা।

বড় আশা করে ডেকেছি তোমারে
জীবনের জ্বালা জুড়াতে,
ব্যথিত যে জন ব্যাথার বেদন
হয় নাকো তায় বুঝাতে!
ভাই ভগ্নী সব কাঁদে দেখ ভাই,
কি দিব তাদের, ঘরে অন্ন নাই,
অন্ন জন্য যদি যাই অন্য ঠাঁই
সেও আসে ভাই তাড়াতে।
চেয়ে দেখ ভাই পতিত ধরায়
তৃষ্ণার জ্বালায় বুক ফেটে যায়
বঙ্গের অদৃষ্ট জল কষ্ট হায়
কল্পনা পারে না আঁকাতে।
একিরে দেখিরে মাতা বিবসনা
ফিরে এস আঁখি মেলনা মেলনা

শ্রীযুক্ত বাবু হাসানন্দ বর্ম্মা।

বস্ত্র গরবিণী আজ বস্ত্র হীনা
পারে নাকো তাই দাঁড়াতে।
আনিয়াছি সেই নয়ন আসার
গাঁথিয়াছি তায় সুচিকণ হার
তপ্তশ্বাসটুকু ল'ও সঙ্গে তার
এ বাসনা হবে পুরাতে।

শ্রীবেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এল।

ত্রিরত্ন-বিজয়।

(১৮৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

চতুরা ও প্রবীণ।

মন্ত্রী রাধগুপ্তের বিশাল প্রাসাদের এক নিভৃততম প্রকোষ্ঠে অপরিস্ফুট দীপালোকে বসিয়া একটী স্ত্রীলোক ও স্বয়ং মন্ত্রী ধীরে ধীরে কথোকথন করিতেছেন। স্ত্রীলোকটী বলিতেছে, "মহাশয়,—আপনি কেন অন্যথা ভাবিতেছেন?—নিশ্চিত জানিবেন আগামী কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কুমার অশোক সসৈন্যে নগর প্রবেশ করিবেন, আপনার জীবন সম্পদ্ যশঃ ও অভ্যুদয়ের প্রতি, দৈব একান্ত অনুকূল, তাই সেই অবশ্যম্ভাবি কার্য্যের সহায়তার জন্য ভগবান উপযুক্ত পদে পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি বৃথা চিন্তা করিতেছেন, আমার কথা শুনুন কাজ অনেক, বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না।"

এক দৃষ্টিতে সেই যতিবেশধারিণী ললনার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে মন্ত্রী রাধগুপ্ত এই কথাগুলি শুনিতে ছিলেন। তাহার ললাট-মণ্ডলে চিন্তার গভীর রেখা এবং নয়নযুগলে ভয় ও বিস্ময়ের পরিস্ফুট ভাব, তাঁহার মনের মধ্যে যে ঝড় বহিতেছিল তাহা অতি বিশদ ভাবে বুঝাইতেছিল; রমণীর কথা শেষ হইলে সহসা সেই ব্যক্তপ্রায় মনোভাব গোপন করিয়া দৃঢ়তা ব্যঞ্জক স্বরে তিনি কহিলেন—

"বুদ্ধোপাসিকে!—তুমি উন্মাদিনী হইয়াছ, অথবা কোন ধূর্ত্তের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছ, ভারত সম্রাট সুষীমের সিংহাসন রাজকর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে অধিকার করিবার বাসনা যদি কোন বিদ্রোহী রাজকুমারের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে, তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তাঁহার সে বাসনা তাঁহারই সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, আর তুমি বুদ্ধোপাসিকে, তুমি এই পবিত্র বেশে অঙ্গীকার করিয়া যে মহাপাতকের কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছ, তাহার পারলৌকিক ফল কি হইবে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞগণ বলিতে পারেন, কিন্তু ইহ-লোকে তাহার ফল যে কি ভয়ঙ্কর তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি রমণী বলিয়া যে ক্ষমা পাইবে, আমার তাহা বোধ হয় না, আমি তোমার এই সকল প্রলাপের কথা আর শুনিতে চাহিনা, আমি এখনও তোমায় ছাড়িয়াদিতে প্রস্তুত আছি।"

রাধগুপ্তের এই কয়টী কথা শুনিয়া পদাহত ফণিনীর ন্যায় সেই রমণী গর্জ্জিয়া উঠিল, ক্রোধ-কম্পিত রুক্ষস্বরে সে তখন কহিল;—

"যথেষ্ট হইয়াছে, আর প্রভুভক্তির কথা কহিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। আপনি আমাকে এখনও চিনিতে পারিতেছেন না। আচ্ছা, বেশ কথা, এই পত্রখানি কাহার লিখিত, ভাল করিয়া পাঠ করিয়া

যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন—তাহা সত্বর করুন” এই বলিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া রমণী তাহা মন্ত্রী রাধগুপ্তের সম্মুখে অবজ্ঞার সহিত ফেলিয়া দিল এবং তাঁহার মুখেরদিকে সেই বিশাল ও সমুজ্জ্বল নয়নদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কম্পিতহস্তে পত্রখানি ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিতে করিতে মন্ত্রী রাধগুপ্তের বদনমণ্ডল আরও বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার হস্ত আরও কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার মুখেরদিকে অকম্পিত দৃষ্টিতে পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাবে চাহিয়া সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী বলিল, “এখন কি বলিতে চাহেন মহাশয়! এইপত্রে কাহার হস্তাক্ষর ও মুদ্রা দেখিতে পাইতেছেন।”

“ইহা আমারই হস্তাক্ষর এবং আমারই মুদ্রা ইহাতে অঙ্কিত রহিয়াছে।”

“ইহা কাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল?”—

“ইহা বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্তের নিকটে বারাণসীতে প্রেরিত হইয়াছিল।”

“এই পত্রের মর্ম্মানুসারে দীর্ঘাদ্রি-বিহারে বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী কুমার অশোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎকারের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, ইহা কি আপনার বিদিত হয় নাই?”

“না আমি জানিয়াছি যে, সিংহলেশ্বর-দুহিতার সখী কুন্তলা সেই সময় সেই খানে উপস্থিত ছিলেন, কোন বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার সেস্থানে উপস্থিত থাকিবার কথা আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই।”

“বেশ কথা, অন্য কেহ আপনাকে না জানাইয়া থাকেন, আপনি না হয় আমার কথায় এখন জানিলেন।” এই বলিয়া সেই বৌদ্ধভিক্ষুণী মন্ত্রী কি উত্তর করেন, তাহা শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি বলিলেন, “তোমার কথায় বিশ্বাস করিলাম, এক্ষণে আমার প্রতি কুমার কি আদেশ করিতেছেন, তাহা জানিতে চাহি।”

“আপনার প্রতি আদেশ এই যে, কল্য দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় দুইশত ভিক্ষুর সহিত একজন শ্রমণক আপনার অধিকৃত তোরণ দিয়া নগরে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে লইয়া আপনি প্রাসাদে লইয়া যাইবেন। তাঁহার গতিবিধিতে কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য আপনি এরূপ আদেশ প্রচার করিবেন যে, প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত নগরের কোন ব্যক্তিই আপনার আজ্ঞা ব্যতিরেকে নিজ নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিবেনা; রণ-ক্ষেত্র হইতে সম্রাট এইপ্রকারই আদেশ করিয়াছেন” ইহাও ঘোষণা দ্বারা প্রচার করিতে হইবে।”

“তাহা কি প্রকারে হইবে?—মন্ত্রীগণের সকলের সম্মতি ব্যতিরেকে এপ্রকার আদেশ ঘোষিত হইতে পারেনা।”

“তাহার জন্য চিন্তা কি?—আপনার হস্তে নগর-রক্ষি-সেনা, আপনার ভয় কি? কল্য প্রাতঃকালেই আপনি মন্ত্রী কয়জনকে বিশেষ কার্য্যানুরোধে আপনার বাটীতে আহ্বান করিয়া বন্দী করুন এবং জোর করিয়া তাহাদের নাম স্বাক্ষর করাইয়া ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করুণ।”

“আচ্ছা তাহাই হইবে?—কিন্তু আমার মনে বড়ই একটা সন্দেহ হইতেছে যে, রাজকুমার অশোক নিজে

একজন মহাবীর, মহাবীর কুমার মহেন্দ্রও তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছেন, উভয়ের সঙ্গে অনেক সুশিক্ষিত সৈন্যও আছে এই সকল সত্ত্বেও কেন যে এমন ষড়যন্ত্র করিয়া সিংহাসনারোহণের চেষ্টা হইতেছে বল দেখি, অনায়াসে সম্মুখ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া সিংহাসনারোহণ করিলে কি ক্ষতি ছিল?”

“শ্রমণক উপগুপ্তের ইহা অভিপ্রেত নহে, শোণিতস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত না করিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা তাহার অভিপ্রেত, সেই জন্যই এই সকল ষড়যন্ত্র, নহিলে রাজধানীর ও রাজ্যের যে অবস্থা তাহাতে একটা যুদ্ধকরিয়া সাম্রাজ্য লাভকরা কুমার অশোকের পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।”

“কুমারের আদেশ আমার ক্ষমতানুসারে অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে, আমি পূর্ব্ব হইতেই নগরের মধ্যে দুই দল সেনাকে আমার হস্তগত করিয়াছি, নগর পালও আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা তুমি এক প্রকার নিজে দেখিয়া যাইতেছ, কুমারকে আমার সবিনয় অভিবাদন জানাইয়া এই সকল বিষয় নিবেদন করিও—আরও জানাইও যে, আগামী কল্য তাঁহাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহার আশ্রিত ভৃত্যবর্গ ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছে।”

“আজ্ঞা করুন আমি তবে এক্ষণে বিদায় হই।”

বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীর এই কথা শুনিয়া রাধগুপ্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর একবার সেই বিচিত্র প্রতিভাময়ী ললনারদিকে চাহিয়া একটু ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুন্তলা! তোমার এ বেশ কেন?—

“লজ্জায় কুন্তলার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, ভূমির দিকে মুখ করিয়া কুন্তলা বলিল”—

“অমাত্যমহাশয় এ সকলই ভাগ্যের ফের—রাজকুমারীর যে পর্য্যন্ত কুমারের সহিত বিবাহ না হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত কত বেশ যে আমাকে ধরিতে হইবে, তাহার ঠিক কি!”

“রাজকুমারী কি এখন কুমারের শিবিরে আছেন।”

“না তিনি এখনও শোণভদ্র-বিহারে ভিক্ষুণীগণের সহিত বাস করিতেছেন। কুমারের অভিষেকের পূর্ব্বে তিনি কুমারের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন না, ভগবান্ উপগুপ্ত এই প্রকার আদেশ করিয়াছেন।”

“আর একটী কথা—কুমার কি সত্যই বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন?”—

“বোধ হয়—নহে, তিনি এখনও যে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে কোন একটা স্থির করিয়াছেন—তাহা বোধ হয় না, তবে বৌদ্ধধর্ম্মের উদারভাবে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এই কারণে অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, কুমার বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।”

“আর তোমাকে ধরিয়া রাখিতে চাহি না, যাও কুন্তলে, আশা করি আবার রাজকুমারীর সহিত তোমাকে শীঘ্রই পাটলীপুত্রের রাজান্তঃপুরে দেখিতে পাইব।”

“ভগবান্ করুন তাহাই হউক” এই বলিয়া মন্ত্রী রাধগুপ্তকে অভিবাদন করিয়া কুন্তলা ত্বরিত-গতিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে শিবিকায় আরোহণ করিল এবং জনবিহীন নিঃশব্দ রাজপথের মধ্য দিয়া সেই শিবিকারোহণে অতি সাবধানতার

সহিত নগর পরিত্যাগ করিল। এদিকে রাজমন্ত্রী নিজের পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীসভার আহ্বানের জন্য পত্র লিখিতে বসিলেন।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

দেবতা।

থাক্ বিদ্যা, থাক্ বুদ্ধি, থাক্ ধনমান,
দেবতা-দুর্ল্লভ রূপ থাকুক তাহার;
সেজন যদিবা হয় হৃদয়-বিহীন
দিব তার মনুষ্যত্বে শতেক ধিক্কার।
সম্মুখে উলঙ্গ দৈন্য অভাব খড়্গেতে
সহস্র দীনের প্রাণ বধিবে অকালে;
সে দৃশ্যে যাহার প্রাণ ব্যথিত না হয়—
বিদ্যা বুদ্ধি ধনে মানে কি তা'র গৌরব!
মূর্খ ভাল তা'র চেয়ে নির্ব্বোধ নির্ধন,
পরদুঃখে যদি গলে হৃদয় তাহার;
কুরূপ কুৎসিত হ'ক এ ভুবনে
দীন যদি রক্ষা পায় তাহার সেবায়।
বিমল হৃদয়ে যা'র আছে উদারতা;
হ'ক সে মানব ক্ষুদ্র, তবু সে দেবতা!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

ভাস্কর্য্য।

(১৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

ত্রি-ফলক বিশিষ্ট শূলকে ত্রিশূল বা পিণাক বলে। ইহা শিব-অস্ত্র। ভগবান শিব স্বয়ং ইহা ব্যবহার করিতেন বলিয়া, লোক তাঁহাকে শূলপাণি, পিণাকী, ত্রিশূলী বা ত্রিশূল-পাণি বা ত্রিশূল-ধারী বলিয়া অভিহিত করে। প্রাচীন ভাস্করশিল্পের মধ্যে নানাস্থানে ত্রিশূলের এইরূপ নানা বিধি আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

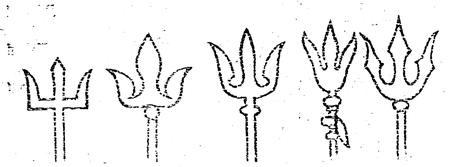

পাশ-অস্ত্র, ইহা যোদ্ধৃপুরুষগণ কক্ষপ্রদেশে রক্ষা করিতেন, ইহা অনতি স্থূল রজ্জুবিশেষমাত্র, আবশ্যক হইলে শত্রুপ্রতি ইহা নিক্ষেপ করতঃ বাঁধিয়া আনিতে পারিতেন। বোধ হয় ইহা বৃহত্তায়তনে ব্যাধের ফাঁসের অনুরূপ হইবে। ধনুর্ব্বেদের মধ্যে নাগ-পাশ, বরুণ-পাশ প্রভৃতি নানাবিধ পাশাস্ত্রের উল্লেখ ও তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্র,—কোন কোন শিখের মস্তকে এই অস্ত্রের আদর্শ দেখা যায়। ইহা লৌহ-নির্ম্মিত একহস্ত পরিমাণ চক্র-বিশেষ, উহার চারি পার্শ্বই ধারাল। শাস্ত্রে ইহার পঞ্চবিধ কার্য্যের বিষয় লিখিত আছে, যথা ভ্রামণ, গ্রন্থন, ক্ষেপণ, কর্ত্তন ও দলিতকরণ। বোধ-হয় দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'সুদর্শন' নামক এইরূপ চক্রই ব্যবহার করিতেন।

গদা,—লৌহময় অষ্টপল-কণ্টক-বিশিষ্ট মুদ্গরের ন্যায় অতি ভয়ানক শস্ত্র। বৈশম্পায়ন-ধনুর্ব্বেদে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। আর্য্যগণ বহু আদিযুগ হইতেই লৌহের ব্যবহার জানিতেন। একথা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, ঋগ্বেদের মধ্যেও লৌহের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। দেবরাজ ইন্দ্র, লৌহাস্ত্র ব্যবহার করিতেন, সেকালেও অশ্বের নাল বাঁধাইতে লৌহের ব্যবহার ছিল। অস্ত্র শস্ত্র লৌহে নির্ম্মিত হইত। মহানুভব 'প্লিনী' বলিয়াছেন—"ইজিপ্সিয়ণ্গণ কঠিনতর বেধ্যযন্ত্র বা 'ড্রিল' ভারতীয় লৌহের দ্বারা নির্ম্মাণ করিতেন।" "পুরুরাজ, মহাবীর আলেকজাণ্ডারকে ৩০ পাঃ (অনুমাণ ১৫ সের) কৃষ্ণ-লৌহ বা ইস্পাত উপহার দিয়াছিলেন। সে সময় ইহা অতি বহুমূল্য-উপহার বলিয়া তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আরব দেশে বহুকাল হইতে একটী প্রবাদ-বচণ আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—'ভারতীয় অসিদ্বারা উহাকে দ্বিখণ্ড কর।' সুতারাং বুঝা যাইতেছে, আর্য্যগণ আদিযুগ হইতেই উৎকৃষ্ণ লৌহ ও লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিতে জানিতেন, কারণ বিশুদ্ধ লৌহই অসি নির্ম্মাণের একমাত্র প্রধান উপাদান।

অসি—প্রাচীন কালে অসি কেবল অষ্টবিধ নামে পরিচিত ছিল ১। অসি, ২। বিশসণ, ৩। খড়্গ, ৪। তীক্ষ্ণবর্ম্মা, ৫। দুরাসদ, ৬। শ্রীগর্ভ, ৭। বিজয়, ৮। ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল। অনন্তর—৯। নিস্ত্রিংশ, ১০। চন্দ্রহাস, ১১। ঋষ্টী ১২। কৌক্ষেয়ক, ১৩। মণ্ডলাগ্র, ১৪। করপাল, ১৫। করবাল, ১৬। তরবার, ১৭। তরবারি, অতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ও বৃহৎভেদে আরও কয়েকটী নাম শাস্ত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতে লৌহবিজ্ঞান।

অসি-নির্ম্মাণোপযোগী লৌহ, সাধারণতঃ দুই প্রকার—নিরঙ্গ ও সাঙ্গ। ইহার আরও বহু অনুবিভাগ আছে। খড়্গাদি শস্ত্রসমূহ সেকালে সাঙ্গ লৌহেই নির্ম্মিত হইত। ইহা আবার গুণানুসারে দশবিধ অনুবিভাগে বিভক্ত।

১। রোহিণী—এই লৌহ ভাঙ্গিলে ক্ষুদ্র কঙ্করের ন্যায় ঈষৎ নীল আভাযুক্ত দানা দেখিতে পাওয়া যায়। এই লৌহ অত্যন্ত দৃঢ়। ইহাদ্বারা নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রে দেহ ক্ষত হইলে, তাহার বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

২। নীলপিণ্ড—ইহার দানাগুলি ঘোর নীলবর্ণ।

৩। ময়ূরগ্রৈবক—যে লৌহের অঙ্গ ময়ূরের গ্রীবার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

৪। নাগকেশর পুষ্পের আভার ন্যায় যে লৌহের বর্ণ, তাহাকে 'ময়ূরবজ্রক' বলিত।

৫। যে লৌহের অঙ্গ তিত্তির-পক্ষীর পক্ষের ন্যায়, তাহার নাম 'তিত্তিরাঙ্গ' লৌহ। ইহা অতি মূল্যবান্ ও দুর্ল্লভ। ইহা সুপাকজম্, অর্থাৎ সুবিজ্ঞ কর্ম্মকার কর্ত্তৃক অতি সাবধানে ইহা প্রস্তুত হইত। এই লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট ও উত্তম গুণ-সম্পন্ন হইত।

৬। সুবর্ণ-জ্রক—এই লৌহের অঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় আভা বিশিষ্ট। ইহাও অত্যন্ত মূল্যবান্ ও সদ্গুণ সম্পন্ন লৌহ।

৭। যে লৌহের গাত্রে অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁইসের ন্যায় দাগ থাকে এবং পালিস করিলে

দুর্ব্বাদলের ন্যায় আভা বাহির হয়, তাহারই নাম 'শৈবলমালান'।

৮। যে লৌহ উভয় পার্শ্ব শ্বেতাভাবিশিষ্ট এবং মধ্যে স্বর্ণ-রেখাযুক্ত তাহাকে 'মৌশলবজ্রক' বলিত, এই লৌহে নির্ম্মিত অস্ত্রদ্বারা আঘাত-প্রাপ্ত স্থান ধূম্রবৎ হইয়া যায়।

৯। কঙ্গোলবজ্রক বা স্বর্ণক—এই লৌহ ভাঙ্গিলে মৃণাল-দণ্ডের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট দেখা যায়।

১০। যে লৌহের সর্ব্বাঙ্গ গ্রন্থিল অর্থাৎ অনেক স্থানে গাঁইট আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহারই নাম ,গ্রন্থিবজ্রক।' ইহাও অতি মূল্যবান ও দুর্ল্লভ।

নিরঙ্গ লৌহেরও অনেক বিভাগ আছে। "লৌহার্ণব" নামক গ্রন্থে এ সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে। এ লৌহেও অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত আজকাল বিলাতি লৌহে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, সেই কারণ দেশীয় পূর্ব্বোক্ত কষ্টলভ্য বহুমূল্য লৌহের আর প্রচলন নাই। ক্রমে তাহাদের নাম, রূপ ও গুণাগুণ সমস্তই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এখন সামান্য পিরেকটী পর্য্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আইসে, সেই কারণ তাহার আর প্রয়োজন মনে হয় না, কিন্তু পূর্ব্বে এইরূপ ছিল না। পূর্ব্বে কোথায় উৎকৃষ্ট লৌহের আকর আছে, কি প্রকারে সেই লৌহ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার বিশেষ রূপ অনুসন্ধান হইত ও পরীক্ষা হইত। তাহারই ফলে ভারতবর্ষে সেই প্রাচীন যুগে যেরূপ উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইত পৃথিবীর আর কোনও দেশে সেরূপ হইত না। সেই কারণ ইস্পাহান ও দামাস্কস আদি প্রধান প্রধান নগরের জগৎ বিখ্যাত অস্ত্র-শস্ত্র এ দেশীয় ইস্পাতে তখন প্রস্তুত হইত। পারস্য ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশের মহাজনেরা এখান হইতে ইস্পাত ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। সে সময়ে বেরার ও মহীশূর ইস্পাতের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। য়ুরোপ হইতেও মহাজনেরা ভারতীয় ইস্পাত লইয়া যাইতেন। মাদ্রাজ হইতেই সেই সকল ইস্পাত তাঁহারা অধিক ক্রয় করিতেন। মাদ্রাজী তেলুগু ভাষায় ইস্পাতকে 'উট্‌জ' বলে। সেই কারণ ভারতীয় ইস্পাতকে য়ুরোপীয়েরা 'উট্‌জ' বলিয়াই জানিতেন। কেবল যে মাদ্রাজেই ইস্পাত হইত, তাহা নহে। রাণীগঞ্জ, বীরভূম, বালেশ্বর, বালীয়া, নারায়ণপুর, দেওচা, দুমকা ও গণপুর আদি ভারতের নানা স্থানে লৌহের ভাঁটি ছিল। সেই প্রাচীন কাল হইতে মোসলমান-আধিপত্যপর্য্যন্ত, এমন কি এই ইংরাজাধিকারস্থিত কলিকাতার বাজারেও সেই লৌহের যথেষ্ট আমদানি হইত। বীরভূমেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লৌহ বাহির হইত। এমন কি এই জেলার পশ্চিম অংশ লেহামহল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তবে বীরভূম অপেক্ষা বালেশ্বরের লৌহ উৎকৃষ্ট ছিল। ইংরাজগণ তাহা প্রতি মণ ৬৷৷ টাকা হিসাবে খরিদ করিতেন। কিন্তু বীরভূমের লৌহ তখন প্রতি মণ ৫৲ টাকায় বিক্রয় হইত। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ডাঃ ওল্ডহাম সাহেবের হিসাব হইতে জানিতে পারা যায়, এই সকল ভাঁটি হইতে তখনও প্রতি বৎসর পঞ্চাশ সহস্র মণ লৌহ নিষ্কৃত হইত। আসাম অঞ্চলেও সেকালে অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত। তিরুগ্রাম ও হাথিগড়ের নিকট প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তি এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দিন-যাপন করিত। এই লৌহেই বড় বড় কামান প্রস্তুত হইত। দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও আসামের

বড় বড় কামান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। 'কর্ণেল হ্যান' সাহেব রঙ্গপুর-দুর্গে একটী প্রাচীন দ্বাদশ হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ্য কামান দেখিয়াছিলেন, ব্রহ্মবাসীগণ আসাম আক্রমণ করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিবার কারণ সেই লৌহ-নিষ্কাষণ-কার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খাসিয় পর্ব্বতে পাণ্ডুয়া নামক স্থানে বালুকাকণাস্থ লৌহকণা জলে গুলিয়া স্বর্ণ-রেণুবৎ ভাটিতে পোড়াইয়া ইহা বাহির হইত। চেরাপুঞ্জি হইতে প্রায় নয় দশ ক্রোশ দূরে অনেক লৌহের আকর আছে। পূর্ব্বে এখান হইতেও অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত, কিন্তু বিলাতি সুলভ লোহার আমদানিতে এ সকলের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

দুঃখের বিষয় অধুনা সেরূপ উৎকৃষ্ট লৌহ আর দেখিতেই পাওয়া যায় না। বোধ হয় অনেকেই পুরাতন দিল্লী বা ইন্দ্রপ্রস্থের সেই অদ্ভুত লৌহস্তম্ভের বিষয় অবগত আছেন। তাহা পাণ্ডবদিগের বিজয়স্তম্ভ বলিয়া এ দেশের সকলেই জানেন, তাহা প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের সেই সাধারণ 'কাট ছাট দেওয়া' যুক্তি অনুসারেও দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা ধরিলেও এই দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া সেই লোহার স্তম্ভটী রৌদ্র, জল, ঝড় ও বৃষ্টিরাশি মাথায় করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় উহার কোন স্থানে এক বিন্দুও মরিচা ধরে নাই। বায়ুমণ্ডলস্থিত অক্সিজেন, লৌহ পাইবামাত্রই মিশিয়া যে যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে, তাহারই নাম মরিচা। এই দেড় হাজার বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল ধরিয়া সেই অক্সিজেন ক্রমাগত এই স্তম্ভের সহিত মিশিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই এক কণা মাত্রও তাহাতে স্পর্শ করিতে পারে নাই। য়ুরোপীয়েরা প্রথম প্রথম এটী যে লৌহনির্ম্মিত, তাহা বুঝিতেই পারেন নাই, কোন মিশ্রিত-ধাতু বলিয়াই স্থির করেন। পরে কানিংহাম সাহেব ইহা হইতে এক 'টুকরা' কাটীয়া রুড়্‌কি-ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে, আর এক খণ্ড বিলাতে পরীক্ষার্থে পাঠান। পরীক্ষাফলে ইহা বিশুদ্ধ লৌহ বলিয়া স্থির হইয়াছে। মরিচা ধরে না, এরূপ বৃহৎ লৌহস্তম্ভ কিরূপে প্রস্তুত হইল, তাহা তাঁহারা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন! স্বাভাবিক বিশুদ্ধ লৌহ বড় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল স্থানেই অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ লৌহের সহিত মিশ্রিত থাকে। কর্ম্মকারগণ তাহাই বিশুদ্ধ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লয়।

সাধারণতঃ লৌহময় পাথর ও কঙ্কর হইতেই লৌহ বহির হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ নহে। খুব বিশুদ্ধ লৌহ এ পর্য্যন্ত য়ুরোপে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে শতকরা ৮০।৮৫ ভাগের অধিক লৌহ দেখিতে পান নাই, তবে কেহ কেহ বলেন, উরল পর্ব্বতের কোন কোন স্থলে ও আমেরিকার কোথাও কোথাও অল্প পরিমাণে বিশুদ্ধ লৌহ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও কোন লৌহে শতকরা ৯২ ভাগ লৌহ, ৬ ভাগ সীসক ও ২ ভাগ তাম্র, আবার কোন লৌহে ৬ ভাগ কার্ব্বণ ও ২ ভাগ অন্যান্য বস্তু এবং অবশিষ্ট বিশুদ্ধ লৌহ দেখা গিয়াছে; কিন্তু আকাশ হইতে যে উল্কাপাৎ হয়, তাহাতেই এরূপ বিশুদ্ধ লৌহ অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উল্কা, দুই

প্রকার; এক লৌহময়, অন্য প্রস্তরময়। লৌহময় উল্কা-প্রস্তরে শতকরা ৮০ হইতে ৯৫ ভাগ পর্য্যন্ত লৌহ দেখা গিয়াছে। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে 'ডন রুচিন নেসেলিম' নামক এক ব্যক্তি ৪২০ মণ ওজনের একটী উল্কা পাথর দেখিয়া ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে সুইডেন দেশের লোকে গ্রীনলণ্ডের তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে যাইয়া অন্যান্য সামগ্রীর সহিত ২০ খানি উল্কা-পাথরও আনিয়া ছিলেন, তাহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার ওজন ৫৮৮ মণ। ইহা এক্ষনে সুইডেনের ষ্টকহলম নগরে আছে। আমাদের কলিকাতা মিউজিয়মে সংগ্রীহিত উল্কাপাথরের সর্ব্বাপেক্ষা বড়টী ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে মাদ্রাজ প্রদেশের মাদুরা জেলায় পরনালী নামক গ্রামে পড়িয়াছিল। শতাধিক বর্ষের পূর্ব্বেও পতিত অনেক উল্কাপাথর এখানে সংগৃহীত আছে।

পারসিক ভাষায় বাদসাহ জাহাঙ্গিরের লিখিত একখানি পুস্তক আছে। তাহাতে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত একটী বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে "১০৩০ হিজরী সালে (অর্থাৎ ১৬২১ খৃঃ অব্দে) ফরওয়ার্দিন মাসের ৩০শে তারিখে প্রাতঃকালে জলন্দর পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রামে একটী উল্কাপাৎ হয়। তাহাতে চতুর্দ্দিকে প্রায় ২৫ হাত ভূমিখণ্ড একেবারে ঝলসিয়া যায়। সেই মৃত্তিকা খনন করিয়া সেই উত্তপ্ত উল্কা-লৌহ বাহির করা হইলে বাদসাহ আপনার সম্মুখে তাহা ১৬০ তোলা ওজন করাইয়া ছিলেন। পরে তাহাতে এক চতুর্থাংশ মাত্র আকরিক লৌহ * মিশ্রিত করিয়া দুইখানি তলোয়ার—একখানি ছোরা ও একখানি ছুরি প্রস্তুত হইল। বাদসাহ স্বহস্তে তাহার পরিক্ষা করিয়া দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "তাহা দক্ষিণ দেশের আলমাসি তলোয়ারের ন্যায় উভয়দিক ধরিয়া সুয়াইয়া দিলে সুয়িয়া যাইত আবার ছাড়িয়া দিলে সোজা হইয়া যাইত। খুব উৎকৃষ্ট তলোয়ারে যেমন কাটে এই তলোয়ারেও ঠিক সেইরূপ কাটে।"

সিঁধল চোরের সিঁধকাটি যন্ত্র বজ্রের লোহায় প্রস্তুত হয় এইরূপ প্রবাদ আছে, তাহা হয়ত এই উল্কা প্রস্তরজাত লৌহেই প্রস্তুত হইত।

যাহা হউক এ লৌহ সদাসর্ব্বদা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়াই বোধ হয় কেহ ইহার সাধারণ ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য পাথর অপেক্ষা চুম্বক পাথরে লৌহ যথেষ্ট পরিমাণ আছে। ইহাতে শতকরা ৭২ ভাগ লৌহ এবং ২৮ ভাগ অক্সিজন আছে। চুম্বক আর কিছুই নয়, বিশুদ্ধ লৌহ ও অক্সিজনের কেবল যৌগিক সমাবেশ মাত্র। কখন কখন ইহার সহিত মাঙ্গানিস্, আলুমেনিয়ম, ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম, গন্ধক ও ফস্ফারাস আদি অন্যান্য দ্রব্যও মিশ্রিত থাকে। পৃথিবীর উত্তর মেরু হইতে সমস্ত উত্তরাংশেই ইহার আকর অধিক। সেই কারণ দিগ্‌নিরূপণ কম্পাসের কাঁটা সততই উত্তরদিকে আকর্ষিত হইয়া বা ঘুরিয়া থাকে। নরওয়ে, রুষ, সুইডেন, সাইবিরিয়া ও উত্তর আমেরিকায় ইহা রাশি রাশি পড়িয়া রহিয়াছে। সুইডেন দেশে শত হস্ত দীর্ঘ্য শত হস্ত প্রস্থ ও তিনশত পঞ্চাশ হস্ত গভীর একটী গহ্বর করিয়া তাহা হইতে চুম্বক পাথর তুলিয়া লৌহ প্রস্তুত করিয়াছে। এই লোহা ইংলণ্ডে আমদানি হয়—সেখানের কর্ম্মকারগণ তাহা হইতেই ইস্পাত প্রস্তুত করে। ভারতেও এই লৌহ এখন প্রচুর আমদানি হয়—ইহাকেই সুইডিস্ বা সুইলিস্ লোহা বলে। ভারতের নানাস্থানে চুম্বক পাথর আছে, মাদ্রাজ প্রদেশের সালেম জেলায় ইহার প্রকাণ্ড আকর রহিয়াছে। সেস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সমূহের চুড়াগুলি চুম্বক পাথরে পরিপূর্ণ। কোটি কোটি মণ চুম্বক পাথর এখনও তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। প্রাচীনকালে তাহা হইতেই লৌহ উদ্ধৃত হইত। এক্ষণে কাষ্ঠ ও কয়লার অভাবে এবং বিলাতি বাণিজ্যের অপ্রতিহত প্রভাবে তাহার কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সুকুলার-লৌহ নামক আর এক প্রকার প্রস্তর আছে, তাহাও উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহাতে শতকরা ৭০ ভাগ লৌহ এবং ৩০ ভাগ অক্সিজন থাকে। এগুলি দেখিতে বিশুদ্ধ পাথরের ন্যায় উজ্জ্বল। ভূমধ্য-সাগরে এল্বা নামক যে দ্বীপ আছে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই তথায় উক্ত প্রস্তর হইতে লৌহ নিস্কৃত হইতেছে। এ লৌহও উৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

*এই লৌহে প্রথমে আকরকি লৌহ না মিশাইয়া অস্ত্র গড়া যায় নাই। খুব পাকা ইস্পাতের ন্যায় ঘা দিলেই চুর হইয়া যাইতে লাগিল।

উমাশশী।

আকুল ভক্তের নেত্রে কি প্রীতি জাগায়ে,
দেখা দিলে জ্যোতির্ম্ময়ি, আজিকে তাহায়,
বিশ্ব-বিমোহিনী বেশে ; চরণ ধরিয়ে
কাঁদিয়ে, নিখিল বিশ্ব বেদনা জানায়—
'পূর্ণ-কর মোরে তুমি থেকনাক ভুলে'
অয়ি রাজরাজেশ্বরি! জগত শোভনা!
ভক্তি-অর্ঘ্য ধৌত করি নয়ন-সলিলে
রাতুল চরণে দিব, জীবন-সাধনা!
আত্ম হারা মহাকালে চৈতন্য দানিতে
সাজিয়াছ শুভঙ্করী-সোনার-তাপসী
পদতলে কিন্তু বিশ্ব তোমারে জাগাতে
ডাকিতেছে অবিশ্রাম-কাঁদে অহর্নিশি।
অবনীতে বিধাতার তুমি শ্রেষ্ঠ দান,
এস, এস, আঁখি অগ্রে তৃপ্ত হো'ক প্রাণ।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পেশাওয়ারস্থ বৌদ্ধ মন্দির।

প্রায় একাদশ-শত বৎসর পূর্ব্বে ভুবন-বিখ্যাত চৈণিক পরিব্রাজক সুপণ্ডিত হিয়ন্থসাং সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যে অপূর্ব্ব ও অমর পরিব্রজন-বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিয়া জগতের পরমোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, সেই বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় গ্রন্থের একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন "আমি আমার সুদীর্ঘ-কালব্যাপী ভ্রমণকালে সিন্ধুনদ-পারে ভারত প্রান্তে যে অদ্ভুত বৌদ্ধমন্দির দর্শন করিয়াছি, তত্তুল্য বৃহদাকার ও সুন্দরতর বৌদ্ধমন্দির আর কোথাও দেখি নাই। এই মন্দিরাভ্যন্তরে পূজনীয় বুদ্ধদেবের মৃত দেহের ভস্ম রক্ষিত আছে।" হিয়ন্থ

সাং মহোদয় "ভারতপ্রান্ত" শব্দে যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রাচীন ও আধুনিক ভৌগলিক ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিলে, ঐ স্থানকে বর্ত্তমান পেশাওয়ার বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ হইতে আফ্‌গানিস্থান, বেলুচীস্থান, গজ্‌নী, বোগ্‌দাদ্‌ ও রসিয়ার সীমা পর্য্যন্ত, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী-জনগণের বসতি ছিল এবং হিন্দু রাজন্যগণ এই সকল দেশ শাসন করিতেন। তখন পেশাওয়ার প্রদেশের কি নাম ছিল, তাহা আমরা অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু হিয়ুন্থসাংবর্ণিত সুবৃহৎ বৌদ্ধমন্দির সম্প্রতি পেশাওয়ারে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই অপূর্ব্ব মন্দিরের কথঞ্চিৎ বৃত্তান্ত প্রদান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, কোন অলস বা নিরুদ্যম ভারতবাসীকর্ত্তৃক এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার-ক্রিয়া সাধিত হয় নাই; সরস্বতীর বরপুত্র স্বরূপ, নব নব জ্ঞানের নিত্যালোচক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ইয়ুরোপীয় পুরুষগণকর্ত্তৃক এই সুবৃহৎ, সুন্দর ও প্রাচীন মন্দির অতি অল্প দিবসমাত্র হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অভিনব আবিষ্কারের জন্য আমরা ইংরাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিয়া তাঁহাদের অমিত পরিশ্রম-পরায়ণতা, অদম্য উৎসাহ, তীব্র অনুসন্ধিৎসা এবং বিদ্যাচর্চ্চা গুণের সদত প্রশংসা করিতে থাকিব!

প্রায় পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ফরাসী দেশস্থ সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও পরিব্রাজক মুসো কুশার, যখন ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন পেশাওয়ার হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে দুই স্থানে দুইটা পর্ব্বতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন প্রস্তররাশিদ্বারা আবৃত স্তূপ দেখিতে পান। ফরাসী ভ্রমণকারীর নিকট তখন দুই একজন মাত্র অনুচর ছিল, অধিক লোক ছিল না; বিশেষতঃ তাঁহার সহিত খনন করিবার কোন যন্ত্র না থাকায়, তিনি ভারতবর্ষীয় আর্কিয়লজিকাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠান যে, "আমার বোধ হয়, এই স্তূপের মধ্যে কোন লুক্কায়িত মন্দিরাদি থাকিতে পারে।" অনেক বর্ষ পরে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯০৭ অব্দে, আর্কিয়লজিকাল বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ মিষ্টার মার্শাল ও তৎসহ ডাক্তার স্পুনার সাহেব, শীত ঋতুতে ঐ স্থান খনন করিতে আরম্ভ করেন। খননের পরে যে সকল অপূর্ব্ব জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, পাঠকদিগের কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য আমি সংক্ষেপে ক্রমে ক্রমে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, বর্ত্তমান কালে পেশাওয়ার প্রদেশ মুসলমানগণকর্ত্তৃক নিবসিত এবং মুসলমান-জাতি ও মুসলমান-ধর্ম্ম এস্থানে অতীব প্রবল। একদা এই সমস্ত দেশ আর্য্য হিন্দুসন্তানের বসতিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। তখন অগণ্য হিন্দু-দেব-মন্দির ও বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মন্দির এই সকল স্থানকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া রাখিয়াছিল। সুলতান মামুদ নামক দুর্বৃত্ত যবন এরং তাহার পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী বহুসংখ্যক নির্দ্দয় ম্লেচ্ছ দস্যু-দলপতি, ভারত প্রান্তস্থ হিন্দু-প্রদেশসমূহের অগণ্য মন্দির, পাঠাগার, বাসগৃহ, ধনাগার, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি ধ্বংসকারির অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও অমানুসীকতার চরম-দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছে।

প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে গৌতম-বুদ্ধের মৃতদেহের ভস্ম রক্ষা করিয়া প্রাচীন কালের প্রখ্যাত শ্রাবকেরা

যে পর্ব্বত-গাত্রের গহ্বরে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতমালার একদেশ পেশাওয়ারে অবস্থিত। ঐ পাত্রে 'কণিষ্ক' নামক রাজার নামাঙ্কিত মোহরের "ছাপ" অদ্য পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। যিশুখৃষ্ট যখন আবির্ভূত হয়েন, কণিষ্ক সম্রাট তখন পেশাওয়ার অঞ্চলে শাসন করিতেন। পরিব্রাজক হিয়ুন্থ সাংবর্ণিত বস্তুসমূহের চিহ্ন ও স্থানের সীমা, এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। উপরিউক্ত সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজককর্ত্তৃক বিবৃত মন্দির, পাঠাগার, গ্রন্থাগার প্রভৃতি যে সকল অট্টালিকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও ক্রমে ক্রমে পেশাওয়ারে আবিষ্কৃত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে। হিয়ুন্থ সাংএর ভুবনবিখ্যাত গ্রন্থে লিখিত আছে, গৌতম-বুদ্ধ-দেবের ভস্মপাত্র কুরুষপুরের পূর্ব্বদিকে রক্ষিত আছে। এই কুরুষপুর, ক্ষণিক বা কনিষ্য সম্রাটের রাজধানী। পেশাওয়ারের অতি অল্প দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে কুরুষপুর অবস্থিত, অদ্যাপি ঐ নামে ঐ স্থান অভিহিত হইয়া থাকে। খনন করিবার সময়, সর্ব্ব প্রথম কয়েকটা সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তদন্তর অনেক নিম্ন স্থান খনন করিতে করিতে ২৮৫ ফিট উচ্চ এক মন্দির পরিদৃষ্ট হয়। ইহার চারি পার্শ্বে বৃহদাকার স্তম্ভমালা দণ্ডায়মান এবং সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভের শিখরদেশ এত উচ্চ যে, ভূতল হইতে তাহা পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না। কোরিন্থ দেশের মাটির মত এক প্রকার কঠিন মৃত্তিকাদ্বারা স্তম্ভ সমূহের তলদেশ সুদৃঢ়রূপে বাঁধান এবং মন্দিরের চারিপার্শ্বেও তাহা সুন্দররূপে বিস্তৃত দেখা গিয়াছিল। ইহার ধারে ধারে বহুসংখ্যক ছোট বড় ভোজন পাত্র অবস্থিত। কোন কোন "বাসনে" বৌদ্ধদিগের প্রাচীন খরোশী ভাষার অক্ষরে নাম ও শ্লোক খোদিত আছে। কিন্তু তাহা পড়িয়া উঠা দুষ্কর। ঐ প্রাচীন ভাষা এখন কথনীয় ভাষা বলিয়া গণ্য নহে। লিখন-ক্রিয়াতেও উহা কোথাও ব্যবহৃত হয় না। মন্দিরের নীচে সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী, এই সোপানশ্রেণী দিয়া গৌতমবুদ্ধ-মন্দিরে উঠিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে হয়। মন্দিরের ছাদের অনেকাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; প্রাচীরসমূহ সর্ব্বস্থানে প্রাচীনাবস্থায় অবস্থিত নাই। এই মন্দিরের ভিতর এক বৃহৎ পাত্রে গৌতম-বুদ্ধ-দেবের পবিত্র মৃত দেহের ভস্ম রক্ষিত আছে। পিত্তল ধাতুর একটা বড় বাক্সে ঐ পাত্র রক্ষিত ছিল। এই বাক্সে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র দেখা যায়; দুই এক স্থানে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হইয়াছে। ঐ বাক্সের আকার ফুটন্ত পদ্ম ফুলের ন্যায়, তাহা দেখিতে অতীব সুন্দর। বাক্সের শিল্পচাতুর্য্য অতিশয় মনোহর। বাক্সের উপরে ধ্যানমগ্ন বোধিসত্বের প্রস্তর-মূর্ত্তি অদ্যাপি অভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। মূর্ত্তির এক পার্শ্বে ইন্দ্র, আর একপার্শ্বে ব্রহ্মার মূর্ত্তি। ইহাঁদের পদতলে ক্ষোরীশী ভাষায় নিম্ন লিখিত কথা গুলি খোদিত আছে "সর্ব্বস্ববাদীর গুরু ও শিক্ষকগণকে প্রণাম করি।" বাক্সের এক পার্শ্বে রাজহংসের মূর্ত্তি, আর একপার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত বিবিধ পুষ্পমালা। সমুদয়ই সুন্দর। যেখানে রাজহংস মূর্ত্তি আছে, সেখানে অনেক কবিতা খোদিত দেখা যায়; তাহাদের অক্ষর পরিষ্কার রূপে পাঠ করা যায় না, কিন্তু সম্রাট কণিষ্কের নাম অনেকবার উল্লিখিত থাকায় ইহা অদ্যাপি নিঃসন্দেহরূপে পঠিত হইতেছে। সম্রাটের

সমসাময়িক মুদ্রাও দুই একটা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রা যেখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহার অতি নিকটে অনেকগুলি ছোট বড় মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক স্থানের ছবি দেখিলে বোধ হয় যেন, বুদ্ধদেব শিষ্যবর্গকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান-পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেছেন। আবিষ্কারক সাহেবেরা অনুমান করেন, পেশাওয়ারের বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ কালে গ্রীশদেশীয় কোন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ভারতবর্ষে উপস্থিত থাকিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণে মিস্ত্রিরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। এক স্থানে এই কয়েকটি কথা খোদিত আছে—"এই মন্দিরের নাম সুগরমা। রাজা কণিষ্কের ইহা সমসাময়িক। মহা-সেন নামে এই স্থান পবিত্র। এই বৌদ্ধ বিহারের প্রধান মিস্ত্রি আগীসালিয়স্।" প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, আগীসালিয়স্, গ্রীশ দেশীয় জনৈকপুরু-ষের নাম হইবে। সাহেবেরা ইহাও কহিতেছেন যে, পেশাওয়ারের এই মন্দির ও তৎসম্পর্কীয় অপরাপর দেবালয়, স্তম্ভ ও জিনিষাদিতে "গান্ধার" শিল্পের কার্য্য দেখা যায়। আফগানিস্থানান্তর্গত বর্ত্তমান কান্দাহার নগরের প্রাচীন হিন্দু নাম গান্ধার। বোধ হয় হিন্দু রাজত্বসময়ে গান্ধার নগর শিল্প ও শিল্পি-গণের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, সেই পুরাতন গান্ধারী-হিন্দু-শিল্পিগণ এই সকল জিনিষের কারুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই অভিনব আবিষ্কারে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক-তত্ত্ব অবগত হইবার আশা রাখি, পেশাওয়ারের এই মন্দির যেমন প্রাচীন, প্রয়ো-জনীয় ও পবিত্র, তেমনি অতীব সুন্দর এবং শিল্প-চাতুর্য্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা দর্শনের যোগ্য। ভারতের কত স্থানে এই প্রকার কত শত মন্দির লুকাইত আছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবাদ।

(১৯৬পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

"সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্।
হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্যতু।"

চঃ সূঃ ১অঃ।

সামান্য সর্ব্বকালে (নিত্যগ ও আবস্থিক) দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের বৃদ্ধির প্রতি হেতু অর্থাৎ প্রয়োজক। বিশেষ ও পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকালে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের হ্রাসের প্রতি হেতু। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মের মধ্যে যেটী যাহার সমান—তাহাদের উভয়ের প্রবৃত্তি (মিলন) সামান্য; এবং সেই সামান্যই বৃদ্ধিকারণ বলিয়া মহর্ষি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্রূপ যেটী যাহা হইতে পৃথক তদুভয়ের মিলনই বিশেষ, এবং সেই বিশেষই হ্রাসহেতু। যেমন কোন স্থানে পাঁচটী ব্রাহ্মণ উপ-স্থিত আছেন; পরে তথায় আর একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, তখন ব্রাহ্মণত্বরূপ সামান্য তাঁহাদের বৃদ্ধির কারণ হইয়া ছয়জন ব্রাহ্মণে পরিণত হইল। সেইরূপ যদি তথায় একটী ক্ষত্রিয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে ক্ষত্রিয়ত্বরূপ বিশেষ তাঁহাদের বৃদ্ধির প্রতি কারণ হইল না; কিন্তু পূর্ব্ব-বৎ পাঁচটী ব্রাহ্মণ এবং একটী ক্ষত্রিয় এইরূপে ছয়-

জন পুরুষ হইলেও, ক্ষত্রিয়ত্বরূপ বিশেষ হ্রাসেরই কারণ হইল।

পূর্ব্বে সামান্যকে নিত্যগ ও আবস্থিক এই উভয় কালেই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মের বৃদ্ধির কারণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে নিত্যগ ও আবস্থিক উভয় কালেরই উদাহরণ পৃথগ্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

যথা—"নিত্যগে কালে দুগ্ধপলং জলপলং বর্দ্ধয়তি দ্রবাদিসামান্যেন পরিমাণতঃ।" নিত্যগকালে এক-পল দুগ্ধ একপল জলকে দ্রবাদি সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা পরিমাণে বৃদ্ধি করে। কিন্তু পারদপল জলপলকে বিশেষত্ব হেতু বৃদ্ধি করিতে পারে না; কারণ পারদ ও জল উভয়ের দ্রবত্বরূপ ধর্ম্ম এক হইলেও—পারদের বলবান তীক্ষ্ণত্ব ও মৃদুত্বাদিরূপ ধর্ম্ম বিশেষ জলের দ্রবত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মকে পৃথক করিতেছে।

"আবস্থিকেতু—কালেপ্যেবং শ্লেষ্মগুণ সমং দুগ্ধং কণাশুণ্ঠ্যাদ্যাক্ষ দ্রব্য সংস্কৃত মবস্থান্তর মাপন্নংকফং হ্রাসয়তি নতু গুণসামান্যেন বর্দ্ধয়তি অবজয়াৎ।" তদ্রূপ আবস্থিক কালে শ্লেষ্ম সমগুণ দুগ্ধ—পিপুল, শুঁঠ ইত্যাদি উষ্ণদ্রব্য দ্বারা সংস্কৃত হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে কফকে হ্রাস করিয়াই থাকে। কিন্তু গুণ-সামান্য তাহার বৃদ্ধির কারণ হয় না।

'সামান্যমেকত্ব করং বিশেষস্তু পৃথক্ত্ব কৃৎ।"

চঃ সূঃ ১অঃ।

যে হেতু সামান্য নিত্যগ ও আবস্থিক কালে সমস্ত ভাবের (দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম) একত্ব কর; অর্থাৎ মিলনদ্বারা একীভাব করে বলিয়া তাহাদের বৃদ্ধির কারণ হয়। তদ্রূপ বিশেষ পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বকালেই পার্থক্য জন্মায়। যেমন পারদ ও জল। পারদ ও জল মিলন দ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হয় না বলিয়া বর্দ্ধিত হয় না।

"তুল্যার্থতা হিসামান্যং বিশেষস্তু বিপর্য্যয়ঃ।"

চঃ সূঃ ১অঃ।

কার্য্যভূত ও কারণভূত বস্তু যাহাদের তুল্য, সেই সমস্ত বস্তুই তাহাদের সমান এবং তাহাই সামান্য। অর্থাৎ যাহা একার্থতা প্রতিপাদক ও সমান জাতী-য়ের বৃদ্ধির কারণ তাহাই সামান্য। যেমন পুরুষের পুরুষোৎপাদক বস্তু—সত্ব, আত্মা ও শরীর তুল্য। সেই সামান্য চতুর্ব্বিধ। দ্রব্যভূত, গুণভূত, কার্য্যভূত ও সমবায়ভূত।

পুরুষের পুরুষোৎপাদক বস্তু সত্ব, আত্মা ও শরীর তুল্য, সেই ত্রিবিধবস্তুই দ্রব্যভূত সামান্য; সেই পুরুষে যে কৃষ্ণাদিগুণ তাহা গুণভূত সামান্য। তাহাতে যে গমনাদিরূপ কর্ম্ম তাহা কর্ম্মভূত সামান্য; এবং তাহাতে সৎরূপে যে সত্বা বর্ত্তমান তাহাই সমান প্রসবাত্মক সমবায়ভূত সামান্য।

কার্য্যভূত ও কারণভূত বস্তু যাহাদের অসমান সেই সমস্ত বস্তু তাহাদের বিপর্য্যয়—বিশেষ। অর্থাৎ যাহা পার্থক্যবোধের জ্ঞাপক ও অতুল্যার্থপ্রতিপাদক তাহাই বিশেষ। যেমন গোত্ব ও গজত্ব।

এই সামান্য, বিশেষ অথবা কার্য্যভূত ও কারণ-ভূত বস্তুর আধিক্য এবং ন্যূনতার সংযোগ বিয়োগ লইয়াই যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসার ভিত্তি। অবহিত চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, যুক্তিসাধ্য সমস্ত ব্যাধিরই হেতু একমাত্র এই সামান্য বিশেষরূপ সূক্ষ্ম সূত্রে অনুস্যূত রহিয়াছে।

আমাদের দেহে বাত পিত্তাদি ও রসরক্তাদি যে সকল ধাতু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোনটীর হ্রাস বা বৃদ্ধি ভিন্ন ব্যাধি অপর কিছুই নহে। চিকিৎসা-সময়ে যে ধাতুর ন্যূনতা হইয়াছে, তাহার আপ্যায়ন (বৃদ্ধি), অথবা যাহার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার অপকর্ষণ (হ্রাস) ;চিকিৎসকমাত্রেরই অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব ব্যাধি ও চিকিৎসা উভয়ই ন্যূনাধিক্য মূলক। যে স্থলে রস ধাতুর হ্রাসপ্রযুক্ত শরীর শুষ্ক হইতেছে, সে স্থলে তদ্ধাতুবর্দ্ধক ভেষজের প্রয়োগদ্বারা রসধাতুকে বর্দ্ধিত করাই তাহার চিকিৎসা। তদ্রূপ যে পরিমাণ রসধাতু শরীরে থাকিলে শরীর ব্যাধিশূন্য হইতে পারে, কোনরূপ রসবর্দ্ধক বস্তুর অতিশয় উপযোগে সেই সমভাবাপন্ন রসধাতুর যদি বৃদ্ধি ঘটে, তাহা হইলে তাহাও ব্যাধি বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব সে স্থলে রসধাতুর বিরুদ্ধ ধর্ম্মি বস্তুর প্রয়োগদ্বারা তাহার ন্যূনতা অর্থাৎ স্বভাবে আনয়ন করাই তাহার চিকিৎসা। ভগবান ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—সমাঃ পালয়িতব্যা, বৃদ্ধা হ্রাসয়িতব্যাঃ, ক্ষীণা বর্দ্ধয়িতব্যাঃ। সমধাতুর—সমতা রক্ষণ, প্রবৃদ্ধ ধাতুর হ্রাস ও ক্ষীণ ধাতুর বৃদ্ধি করা উচিত।

সামান্য ও বিশেষ শরীরস্থ বাতপিত্তাদি ধাতুর সাম্যরক্ষণ ও বিষম ধাতুর ধাতুসাম্য করণেরও কারণভূত। যে স্থলে বায়ুবর্দ্ধক আহারাদিদ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি নিবন্ধন জরাদিরোগের উৎপত্তি হয়, সে স্থলে একমাত্র বায়ুর আধিক্যই যে ব্যাধির নিদান, তথায় বায়ুবর্দ্ধক আহারাদি পুনঃ প্রযুক্ত হইলে, বায়ুর প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পাইয়া রোগ প্রবল হইয়া উঠিবে ; শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা ইহা স্থির করিয়া তথায় বাত প্রশমনী ক্রিয়াদ্বারা ধাতু সাম্যকরণ কর্ত্তব্য। এইরূপ সেই বাতপিত্তাদি ধাতু যাহাতে প্রবৃদ্ধ বা ক্ষীণ না হয়, যুক্তি পূর্ব্বক তদুপযোগী ভেষজের প্রয়োগদ্বারা ধাতুসাম্যরক্ষণও কর্ত্তব্য।

ইতঃপূর্ব্বে সামান্য এবং বিশেষদ্বারা ধাতু সাম্যরক্ষণ ও বিষম ধাতুর ধাতু সাম্যকরণ এবং হেতু, লিঙ্গ ও ভেষজ উদাহরণের সহিত বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্দেশক্রমে গুণ বিষয় বর্ণনাই কর্ত্তব্য বলিয়া গুণের মধ্যে প্রধানতম আয়ুর্ব্বেদোপযোগী সত্বাত্ম শরীর সংযোগ প্রথমে বলা যাইতেছে। যথা—

"সত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেত ত্রিদণ্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাত্তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥
সপুমাংশ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্।
বেদস্যাস্য তদর্থং হি বেদোঽয়ং সম্প্রকাশিতঃ॥"
চঃ সূঃ ১অঃ।

সত্ব (সত্ব সংজ্ঞক মন), আত্মা (সত্বাদি ত্রিগুণ লক্ষণ চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক অব্যক্ত ব্রহ্ম) শরীর (পঞ্চ মহাভূত বিকার সমুদায়াত্মক চেতনাধিষ্ঠানভূত শুক্র শোণিতাদি সম্ভূত স্থূল শরীর) ; † যেমন দণ্ডত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া ধারণ এবং অবস্থানাদি কার্য্যে সমর্থ হয়, তদ্রূপ এই ত্রিতয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া লোক আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সেই লোকে সমস্ত দ্রব্য গুণাদি অবস্থিত। সেই লোকই চেতনাবান অন্নময় পুরুষ এবং তাহাই এই আয়ুর্ব্বেদের অধিকরণ। সেই পুরুষের উপকারের জন্য এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র জগতে প্রকাশিত হইয়াছে।

† এস্থলে শরীর শব্দদ্বারা স্থূল শরীরই গৃহীত হইল। নিষ্ক্রিয় বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর গৃহীত হইল না।

পরে পুরুষ বিচারের সময় তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদর্শিত হইবে; এই হেতু এস্থলে আয়ুর্ব্বেদের অধিকরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত—পুরুষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইল।

পূর্ব্বে "সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা সামান্য নামক কারণ এবং তাহার সর্ব্বভাবের বৃদ্ধি ও একত্বরূপ কার্য্য ; বিশেষ নামক কারণ তাহার সর্ব্বভাবের হ্রাস ও পৃথকত্বরূপ কার্য্য ; সমবায়রূপ কারণ, তাহার সর্ব্বভাবের মিলনরূপ কার্য্য ; দ্রব্যরূপ কারণ তাহার গুণকর্ম্মাশ্রয়ীভূত সজাতীয় দ্রব্য মূর্ত্তাদিরূপ কার্য্য ; গুণরূপ কারণ, তাহার নিশ্চেষ্ট সজাতীয় গুণবিশেষরূপ কার্য্য ; কর্ম্মরূপ কারণ তাহার সজাতীয়, বিজাতীয় এবং সংযোগ ও বিভাগরূপ কার্য্য দেখাইয়া, আয়ুর্ব্বেদের অধিকরণস্বরূপ পুরুষরূপ কারণ দেখান হইয়াছে। এক্ষণে সেই সত্বাদিত্রিতয়াত্মক পুরুষে আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজনীভূত ধাতুসাম্যরূপ কার্য্য প্রদর্শিত হইতেছে।

ক্রমশঃ

কবিরাজ শ্রীঅমূল্য চরণ বৈদ্যরত্ন।

সাধু হাসানন্দ।

সুদূর বেলুচিস্থান-নিবাসী বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ক্ষত্রিয়-কুলতিলক শ্রীযুক্ত হাসানন্দ বর্ম্মা, ধন, মান ও সংসার-বন্ধনের সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে কলিকাতার হিন্দু সমাজের সম্মুখে আজ উপস্থিত। কলিকাতা এবং নিকটস্থ গ্রামগুলির মধ্যে গো-কুলের দুরবস্থা ও ক্রমে গো-বংশের মূলোৎপাটন হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া সাধু হাসানন্দ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি বাণিজ্য-ব্যপদেশে এখানে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া দিবারাত্রি সেই গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতি-কামনায় সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সাশ্রুলোচনে ভিক্ষা করিতেছেন!

হিন্দু-গোয়ালাগণ কসায়ের হস্তে গোবৎসসহ গাভীগুলি বিক্রয় করিয়া গো-কুলের উপর ভীষণ কুঠারাঘাত করিতেছে, ব্রাহ্মণেতর সকল জাতি নিত্য স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াও তাহার কোন প্রতিবিধান করিতেছেন না, সুতরাং তাঁহারাই যে পরোক্ষে গোহত্যার মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন,—সাধু হাসানন্দ, সুতীব্র ভাষায় বিচিত্র ভাবে সেই সকল কথা সকলকে বুঝাইতেছেন। তাঁহার এই অসাধারণ উৎসাহ ও ত্যাগস্বীকার এবং নিস্বার্থ গোহিত-চিন্তার ফলস্বরূপ সম্প্রতি কলিকাতায় "শ্রীকৃষ্ণগোশালা" নামে একটী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। স্বধর্ম্ম পরায়ণ ও সর্ব্ববিধ লোকহিতকর কর্ম্মে সর্ব্বাগ্রণী মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় স্বইচ্ছায় এই সভার সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছেন, বহু গণ্য মান্য হিন্দু মহাত্মগণ ইহার সভাসদ ও পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। তাঁহাদের যত্ন ও উৎসাহে সাধু হাসানন্দ হাবড়ার অন্তর্গত লেলুয়া ষ্টেসনের নিকট এক খণ্ড বিস্তৃত ভূমি লইয়া গোশালার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—কেবল পিঁজরাপুলের ন্যায় গোরক্ষিণী-সভা করিলে চলিবে না, তাহাতে গোকুলের ধ্বংসের পথ কিয়ৎপরিমাণে রুদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে

গোজাতির প্রকৃত উন্নতির কোনও উপায় হইবে না। গাভী-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যথেষ্টরূপ ব্যবস্থা না করিলে কখনই গোকুলের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সেই উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলেন,—ভারতে, বিশেষ এই বিস্তৃত বঙ্গে গোচারণ-ভূমির বিশেষ অভাব, গোয়ালাগণ গাভীর দুগ্ধ বন্ধ হইলে, অনায়াসে সেই সকল গরু বাছুর চরাইবার উপযুক্ত স্থান পায় না, এই মহার্ঘের বাজারে তাহাদিগকে গৃহে বসাইয়া তাহাদের আহার যোগাইতে হইবে, কেবল মাত্র এই ভয়েই হিতাহিত জ্ঞানবিহীন দরিদ্র গোয়ালাগণ গো-বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তখন সেই আহার-অভাবে রুগ্ন ও শীর্ণ বৎস এবং গাভীগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য কসাই সকল গোয়ালার দ্বারে উপস্থিত হইলে, তাহারা আর অন্যথা করিবার অবসর পায় না, সুতরাং বাধ্য হইয়াই তখন তাহারা এই ভীষণ অধর্ম্মাচরণ করিয়া বসে, ফলে গোকুল নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ অবস্থায় গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণ সমবেত হইয়া যদ্যপি নিকটবর্ত্তী পাঁচ সাতখানি গ্রামের মধ্যে গোচারণোপযোগী কিয়ৎ পরিমাণে ভূমি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সকল গ্রামবাসী গোয়ালাগণ আর গরু বাছুর বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবে না। অথচ বৃষ, বৎস ও গাভীগুলি মুক্ত গোচারণ ভূমিতে বিচরণ করিয়া ক্ষেত্রের নব নবজাত তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে থাকিবে। ফলে, গো-বংশের ক্রমোন্নতি সাধিত হইবে। সাধু হাসানন্দের এই যুক্তি অত্যন্ত মূল্যবান ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পূর্ব্বোক্ত লেলুয়াস্থিত বিস্তৃত গোচারণ-ভূমির কার্য্য আদর্শরূপে আরব্ধ হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যেক হিন্দু-গৃহস্থেরই যে ইহাতে বিশেষরূপে সাহায্য করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নাই। হাসানন্দ বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার উৎসাহ প্রশংসার্হ। আমরা এই সংখ্যায় তাঁহার গো-বৎস প্রীতির দুইখানি চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। কলিকাতা বড়বাজারে শ্রীকৃষ্ণ-গোশালার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা সকলকেই সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করি।

সনাতন সাধন-তত্ত্ব।

বা

তন্ত্র-রহস্য—

পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামীর সেই "তন্ত্র কি" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের একত্র সমাবেশমাত্র। যাঁহারা ইহা একত্র সম্পূর্ণ পাঠ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা সত্বর গ্রহণ করুন। ইহাতে আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালিকার একখানি সুন্দর সুরঞ্জিত হাফটোন চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। স্বর্ণাক্ষর-লিখিত বিলাতিবৎ সুন্দর বাঁধান—মূল্য ৸০ আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

'শিল্প ও সাহিত্য' কার্য্যালয়, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, বহুবাজার, কলিকাতা।

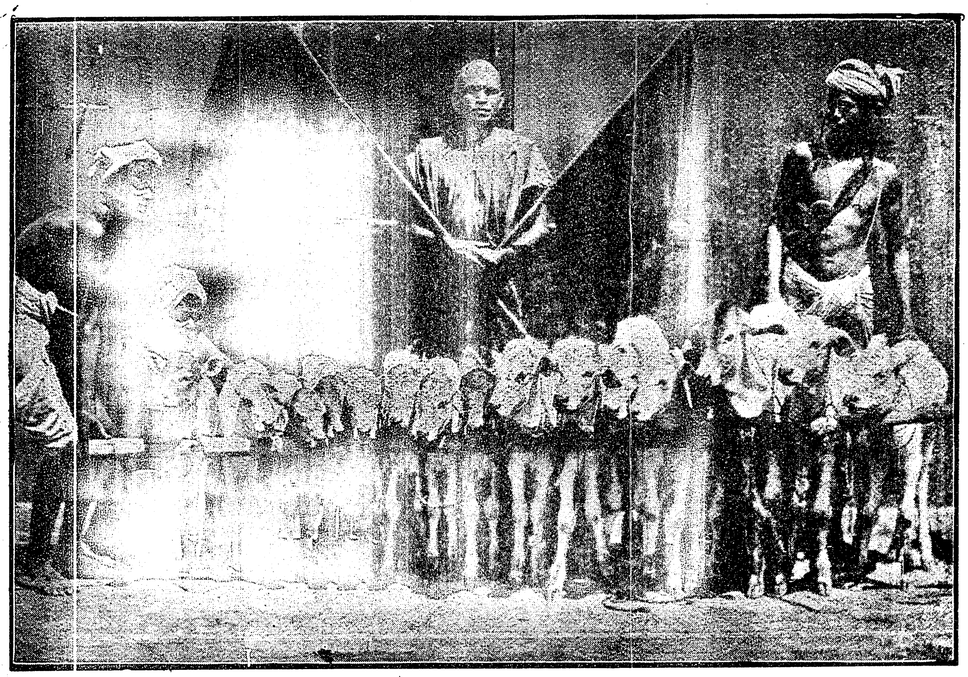

সন্ন্যাসী বেশে সাধু হাসানন্দ জী।

শিল্প ও সাহিত্য।

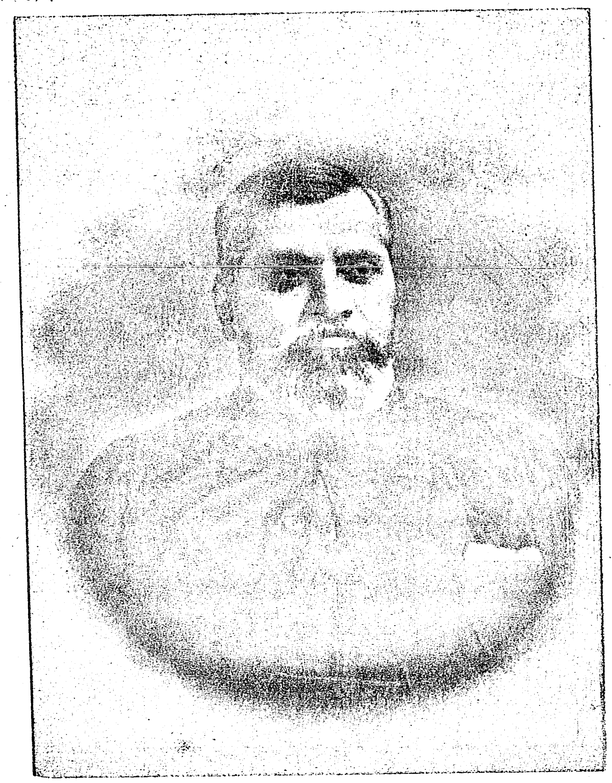

শ্রীযুত ভূপেন্দ্র নাথ বসু।

I. A. School.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৩০১ সাল

শিল্প ও সাহিত্য

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড | সন ১৩১৬—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা

কাশীধাম।

(২২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

বারাণসী।

'বারাণসী' এই শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে যাইয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে তাহার এত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহাতে অমূলক বা মাত্র প্রবাদসমূহ আদৌ শুনিতেই ইচ্ছা হয় না। প্রথমতঃ 'বারাণসী' শব্দের শব্দার্থ ধরিয়া অধ্যাপক উইলসন্ তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে 'বর' শব্দের উত্তর 'অনস্' প্রত্যয় যোগে বারাণসী সিদ্ধ হয়, এইরূপ বলিয়াছেন এবং 'বর' অর্থে শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র এবং 'অনস্' অর্থে অপ্ বা জল অর্থাৎ পবিত্র জল অথবা পতিতপাবনী গঙ্গা; তাহারই তীরে অবস্থিত বলিয়া তীর্থরাজ বারাণসী নামে কল্পিত হইয়াছে। (Murry's Hand-Book of Bengal. P. 203.)

পতঞ্জলীর মহাভাষ্য, বিষ্ণুপুরাণ, বামনপুরাণ প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বরুণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী উত্তর-প্রবাহিতা গঙ্গাতটস্থিত ভূভাগ অবিমুক্ত বারাণসী নামে খ্যাত। পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ-কাশী-খণ্ডেও ঐ কথা লিখিত আছে।

বারাণসীতি যৎখ্যাতং তন্মানং নিগদামিবঃ।
দক্ষিণোত্তরযোর্ণদ্যো বরণাসিশ্চ পূর্ব্বতঃ॥

* * *

দক্ষিণোত্তরদিগ্ভাগে কৃত্তাসিং বরণাং সুবাঃ।
ক্ষেত্রস্য মোক্ষনিক্ষেপ রক্ষারিবৃতি মায়যুঃ॥

বরুণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী স্থানই বারাণসী ক্ষেত্র বা তীর্থ। এই বরুণা বা অসি সম্বন্ধে বামনপুরাণে (৩।২৪।২) ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন, "এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে

প্রয়াগ-তীর্থে আমার অংশসম্ভূত যোগশায়ী নামে যে বিখ্যাত বিরাট অব্যয় পুরুষ নিরন্তর বাস করিতেছেন, তাঁহারই দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী শুভঙ্করী বরুণা এবং বাম পদ হইতে অসি নামক নদীদ্বয় নিস্থত হইয়াছে। এই দুই নদীর মধ্যে যোগশায়ী মহাদেবের সর্ব্ব পাপবিনাশক ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ যে তীর্থক্ষেত্র বিরাজিত, তাহারই নাম অবিমুক্ত বারাণসী। রামায়ণ, মহাভারত ও উপনিষদাদি আর্য্য-শাস্ত্রের সকল স্থানেই এই একই কথা লিখিত রহিয়াছে। তবে কোন কোন উপনিষদ ও তাহার টীকাকার (শঙ্করানন্দ প্রভৃতি) 'বরুণা ও অসি' না বলিয়া 'বরুণা ও নাশী' বলিয়াছেন। জাবালোপনিষদে লিখিত আছে—"এই স্থানে জীবের মৃত্যু হইলে স্বয়ং রুদ্র তাহাকে তারকব্রহ্ম নাম শুনান, সেই কারণ জীব অমৃতত্ব লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সতত বাস করা কর্ত্তব্য, ইহা পরিত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নহে। হে যাজ্ঞবল্ক, আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য বলিয়া জানিবে। সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বরুণা ও নাশীর মধ্যে অবস্থিত। সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষসমূহ নিবারণ করে বলিয়া একের নাম বরুণা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপরাশি নাশ করে বলিয়া অপরের নাম নাশী হইয়াছে।" কেহ কেহ বলেন প্রাচীন বৈদীক-যুগে 'নাশী' নামই প্রচলিত ছিল, পৌরানিক যুগে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অসি বা অসী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ উহার আধ্যাত্মিক ভাবে বরুণা অর্থাৎ পিঙ্গলা এবং অসী অর্থাৎ ইড়া, ইহাদের মিলনে বারাণসী হইয়াছে, এইরূপ বলিয়াছেন। স্থূলতঃ বরুণা ও অসির মিলনে বারাণসী ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে এই, বারাণসীই সেকালে কাশীপুরী বা কাশীতীর্থ ছিল। 'দশকুমার চরিত্র' ও 'রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে' কাশীপুরীকেই বারাণসী বলা হইয়াছে।

বারাণসীর স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞান, গভীর গবেষণা ও সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা ভারতখণ্ডের মধ্যে পবিত্র গঙ্গাতটে এমনই এক অদ্ভুত স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন, যথায় ভগবতী ভাগিরথী হিমগিরি হইতে প্রবলবেগে বিনির্গতা হইয়া দক্ষিণ সাগরাভিমুখে সমতল আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিবার সময়, কি জানি কি চিন্তা করিয়া, একবার উত্তরদিকে নিজ পিত্রালয়ের প্রতি ফিরিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মুখেই নিজপতি কাশীশ্বর বিশ্বনাথকে এবং তদ্‌সহ চতুর্দ্দিকে পুষ্পাঞ্জলী-হস্তে ভক্ত সন্তানমণ্ডলীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বুঝি মা আমার, সে অভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন; তাই সাধ্বী, পতি-চরণতল স্পর্শ করিয়া পতিতপাবনী পূত-সলিলা পাপীকুলের উদ্ধারমানসে পুনরায় পূর্ব্ব পথেই চলিতে লাগিলেন। মায়ের সেই উত্তর-প্রবাহ, এই কাশীতলে এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। গঙ্গার এরূপ অভিনব প্রবাহ ভারতের আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না! কেবল পিতৃক্রোড়েই পিতা মাতাকে শেষ-দেখা দেখিবার জন্য বুঝি মা আমার উত্তরাখণ্ডে উত্তর কাশীতে সেই একবার উত্তরাভিমুখী হইয়াছিলেন, আর সমতলভূমিতে আসিয়া এই একবার। আর্য্য-ঋষিগণ মায়ের কৃপায় বারাণসীক্ষেত্রের জন্য প্রকৃতই এই অতুলনীয় স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন। বারাণসী অসি ও বরুণার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গাতটস্থিত এক অনুন্নত

পার্ব্বত্যভূমির উপর অবস্থিত। সেই কারণ অন্যান্য স্থানের ন্যায় গঙ্গার এই তটভূমি কখনও গঙ্গা-গর্ভ-গত হইতে পারে নাই। সেই আদিকাল হইতে এখনও সমান ভাবে একই স্থানে ইহা স্থির হইয়া আছে। বর্ত্তমান কাশী-সহরের উচ্চ-নিম্ন অসমতল পথ-ঘাট দেখিলে এখনও তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এ বিষয় পাশ্চত্য সুধিমণ্ডলীও লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হন নাই। মহানুভব "কেন্" বলিয়াছেন, "বারাণসী-তীর্থ উক্ত গঙ্গাতটে জল-তল হইতে প্রায় শত ফুট উচ্চ এক পর্ব্বত-চূড়ার উপর চিত্রিতবৎ শোভিত রহিয়াছে। ভারতে এমন সুন্দর সহর আর দ্বিতীয় নাই।" এতদ্ব্যতীত প্রবাদ আছে, বারাণসীমধ্যে কখনও ভূমিকম্প হয় না। ইহাও ঋষিদিগের সাধারণ দূরদর্শীতার কথা নহে! প্রকৃত পক্ষে বারাণসীর জন্য এরূপ স্থান নির্ব্বাচন, তাঁহাদের গভীর গবেষণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। একাল পর্য্যন্ত বারানসী বা কাশী-ক্ষেত্রমধ্যে ভূমিকম্পের তীব্রতা কখনও অনুভূত হয় নাই। সিস্‌মোগ্রাফ-যন্ত্র সাহায্যেও অতি ক্ষীণ ও ধীর আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। এই সকল নানা কারণেই বারাণসীকে ভারতের তীর্থরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কাশীরাজ্যের নৃপতিবৃন্দ।

কাশীরাজ্যের নৃপতিবৃন্দের ধারাবাহিক কোনও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না; তবে বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে বহু নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব প্রথম ঋগ্‌বেদে ও আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে দিবোদাস ও প্রতর্দ্দনের বিষয় জানিতে পারা যায়। অনন্তর পরবর্ত্তী অন্যান্য শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতর্দ্দন আবার দিবোদাসের পুত্র; ইহাঁরা কাশীরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কাত্যায়ণ তাঁহার ঋগ্‌বেদ অনুক্রমণিকায় দ্বিতীয় ব্যক্তিরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে দুইজন দিবোদাসের বিষয় বর্ণিত আছে। একজন হর্য্যশ্ব বা বধ্র্যাশ্বের সন্তান এবং অন্য ভীমরথের সন্তান, ইনিই প্রতর্দ্দনের পিতা কাশীরাজ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অনেক ইংরাজ পণ্ডিত মনে করেন হর্য্যশ্ব বা বধ্র্যাশ্ব ও ভীমরথ একই ব্যক্তি হইবেন। (English Vishnu-Purana, Vol. IV, PP, 33 and 145, 146,) মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব হইতেও এরূপ জানিতে পারা যায়।

পুরাকালে আয়ুবংশীয় সুহোত্র-পুত্র কাশ নামক কোন এক গণ বা দেবতা হইতেই কাশীর ক্ষত্রিয় রাজাবলীর আরম্ভ হইয়াছিল। সেই বংশেই ক্রমে কাশ্য, রাষ্ট্র, দীর্ঘতপা, ধর্ম্ম, ধন্বন্তরী, কেতুমত, ভীমরথ ও দিবোদাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান নৃপতিবৃন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীরাজ্য পরিচালনা করিয়া ছিলেন।

মহারাজ ধন্বন্তরী মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র বা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। সেই কারণ তিনি বৈদ্য নামে প্রসিদ্ধ হন; এবং আয়ুবংশসম্ভূত ধন্বন্তরী দ্বারা এই বেদের প্রচার হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। দেবাদিদেব শঙ্কর আয়ুর্ব্বেদের আবিষ্কারক—তাঁহার পরম প্রীতিপ্রদ স্থান

কাশী হইতেই শকরাদেশে মহারাজ ধন্বন্তরী কর্ত্তৃক ইহার প্রচার হইয়াছে। ইহাঁর বংশে পরে কেতুমন্তাদি রাজন্যবর্গ জন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীর অধিপতি হন। এই সময় হৈহয়পুত্রগণ কাশীরাজার সহিত বিবাদ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তাহাতে হর্য্যশ্ব নিহত হন। অনন্তর সুদেব সিংহাসনারূঢ় হন কিন্তু তিনিও হৈহয়গণকর্ত্তৃক নিহত হইলে উক্ত বংশের একমাত্র বংশধর দিবোদাসই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

"দিবোদাস ইতিখ্যাত বারাণস্যাধিপী ভবেৎ।"

দিবোদাস বারাণস্যাধিপ হইয়া বোধহয় বারাণসীর অন্তর্গত বরুণার নিকট কাশীরাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া শত্রুভয়ে তাহা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হৈহয়গণ কাশীরাজকে পরাস্থ করিয়াছিলেন। সেই সময় হৈহয়বংশীয় নৃপতি ভদ্রশ্রেণ্যই বারাণসী অধীকার করিয়াছিলেন, পরে দিবোদাস তাহাকে বিনাশ করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। নিকুম্ভের অভিশাপে ও ক্ষেমক-রাক্ষসের উৎপাতে এই সময় বারাণসী হতশ্রী ও জনশূন্য হইলে, দিবোদাস গোমতীতটে এক নগর সংস্থাপিত করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। হৈহয়বংশীয় ভদ্রশ্রেণ্যের শিশুপুত্র দুর্দ্দম ক্রমে বর্দ্ধিত ও পরাক্রান্ত হইয়া পিতৃহন্তা দিবোদাসকে পরাজিত করতঃ বারাণসী পুনরাধিকার করেন। কিন্তু দিবোদাস ও দৃষদ্বতী বা মাধবীর গর্ভে প্রতর্দ্দন নামে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি কালে মহা পরাক্রান্ত হইয়া দুর্দ্দমকে পরাজিত করিয়া পুনরায় কাশীরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন। ইনি যেমন প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, সেইরূপ সধর্ম্ম পরায়ণ ও পরম যাজ্ঞিক বলিয়া উপনিষদাদির মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায়, ইনি অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। ইহাঁরই পুত্র বৎস—ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত হন। পরম জ্ঞানশীলা তত্ত্বদর্শিনী মদালসা এই কুবলয়াশ্বের সহধর্ম্মিনী ছিলেন। মহা বীর্য্যবান মহারাজ অলর্ক ইহাদের পুত্র, ইনিই ক্ষেমক-রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়া বারাণসীকে সুশোভিত করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে সন্নতি, সুনীথ, ক্ষেম, সুকেতু, ধর্ম্মকেতু, সত্যকেতু, বিভু, সুবিভু, সুকুমার, ধৃষ্টকেতু (ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন) বেণুহোত্র, ভর্গ ও ভার্গভূমি প্রভৃতি প্রাচীন কাশবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করেন। মৎস্যপুরাণে চতুর্বিংশতিজন কাশবংশীয় নরপতির উল্লেখ আছে। ভার্গভূমির পর কোন্ ব্যক্তি কাশীরাজ্য পরিচালিত করেন, তাহার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার পর সেই প্রাচীন রাজবংশের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। অনন্তর হৈহয়বংশীয় অষ্টবিংশতি ব্যক্তি কাশীর রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ইহাদের পর প্রদ্যোৎবংশীয় নরপতিগণ ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে শিশুনাগ ইহাদিগকে নিহত করিয়া তৎপুত্র যশকে বারাণসীতে অভিষিক্ত করিয়া গিরিব্রজে গমন করেন। বুদ্ধদেবের সময় ইনিই কাশীর মহা পরাক্রান্ত অধিপতি ছিলেন। ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি কাশীতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের বিপুল সহায়তা করিয়াছিলেন।

জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়—৭ম তীর্থঙ্কর ভগবান সুপার্শ্ব মহারাজ প্রতিষ্ঠের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীতে জৈন-ধর্ম্মের প্রথম প্রচার

করেন। সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠ-রাজের নামানুসারেই কাশীরাজ্যের অন্যতর রাজধানী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। তদনন্তর খৃঃ পূঃ প্রায় ৮০০ অব্দে কাশীপতি অশ্বসেনের ঔরসে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দেব জন্ম গ্রহণ করেন। তখন কাশীতে জৈনধর্ম্মের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার নির্ব্বাণলাভের প্রায় দুইশত বৎসর পরে মহামুনি শাক্যসিংহ বারাণসীতে পদার্পণ করেন।

বিম্বসর-পুত্র মহারাজ অজাতশত্রুর রাজত্বকালে কাশীরাজ্য-পরিচালক নরপতিগণের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠান নামক রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে ৩৯০৫-৩৯১৮ শ্লোকের পাঠানুসারে জানিতে পারা যায়, মহারাজ পুরুর পূর্ব্বে মহারাজ নহুষাত্মজ যযাতি কাশীরাজরূপে রাজধানী প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতেন।

"ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
পুরুশ্চকার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশীরাজ্যে মহাযশাঃ।

কথা-সরিৎ-সাগর পাঠেও জানা যায়, প্রতিষ্ঠান কাশীরাজ্যের রাজধানী ছিল।

বৌদ্ধ আধিপত্যসময়ে বহু রাজা কর্ত্তৃক কাশীরাজ্য শাসিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম 'ভীমগুপ্ত', ইনি একজন মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। (Der Budhisims translated from the Russian of Professor Wassiljew, Part I, P. 54.)

কেহ কেহ দিবোদাসকে বৌদ্ধ রাজা বলেন। বোধ হয় পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দিবোদাস নামে কোনও স্বতন্ত্র রাজা হইয়া থাকিবেন।

মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে কাশীরাজ্য পাটালিপুত্রের অধীন হইয়াছিল। তৎপুত্র প্রিয়দর্শী অশোক সারনাথে বহু স্তূপ ও বুদ্ধদেবের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অশোকের পর তদীয় পৌত্র দশরথের সময় জৈন আজীবকগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। অনন্তর ক্রমান্বয়ে চৌরাশিহাজার রাজা কাশীর রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, 'দিপবংশে' এইরূপ বর্ণিত আছে (Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1838, P, 927,)

মৌর্য্যরাজাদিগের রাজত্বকালে কাশীরাজ্য পাটলিপুত্রের অধীনে ছিল। শুঙ্গমিত্র ও কাণ্বায়নদিগের সময় বারাণসীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। মহারাজ অগ্নিমিত্র এই সময় অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব উদ্ধারে যত্নবান হইয়াছিলেন।

চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাং, ভারতে আসিবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্য নরসিংহগুপ্ত কাশীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময় হূণপতি তোরমাণ্ ও মিহিরকুল ভারতাক্রমণ করেন। মালবপতি যশোবর্ম্মার সাহায্যে মহারাজ বালাদিত্য হূণাধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সকল সম্প্রদায়কে সমান ভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার

পুত্র প্রকটাদিত্য কিছুকাল কাশীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সময়ে সারনাথেও হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিয়া ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন কাশীর অধিশ্বর ছিলেন। তৎপরে পুনরায় মগধের রাজারা কিছুদিন কাশীর নৃপতি হয়েন। অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিশ্বর যশোবর্ম্মা মগধাধিপকে পরাজিত করিয়া কাশীরাজ্যকে কনোজ-রাজ্যভুক্ত করিয়া ছিলেন। তাহার যত্নে কান্যকুব্জ ও কাশীধাম বৈদিকাচারের কেন্দ্রস্থান-রূপে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র ও পৌত্র—চক্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধ কনোজের অধিপতি হন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন না। ইন্দ্রায়ুধের সময় পালবংশীয়গণ প্রবল হইয়া উঠেন। ধর্ম্মপাল কিছু কালের জন্য কাণ্যকুব্জ পর্য্যন্ত জয় করিয়া ছিলেন। এই ভোজ ও তাঁহার বংশধর পাল উপাধি-ধারী রাজাগণ বারাণসী ও শ্রাবস্তীর মধ্যে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া বারাণসীক্ষেত্রে বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এসিয়াটিক রিসার্চের পঞ্চমখণ্ডে এক প্রস্তর খোদিত শাসনলিপির উল্লেখ আছে—সেখানি ১৭৯৪ খৃঃ বেনারাসের মধ্যেই সারনাথগর্ভের কোন স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জানা গিয়াছে, গৌড়-রাজগণও কিছুদিন কাশীরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্থিরপাল ও বসন্তপালের পিতা মহীপালের রাজত্বকাল ১০৮৩ বিক্রম অব্দে বা ১০২৬ খৃঃঅব্দে শেষ হয়। এই প্রস্তরফলক খানির খোদিত অক্ষরগুলি অতি জীর্ণ হইয়া ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই কারণ কোনও কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ উহার লিখিত কাল সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে আরও প্রাচীন সময়ে ইহাঁরা কাশী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশীরাজ্য রাষ্ট্রকুট-বংশীয় গাহড়বাল নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহাদের যত্নে বহু হিন্দু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

মোসলমান ঐতিহাসিক দিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মোসলমান-আধিপত্য সময়ে বেনারস এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশসমূহ কনোজের অধীনরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; এবং কনোজের শেষ রাজা মদনপাল হইতে জয়চন্দ্র পর্য্যন্ত বেনারসের রাজত্ব করিয়া ছিলেন।

হোসেন নিজামীর ইতিহাস এবং Colonel Briggs's translation From Farishta, vol. I., P. 179. হইতে জানিতে পারা যায় যে, "সিহাবুদ্দিন ঘোরীর প্রধান সেনাপতি কুতবুদ্দিন কর্ত্তৃক ১১৯৪খৃঃ-অব্দে কাশীরাজ্যের অধিশ্বর মহারাজ জয়চাঁদ পরাভূত ও নিহত হইয়াছিলেন। কুতব সেই সময় নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্রাধিক মন্দির ও মন্দিরস্থিত দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়া ছিল। সেই মন্দিরাদির ইষ্টক ও প্রস্তর গুলি লইয়া সেই সকল স্থানে মস্‌জিদ্ প্রস্তুত করাইয়া ছিল। এই সময় হইতে কাশীরাজ্য মোসলমান রাজাদিগের দ্বারা শাসিত এবং এলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হইয়া আসিতে ছিল। সহস্র সহস্র অনাদি লিঙ্গ দেববিগ্রহ ধ্বংসকারী কুতবেরকিঞ্চিৎ পরিচয় এই স্থলে দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি, কারণ বোধ হয় অনেকেই কুতবের প্রকৃত পরিচয় অবগত

নহেন। কুতব মোসলমান ঔরসজাত খাঁটী মোসলমান নহে। তাহার প্রকৃত নাম রামপ্রসাদ, পাঞ্জাব প্রদেশ-বাসী একজন অতি নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয়-সন্তান। গজনীপতি সিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া প্রথমে তাঁহার গোলামরূপে নিযুক্ত হয়, পরে বাধ্য হইয়া মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণান্তর কুতবদ্দিন নাম ধারণ করে। ক্রমে নিজ কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া সম্রাটের অতি প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠে ও তাঁহার প্রধান সেনাপতিরূপে ভারতের নানা প্রদেশ জয় করিয়া সম্রাট কর্ত্তৃক দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয়। এই সময় অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশীধাম পর্য্যন্ত কুতব নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া-ছিল। প্রবাদ আছে, কুতব সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী নিষ্ঠাবান আর্য্যবংশ সম্ভূত হইয়াও কোন্ পাপে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল, নিজে তাহার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মূর্খ দেব-দ্বিজের উপর ক্রুদ্ধ হইল ও তাহার ধ্বংস সাধনে মনোনিবেশ করিল। বোধ হয় কুতব মোসলমান ঔরসজাত প্রকৃত মোসলমান হইলে এতাধিক অত্যাচার করিতে পারিত কিনা সন্দেহ! কেবল কুতবই যে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহা নহে, তাহার পরবর্ত্তী আরও কয়েকজন কাশীর যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে। তন্মধ্যে দিল্লীর সম্রাট বেলোল লোদীর সেনাপতি মহম্মদ ফর্ম্মুলি বা প্রসিদ্ধ কালা পাহাড় অন্যতর। কুতবের পর এক এই কালাপাহাড় হইতে হিন্দুর যে অনিষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত সমস্ত মোসলমানের সকল অত্যাচার একত্র করিলেও তাহার সমান হইবে না। কুতবের ন্যায় এটীও গৃহের শত্রু বিভীষণ—এটীর পরিচয় বঙ্গীয় পাঠকগণের আরও জানিবার বিষয়, কারণ এটী আমাদের খাস বাঙ্গালার কুলাঙ্গার। ইহার প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত একটাকিয়ার ভাদুড়ী-রাজা জগদানন্দের বংশজাত। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত খান্দা থানার অধীন বীরজাওন গ্রামে তাহার জন্ম-স্থান। অল্প বয়সেই পিতার মৃত্যুহইলে মাতামহ কর্ত্তৃক কালাচাঁদ লালিত পালিত হইয়া তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা ও পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিল। কালাচাঁদ বাল্যকাল হইতে বেশ বলবান, শস্ত্র-চালনায় ও অশ্বারোহণে বিশেষ পটু ছিল। শ্রীপুরনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুইকন্যার পাণিগ্রহণ করিবার দুই বৎসর পরে, গৌড়-সম্রাটের অধীনে ফৌজদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। পরে দৈব-দুর্ব্বিপাকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে সম্রাট-কন্যার পাণিগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারিয়া, মনের দুঃখে পুরী-জগন্নাথ দেবের নিকট সপ্তাহকাল অনাহারে ধরণা দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোনও প্রত্যাদেশ না পাইয়া অধিকন্তু পাণ্ডাগণের কর্ত্তৃক অযথা তিরস্কৃত হইয়া কালাচাঁদ ক্রোধান্ধ হইল ও মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, পরে নিজ শ্বশুর গৌড়-সম্রাটের অনুমতি লইয়া উড়িষ্যা-বিজয় করে এবং জগন্নাথ-বিগ্রহ দগ্ধ করিয়া পাণ্ডা-দিগকেও জোর করিয়া মোসলমান করিয়া-ছিল। তাহার অত্যাচারে লোকে তাহাকে বিজাতীয় ঘৃণা করিয়া কালাপাহাড় বলিত। যে যে স্থানে কালাপাহাড় গিয়াছিল, সেই সেই স্থানেরই দেব-বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতের এমন স্থান নাই, যথায় কালাপাহাড় হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। বার্ব্বাকসাহ যখন জৌনপুরের অধি-

পতি, তখন বেলোললোদী দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সাতাইশ-বর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে ছিল। বার্ব্বাকসাহ বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বীর কালা-পাহাড়ের অতুল বিক্রমের কথা শুনিয়া তাহাকে নিজ সেনাপতি করিতে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু পথিমধ্য হইতে বেলোললোদী কর্ত্তৃক কৌশলে বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে নীত হইলে, তথায় সম্রাট কর্ত্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত ও অল্প দিনের মধ্যে সম্রাটের বিশেষ অনুরোধে তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করে। তাহার পর শ্বশুরের সহিত যাইয়া জৌনপুর সাম্রাজ্য অধিকার করে। এই সময় শ্রীক্ষেত্র ও কামরূপের ন্যায় কাশীধামেরও হিন্দু ধর্ম্ম এককালে লোপ করিবার প্রয়াসে প্রভূত অত্যাচার করিয়াছিল। কোনও প্রাচীন মন্দিরই তাহার নিষ্ঠুর করে রক্ষা পায় নাই। এই সময় কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাস করিতেন। চরম অত্যাচার-উপলক্ষে একজন দুষ্ট যবন তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করে। তিনি ঘৃণা, দুঃখ ও ক্রোধে রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে যৎ-পরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন ও তাহার সম্মুখে সেই স্থানেই আত্মহত্যা করিলেন। কালাপাপাহাড় স্বচক্ষে এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া তখনই অত্যাচার বন্ধ করিতে আদেশ করিল। আদেশমাত্র অত্যাচার তখনই বন্ধ হইল সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বারাণসীর সকল দেবালয়ই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র কেদারেশ্বর অনাদি শিবলিঙ্গটী তখন রক্ষা পাইল। এদিকে কালাপাহাড়, সেই রাত্রেই কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইল, পরে আর কেহই তাহার সন্ধান পায় নাই। ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

আলিঙ্গন।

আসি তবে, হে জলধি, বিদায়, বিদায়!
এক দিন তব কূলে এসেছিনু, হায়!
অতৃপ্ত বাসনা লয়ে, আকুল কামনা,
শত জন্ম-জন্মান্তের সঞ্চিত বেদনা,
নিরাশার শত স্মৃতি, শত হাহাকার,
সাধ ছিল চিরন্তন হৃদয়ে আমার,
সকলি ও শ্যাম-অঙ্গে করি সমর্পণ,
লভিব সিকতা পরে সাধের মরণ!
ওগো কান্ত, ওগো শ্যাম, ওগো প্রিয়তম!
ওগো মোর প্রাণধন, সোহাগ সরম!
কি অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রাগিণী তুলিয়া,
আমার জীবন-কুঞ্জ দিয়াছ ভরিয়া,—
আকাঙ্ক্ষার নব স্রোতে; বিভোর হৃদয়ে
তাইত তোমার কূলে সকলি ভুলিয়ে
পড়ে আছি দিবানিশি; নিত্য দিন শেষে
নেমে আসে যবে রবি পশ্চিম আকাশে,
মনে হয়—দিগন্তের কদম্বের মূলে
তুমি শ্যাম দাঁড়াইয়া, তরঙ্গেতে তুলে
মোহন মুরলী-তান, ডাক রাধিকায়,
তাই রবি ছুটে আসে, ভেটিতে তোমায়
সোণার কিশোরী রূপে; বাহু প্রসারিয়া
তুমি তারে নিজ বক্ষে লহগো টানিয়া।
আমি ভ্রান্ত, সুখ হারা, উদাস নয়নে
কেবলি চাহিয়া থাকি,—কিছুই বুঝিনে
কি ওই অপূর্ব্ব লীলা; দেখিতে, দেখিতে,
কেমন মিলায়ে যায় তোমার অঙ্গেতে—
কিশোরী-তপন-রাধা, হেম-রশ্মিধারা
নবীন-মিলনচ্যুত সোহাগের পারা,
কেমনে ব্যাপিয়া পড়ে সর্ব্বাঙ্গে তোমার,
তার পর কিছু নাই, শুধু অন্ধকার,
আছ শুধু একমাত্র সত্য, চিরন্তন
তুমি শ্যাম পার-হীন; জীবন-মরণ
তোমাতে উত্থিত হয়ে তোমাতে বিলয়,—
প্রভাতে তোমার রবি, গোধূলি বেলায়
তোমাতে আসিয়া মিশে, তুমি সর্ব্বশেষ,
তাইত তোমার কূলে, হে মোর প্রাণেশ!
বেঁধেছিনু ঘরখানি, করেছিনু মন
দেখিতে দেখিতে ওই অপূর্ব্ব মিলন,
একদিন সন্ধ্যাকালে সর্ব্বস্ব আমার
শীতল ও পাদ-পদ্মে দিব উপহার।
হ'লনা হ'লনা মোর কিছুত হ'লনা,
আমারে কোলেতে তুমি স্থানত' দিলে না,
বুঝিয়াছি—এ সংসার মহাকাশ ঘুরে
যখনি নামিব আমি পশ্চিমের তীরে,
তখনি হে মোর কান্ত, বাহু দুটী মেলি
আমারে নেবেগো তুমি প্রিয়জন বলি।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ণ-চিত্রণ।

(২০১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

পরিচ্ছদ (Dress বা Drapery.)

পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও চিত্রগত-ব্যক্তির জীবিকা, অবস্থা, বয়ঃক্রম ও তাহার উপযুক্ত সম্ভ্রমসূচক ব্যবস্থা করিতে হইবে। হয়ত একজন দশকর্ম্মবিদ্ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, যজমান, শিষ্য-সেবক হইতে বেশ কিছু সংস্থান করিয়াছেন, সংসার সচ্ছল, ঘর বাড়ীও বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির অনুরূপ, তিনি স্বয়ং বা তাঁহার পুত্রগণ পূজ্য-পাদ পিতার প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন,—শিল্পী এরূপ অবস্থায় তাঁহার পরিচ্ছদাদির প্রতি যদ্যপি লক্ষ্য না রাখেন, তাহা হইলে হয়ত চিত্রগতমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারই প্রতিরূপ বলিয়া অনেকে চিনিতেই পারিবেন না; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা যে পরিচ্ছদে সকলের সমক্ষে পরিচিত, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে যদি চোগা চাপকান ইত্যাদি বা কোন য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে অথবা রাজা ও জমীদারগণের অনুরূপ কোন আড়ম্বরপূর্ণ পোষাক পরাইয়া চিত্রিত করা হয়, তাহা হইলে কেহই সহজে সে চিত্র দেখিয়া চিনিতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐরূপ কোনও নব্য-শিক্ষিত হাকিম বা ডাক্তার, যিনি সদাসর্ব্বদা য়ুরোপীয় ভাবেই সকলের নিকট পরিচিত, তাঁহাকে সহসা বৈরাগী-বৈষ্ণবদিগের সাধারণ সাম্প্রদায়িক পরিচ্ছদে চিত্রিত করিলেও কেহ সহসা কাহার চিত্র, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ যিনি যে ভাবে, যে পরিচ্ছদে, সাধারণ সমক্ষে অধিক সময় থাকেন, তাঁহাকে সেই পরিচ্ছদেই চিত্রিত করিতে হইবে। হয়ত কোন কৌতুক-প্রিয় উচ্ছৃঙ্খল বুদ্ধি বিশিষ্ট যুবক খেয়ালবসে কোন এক অস্বাভাবিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নিজ চিত্র গ্রহণ উদ্দেশে শিল্পীর নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহাকে সেই পরিচ্ছদ বিষয়ে শিল্পীর সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক; তাহা না হইলে ভবিষ্যতে সেই চিত্র লইয়া শিল্পীকে নিশ্চয়ই বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইবে;—সুতরাং দেখা যাইতেছে এই পরিচ্ছদও

চিত্রস্থ ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রদানে অন্যতম যন্ত্র-স্বরূপ, শিল্পীর পূর্ব্বানুরূপ সূক্ষ্ম-দৃষ্ট এ বিষয়েও উপদেশ প্রদানে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এ সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষ-পরিচ্ছদ ভেদে আরও দুই একটী কথা বলিবার আছে। পুরুষের চিত্রাঙ্কনকালে কেবল ইহাই দেখা আবশ্যক যে, চিত্রস্থ ব্যক্তির মর্য্যাদানুরূপ যথাযথ পরিচ্ছদ হইয়াছে কি না, এবং তাহাতে তাঁহার গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে কি না, কিন্তু স্ত্রীমূর্ত্তি চিত্রনকালে চিত্রগতা যেমনই সুন্দরী হউন না, তাঁহার পরিচ্ছদের মনোহারিত্বের প্রতি শিল্পীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন্ পরিচ্ছদে এবং কিরূপে তাহা পরিহিত হইলে, পরিচ্ছদের ভাঁজগুলি (folds) কি ভাবে কোথায় পড়িলে অপেক্ষাকৃত কোমল (soft) ও মনোহর হয় শিল্পীর তাহাতে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত চিত্রস্থ মূর্ত্তির ক্ষেত্রপৃষ্ঠ (Back ground) ও আশে পাশে যে সকল সামগ্রী চিত্রের শোভা সম্পাদনার্থে অঙ্কিত হয়, তাহাও চিত্র-বিজ্ঞানানুসারে পরিচ্ছদ আখ্যার অন্তর্গত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভাবে এ সকলেরও যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করিয়া চিত্রে সন্নিবেশ করিবে। সঙ্গীতের অনুগত সঙ্গতের ন্যায় চিত্রস্থ মূর্ত্তির সহিত ইহার যেন বেশ মিল থাকে। নতুবা বিসদৃশ বোধ হইবে।

বর্ণাবলী (colours) প্রতিমূর্ত্তি-চিত্রণের আলোচ্য বিষয়-চতুষ্টয়মধ্যে এইবার চতুর্থ বা শেষ, বর্ণাবলীর কথা বলিব। আদর্শ মূর্ত্তির অনুরূপ বর্ণ বিন্যাসে শিল্পীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ রক্ষা করিতে হয়। বাস্তবিক বর্ণ-চিত্রকরের ইহাই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। প্রকৃত পরিচয়জ্ঞাপক বর্ণই যে, প্রতিমূর্ত্তি-চিত্রের সার-সামগ্রী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যদিও যথার্থ আদর্শের অনুকরণ ব্যতীত ইহাতে অন্য কিছুই নাই, তথাপি ইহার প্রকৃত পরিস্ফুরণ নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। অনেকেই কেবলমাত্র আলিম্পন বা অঙ্কনবিদ্যা (Drawing) ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়াই বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি-চিত্র প্রস্তুত করিতে যান। তাহাতে যথাযথ সীমরেখা ও নির্ভুল ছায়ালোক সম্পাতে চিত্র আদর্শানুরূপ ছবি বলিয়া চিনিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া দর্শকের ভ্রম হয় না। অতি অল্পসংখ্যক শিল্পীই জীবিতবৎ বর্ণ প্রতিফলিত করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে দুইটী বিষয়ের প্রতি শিল্পীর মনোযোগ রাখিতে হয়। প্রথমটী বহু বর্ণের মিলনজাত, একটী অনুরূপ অভিলষিত বর্ণের সংকলন; অন্যটী চিত্রমধ্যে সেই সকল বর্ণের যথাযথ বিলেপন। প্রথমটীর জ্ঞান, কর্ম্ম করিতে করিতে বহু দিনের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী সম্পূর্ণ কলা-বিজ্ঞান, তাহা শিক্ষকের উপদেশ মত ধীরচিত্তে শিক্ষা করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়।

বস্তুতঃ শিল্পী নিজের চক্ষে যাহা কিছু দেখে তাহাই চিত্রে প্রতিভাত করিতে যত্ন করে মাত্র, প্রতিমূর্ত্তি চিত্রে তদতিরিক্ত কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এ পর্য্যন্ত কোন শিল্পীই যে সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। বিশ্বশিল্পীর শিল্প রচনার যথার্থ অনুকরণ করা এই মনুষ্যশিল্পীর আদৌ সাধ্যায়ত্ত নহে—তবে যিনি আদর্শের যত অনুরূপ করিতে পারেন, তিনি ততই উচ্চশ্রেণীর শিল্পী বলিয়া সম্মানিত হয়েন। অনেকেই

নিজকৃত চিত্র চিত্র-দণ্ড বা ইজেলের উপর দেখিতে দেখিতে মোহিত হন, কিন্তু অন্যের চক্ষে তাহা হয়ত সেরূপ সুন্দর বলিয়া মনে হয় না—হয়ত শিল্পী নিজেই অপেক্ষাকৃত দূর হইতে বা উচ্চ গৃহভিত্তিতে চিত্রখানি রক্ষিত হইলে ঠিক হইয়াছে বা পূর্ব্ববৎ সুন্দর হইয়াছে অনুভব করিতে পারিবেন না। তাহার কারণ বর্ণ-চিত্রণের বর্ণ-বিজ্ঞান, তাহার বিলেপন জ্ঞান ও বহুদর্শিতালব্ধ অভিজ্ঞতার অভাব। একটী মিলিত বর্ণে, নিকট হইতে দেখিলে যে বর্ণের আধিক্য বোধ হয়, হয়ত দূর হইতে দেখিলে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য একটী বর্ণের আধিক্য উপলব্ধি হইবে, তাহাতে সেই আদর্শের অনুরূপ ছায়ালোকের ভিন্নতা বোধ হইবে, ফলে চিত্র দেখিয়া ভাল চিনিতে পারা যাইবে না। চিত্রের সীমারেখাগুলি হয়ত নির্ভুল, ছায়ালোকও যথাযথ সন্নিবেশিত হইয়াছে, পেন্সিল বা ক্রেয়নাদি দ্বারা কেবল কাল শাদায় অঙ্কিত হইলে, যে কেহ দেখিয়া সে ছবি চিনিতে পারিত, কিন্তু বর্ণ-বিলেপন হেতু নিকট হইতে ঠিক বোধ হইলেও, দূর হইতে হয়ত প্রতিমূর্ত্তির সেই ঈষৎ লালাভাযুক্ত ছায়াময় গাত্র-বর্ণের মধ্যে ভিতর হইতে যেন একটী নীল বা কৃষ্ণ বর্ণের আভাস প্রতীত হইতেছে, তাহাতে যেন আদর্শের সুগোল কপোল অপেক্ষাকৃত গভীর বা নিম্ন বলিয়া বোধ হইতেছে অথবা চিত্রের উজ্জ্বল পিতাভাযুক্ত আলোকাংশের মধ্যে কোথা হইতে যেন একটা অস্বাভাবিক লোহিত বর্ণ আসিয়া সেই অংশকে কিম্ভূত কিমাকার করিয়া তুলিয়াছে। চিত্রে এই সকল দোষ যাহাতে না হইতে পারে শিল্পীকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—টিসিয়েন, রুবেন্স, ভ্যানডাইক ও রেম্ব্রেণ্ট-প্রতীম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিত্র-শিল্পীগুরুদিগের কার্য্যাবলি ও তাহার বর্ণ-বিন্যাস-কৌশল আলোচনা করিতে হইবে।

আদর্শব্যক্তির বর্ণ অনুকরণ কালে শিল্পীকে আদর্শের তিনটী অবস্থা হইতে তাহার প্রকৃত বর্ণ সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথম যখন সে ব্যক্তি প্রথম আসিয়া বসিলেন, তখন তিনি স্বভাবতঃ বেশ প্রফুল্ল ও অধিকতর উৎসাহপূর্ণ থাকেন, সে সময় তাঁহার বর্ণও বেশ উজ্জ্বল ও চাকচিক্য বলিয়া মনে হয়, বোধ হয় ইহাই চিত্রানুকরণের সময়ে তাঁহার প্রথম অবস্থা; দ্বিতীয়, কিয়ৎক্ষণ পরে সে সাময়িক উত্তেজনা ও প্রফুল্লভাব প্রশমিত হইয়া নিত্য সরল সাধরণ ভাব আসিয়া পড়ে, তখন তাঁহার বর্ণও ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, ইহা চিত্রানুকরণকালের দ্বিতীয় বা মধ্যাবস্থা। অনন্তর তিনি অধিকক্ষণ আদর্শরূপে একভাবে একাসনে বসিয়া ক্লান্ত ও আলস্যপীড়িত হইয়া ক্রমেই তন্দ্রাভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, সেই সময় তাঁহার বর্ণও অপেক্ষাকৃত ম্লান ও বিশুষ্ক বলিয়া বোধ হয়, এই সময়ই চিত্রানুকরণের তৃতীয় কাল বলিয়া শিল্পিগণ নির্দ্দেশ করেন। এক্ষণে বলা আবশ্যক যে, আদর্শ-ব্যক্তির এই তিনটী অবস্থা সুন্দররূপে পর্য্যালোচনা করিয়া শিল্পী তাঁহার চিত্রে বর্ণ বিলেপন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রথম অবস্থা হইতে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষীণ রাখিয়া এবং শেষ অবস্থা হইতে তীব্রতর করিয়া মধ্যবর্ত্তী অবস্থার বর্ণই শিল্পীর অনুকরণীয়। শেষ অবস্থায় ক্লান্ত আদর্শকে কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই গৃহ মধ্যেই অথবা বাহিরে বিচরণ

করিতে অবসর দেওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে আদর্শের সেই মন্দীভূত বর্ণ পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, শিল্পীর বর্ণানুকরণে তখন সুবিধা হয়।

চিত্রস্থিত দৈহিক বর্ণের সঙ্গেসঙ্গেই পরিচ্ছদ ও ক্ষেত্রপৃষ্ঠের বর্ণ সকলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে তাহাদের সামঞ্জসে সেই বহু আয়াসলব্ধ দেহবর্ণও বিকৃত ও ম্লান বলিয়া বোধ হইবে। অনেক সময় অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বিশিষ্ট নর নারীকেও শুভ্র পরিচ্ছদে চিত্রিত করিতে হয়। য়ুরোপীয় প্রতিমূর্ত্তি বা তদনুরূপ পরিচ্ছদ পরিহিত ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। সে স্থলে কৃষ্ণ বা কোন গাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট স্থূল বস্ত্রই তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচ্য-প্রদেশ-সুলভ সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র ভারতবাসীর অধিকাংশ ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ, সুতরাং বাধ্য হইয়াই শিল্পীকে পূর্ব্বোক্তরূপ শুভ্র বস্ত্রসমূহ অনেক সময় চিত্রে বিন্যাস করিতে হয়। যদিও কৃষ্ণ বা যে কোনও গভীর বর্ণের পরিচ্ছদে চিত্রগত ব্যক্তির দেহ বর্ণের স্বাতন্ত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য অধিকতর বিকশিত হয়, কিন্তু ব্যবহার ও রুচিভেদ অনুসারে শুভ্র অথবা অতি হালকা বর্ণেরও বস্ত্র চিত্রে বিন্যাস না করিলে চলে না। অতএব শিল্পীকে অতি ধীর বিবেচনা সহকারে তাহা চিত্রিত করা বিধেয়। শুভ্রোজ্জ্বল দেহকান্তি বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচ্ছদে পীতাভ শ্বেতবস্ত্র কখনই প্রদান করিতে নাই, তাহাতে দেহ ও বস্ত্রের বর্ণ-পার্থক্যে সেই দেহ কান্তি বিকৃত হইয়া রক্তমাংস বর্জ্জিত শ্বেত প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় বোধ হইবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে পীতের পরিবর্ত্তে হরিৎ, নীল অথবা ধূসরাদি বর্ণাভায় শুভ্রবস্ত্র চিত্রিত করিলে চিত্র মূর্ত্তির দেহকান্তি অপেক্ষাকৃত সুন্দর বলিয়াই বোধ হইবে। অন্য পক্ষে গৌর কিম্বা শ্যাম বর্ণ বিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তিতে পীতাভ শুভ্র বস্ত্রই অধিকতর প্রীতিপ্রদ ও দেহবর্ণের অপেক্ষাকৃত ঔজ্জ্বল্য প্রদায়ক, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধে এই মাত্র মনে রাখিতে হইবে যে, অতিরিক্ত উজ্জ্বল কোন বর্ণের পরিচ্ছদ চিত্রমধ্যে বিন্যস্ত হইলে প্রতিমূর্ত্তির মুখচ্ছবি নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে, অর্থাৎ দর্শকের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম তাহার বস্ত্রাদির উপরই পতিত হইবে। প্রতিমূর্ত্তি-চিত্রের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যস্থল তাহার মুখ-মণ্ডল, যাহাতে সেই অংশের বিশিষ্টতা অতি সুন্দর-রূপে প্রতীয়মান হয়, শিল্পীর তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে চিত্রের ক্ষেত্রপৃষ্ঠ (Back ground) ও তাহার তল ক্ষেত্র সম্বন্ধেও বলা কর্ত্তব্য যে, পরিচ্ছদ-বস্ত্রের বর্ণের অনুরূপ এই উভয় স্থানের বর্ণাবলীর প্রতিও সমান মনোযোগ রাখিতে হইবে; অর্থাৎ বস্ত্র ও পরি-চ্ছদ অপেক্ষা এই সকল স্থানের বর্ণ আরও গাঢ়তর করিতে হইবে, যাহাতে দর্শকের দৃষ্টি আদৌ তাহাতে আকৃষ্ট না হয়। স্থূল কথা—গাঢ় পাটল বা নীল কৃষ্ণ বর্ণই এই সকল স্থানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। অনেক স্থলে চিত্রস্থ ব্যক্তির মূর্ত্তি উজ্জ্বলতর করিবার মানসে উহার পশ্চাতে পূর্ব্বোক্ত বর্ণের কোনও পরদা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। যে স্থলে পরদার সুবিধা না হয় সে স্থলে ক্ষেত্রপৃষ্ঠে গৃহভিত্তির অনুরূপে চিত্রিত করা হয়, কিন্তু তাহাতেও সেই গাঢ়তর বর্ণের বিলে-পন বাঞ্ছনীয়। তবে এই ক্ষেত্রপৃষ্ঠ উন্মুক্ত মেঘ-রাশিরঞ্জিত আকাশাংশ না হইলে প্রতিমূর্ত্তিস্থিত আলোক-গতির বিপরীতে ছায়ালোক বিন্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ যে পার্শ্ব হইতে আলোক আসিয়া

প্রতিমূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলোকিত করিয়াছে, ক্ষেত্র-পৃষ্ঠের বর্ণবিন্যাস-সময়ে সেই পার্শ্বই ছায়াময় করিয়া তাহার বিপরীত পার্শ্ব ছায়ালোকের ক্রমমিল দ্বারা অপেক্ষাকৃত আলোকময় করিতে হইবে। তাহাদ্বারা প্রতিমূর্ত্তির ছায়াংশ পরিস্ফুট হইবে, অর্থাৎ পশ্চাতের অপেক্ষাকৃত আলোকময় ক্ষেত্রদ্বারা প্রতিমূর্ত্তির ছায়াংশের সুন্দর পার্থক্য প্রতিপাদন করিবে। পূর্ব্বে ছায়ালোকের যে, (Digree) ডিগ্রি বা অংশের কথা বলা হইয়াছে, শিল্পী সে বিষয় কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, আলোক গৃহের এক পার্শ্ব হইতে আলোক আসিয়া মূর্ত্তির যে যে অংশ আলোকিত করে, ক্ষেত্র-পৃষ্ঠে ঠিক তাহার বিপরীত ভাবেই আলোক পতিত হয়। যদ্যপি কোন গৃহে শিল্পীর বাম পার্শ্বস্থ উত্তর-দিকের কোনও দ্বার বা জানালা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ আলোক গতির অংশ নিরূপিত হয় এবং সেই আলোকে আদর্শ ব্যক্তিকে পশ্চিমাস্য করিয়া বসান হয়, তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধ দেখা যাইবে, আদর্শের দক্ষিণ পার্শ্ব আলোকিত এবং তদ্বিপরীত পার্শ্ব ছায়া-ময় হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই আদর্শের ক্ষেত্রপৃষ্ঠ বা ঐ গৃহের পূর্ব্বদিকে ভিত্তিগাত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উত্তরের সেই দ্বার বা জানালা হইতে বক্র গতিতে আলোক আসিয়া তাহার উপরেও পতিত হই-য়াছে, তাহাদ্বারা সেই সম্পূর্ণ দেয়ালটী আলোকিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে ছায়ালোকের এমন একটী সুন্দর ক্রমমিল (Harmony of the light of sha-de) বিন্যস্ত হইয়াছে, যাহাতে গৃহের সেই দেয়ালের উত্তর পূর্ব্ব উপরের কোণের ঘনচ্ছায়া হইতে নিম্নের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত আলোকপ্রভার ক্রমমিলন পরিলক্ষিত হইবে। শিল্পীকে অতি সাবধানে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিত্রের ক্ষেত্রপৃষ্ঠ চিত্রিত করিতে হইবে। নতুবা চিত্র ক্ষেত্রপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইবে না। চিত্রে পূর্ণ প্রতি-মূর্ত্তি না হইয়া যদ্যপি মুখ ও বক্ষস্থলমাত্র (Bust) চিত্রিত হয় তাহা হইলে উহার পশ্চাতে পূর্ব্বোক্তরূপ কেবল মাত্র গাঢ় বর্ণের দেয়ালের অনুরূপ ছায়ালোক বিন্যাস করিলেই হইবে, কিন্তু হস্ত পদাদি যুক্ত সুবৃহৎ সম্পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তির চিত্রণকালে ক্ষেত্রপৃষ্ঠে আবশ্যক ও রুচি অনুসারে গৃহভিত্তি পরদা, ও অন্যান্য বিবিধ সামগ্রী রক্ষিত হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে পার্শ্বস্থিত কোনও উন্মুক্ত দ্বার, জানালা বা দালানের মধ্য দিয়া দূরস্থিত প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যাবলী সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রতিমূর্ত্তি চিত্রকরকে নিসর্গচিত্রেও (Landscape painting) অল্পাধিক অভিজ্ঞ হইতে হইবে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইবে। এক্ষণে প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণের ত্রিবিধ অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই অংশ শেষ করিব।

প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণ ব্যাপারে শিল্পীকে যথাক্রমে চিত্রের তিনটী অবস্থার বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথম শুষ্কবর্ণ বিলেপন, ইংরাজী ভাষায় ইহাকে (Dead colouring) বলে, দ্বিতীয় মধ্যবর্ণ বিলেপন, (2nd colouring) এবং তৃতীয় সংশোধন ও সম্পন্ন করণ (Retouching finishing)।

শিল্পী প্রতিমূর্ত্তি চিত্র আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শানুরূপ যথার্থ বর্ণাবলীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য

করিবে, সে সময় কেবল মূর্ত্তির সীমারেখা, ছায়ালোক ও আস্য রেখাদির অঙ্গস্থ স্থানের নির্দ্দেশ সহযোগে যে কোনও অগভীর বা হালকা বর্ণে চিত্রের লাঞ্ছনান্তর্গত স্থান সমূহ পূর্ণ করিয়া যাইবে। বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা মূর্ত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার অবসর তখন শিল্পীর থাকিতে পারে না, কোনরূপে কতকটা আদর্শের অনুরূপ ভাব ও পরিচায়ক বর্ণাবলী সহযোগে চিত্রের সকল স্থান পূর্ণ করাই তখন তাঁহার কার্য্য। তদনন্তর চিত্রের দ্বিতীয় অবস্থায় শিল্পী আদর্শের অনুরূপ বর্ণের বিন্যাস করিতেই বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম স্থানসমূহ ও ছায়ালোকের যথাযথ সমাবেশাদি কার্য্যও এই মধ্য-বর্ণ বিলেপন সময়েই শিল্পীর করণীয়। ইহার পর চিত্রের তৃতীয় অবস্থায় শিল্পী অতিশয় মনোযোগসহ আদর্শের সহিত পুনঃ পুনঃ তুলনা দ্বারা ও ধীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহযোগে তাহার ভ্রমপূর্ণ স্থান সকলের সংশোধন, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও উজ্জ্বল আলোকাংশের (High lights) যথাযথ সংরক্ষণ এবং চিত্তমনোভাববোধক পেশীসমূহের সংকোচনাদি দ্বারা আস্য-রেখাগুলির সম্পূর্ণ পুষ্টিসাধন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া চিত্রের পরি-সমাপ্তি করিতে হয়। এই বিষয়ত্রয় বর্ণ বিলেপন প্রণালী বা তাহার ক্রিয়াসিদ্ধাংশে অধিকতর বিস্তৃত করিয়া বিবৃত হইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভুল।

সখা!
ভুল ভালবাসা, ভুল সব আশা,
ভুল যত সব কল্পনা,
ভুল মায়াকথা, ভুল প্রাণে ব্যথা,
ভুল সব মোর যাতনা।
অদ্ভুত সংসার, ভুলের আগার,
ভুল তুমি আমি সখা হে,
ভুলিয়া দুজনে, মিলিনু স্বপনে,
স্বপনের মত যা'ব হে।
মোর প্রিয় যাহা, ভুল যদি তাহা,
ভুলে ভুলে কেন ভ্রমি রে—
ভুলে চোখে দেখা, ভুলে মনে আঁকা
ভুলে যাও সখা আমারে।

শ্রীঅভয়াপদ গঙ্গোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবাদ।

কেবল মাত্র সমধাতু রক্ষাই আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু বিষমধাতু পুরুষে ধাতুসাম্যকরণ অর্থাৎ ধাতুসাম্য ক্রিয়াও এই তন্ত্রের উদ্দেশ্য। বাতপিত্তাদি ধাতুর সমতা অর্থাৎ সমভাবে অবস্থান প্রকৃতি, আরোগ্য ইত্যাদি অর্থবোধক।

যথা—

"বিকারো ধাতু বৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতি রুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞক মারোগ্যং বিকারো দুঃখমেবতু॥"

চঃ সূঃ ৯ অঃ।

সর্ব্বত্রই সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তিই মুখ্য প্রয়োজন। কিন্তু তদুভয় কেবলমাত্র ধাতুসাম্যক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ধাতুসাম্যকার্য্য—সুখ; পরন্তু দুঃখনিবৃত্তি (চরম দুঃখধ্বংস) মোক্ষ দ্বারা লাভ হয়। ধাতুসাম্য কার্য্যে যে সুখের উল্লেখ করা হইল তাহা নিত্যসুখ নহে। কারণ নিত্যসুখ অথবা অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত নিষ্পন্ন হয় না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত মন সমধাতু হয় না; অতএব ধাতুসাম্য কার্য্যই দুঃখনিবৃত্তির কারণ।

এই জন্য অমরাময়নিসূদন ভগবান ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

"অথ খল্বায়ুর্ব্বেদ প্রয়োজনং ব্যাধ্যুপ সৃষ্টানাং
ব্যাধিপরিমোক্ষঃ সাম্যরক্ষণঞ্চেতি।" সুশ্রুত।

ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির রোগ বিমোচন ও স্বস্থের ধাতু সাম্যরক্ষণ এতদুভয়ই আয়ুর্ব্বেদের মুখ্য প্রয়োজন।

কিরূপে ধাতুবৈষম্য ও ধাতুসাম্য হয় তাহার কারণ সংক্ষেপে দেখান যাইতেছে।

"কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগোমিথ্যা নচাতিচ।
দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ'।"

চঃ সূঃ ১অঃ।

শীত গ্রীষ্মাদি কাল, বুদ্ধি (ধী, ধৃতি, স্মৃতি প্রযুক্ত বাক্য, মন ও শরীর প্রবৃত্তি) এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থের পুরুষে অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ মন ও শরীরাশ্রিত ব্যাধি-সমূহের তিন প্রকার সংক্ষিপ্ত কারণ।

এক্ষণে অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ এই কারণ ত্রয়ের প্রকৃতার্থ অনুসরণ করা যাউক।

১। শীত গ্রীষ্মাদি কালের—শীতত্ব, উষ্ণত্বাদি স্বরূপের অতিশয়রূপে প্রকাশ—অতিযোগ। উহা-দের স্বরূপের হীনভাবে প্রকাশ—অযোগ এবং স্বরূ-পের বিপরীত রূপে প্রকাশ—মিথ্যাযোগ।

২। বাক্য, মন ও শরীরের অতিশয়ভাবে প্রবৃত্তি (ক্রিয়া)—অতিযোগ। উহাদের সর্ব্বথা অপ্রবৃত্তি—অযোগ এবং উপস্থিত মূত্রাদিবেগের বেগধারণ, অনা-গত বেগের উদীরণ, উচ্চস্থান হইতে পতন, সমস্থানে বিষমভাবে পতন, বিপর্য্যয়রূপে অঙ্গ পরিচালনাদি, অধিকরূপে কণ্ডূয়নাদি জনিত অঙ্গদোষ, দণ্ডাদি দ্বারা অঙ্গে আঘাত, অঙ্গ বিমর্দ্দন, অযথারূপে নিশ্বাস প্রশ্বাস ধারণ এবং অনিয়মিত ব্রত, উপবাসাদি জনিত ক্লেশ—মিথ্যাযোগ।

৩। চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য—অতিপ্রভাবশালী সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি দৃশ্যবস্তুর অতিশয় দর্শন—অতিযোগ; উহাদের সর্ব্বথা অদর্শন—অযোগ এবং অতি সূক্ষ্ম ও অতি নিকটস্থ দৃশ্য, অতি দূরস্থ মূর্ত্ত দ্রব্য, উগ্ররূপ, ভীমমূর্ত্তি, আশ্চর্য্যজনক দ্রব্য, যে বস্তু যাহার দ্বেষ্য, নিন্দনীয় ঘৃণাজনক বস্তু, চক্ষু কর্ণাদিহীন মূর্ত্তি, অমনোজ্ঞ এবং অপবিত্র বস্তু ইহাদের সম্যক দর্শন হয় না বলিয়া—মিথ্যাযোগ!

৪। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য—অতিশয় মেঘ শব্দ, পটহ শব্দ, (ঢাকের শব্দ) উচ্চৈঃ শব্দ, বীরদর্প ও সিংহনাদাদি শব্দের অতিমাত্র শ্রবণ ও অনতিমাত্র মেঘশব্দাদির অতি শ্রবণ—অতিযোগ। ঐ সমস্ত শব্দের সর্ব্বথা অশ্রবণ অযোগ এবং পরুষাদি শব্দের শ্রবণ মিথ্যাযোগ।

৫। ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য—অতি তীক্ষ্ণ মরিচাদি, অতি উগ্র চম্পকাদি, অত্যভিষ্যন্দি ফাণিত সুরা আসবাদি

দ্রব্যের অতিমাত্র আঘ্রাণ—অতিযোগ। ইহাদের আদৌ ঘ্রাণ না লওয়া—অযোগ এবং পূতি, দ্বেষ্য, অপবিত্র, ক্লেদযুক্ত, বিষযুক্তবায়ু, ও শব প্রভৃতি গন্ধের আঘ্রাণ—মিথ্যাযোগ।

৬। রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য—মধুরাদি রসযুক্ত দ্রব্যের অতিশয়রূপে অশন, পানাদি—অতিযোগ। উহাদের সর্ব্বতোভাবে ভক্ষণ ও পানলেহাভাব—অযোগ এবং পরিমাণ, অপরিমাণের প্রয়োজন বিনিশ্চয়কারক রাশি (আহার পরিমাণ রূপ) পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, দেশ, কাল, উপযোগ সংস্থা এবং উপযোক্তা ইহাদের বিরুদ্ধভাবে আহাররসের উপযোগ—মিথ্যাযোগ।

৭। স্পর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য—অতিশয় শীতোষ্ণ, স্নান, অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন), উদ্বর্ত্তন (গাত্রে দ্রব্যাদি বিলেপন), প্রভৃতির অত্যধিক সেবন—অতিযোগ। উহাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপসেবন অযোগ এবং বিষমস্থান, খড়্গাদির আঘাত ও অশুচি দ্রব্যাদির সংস্পর্শ—মিথ্যাযোগ।

এক্ষণে রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য আহার রসের মিথ্যাযোগে উক্ত প্রকৃতি, করণ প্রভৃতি শব্দের প্রত্যেকের পৃথক্‌ভাবে অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। কারণ এই কয়টীর অর্থ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসান্বিত দ্রব্যের মিথ্যাযোগ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না।

প্রকৃতি—স্বভাব; অর্থাৎ আহার্য্য এবং ঔষধের স্বাভাবিক গুরুত্বাদি গুণযোগ। যেমন মাষকড়াই ও মুদগ; বরাহ মাংস এবং এণ (হরিণ বিশেষ) মাংস। এস্থলে মাষকড়াই—গুরু ও স্নিগ্ধ গুণযুক্ত। মুদগ (মুগ) লঘু এবং রুক্ষগুণযুক্ত। তদ্রূপ বরাহ মাংস গুরু ও শ্লেষ্মকারক, এণমাংস লঘু এবং ত্রিদোষনাশক। এইরূপ, দ্রব্যে স্বাভাবিক গুরুত্ব, লঘুত্ব প্রভৃতি গুণযোগই প্রকৃতি নামে অভিহিত।

করণ—জল ও অগ্নিসংযোগ, শৌচ, মন্থন এবং দেশকালানুসারে ভাবনাদি দ্বারা * দ্রব্যের সংস্কার অর্থাৎ গুণাধিক্য সাধনের নামই করণ।

সংযোগ—দুই অথবা বহু বস্তুর মিলনের নাম সংযোগ। পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য সমূহে যে বিশেষ গুণ দেখাযায় না, এই সংযোগ সেই বিশেষ গুণের উৎপাদক। যেমন মধু ও ঘৃতের সংযোগ বিষের ন্যায় গুণ কর্ম্ম উৎপাদন করে; কিন্তু পৃথকভূত মধুও ঘৃতে তাহা অনুভূত হয় না। এই প্রকার মধু, মৎস্য ও দুগ্ধ সংযোগ।

দেশ—অর্থাৎ স্থান, এই স্থান তিন প্রকার। দ্রব্যের উৎপত্তি স্থান, প্রচার স্থান এবং দেশসাত্ম্য †। উৎপত্তি স্থান—আনূপ স্থান (জলসমীপস্থ স্থান) ও জাঙ্গল স্থান (অরণ্য) তত্তত্‌স্থানজাত ওষধি প্রভৃতির মৃদু তীক্ষ্ণাদি গুণের জ্ঞাপক। প্রচার স্থান—দেশান্তর হইতে আনীত দ্রব্য সমূহের দূরতা নিবন্ধন কালবিলম্ব হেতু গুণান্তরের জ্ঞাপক। দেশ সাত্ম্য—জাঙ্গল দেশবাসী বহুভোজী এবং প্রাচ্য দেশবাসী (বঙ্গদেশ বাসী) মৎস্য সাত্ম্য (মৎস্য প্রিয়) ইত্যাদির প্রকাশক।

কাল—নিত্যগ ও আবস্থিক ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে নিত্যগ—সংবৎসররূপ; আবস্থিক—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, তিন, চারি, পাঁচ দিবস প্রভৃতি। সুস্থ ব্যক্তির যে ঋতুতে যে দ্রব্য উপকারী ও প্রিয়, সেই ঋতুতে সেই দ্রব্য ভোজন করা উচিত, ঈদৃশ সম্বন্ধ বিশিষ্ট সংবৎসরই নিত্যগ কাল। জরাদি রোগযুক্ত ব্যক্তি দিগের অবস্থা বিশেষের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, দুইদিবস, তিনদিবস, পাঁচদিবস প্রভৃতি কাল আবস্থিক নামে অভিহিত।

উপযোগ সংস্থা—উৎসাহ, শরীরের লঘুতা, পরিপাক সূচক উদ্গার ও ক্ষুধা তৃষ্ণাদিরূপ জীর্ণাহার লক্ষণ জ্ঞাত হইয়া আহারের নিয়মই উপযোগ সংস্থা নামে কথিত।

উপযোক্তা—ভোজ্য দ্রব্য প্রকৃষ্টরূপে রোগের অনুৎপাদক এবং সুখকর বিবেচনা করিয়া, স্বাভাবিক গুরুত্ব লঘুত্বাদি গুণের বিচার পূর্ব্বক, পুরুষের প্রকৃতি অগ্নি এবং বলাদির অনুরূপ গুণাধিক্য সাধন দ্বারা তাহার অনুরূপ করিয়া, বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ স্থির করিয়া রাশি দ্বারা (আহার পরিমাণরূপ) মাত্রা নিরূপণ করিয়া, দ্রব্যের উৎপত্তিস্থান, প্রচারস্থান ও দেশসাত্ম্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক আবস্থিক কাল দ্বারা অবস্থা বিশেষ বিচার পূর্ব্বক, তদনুরূপ মণ্ডাদি প্রস্তুত করিয়া, নিত্যগ কালদ্বারা গ্রীষ্মাদি ঋতুর উপযোগী বিবেচনা করিয়া, উপযোগ সংস্থাদ্বারা জীর্ণ ও অজীর্ণ চিহ্ন বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া, যাহার সম্বন্ধে যে দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য তাহাকে উপযুক্তরূপে যে ব্যক্তি সেই আহার দ্রব্য প্রদান করে তাহার নাম উপযোক্তা।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন।

* গুণাধিক্যের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত দ্রবদ্রব্যদ্বারা ঔষধের পুনঃ পুনঃ মারণ ও শোধনের নাম ভাবনা।

† দেশভেদে রোগাদি বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস নিবন্ধন পীড়াকর না হইয়া যে সুখজনক হয় তাহাই দেশসাত্ম্য।

দেশের দুরবস্থা।

এই বঙ্গের দুরবস্থার কথাই বলিতেছি। ভাবিলে, চক্ষে জল বহে—ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে বুক ভাঙ্গিয়া যায়—এ বঙ্গের জাতীয় জীবনের আশা আকাশ-কুসুম বলিয়া মনে হয়!—তথাপি, এখনও সময় আছে; তাই পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়াছি। পাঠক, আসুন, আজ একবার ভাবিয়া দেখি,—এ বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা কি?—এ বঙ্গের দুরবস্থা কি?—তাহার প্রতিকার কি? নতুবা এ বঙ্গের ভবিষ্যৎই বা কি?

বস্তুতঃই কি বঙ্গদেশ শনৈঃ শনৈঃ দুরবস্থার নিম্ন ও নিম্নতর স্তরে অবতরণ করিতেছে?—সে কথা সর্ব্বথা স্বীকার করা যায় না। বঙ্গের কত কৃতবিদ্য ও রাজনীতিজ্ঞ মনীষীগণ বাগ্মিতা প্রদর্শনে সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না; বঙ্গদেশ স্বদেশী পণ্যে অনুরক্তি প্রদর্শন করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছে, ও আপনার অর্থ সম্পদের পথ প্রশস্ত করিয়াছে, সে কথাও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য; বঙ্গদেশ 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য আজ ইংরাজের দ্বারে আবেদন নিবেদনে অগ্রসর হইয়াছে, ইহাও যে দেশের পক্ষে বিশেষ শুভাশংসী তৎপক্ষেও অনুমাত্র সন্দেহ করি না; বঙ্গদেশ যে পৃথিবীর অনেক দেশ অপেক্ষা শিক্ষায় সমুন্নত হইয়াছে, তাহাও সর্ব্ববাদী সম্মত, ও বঙ্গের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। তবে কেমন করিয়া বলিব, বঙ্গদেশ সর্ব্বাংশেই দুরবস্থার নিম্নতর স্তরে অবতরণ করিতেছে?

কথাটী তা' নয়। আমি এ বঙ্গের স্বল্পাঙ্গের আপাত ঔজ্জ্বল্যে বিমুগ্ধ হইয়া, ইহার অন্যান্য অঙ্গের দুরবস্থা ও ইহার ভবিষ্যতের প্রতি অন্ধ দৃষ্টিতে নেত্রপাত করিতে সম্মত বা সমুৎসুক নহি।

বস্তুতঃ, যখন ভাবিয়া দেখি যে এ বঙ্গের জাতীয় জীবনে স্বাস্থ্য নাই, শক্তি নাই, সম্পদ্ নাই, বুঝি ধর্ম্ম-জ্ঞানও নাই, কিছুই নাই,—সমস্তই ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া আসিতেছে, তখনই মনে হয়, ধরিত্রীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসে বুঝি এ অভাগিনী অনুগাঙ্গিনী বঙ্গভূমির স্থান নাই—মনে হয় বুঝি সহস্র বৎসর পরে অতীত ইতিহাসের স্মৃতির কুক্ষিতে এ বঙ্গের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!

নয়ত, কি?—এ বঙ্গের কি আছে? শস্য নাই সম্পদ্ নাই;—দুর্ভিক্ষের করাল রাক্ষস অট্ট হাস হাসিয়া বর্ষে বর্ষেই এ বঙ্গের কোন না কোন দেশে নাচিয়া নাচিয়া বিচরণ করিতেছে! এ বঙ্গের কি আছে? স্বাস্থ্য নাই, শক্তি নাই;--বাঙ্গালী কদর্য্য আহারে পুষ্ট, ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত, বাঙ্গালার অধিবাসী রোগে, শোকে ও দৈন্য-দারিদ্র্যে দিন দিন জীর্ণ-শীর্ণ ও অস্থি-কঙ্কালে পরিণত! এ বঙ্গের কি আছে? ধর্ম্মজ্ঞান নাই, আত্ম-সংযম নাই;—মানুষ মাম্‌লা করিয়া গৃহ শ্মশান করিতেছে, পরোপকার ও স্বার্থ-ত্যাগাদি সদ্‌গুণ বিসর্জ্জন করিয়া দাম্পত্য-প্রণয়ের আপাত সুখে স্বাস্থ্য সৌভ্রাত্র ও একান্নবর্ত্তিতা বিসর্জ্জন দিতেছে! এ বঙ্গের কি আছে? ধর্ম্মজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ পুষ্করিণী খননে মনোযোগী হয় না—পরের জন্য কেহ রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হয় না—জ্ঞাতি-হিংসা ত্যাগ করিয়া কেহ পৈত্রিক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করে না—গো জাতির সুখ-দুঃখের প্রতি কেহ নেত্রপাত করে না—স্বার্থ ও বিলাসিতার জন্য আকৃষক ভদ্র সন্তান পাটের চাষে নির্ভর করিয়াছে—মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় ও অধিকাংশ জমীদারগণ নগরজীবন যাপনের জন্য স্বপল্লী ত্যাগ করিয়াছে!—বঙ্গপল্লী শ্মশান হইতে চলিয়াছে! বঙ্গপল্লীর সে স্বাস্থ্য-সুখ আমোদ-উৎসব আর নাই! তাই বলিতে ছিলাম, এ বঙ্গের কি ছিলনা, এখন কি আছে? এ বঙ্গের ভবিষ্যৎই বা কি? কথাটী ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি, তাই কথাটী পাড়িয়াছি। পাঠক, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আমাদের কি আছে? আমাদের পরিণাম কি?

বঙ্গের জাতীয় জীবন।

স্থূলতঃ, দেশের ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টির নামই জাতীয় জীবন। হিন্দু মুসলমানের সমষ্টি লইয়া বাঙ্গালী; এই বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টিই আমাদের জাতীয় জীবন। কিন্তু আমাদের এই ব্যক্তিগত জীবনের পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কি দেখিতে পাই?—মানুষ হইতে হইলে আমাদের কি চাই? মানুষের স্বাস্থ্য চাই, শারীর শক্তি চাই, অর্থ-সম্পদ্ চাই, শিক্ষা চাই, নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান চাই, বৈষয়িক জ্ঞান চাই;—মানুষের অনেক পদার্থ চাই, তবেই মানুষ যথার্থ মনুষ্য পদ-বাচ্য। তেমন মনুষ্য-জীবনের সমষ্টি লইয়া এ বঙ্গের জাতীয় জীবন গঠিত কি না, তাহাই আমরা পর্য্যালোচনা করিব।

(১) স্বাস্থ্য ও শারীর শক্তি।

স্বাস্থ্য এ বাঙ্গালার কয়জনের আছে? উচ্চ শিক্ষাভিমানী যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিষ্পেষণে

স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ধনিসন্তানগণ আলস্য ও দুশ্চিন্তায় স্বাস্থ্যহীন, কৃষকগণ দৈন্য-দারিদ্র্য ভারে ও নানা কারণে স্বাস্থ্যহীন, মধ্যবিত্তগণ কেহ বা দাসত্ব-ভারে কেহ বা বিলাসিতা ও সংসার পালনার্থ অর্থ-চিন্তায়, কেহ বা কন্যা ভারে কেহ বা পুত্র শিক্ষার ব্যয় ভারে, কেহ বা মাম্‌লার দুশ্চিন্তায় আর কেহ কেহ বা মদ্য বারাঙ্গনায়,—ইত্যাদি নানা কারণে প্রায় অনেকেই ভগ্ন-স্বাস্থ্য। উপযুক্ত স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি এ বঙ্গে বর্ত্তমানে বড় দুর্লভ। সুতরাং শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য-সম্পন্ন ব্যক্তির এ বঙ্গে যে বর্ত্তমানে কত অভাব তাহা স্বতঃই অনুমেয়!

তবে আশা কি? এমন দুর্ব্বল জাতীয় জীবনে আশা কত টুকু? সমাজের নিম্ন মধ্য ও উচ্চস্তরের অধিকাংশেরই স্বাস্থ্য ও শারীর শক্তির এবম্বিধ দুরবস্থায়, আমাদের এই স্বাস্থ্য-শক্তি- হীন জাতীয় জীবনে কতটুকু আশা ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে?

একজন আফগান বা একজন গোরার সহিত বঙ্গের অধিকাংশ লোকের তুলনা করিয়া দেখ। দশজন ইংরাজ বা ফরাসী বা রুশিয়ান বা আফগানকে দাঁড় করাইয়া, তাহার সম্মুখে শত বাঙ্গালীকে স্থাপন কর,--দেখিবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্যের সহিত উল্লিখিত জাতি-চতুষ্টয়ের স্বাস্থ্য-শক্তির পার্থক্য কত অধিক! কেবল যে বাঙ্গালার জল-বায়ুই বাঙ্গালীকে এত হীনবল রুগ্ন-শীর্ণ ও ক্ষুদ্রকায় করিয়া গঠন করিতেছে, এ কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করা যায় না। এক দিন এ বাঙ্গলায় অসংখ্য লোক স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তিমান্ ছিল, তাহার যদি প্রমাণ থাকে, তবে দেশের দোষেই যে আমরা দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রাকার, সে কথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? এখন জিজ্ঞাস্য, তবে বর্ত্তমান বাঙ্গালীর এ ক্ষুদ্র কায়ত্ব ও দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতা কোথা হইতে আসিল? দেশের জলবায়ু-ভেদে মানুষের স্বাস্থ্য-শক্তির যে বিভিন্নতা ঘটে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু বাঙ্গালী কেবল সে কারণে হীন-স্বাস্থ্য বা হীন-বল নহে।

বাঙ্গালীর অস্বাস্থ্যের কারণ।

স্বাস্থ্যবান্ ও বলবান্ হইতে হইলে মানুষের অনেক পদার্থ চাই;—উপযুক্ত আহার্য্য চাই, উপযুক্ত বাসস্থান চাই, বিশুদ্ধ জলবায়ু চাই, ধর্ম্মজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-সংযম চাই, উপযুক্ত ব্যায়াম চাই,—অনেক পদার্থ চাই; কিন্তু আজ বাঙ্গালীর বোধ হয় উল্লিখিত সমস্ত পদার্থেরই অভাব ঘটিয়াছে।

(ক) পেট ভরিয়া পুষ্টিকর খাদ্য বাঙ্গালী আর খাইতে পায় না,—বঙ্গদেশে দুগ্ধ-ঘৃত মৎস্য মাংসের আর তেমন প্রাচুর্য্য নাই, যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাও মহার্ঘ্য, কাজেই পুষ্টিকর খাদ্য শতকরা ৯০জন লোকের অভাব! তারপর, অধিকাংশ স্থলে ভেজাল তৈল ঘৃতাদি বাজারে বিক্রীত হইয়া মানুষের স্বাস্থ্যে বিষ-প্রয়োগ করে! তার পর দরিদ্র কৃষকগণের কথা। তাহারা উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষ বশতঃ দু'বেলা পেট ভরিয়া তণ্ডুলান্নেও বঞ্চিত হইয়াছে! কার কথা বলিব? উপযুক্ত আহার দ্বারা শক্তিমান্ ও স্বাস্থ্য-বান হওয়ার পথ বাঙ্গালীর পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছে। কেন, তাহা আর কি বলিব?

(খ) অতঃপর ইন্দ্রিয় সংযমের কথা। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাবে ও নৈতিক জ্ঞানের দুরবস্থায়,

বাঙ্গালী শুক্র সঞ্চয়ে আর তেমন পুণ্য মনে করে না; উচ্ছৃঙ্খল যুবক শৌণ্ডিকালয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন করে ও বারাঙ্গনার দ্বারে রোগের বীজ ক্রয় করে, আর উপন্যাস-পাঠক নব্য-যুবকগণ ধর্ম্মপত্নীকে উপপত্নীত্বে পরিণত করিয়া স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন করে। ফল কি হয়? যাহারা রোগের বীজ ক্রয় করিয়া আনে, তাহারা সমাজের অঙ্গে তাহা বিস্তার করে, তাহাদের বংশ-ধরেরা বংশানুক্রমে সেই ব্যাধি-বীজ বহন করে, আর যাহারা ধর্ম্মপত্নীতে অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় করিয়া স্বাস্থ্য-শক্তি নষ্ট করে, তাহারা দুর্ব্বল মানববংশের জনক রূপে সমাজের অঙ্গ দুর্ব্বল করিয়া দেয়! কেবল তাহা নহে। শুক্র ক্ষয়ের দ্বারা যে দেহ তেজশূন্য, তাহা ম্যালেরিয়াদি দ্বারা অতি শীঘ্রই পর্য্যুদস্ত হয়।

(গ) অতঃপর ব্যায়ামের কথা। কৃষকগণকে ও দরিদ্র ব্যবসায়িগণকে অনেক সময় পেটের দায়ে অতি পরিশ্রমে বাধ্য হইতে হয়; অন্ততঃ, ভদ্র সন্তান-গণ শ্রমকর অঙ্গসঞ্চালনাদিকে অভদ্রতা মনে করেন! উপযুক্ত আহার্য্য ও ব্যায়ামের অভাবে শিক্ষিত যুবক গণ অধিকাংশই পীড়িত জীবন বহন করেন,—এ কথার প্রমাণের ভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

(ঘ) অতঃপর উপযুক্ত বাসস্থান ও বিশুদ্ধ জল বায়ুর কথা। পাঠক, এ বর্ষায় আপনার পল্লীগ্রামের প্রতি একবার নেত্রপাত করুন।

রাস্তা-ঘাট পচিয়া গলিয়া ধসিয়া গিয়াছে! কোন কোন পল্লীতে বাঁধা রাস্তা-ঘাটও নাই, আজানু কর্দ্দমে পথ-ঘাট নরকের বিভীষিকা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! সংস্কার-শূন্য পুষ্করিণী সকল দূষিত গ্যাস উদ্গীরণ করিতে করিতে বর্ষার জলে পূর্ণ রহিয়াছে! মশক পূর্ণ আগাছা-জঙ্গল ও পাটবন গ্রাম ঢাকিয়া রাখিয়াছে! মানুষ তাহারই মধ্যে বাস করে, সেই কাদায় বিচরণ করে, সেই দূষিত পুষ্করিণীর জল পান করে! অথচ তেমন আহার্য্য পায় না; নানা কারণে মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রহে। ঘরে ঘরে শিশু যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ, ম্যালেরিয়ায় কেহ না কেহ শুইয়া আছে!—ইহারই নাম বঙ্গের পল্লীগ্রাম। ইহারই ভয়ে বহুসংখ্যক লোক নগর-বাস আশ্রয় করে! কিন্তু বঙ্গ-পল্লীর সংস্কারের দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে না।

পল্লীগ্রামের আর সে মুক্ত প্রান্তর নাই, মানুষের ব্যায়ামের স্থান নাই, গোচারণের ক্ষেত্র নাই, বিশুদ্ধ জল বায়ু নাই! কেন এমনটী হইল?—এ কথা ভাবিলে অনেক কথা মনে পড়ে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে পাটের চাষের দিকেই আমাদের নয়ন আকৃষ্ট হয়।

বিলাসিতার জন্য, মামলার জন্য, অনাবশ্যকীয় আমোদ প্রমোদের জন্য, অনাবশ্যকীয় মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য, আজকাল বাঙ্গালীর অর্থাধিক্যের প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রয়োজন-জ্ঞান অনেকের মনে অর্থগৃধ্নুতা সৃজন করিয়াছে। পল্লীগ্রামের ভদ্র-অভদ্র কৃষকগণও এ অর্থগৃধ্নুতায় উন্মত্ত হইয়াছে। আমার মনে হয়, সেই জন্যই দেশে পাটের চাষের আধিক্য ঘটিয়াছে। ৩০।৪০ বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন উল্লিখিত পাপ সকল সমাজে প্রবেশ করে নাই, তখন পাটের চাষে লোক এত নির্ভর করে নাই, তখনও দেশের স্বাস্থ্য এত হীনাবস্থা হয় নাই।

যাহা হউক অর্থগৃধ্নুতা পাপের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষিজীবী ভদ্র সন্তানগণ ও নিরক্ষর কৃষকগণ, দেশের

স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অমঙ্গলের প্রতি নেত্রপাত করিতে সম্মত নহে। ইহারাই পাটের চাষ বিস্তার করিতেছে। ফল ফলিতেছে কি? পাটের চাষের আধিক্যে, মশকের আধিক্যে ম্যালেরিয়ার বিস্তার, ইহা সরকারী চিকিৎসক গণই প্রকাশ করিয়াছেন: তা'রপর পাট পচিয়া দেশের বায়ুস্তর অন্ততঃ ৩৪ মাস কাল কতদূর বিকৃতি ও পূতিগন্ধ-যুক্ত রাখে, তাহা যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই বিচার্য্য। তৃতীয়তঃ ডোবা, পুষ্করিণী ও নদীতে পাট পচিয়া কেবল যে ঐ সকল জলাশয়ের জলই দূষিত করে তাহা নহে, প্রত্যুতঃ তন্মধ্যস্থ মৎস্যকুলকেও ধ্বংস ও রোগাক্রান্ত করে। মানুষ সেই সমস্ত রোগাক্রান্ত মৎস্য উদরসাৎ করিয়া পীড়িত হওয়া কি স্বাভাবিক নহে? কিন্তু, পাট এই পর্য্যন্ত অনিষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত নহে। পল্লীগ্রামের যে কত গোচারণ ভূমি পাটের চাষের আধিক্যে আবাদ হইয়াছে, তাহা পল্লীবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। গোচারণের উপযুক্ত ভূমি পল্লীগ্রামে দুর্লভ হইয়াছে, গোজাতির উপযোগী তৃণের অভাব ঘটিয়াছে, উপযুক্ত খৈলাদিরও নানা কারণে অভাব, এই হেতু গোজাতি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রধান আহার্য্য দুগ্ধ-ঘৃতেরও অভাব ঘটিয়াছে। সমস্ত কথা বিশদ করিয়া বুঝাইবার এ স্থলে স্থান নাই। পরন্তু, পাঠক অবগত আছেন, পাটের চাষের আধিক্যে অন্যান্য চাষের ও হ্রস্বতা ঘটিয়াছে। তৎ কারণেই তরী তরকারী মহার্ঘ্য হইয়াছে, আউস চাষ কমিয়া গিয়া দেশের ধান্য মহার্ঘ্য হইয়াছে। বিদেশী বণিক ভারতের ধান্য বিদেশে রপ্তানি করে, দেশের সকল দিকে এখন আর তেমন সমান ভাবে ধান্য জন্মে না, ধান্যের মহার্ঘ্যতা সম্বন্ধে এ সমস্ত প্রধান কারণ আমি এস্থলে উল্লেখ করিতেছিনা; আমি পাটের দ্বারা দেশের কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহাই বলিতেছি।

বস্তুতঃই, পাটের চাষ আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে;—পাটের চাষ আমাদিগকে ঘৃত-দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিতেছে, সুস্থ মৎস্যাদি হইতে বঞ্চিত করিতেছে, নির্ম্মল জল বায়ু হইতে বঞ্চিত করিতেছে, খাদ্য-শস্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে, পাটের চাষ আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি অসংখ্য রোগপ্রবণতা সৃজন করিতেছে! তথাপি শুনিবে কে? ভদ্র ও অভদ্র কৃষকগণ পাটের দর নামিয়া যাওয়ায়, বর্ত্তমান বৎসরে পাটের চাষে তত অনুরাগ দেখায় নাই, ইহা সুলক্ষণ বটে; কিন্তু এ অনুরাগের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া আমরা আতঙ্কিত হই!

যাহাহউক আমরা বাঙ্গালীর জাতীয় দুর্ব্বলতার কথা বলিতে ছিলাম। আমরা উপরে যে সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ভিন্ন বাঙ্গালীর জাতীয় দুর্ব্বলতার আরও একটী গুরুতর কারণ আছে। সেটী বাঙ্গালীর বাল্যবিবাহ। দশম বর্ষ বয়সে বাঙ্গা-লীর মেয়ে বিবাহিতা হয়, ত্রয়োদশ বর্ষে তাহার সন্তান জন্মে। এরূপ বালিকার সন্তান-সন্ততিগণ কতদূর সুস্থ ও সবলকায় হয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আমরা, তাহা কদাপি চিন্তা করি না। তাই বলি, নানা কারণে আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যশক্তি অধঃপতনের নিম্নতর স্তরে নামিতে বসিয়াছে!—অর্থ-গৃধ্ন দুষ্ট ব্যবসায়ীগণ তৈল ও ঘৃত-দুগ্ধাদি ভেজাল করিয়া দেশের স্বাস্থ্য-শক্তিতে বিষ ঢালিতেছে, শৌণ্ডিক ও বারাঙ্গণা দেশের

স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিতেছে, পাট চাষী অর্থ-গৃধ্ন কৃষকগণ দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিতেছে, বাল্য বিবাহানুরক্ত সামাজিক কুসংস্কার আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিতেছে, রাস্তাঘাট-পুষ্করিণী ও গোজাতির প্রতি অমনোযোগ আমাদের স্বাস্থ্য-শক্তি ধ্বংস করিয়া আনিতেছে!—কে নয়? তাই বলি উপায় কি? পরিণাম কি? প্রতীকার কি? আর কি পেট ভরিয়া বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য বাঙ্গালী খাইতে পাইবে না? আর কি শুক্রক্ষয়কে মহাপাতক মনে করিয়া, আমরা সংযমী হইতে পারিব না? আর কি বিশুদ্ধ জলবায়ু দ্বারা সোণার বাঙ্গালা স্বাস্থ্যকর হইবে না? আর কি বাঙ্গালী পরোপকার-পরায়ণ হইয়া রাস্তাঘাট ও জলাশয় খননে ও গো-জাতির প্রতি মনোযোগী হইবে না? আর কি অঙ্গ সঞ্চালনাদি শ্রমকর কার্য্যে ভদ্র-সন্তান সহর্ষ চিত্তে নিযুক্ত হইতে গৌরব অনুভব করিবে না? আর কি এই আর্য্য দেশ বাল্যবিবাহকে ঘৃণা করিয়া পরিণত দেহে দাম্পত্য মিলনে মিলিত হইবে না? বস্তুতঃ এই বাঙ্গালী কি বলবান্ ও তেজস্বী জাতি বলিয়া, একদিন জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না? হা ভগবন্, তুমিই জান!

(২) অর্থ-সম্পদ্।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন অর্থ-বিত্তের প্রয়োজন, জাতিগত ভাবে জাতীয় জীবনেও তেমনি অর্থ-সমৃদ্ধির আবশ্যক। অর্থ-বল শ্রেষ্ঠ না হইলেও মনুষ্য-সংসারে অর্থ না হইলে যে কোনও কাজই সম্পন্ন হয় না, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত। কি বাণিজ্য-ব্যাপারে, কি কৃষিকার্য্যে, কি বিদ্যালয় স্থাপনে, কি রেলওয়ে গঠনে, কি পুষ্করিণী খননে, কি রাস্তা নির্ম্মাণে, অর্থ ভিন্ন এক পদও অগ্রসর হওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমার উত্তম অধ্যবসায় ও বৈষয়িক জ্ঞানের সঙ্গে আমার অর্থবল মিশ্রিত হইলে, সোণায় সোহাগা হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমরা কি পরিমাণ ধনী, জাতিগত ভাবে আমাদের ধনভাণ্ডারেই বা কি পরিমাণ ধন আছে, এ কথা চিন্তা করিলে আমরা আতঙ্কিত ও ভীত হই! যদি ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেনী বা জাপানের ন্যায় আমাদের ধন-সম্পদ্ না থাকে, বলিতে পার আমাদের সে জাতীয়দারিদ্রের কারণ কি?

দারিদ্র্যের কারণ।

(ক) দৈহ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বঙ্গ-যুবক বিবাহের সুখাস্বাদ অনুভবের জন্য এ বঙ্গে কত দরিদ্র ও অশিক্ষিত মনুষ্যবংশের সৃজন করিতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

ভারতের লোক খাইতে পায় না, তথাপি তাহারা সকলেই বিবাহ করিবে। ঘরের চালে যাহাদের খড় নাই, যাহারা কাল কি খাইবে তাহার সম্বল নাই, তাহারা বিবাহ করিলে ফল কিরূপ বিষময় হয়, তাহা স্বতঃই অনুমেয়। অথচ, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বর্ষে বর্ষে মনুষ্যবংশ বাড়িয়া উঠিতেছে, অন্ততঃ জমিদার ভবনে বংশানুক্রমে পোষ্য-পুত্রের প্রয়োজন ঘটে! কার পাপে কি ঘটে, সে সব অবান্তর কথার নিষ্পত্তির জন্য আজ আমরা আহূত নহি। আমাদের বক্তব্য এই, যাহাদের আত্মসংযম আছে ও যাহাদের চিত্ত পরোপকার-প্রবণ, তেমন সব দরিদ্র জনের পক্ষে বিবাহ, বর্ত্তমান যুগে বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে।

(খ) দারিদ্র্যের দ্বিতীয় কারণ—বিলাসিতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতে এই বিলাসিতার আমদানী করিয়াছে;—বাঙ্গালার এই বিলাসিতা রোগ-বিশেষে

পরিণত হইয়া প্রায় সর্ব্বসাধারণকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। চারি টাকা মাহিনার চাকর চারি টাকা দামের জুতা পরিয়া বাবু সাজে, কেরাণীরা সোণার চেইন্ আঁটিয়া আফিসে যায়, গৃহিণীগণ বিলাস সামগ্রী না পাইলে মনে মনে স্বামীকে ধিক্কার দেয়!—কারণও অধিক দূরে নহে। বিলাস ব্যঞ্জক পোষাক পরিচ্ছদই অনেক সময় মানুষকে সম্ভ্রান্ত বলিয়া সম্মান দেয়। অরুচিকীর্ষাও কারণান্তর বটে। ফল দাঁড়াইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে গৃহস্থের পোষাক পরিচ্ছদাদির ব্যয় এক টাকা ছিল, এখন পরিবার সংখ্যার আধিক্য ও বিলাসাধিক্য বশতঃ, সে ব্যয় এক শত টাকায় উঠিয়াছে! এবম্প্রকারে, পূর্ব্বাপেক্ষা আয় বাড়িয়াও মানুষের দৈন্য-দারিদ্র্য বাড়িয়া উঠিতেছে।

(গ) দারিদ্র্যের তৃতীয় কারণ—অন্নপ্রাশন ও বিবাহাদি উৎসবে ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয়াধিক্য। অতিমাত্রায় ঋণ করিয়াও লোক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয় বহন করায়, অনেক সংসার দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে—অন্যায্য ব্যয়ের মহাপাপে অনেক সংসার উৎসন্ন গিয়াছে;—ইহার অনেক জলন্ত প্রমাণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে দেদীপ্যমান।

(ঘ) দারিদ্র্যের চতুর্থ কারণ—মাম্‌লা-মোকর্দ্দমা। মাম্‌লা-মোকর্দ্দমায় কত সোণার সংসার শ্মশান হইতেছে, তাহা গণণা করিলে চোখে জল আসে!—তথাপি মোহান্ধ আমরা এখনও মাম্‌লা-মোকর্দ্দমা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম না!

(ঙ) দারিদ্র্যের পঞ্চম কারণ—মদ্য-বারাঙ্গণা। মদ্য-বারাঙ্গণায় এ বঙ্গের কত রাজা-জমীদার উৎসন্ন গিয়াছে, এখনও কত লোক উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা গণণা করা বৃথা। মানুষের নৈতিক জ্ঞান বলীয়ান্ বা জাগ্রত না হইলে, সমাজ হইতে এ সব পাপ উঠিবে বলিয়া আশা করা যায় না।

(চ) দারিদ্র্যের ষষ্ঠ কারণ—স্বার্থপরতা। বর্ত্তমান বঙ্গে অনেক সংসারই একান্নবর্ত্তিতা ভাঙ্গিয়া পৃথক পৃথক সংসার পাতাইয়া, সাংসারিক ব্যয়ের আধিক্য ঘটায়। সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জনের আধিক্য ঘটিলেই মঙ্গল; কিন্তু প্রায়ই তাহা দেখা যায় না। এ কারণে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরিদ্র সংসারের সৃষ্টি ঘটে।

(ছ) বঙ্গের দারিদ্র্যের সপ্তম কারণ—আলস্য। অলস ভিক্ষুক বৈষ্ণব সম্প্রদায় আলস্য-পরতন্ত্র ও শ্রম-বিমুখ হইয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করে; একান্নবর্ত্তী সংসারে অনেক সময় এক জনের স্কন্ধে সংসারের ভার চাপাইয়া অন্য পাঁচজন নিশ্চিন্ত ও অলস থাকে; গ্রাসাচ্ছাদন চিন্তাশূন্য অনেক জমীদার সন্তান অলস ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় দিন যাপন করে; দেশীয় প্রথানুসারে স্ত্রীলোক সম্প্রদায় অশিক্ষিত ও অর্থোপার্জ্জনের কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হইবার শিক্ষা ও সুযোগ পায় না। এবম্বিধ নানা কারণে উপার্জ্জন বিমুখ অলসের সংখ্যা বঙ্গদেশে যত অধিক, আমার মতে কোনও সভ্যদেশে তত নহে। পাশ্চাত্য দেশে,—শ্রম-ক্ষম ভিক্ষুক আইনতঃ দণ্ডার্হ, সংসারে শ্রম-ক্ষম পুরুষেরা কেহ কাহারও স্কন্ধে নির্ভর করে না; কোটীপতিরাও উপার্জ্জনশীল ও অনেক সময় উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালনে সহায়তা করে। বস্তুতঃই, যে, দেশে একজনকে খাটিতে হয়, ও অন্য দশজন তাহার মুখাপেক্ষী থাকে, সে দেশের দারিদ্র যে স্বাভাবিক, তৎপ্রতিপাদনে আয়াস স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

(জ) দারিদ্র্যের অষ্টম কারণ—ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব। এ বাঙ্গালায় যাহাদের টাকা আছে, তাহারা কল কারখানা গড়িয়া টাকা বাড়াইতে সাহসী হয় না, এমন কি লাভকর কৃষিকার্য্যেও তাহারা মনোযোগী হয় না। অলস ধনিসন্তানগণ লক্ষ লক্ষ টাকা কোম্পানির ঘরে ঢালিয়া দিয়া, কাগজ লইয়া বসিয়া আছেন, বৎসর বৎসর শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে সুদ পাইয়া, তাঁহারা নিশ্চিন্তে শয্যায় দিন যাপন করেন! ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কত কল কারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গের কল কারখানার সংখ্যা গণনা করিলে আমাদিগকে মর্ম্মাহত

হইতে হয়! আর কৃষিকার্য্যে? এখনও সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ বিঘা জমী আবাদ যোগ্য অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। বাঙ্গালার ধনিসন্তানগণ 'কৃষিকোম্পানি' গঠন করিয়া যদি ঐ সমস্ত জমী আবাদে পরিণত করেন, তবে দেশের শস্য-মহার্ঘ্যতা যে কত পরিমাণে হ্রাস পায় তাহা বর্ণণাতীত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এ সব বিষয়ে মনোযোগী নহেন। তাঁহারা অধিকাংশই চাকুরি ও ওকালতী অভিমুখে ধাবমান। দেশের ধনাগম ও শূন্য শস্য-ভাণ্ডারের দিকে নেত্রপাত করিতে স্বল্প লোকই অগ্রসর। প্রত্যেক ব্যবসায়েই তদুপযোগী বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধির ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন; তাহা নাই বলিয়াই বাঙ্গালী ব্যবসায়-বানিজ্যে পরাঙ্মুখ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হায়, বঙ্গের এ অবস্থার কি প্রতিক্রিয়া আসিবে না?

(৩) শিক্ষা।

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য—জ্ঞান। যে দেশের স্ত্রী-পুরুষ আপামর-সাধারণ সকলেই জ্ঞানী, সে দেশ স্বর্গের সঙ্গে তুলনীয়! কিন্তু বঙ্গের জাতীয় জীবনে তেমন জ্ঞানী কয়জন? বিগত সেন্‌সস গণনায় প্রকাশ, বঙ্গের ৮ কোটী লোকের মধ্যে শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর! অবশিষ্ট ২০ জনের মাত্র লেখা পড়ায় জ্ঞান আছে। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা বলে, উক্ত ২০ জনের মধ্যে তেমন শিক্ষা কয়জনের আছে। তবেই বুঝা যাইতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনে শতকরা শিক্ষার হার এখনও অতি সামান্য। আমি জিজ্ঞাসা করি, এমন অশিক্ষিত জাতীয় জীবনে আশা কত টুকু?

শিক্ষার কথা বলিলে আমাদের অনেক কথা মনে পড়ে। কিন্তু আজ আর সে সব কথায় কাজ নাই। আজ স্থূলতঃ এইমাত্র বলিতে পারি, সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা অথবা ইংরাজী শিক্ষাই যে আমাদের লক্ষ্য, এমন নহে। যে শিক্ষা দ্বারা আমাদের সত্বঃ ও রজোগুণের স্ফুরণ হয়, অর্থাৎ যে শিক্ষা দ্বারা আমরা ধার্ম্মিক ও কর্ম্মতৎপর হইতে পারি, এমন নৈতিক শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং যে শিক্ষা দ্বারা পার্থিব ক্লেশ নিবারণোপযোগী শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষায় আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তেমন শিক্ষাও আমাদের চাই। যে শিক্ষা দ্বারা এই উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়, অথচ শিক্ষালাভের জন্য স্বাস্থ্য-শক্তির বিসর্জ্জন করিতে হয় না, বরং জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-শক্তিরও উন্নতি ঘটে, তেমন শিক্ষাই মনুষ্য-সমাজের আদর্শ; তেমন আদর্শ শিক্ষা দ্বারা কি বঙ্গীয় যুবক বর্ত্তমানে শিক্ষা লাভ করে? যাহা হউক জাপান ইংরাজের আদর্শে স্ত্রীপুরুষ ও উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে শিক্ষাদান করিয়া সভ্যজগতে আসন পাইয়াছে, এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গদেশ কি শিক্ষাদান বিষয়ে সেই ইংরাজের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে না?

বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক শিক্ষার অভাবে দেশ দরিদ্র হয়, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে দেশে তমো গুণের প্রাবল্য ঘটে। এত যে চৌর্য্য-দস্যুতা লাম্পট্য ব্যভিচার, এত যে মদ্যপান, গঞ্জিকা সেবন, এত যে মামলা-মোকর্দ্দমা, এত যে পরস্পরে ঘৃণা অনৈক্য ও অসদ্ভাব,—এ সমস্তই কি তমোগুণের আধিক্যের পরিচায়ক নহে?—নৈতিক জ্ঞানের অভাবই কি এ সমস্তের জনক নহে? হায়, আজ যদি বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই শিক্ষিত হইত, তবে বিদ্বেষ বুদ্ধি-জাত অনৈক্য এ বঙ্গে এত উচ্চস্থান লাভ করিত না!

উপসংহারে কি বলিব? বঙ্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হই ও ইহার পরিণাম ভাবিয়া আতঙ্কিত হই! কিন্তু এখনও সময় আছে, প্রতীকার সম্ভব—বাঙ্গালীজাতির এখনও আশা আছে। নতুবা এই কালের বুদ্‌বুদ্ কাল-সাগরে বিলীন হইয়া যাইবে! ভাই দেশবাসীন্, এখনও সাবধান হও! জাতীয় জীবন দৈহিকবলে, বৈজ্ঞানিকবলে, ধনবলে ও নৈতিক বলে উন্নত করিতে প্রয়াসী হও।

শ্রীক্ষিতিনাথ দাস।

বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির-চিহ্ন।

দুর্গাবাড়ী।

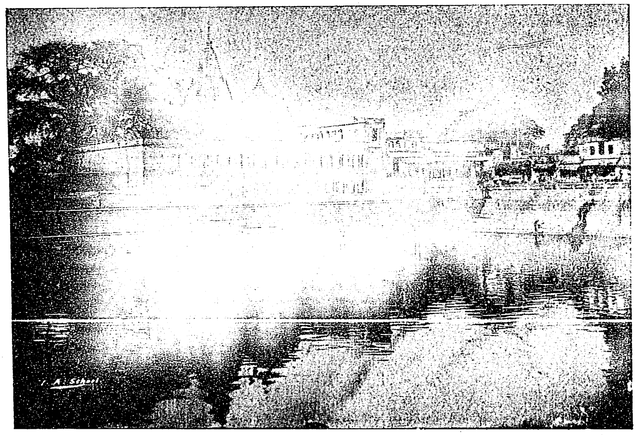

I. A. School, Calcutta.

শিল্প, জাগতিক উন্নতি ও সুখ-সৌকর্য্যের প্রধান সাধন, সাহিত্য তাহার প্রাণ ;
আবার সাহিত্যের বিশাল প্রাণের নিভৃত কক্ষে শিল্প ক্রিয়াশক্তি রূপে বিরাজমান।

৮ম খণ্ড { সন ১৩১৬—ভাদ্র। { ১২শ সংখ্যা

কাশীধাম।

(২৪৩ পৃষ্ঠার প্রকাশের পর।)

এত অত্যাচারেও এক হিসাবে কাশীর সেরূপ কোনও ক্ষতি হয় নাই ; তাহার কারণ—মোসলমানগণ বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহার ধর্ম্ম-মতের প্রতি এমন বিশেষ লক্ষ্য করে নাই, যাহাতে সে সনাতন মতের কিছু মাত্রও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সে কালে বারাণসী ও তাহার সহর সেরূপ রাজনৈতিক বা বাণিজ্যবহুল স্থান বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিল না।

তৎপরে অওরঙ্গজেব নিজ রাজত্ব সময়ে বিশ্বেশ্বরের সেই প্রাচীন পবিত্র মন্দির অতি বর্ব্বরের ন্যায় ধ্বংস করিয়া তাহারই উপরে এক মসজিদ্ নির্ম্মাণ করে এবং 'বারাণসী' আর্য্যের এই প্রাচীন নাম 'মহম্মদাবাদে' পরিবর্ত্তিত করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

কুতবুদ্দিনের পর যে সকল মোসলমান নরপতি আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই যে, দেবদ্বেষী ও মন্দির-ভঙ্গকারী ছিলেন তাহা নহে ; সুলতান বল্‌বন্ প্রভৃতি কোন কোনও সম্রাট যথেষ্ট সমদর্শী ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দু ও মোসলমানকে সমান চক্ষেই দেখিতেন। সম্রাট আকবরের সময়েও কাশীর অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহারই সহায়তায় জয়পুরাধিপতি মানসিংহ কর্ত্তৃক শত শত দেবালয় ও মানমন্দির এই সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাদসাহ শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহিত্যানুরাগী দারাসেকো কিয়ৎ কালের জন্য যখন কাশীতে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ছিলেন (তিনি সে সময়ে যে স্থানে অবস্থান করিতেন, তাহা এখনও 'দারানগর' বলিয়া প্রসিদ্ধ) তখন কাশীরাজ্যের

একজন স্বতন্ত্র অধিপতি হওয়াই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কিছুকাল পূর্ব্বেই সে পুরাতন রাজবংশের এককালীন লোপ হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক ত্রিকর্ম্মা ব্রাহ্মণ দিগের দলপতি গঙ্গাপুরের জমিদার 'মনসারাম, রাজা উপাধি পাইয়া তাঁহারই অধিনে কাশীর রাজা মনোনীত হ'ন। কেহ কেহ বলেন মনসারাম কৌশল ও বিশ্বাস ঘাতকতায় নিজ প্রভু—নবাবের সর্ব্বনাশ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ইনি আট বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে পরলোকগত হ'ন।

মনসারামের পুত্র বলবন্ত সিং ১৭৪০ খৃঃ অব্দে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নানা কৌশলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মহম্মদ সাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আহম্মদ সাহ, সফদরজঙ্গকে উজীরি ও অযোধ্যা প্রদেশ প্রদানকরেন। তখন কাশী রাজ্য পুনরায় অযোধ্যাসুবার অন্তর্গত হয়। কিন্তু বলবন্তসিং সুবাদার সফদরজঙ্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া অসীম সাহস ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র সুজাউল্লাও বলবন্তের তেজ খর্ব্ব করিতে বিশেষ যত্নবান হ'ন। এই সময়েই রাজা বলবন্ত আত্মরক্ষার্থে রামনগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার নবাব মির্জাফরের সহিত পরস্পর বিপদের সময় সাহায্য করিবেন, এইরূপ তাঁহার সন্ধি হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বাদসাহ সাহ আলাম কর্ত্তৃক বারাণসী রাজ্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পিত হইলে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে উক্ত কোম্পানী সন্ধিসূত্রে সুজাউদ্দৌলাকে পুনরায় তাহা ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সুচতুর বলবন্ত ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগত হইয়া সুজাউদ্দৌলা হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৃটীশের মিত্র-রাজা বলিয়া নিজকে পরিচয় দেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ২২শে আগষ্ট তারিখে রামনগরের প্রাসাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা বলবন্তের ঔরসে তাঁহারই এক আশ্রিতা ও অনুগতা দাসীর গর্ভজাত সন্তান চেৎসিংকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে বারাণসী আবার ইংরাজের অধীন হয়। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক চেৎসিংকে 'রাজা' সনন্দপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পরে রাজস্ব লইয়া নানা দুর্ঘটনান্তে ওয়ারেণ হেষ্টিংসএর আক্রমণ ভয়ে চেৎসিং আত্মরক্ষা করিবার জন্য শিবালয় নামক বাটী হইতে দুঃসাহসিক ভাবে পলায়ন করিয়া, ১৮১০ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়ারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইতিমধ্যে ১৭৮১ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস বলবন্তসিংএর দৌহিত্র মহীপনারায়ণকে বেনারসের উত্তরাধিকারী রাজা বলিয়া প্রচার করেন ও জমিদারী সনদ প্রদান করেন। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র উদিৎনারায়ণ রাজা হন এবং ১৮০৫ খৃঃ অব্দে আবার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ রাজা হন।

পরে মহারাজ উপাধিধারী ঈশ্বরীনারায়ণপ্রসাদ ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে দরবারে G. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইনি রামনগরেই বাস করিতেন। গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে ক্রমে ১৩টী তোপের সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। (Murray's Hand Book of Bengal 1881,)

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (K. C. S. I.) রামনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনিই এখন কাশীনরেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাশীর রাজাবলীর মধ্যে যতদূর জানা গিয়াছে, অতি সংক্ষেপেই তাহা বিবৃত হইল। ইহাঁরা সকলেই কাশীরাজ্যের শাসক ও পরিচালক লৌকিক রাজা মাত্র। কিন্তু আর্য্যের প্রকৃত রাজা ইহাঁরা নহেন। সেই স্বার্থপরতা পরিশূন্য নিষ্ঠাবান ও সাধনতৎপর দেবতুল্য ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষিগণই প্রকৃত কাশীর অধিরাজ পদবীবাচ্য। তাঁহারা কেবল কাশীরাজ্যের উপরই তাঁহাদের জীবিত কালে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন নাই, তাঁহারা এক ভারতের সমস্ত আর্য্যজাতির উপর সনাতন ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া ত্রিকালের শাসণদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। সেই কপিলের 'সাংখ্য' গৌতমের 'ন্যায়' পাণিনীর 'ব্যাকরণ' সমস্তই এই স্থান হইতে প্রচারিত। সেই বাল্মীকি, ব্যাস সেই বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাত্মগণ এই পুণ্যতীর্থ কাশীধামের নিত্যশুদ্ধ ধর্ম্ম-সিংহাসন হইতেই ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্মের সকল বিধি নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদিগের এ দুর্দ্দিনেও জগতপূজ্য তুলসীদাস, কবীর, মহাত্মা ত্রিলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ স্বামী, কাষ্ঠজিহ্বা স্বামী, অঘোরী বাবা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কাশীর সেই পবিত্র আসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও কত মহাপুরুষ গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে কত স্থানে নিজ নিজ কঠোর সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া কাশীর সেই মাহাত্ম্য এখনও রক্ষা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যঋষিগণের সেই পুণ্যতপোবন পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্র আর্য্যকুলকলঙ্ক নরাধম আমাদিগের দ্বারাই রাজসিক ও তামসিকতার লীলা-নিকেতনে পরিণত হইলেও তাহারই অন্তরালে ঘনমেঘাচ্ছাদিত সবিতাদেবতার মত সনাতন ধর্ম্মের সার সাত্বিকতা নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে। কাশীকে যিনি যে চক্ষে দেখিবেন, তিনি সেইরূপেই দেখিতে পাইবেন। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা-রাজ্যের ইহাই বিশেষত্ব। এ রাজ্যের রাজতক্ত কোন নরপতির দ্বারা কখনও শোভিত হইতে পারে না, সেরূপ অনিত্য রাজা মহারাজ দুদিনের তরে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াই বিশ্ব-কোতোয়াল কালভৈরবের করাল কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ কাশীপতি রাজ্যেশ্বর চিরসম্রাটরূপে অন্নপূর্ণাসেবিত হইয়া সেই পবিত্র আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ও তাঁহার চির আদরের বারাণসীরাজ্য সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত সাধুমণ্ডলী কর্ত্তৃক চিরদিন পরিচালনা করিতেছেন। জয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার জয়! জয় পতিতপাবনী গঙ্গা মণিকর্ণিকার জয়!! জয় বিশ্ব-কোতায়াল কালভৈরবের জয়!!!

কাশীর মন্দির।

সেই পবিত্র পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর শান্তি-শীতল-সলিল-সেবিত ত্রিভুবন-বরেণ্য বিশ্বনাথের বারাণসী রাজ্যে কল্পান্তকালব্যাপী কত শত মন্দির যে বিরাজিত রহিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে? কালের করাল পীড়নে, দুষ্ট অসুর দলের বীভৎস তাড়নে,

একজন স্বতন্ত্র অধিপতি হওয়াই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কিছুকাল পূর্ব্বেই সে পুরাতন রাজবংশের এককালীন লোপ হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক ত্রিকর্ম্মা ব্রাহ্মণ দিগের দলপতি গঙ্গাপুরের জমিদার 'মনসারাম, রাজা উপাধি পাইয়া তাঁহারই অধিনে কাশীর রাজা মনোনীত হ'ন। কেহ কেহ বলেন মনসারাম কৌশল ও বিশ্বাস ঘাতকতায় নিজ প্রভু—নবাবের সর্ব্বনাশ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ইনি আট বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে পরলোকগত হ'ন।

মনসারামের পুত্র বলবন্ত সিং ১৭৪০ খৃঃ অব্দে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নানা কৌশলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মহম্মদ সাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আহম্মদ সাহ, সফদরজঙ্গকে উজীরি ও অযোধ্যা প্রদেশ প্রদানকরেন। তখন কাশী রাজ্য পুনরায় অযোধ্যাসুবার অন্তর্গত হয়। কিন্তু বলবন্তসিং সুবাদার সফদরজঙ্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া অসীম সাহস ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র সুজাউল্লাও বলবন্তের তেজ খর্ব্ব করিতে বিশেষ যত্নবান হ'ন। এই সময়েই রাজা বলবন্ত আত্মরক্ষার্থে রামনগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার নবাব মির্জাফরের সহিত পরস্পর বিপদের সময় সাহায্য করিবেন, এইরূপ তাঁহার সন্ধি হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বাদসাহ সাহ আলাম কর্ত্তৃক বারাণসী রাজ্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পিত হইলে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে উক্ত কোম্পানী সন্ধিসূত্রে সুজাউদ্দৌলাকে পুনরায় তাহা ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সুচতুর বলবন্ত ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগত হইয়া সুজাউদ্দৌলা হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৃটীশের মিত্র-রাজা বলিয়া নিজকে পরিচয় দেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ২২শে আগষ্ট তারিখে রামনগরের প্রাসাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা বলবন্তের ঔরসে তাঁহারই এক আশ্রিতা ও অনুগতা দাসীর গর্ভজাত সন্তান চেৎসিংকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে বারাণসী আবার ইংরাজের অধীন হয়। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক চেৎসিংকে 'রাজা' সনন্দপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পরে রাজস্ব লইয়া নানা দুর্ঘটনান্তে ওয়ারেণ হেষ্টিংসএর আক্রমণ ভয়ে চেৎসিং আত্মরক্ষা করিবার জন্য শিবালয় নামক বাটী হইতে দুঃসাহসিক ভাবে পলায়ন করিয়া, ১৮১০ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়ারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইতিমধ্যে ১৭৮১ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস বলবন্তসিংএর দৌহিত্র মহীপনারায়ণকে বেনারসের উত্তরাধিকারী রাজা বলিয়া প্রচার করেন ও জমিদারী সনদ প্রদান করেন। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র উদিৎনারায়ণ রাজা হন এবং ১৮০৫ খৃঃ অব্দে আবার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ রাজা হন।

পরে মহারাজ উপাধিধারী ঈশ্বরীনারায়ণপ্রসাদ ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে দরবারে G. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইনি রামনগরেই বাস করিতেন গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে ক্রমে ১৩টী তোপের সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। (Murray's Hand Book of Bengal 1881,)

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (K. C. S. I.) রামনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনিই এখন কাশীনরেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাশীর রাজাবলীর মধ্যে যতদূর জানা গিয়াছে, অতি সংক্ষেপেই তাহা বিবৃত হইল। ইহাঁরা সকলেই কাশীরাজ্যের শাসক ও পরিচালক লৌকিক রাজা মাত্র। কিন্তু আর্য্যের প্রকৃত রাজা ইহাঁরা নহেন। সেই স্বার্থপরতা পরিশূন্য নিষ্ঠাবান ও সাধনতৎপর দেবতুল্য ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষিগণই প্রকৃত কাশীর অধিরাজ পদবীবাচ্য। তাঁহারা কেবল কাশীরাজ্যের উপরই তাঁহাদের জীবিত কালের নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন নাই; তাঁহারা অগ্র ভারতের সমস্ত আর্য্যজাতির উপর সনাতন ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া ত্রিকালের শাসণদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। সেই কপিলের 'সাংখ্য' গৌতমের 'ন্যায়' পাণিনীর 'ব্যাকরণ' সমস্তই এই স্থান হইতে প্রচারিত। সেই বাল্মীকি, ব্যাস সেই বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাত্মগণ এই পুণ্যতীর্থ কাশীধামের নিত্যশুদ্ধ ধর্ম্ম-সিংহাসন হইতেই ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্মের সকল বিধি নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদিগের এ দুর্দ্দিনেও জগতপূজ্য তুলসীদাস, কবীর, মহাত্মা ত্রিলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ স্বামী, কাষ্ঠজিহ্বা স্বামী, অঘোরী বাবা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কাশীর সেই পবিত্র আসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও কত মহাপুরুষ গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে কত স্থানে নিজ নিজ কঠোর সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া কাশীর সেই মাহাত্ম্য এখনও রক্ষা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যঋষিগণের সেই পুণ্যতপোবন পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্র আর্য্যকুলকলঙ্ক নরাধম আমাদিগের দ্বারাই রাজসিক ও তামসিকতার লীলা-নিকেতনে পরিণত হইলেও তাহারই অন্তরালে ঘনমেঘাচ্ছাদিত সবিতাদেবতার মত সনাতন ধর্ম্মের সার সাত্বিকতা নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে। কাশীকে যিনি যে চক্ষে দেখিবেন, তিনি সেইরূপেই দেখিতে পাইবেন। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা-রাজ্যের ইহাই বিশেষত্ব। এ রাজ্যের রাজভক্ত কোন নরপতির দ্বারা কখনও শোণিত হইতে পারে না, সেরূপ অনিত্য রাজা মহারাজ দুদিনের তরে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াই বিশ্ব-কোতোয়াল কালভৈরবের করাল কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ কাশীপতি রাজ্যেশ্বর চিরসম্রাটরূপে অন্নপূর্ণাসেবিত হইয়া সেই পবিত্র আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ও তাঁহার চির আদরের বারাণসীরাজ্য সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত সাধুমণ্ডলী কর্ত্তৃক চিরদিন পরিচালনা করিতেছেন। জয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার জয়! জয় পতিতপাবনী গঙ্গা মণিকর্ণিকার জয়!! জয় বিশ্ব-কোতায়াল কালভৈরবের জয়!!!

কাশীর মন্দির।

সেই পবিত্র পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর শান্তি-শীতল-সলিল-সেবিত ত্রিভুবন-বরেণ্য বিশ্বনাথের বারাণসী রাজ্যে কল্পান্তকালব্যাপী কত শত মন্দির যে বিরাজিত রহিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে? কালের করাল পীড়নে, দুষ্ট অসুর দলের বীভৎস তাড়নে,

দুরাচারী যবনাধম নৃশংস ও বর্ব্বরগণের যথেচ্ছ অত্যাচারে কত মন্দির, কত মঠ, কত আশ্রম, কত সেবালয় কোথায় যে ধূলিকণারূপে বিলীন হইয়াছে, তথাপি শিবময় কাশীর শিবালয় ও শিবলিঙ্গের হিসাব করা বোধ হয় মানবের গণিত শাস্ত্রেরও অতীত। কাশীর গৃহ প্রাঙ্গণে, অলিন্দ প্রাচীরে, পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে যথায় যেথা তথায়ই শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইবে। কাশীর ধূলিকণার মধ্যেও যেন শিবকণা বিরাজিত রহিয়াছে। আহা! সাধক, তুমি এ স্থানে বসিয়া অঙ্গ আর করাঙ্গ ন্যাস করিবে কি? তোমায় শিবকণা-সমাচ্ছাদিত করিয়া বিশ্বনাথ একেবারে যে, ব্যাপক ন্যাস করাইয়া দিয়াছেন। ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের ত্রিনয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ দেখি, রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মা আমার বিশ্বনাথের বিশ্বকল্পে কেমন অলৌকিক ভাবে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন! মায়ের পরম ভক্ত সন্তানগণ সেই অন্নকণা কুড়াইয়া লয়, প্রসাদ পাইয়া তাহাদের চির আকাঙ্খিত ভবজঠর-যন্ত্রণা দূর করে। যিনি মায়ের প্রসাদসেবী এমনই সাধক হইতে পারেন তিনিই ধন্য। তাঁহার চরণপ্রান্তে এ দীনেরও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, ক্রমে কত কল্পান্তরের পূর্ব্বে ও পরে ঐরূপে কত মন্দির, কত মঠ ছিল, কত লয় হইয়াছে, আবার সেই সেই স্থলে কতই না নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! হয়ত কালের গহ্বরে তাহাও একদিন নিক্ষিপ্ত হইবে! কিন্তু কাশী কখনই মন্দিরশূন্য হইবে না। বৈদিক যুগে যাহা ছিল, বৌদ্ধ যুগে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই, বৌদ্ধ যুগে হুয়েন্ সাংএর বিবরণ হইতে ইতিপূর্ব্বে তাহা জানা গিয়াছে;—সর্ব্ব শুদ্ধ একশতটী প্রধান মন্দির তখন কাশীতে বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে আবার কুড়িটী মাত্র নগরের মধ্যে উপবন ও তড়াগাদি পরিবেষ্টিত সুন্দর প্রস্তরময় মন্দির ছিল। সে সময় বিশ্বেশ্বরের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রাচীন বিরাট মন্দির-মধ্যে প্রায় ষড়্ষষ্টি হস্ত (প্রায় একশত ফুট) পরিমিত দীর্ঘ বিশুদ্ধ তাম্রময় দেবাদিদেব বিশ্বনাথের অতি বিশাল ও পরম পবিত্র অনাদি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহানুভব হুয়েন্ সাং স্বচক্ষে তাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সেই গগন-চুম্বিত বিরাট বিচিত্র মন্দির, তাহারই মধ্যে অপূর্ব্ব রত্নবেদীকাশ্রিত সেই অসাধারণ বিশাল গম্ভীর মূর্ত্তি, হতভাগ্য আমরা এ নয়নে তাহা দর্শন করিতে পারিলাম না! কি[illegible] কল্পনার চক্ষে, সেই মন্দির প্রাঙ্গনে সভামণ্ডপের এক প্রান্তে দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই আর্য্যঋষি-মুনি-সেবিত, সুরাসুর-বন্দিত, দেবাদিদেব বিশ্বনাথচরণ চিন্তা করিলেও এ দীনের প্রতি রোমকূপ পুলকে পূরিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চ হয়। ভক্ত পাঠক! পবিত্র ভাবে একবার সেই রূপ চিন্তা করিয়া দেখ, পরম সুখী হইবে। হায়! বিশ্বনাথের সে পবিত্র আদি মূর্ত্তি নাই। কোন্ সনাতন-ধর্ম্মবিদ্বেষী নিষ্ঠুরের হস্তে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে! চর্ম্ম চক্ষে সাধারণের আর তাহা দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু ধ্যানসিদ্ধ সাধকের চক্ষে তাহার বিলয় হয় নাই। তাহা নিত্য বিরাজমান্!

তাহায পর আবার সহস্র সহস্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। দুষ্ট কুতবের অত্যাচারে তাহারও সহস্রাধিক পুনরায় বিচুর্ণ হইল। সেই বিরাট তাম্র মূর্ত্তিও বোধ

হয় এইসঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে! অনন্তর পুনরায় কত নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল—আর্য্যধর্ম্ম-বিদ্বেষী অওরঙ্গজেব আর্য্যগৌরব আমাদিগের পরম পবিত্র বিশ্বনাথের দ্বিতীয় মন্দির সহ সেই শত শত মন্দির ও মঠ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। যাহা হউক বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠার বিরাম নাই, আবার সহস্র সহস্র মন্দির প্রতি বর্ষে বিনির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষা-রহস্য।

একবিংশ অধ্যায়।

প্রভাত হইয়াছে। কিন্তু এখনও সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে। পূর্ব্বাকাশ এখনও আরক্তিম হয় নাই। কেবল দিবালোকের আভাসে পূর্ব্বাকাশ আলোকিত। সেই আলোকে রজনীর অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছে মাত্র।

এমন সময়ে, রামেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহাদের পিসিমা গৃহের এক প্রান্তে ধ্যান-স্তিমিত লোচনে জপে নিযুক্ত। তিনি মনে মনে কি বলিয়া করযোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিলেন ও নিঃশব্দে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে গমন করিলেন।

ঊষা সময়ে প্রকৃতির প্রশান্ত ছবি যে না দেখিয়াছে তাহার জীবন বিফল। যে দেখিয়াছে, সে সুখ সে কখনও ভুলিতে পারে না—চিরদিনই তাহার ঊষার সঙ্গেই নিদ্রা ভঙ্গ হয়—প্রতিদিনই সে সেই সুন্দর ছবি দেখিয়া ক্রমশঃই বিশ্বেশ্বরের চরণ সন্নিকটে যাইবার অধিকারী হইতে থাকে।

রামেশ্বর কিয়ৎক্ষণ কুটীর-সন্নিকটে কুসুমোদ্যান-মধ্যে ভ্রমণ করিলেন। ক্রমে, পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ আরক্তিম হইল; তখন প্রকৃতির আর এক শোভার বিকাশ হইল। এ শোভা রামেশ্বরের একা ভোগ-করিতে ইচ্ছা হইল না। তাহার নবীন সহচর মনোরঞ্জনকে সে শোভা দেখাইবার ইচ্ছা হইল। দেখিলেন দুর্গাদেবীর জপ শেষ হইয়াছে। মনোরঞ্জন তখনও নিদ্রাচ্ছন্ন।

রামেশ্বর ডাকিলেন "ভাই মনোরঞ্জন, উঠ, বাহিরে এস—দেখ আকাশের কেমন শোভা হইয়াছে।"

মনোরঞ্জন কোনও উত্তর দিলেন না।

রামেশ্বর, তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন।

মনোরঞ্জন বিরক্তভাবে "আঃ!" বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।"

রামেশ্বর আর একবার ডাকিলেন, মনোরঞ্জন শয্যার অপর প্রান্তে গেল। অগত্যা রামেশ্বর সেই বিফল চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় বাহিরে আসিলেন।

এ দিকে মনোরঞ্জন যদিও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। নিদ্রা ভঙ্গে তাহার মনে হইল যে, সে এখন বাড়ীতে নাই—সে যেখানে আছে সেখানে তাহার জননী নাই—পিতা নাই—অন্য কোনও পরিজন নাই। পিতা মাতা প্রভৃতির জন্য তাহার মনে কষ্ট হইতে লাগিল—সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সে ক্রন্দন ধ্বনি, রামেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল। রামেশ্বর তখন কুটীর হইতে একটু দূরে, পুষ্করিণী তটে উপবিষ্ট ছিলেন—তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আবার কুটীরে আসিয়া দেখিলেন, মনোরঞ্জন শয্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে।

রামেশ্বর বলিলেন "ভাই, মনোরঞ্জন, এস—মুখ হাত ধোবে ত এস—অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে—বাগানে কত ফুল ফুটেছে দেখবে এস—আমাদের এই ঘরের সুমুখে কত পাখী এসেছে দেখ্‌বে এস ?"

মনোরঞ্জন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি মার কাছে যাব।"

রামেশ্বর বলিলেন "ভাই, কেন মিছে কাঁদ্‌চো, তোমার বাবা এসে নিয়ে না গেলে কেমন করে যাবে। হয়ত তিনি বেলা হলে আস্‌তে পারেন। এখন এস একটু বেড়াই গিয়ে।"

এমন সময়ে দুর্গাদেবী তাঁহাদের প্রাতর্ভোজনের জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিলেন, এবং অর্দ্ধেক রামেশ্বরকে দিয়া, মনোরঞ্জনকে বলিলেন "বাবা, মনোরঞ্জন, ওঠ বাবা, মুখ ধোয়ে কিছু খাও" এই বলিয়া মনোরঞ্জনের মুখ পানে স্নেহ-করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির প্রভাবে, মনোরঞ্জন বিনা আপত্তিতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া আহার করিল। তার পর বলিল পিসিমা, আমি বাড়ী যাব কখন ?"

দুর্গাদেবী বলিলেন "তোমার, বাবা এসে নিয়া গেলেই যাবে।" ততক্ষণ রামের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।

দুর্গাদেবীর আদেশে না জানি কি শক্তি আছে! মনোরঞ্জন দ্বিরুক্তি না করিয়া রামেশ্বরের সঙ্গে বাহিরে গেল।

তারা দুটিতে ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর পার্শ্বে উপনীত হইল। দেখিল পাদরী সাহেব বাগানে বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন।

তাহারা দুইজনে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইল, পুষ্করিণীর অপর পারে একটী বক জলের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সাহেব তাহারি ছবি আঁকিতেছেন।

রামেশ্বর ও মনোরঞ্জন তাঁহার আঁকা দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে বকটি আঁকা শেষ হইল। তাহার পর জলে বকের ছায়া আঁকা হইল, পুকুর পারের শরবন আঁকা হইল।

রামেশ্বরেরও ছবি আঁকিতে ইচ্ছা হইল। সাহেবের পার্শ্বেই দুইখানা শ্লেট ও দুইটা পেন্সিল ছিল। সেই দুইখানি শ্লেট, সাহেব, তাঁহাদের দুইজনের জন্য আনিয়াছিলেন। রামেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিয়া একখানা আপনি লইলেন, আর একখানা মনোরঞ্জনকে দিয়া, বলিলেন "এস ভাই আমরাও বক আঁকি।"

"মনোরঞ্জন বলিল আমিত আঁকিতে জানি নি !"

রামেশ্বর বলিলেন "আমিই কি জানি ? কিন্তু চেষ্টা করিয়া দেখি এস, না পারলে ত মুছে ফেললেই হবে, শ্লেটের দাগ বইত নয় !"

তখন দুইজন নবীন চিত্রকর, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া চিত্র কার্য্যে দীক্ষিত হইল। শিশুর স্বভাবই চিত্র করা। শিশু, স্বীয় চিত্তপটে দৃষ্ট পদার্থের প্রতিকৃতি দৃঢ়াঙ্কিত করিবার জন্য নিরন্তর চিত্র করে, একটু কয়লা কি একটু খড়ি তাহার হস্তগত হইলেই—তাহার প্রাকৃতিক চিত্রশালায় ঘরের দেওয়াল পূর্ণ হয়। তাই আজ রামেশ্বর ও মনোরঞ্জন চিত্র করিতেছে।

সাহেবের ছবি আঁকা শেষ হইল। তখন তিনি দেখিতে লাগিলেন, শিশু দুটি কি করিতেছে। রামেশ্বরের চিত্র ভাল না হইলেও যেন বকের মত বোধ হইল। মনোরঞ্জনের চিত্রে সে রূপ আভাসও পাওয়া গেল না। সাহেব বলিলেন "মনোরঞ্জন, বকের পাদুটি আরও একটু বড় হবে। ঠোঁটও আর একটু বড় হবে।"

মনোরঞ্জন তাহা করিবার যত্ন করিল, শেষে সাহেব নিজ হস্তে মনোরঞ্জনের ছবিটি একটু ভাল করিয়া আঁকিয়া দিলেন। এবং বলিলেন, "আমি বিকালে তোমাদের দুজনকে, দুখানি বকের ছবি ক'রে দিব।" এখন চল একটু বাগানের কাজ করি গে। বেশী রৌদ্র হলে ত আর বাহিরে কাজ করা যাবে না। এই বলিয়া তাঁহারা তিনজনে উদ্যানের অপর পার্শ্বে গমন করিলেন।"

সাহেবের এ উদ্যানটি অতি বিস্তীর্ণ। তাহারই এক পার্শ্বে সাহেবের বাঙ্গলা। বাঙ্গলার সম্মুখেই একটী প্রশস্ত দীর্ঘিকা।—যে পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া সাহেব ছবি আঁকিতেছিলেন, সে পুষ্করিণী, উদ্যানের আর এক ধারে অবস্থিত, সেই পুষ্করিণীর অদূরেই রামেশ্বর প্রভৃতির থাকিবার জন্য কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন তাহারা যে প্রান্তে গমন করিলেন, সেদিকেও আর একটি পুষ্করিণী আছে, সেটিও প্রশস্ত। কিন্তু তাহার জলে বিবিধ জলজ পুষ্প বিকশিত। অপর পুষ্করিণী দুইটি সুপরিষ্কৃত। এই পুষ্করিণীত্রয়ের মধ্যস্থ ভূমি, বিবিধ ফলবৃক্ষ পূর্ণ। এত গাঢ় সমাচ্ছন্ন যে একটী হইতে আর একটি জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায় না। পুষ্করিণী ত্রয়ের চারিধারেই নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ। প্রত্যেক পুষ্করিণীতেই দুটি করিয়া বাঁধা ঘাট।

আমরা এ উদ্যানের বর্ণনার চেষ্টা করিব না, কারণ বাক্য দ্বারা কোন স্থান বর্ণনা করিয়া বুঝান সম্ভব নহে।

সাহেব, রামেশ্বর ও মনোরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ব কথিত স্থানে উপনীত হইয়া, স্ব স্ব চিহ্নিত ভূমিতে বীজাদি বপন ও জল সেচনাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন, ক্রমে বেলা প্রায় আটটা হইল। সাহেব বলিলেন, "আজ আর নয়। চল, ঐ বৃক্ষ তলে বসি গিয়ে।"

তখন, তাঁহারা তিনজনে উপবেশন করিলেন। মালীও, একটী চুপড়িতে করিয়া কতকগুলি সুপক্ক ফল আনিয়া তাহাদের সমক্ষে স্থাপন করিল।

সাহেব বলিলেন, "রামেশ্বর, এই ফলগুলি সমান তিন ভাগ করিয়া, এক ভাগ তুমি লও, এক ভাগ আমায় দাও, আর এক, মনোরঞ্জন কে দাও।"

রামেশ্বর তাহাই করিলেন।

ফলাহার শেষ হইলে, পুষ্করিণীতে, হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক, তিনজনে তৎপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র গৃহটিতে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহের মধ্যস্থিত টেবিলের উপর কয়েকখানি গ্রন্থ।

তিনজনে তথায় উপবিষ্ট হইল। সাহেব বলিলেন "মনোরঞ্জন, তুমি পড়িতে পার ?"

মনোরঞ্জন নীরব রহিল।

সাহেব রামেশ্বরকে রামায়ণ পড়িতে বলিলেন, বলিলেন 'যেখানে চেনা দেওয়া আছে ঐখান হইতে পড়।'

রামেশ্বর পড়িতে লাগিলেন।—

পঞ্চবর্ষ গত হৈল হাতে দিল খড়ী।
পড়িতে পাঠা'ন রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী॥

ক খ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি॥
ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি।
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি॥
কোন শাস্ত্র নাহি তার হয় অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর॥
বিদ্যা শিখি করিলেন গুরুকে প্রণাম;
অস্ত্র বিদ্যা তার পর শিখিলেন রাম॥
প্রাতঃকালে চারিভাই যান মাল ঘরে।
মল্লবিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে॥
সূর্য্যবংশী বালক ধনুক ভাল জানে।
ফুল ধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে॥
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ॥

এই পর্য্যন্ত পড়িবার পর সাহেবের ইঙ্গিতে রামেশ্বর আসিলেন?

সাহেব জিজ্ঞাসিলেন 'ভাল, এইটুকু পড়ে কিশিখ্‌লে?'

রামেশ্বর বলিলেন "বিদ্যা শিখ্‌তে হলে, রাজার ছেলেরও, বাপ মা ছেড়ে গুরুর কাছে থাকতে হয়, আর যত্ন করে শিখ্‌লে শীঘ্রই নানা বিষয় শিখ্‌তে পারা যায়।"

সাহেব বলিলেন "তুমি ঠিক বুঝেছ। শীঘ্রই তোমাকে গুরুদেবের কাছে গিয়ে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে, সে সময়ে তুমি বোধ হয় পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়ের জন্য ব্যাকুল হবে না।"

মনোরঞ্জন বলিল "আমার কিন্তু মাকে ছেড়ে এখানে থাক্‌তে বড় কষ্ট বোধ হয়! আমি বাড়ী যাব কখন?"

সাহেব বলিলেন "তোমার পিতা যখন আস্‌বেন তখনি যাবে। কিন্তু, জ্ঞান লাভ করা আগে দরকার। দেখ আমাদের দুটি পুত্র আছে, তারা বাল্যকাল থেকেই বিলেতে আছে। তারা দুজনে লেখা পড়া শিখিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট আছে। প্রায় দশবৎসর হলো তারা আমাদের দেখে নাই, আমরাও তাহাদের দেখি নাই। রামেশ্বর যখন গুরুদেবের আশ্রমে যাবেন, তখনও তাঁকে দশ পনর বৎসর সেখানে থাক্‌তে হবে। পুরুষের জ্ঞান উপার্জ্জন ও অর্থ উপার্জ্জন করবার জন্য আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ছেড়ে দূর দেশে থাক্‌তে হয়, তাতে কষ্ট করলে কি চলে। যখন যেখানে থাক্‌বে নিজের কর্ত্তব্য পালন ও সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করবে, কখনই কষ্ট হবে না। তুমি মনে কর্‌ছো তোমার পিতা বড় মানুষ, তোমাদের অনেক টাকা আছে, এ রকম কষ্ট ক'রে লেখা পড়া শেখবার দরকার কি?—কিন্তু একটা গল্প বলি শোনো—

এক দেশে একজন খুব বড় জমিদার ছিল। তার মস্ত বাড়ী, অনেক গাড়ী, জুড়ী, অনেক টাকা, অনেক চাকর নফর। সে কেবল পায়ের উপর পা দিয়ে বসে, খোসামুদেদের সঙ্গে গল্প করতো, ভাল ভাল খাবার জিনিষ খেতো আর ঘুমুতো। লোকের খোসামোদে তার এমন অবস্থা হয়েছিলো যে, সে ধরাকে সরা মনে কর্‌তো—আর ভাবতো তার চেয়ে পৃথিবীতে বড় কেউ নেই। সে যারে যা বল্‌বে সেই তা শুন্‌বে।

ঐ জমীদারের বাড়ীর কাছে একজন গরীব লোক বাস কর্‌তো সে নিকটস্থ জলাভূমি থেকে নলগাছ

তুলে, তাই দিয়ে চুপড়ী তৈয়ার করে বিক্রী কর্‌তো? তা ছাড়া নল, তাল পাতা, নারিকেল পাতা, খেজুর পাতা প্রভৃতি দিয়ে ছেলেদের খেলাবার নানা রকম জিনিষ তৈয়ার করেও বিক্রী কর্‌তো। তার স্ত্রী পুত্রাদি কিছুই ছিল্‌না। সুতরাং তাঁর দৈনিক উপার্জ্জনে তার এক রকম দিন কেটে যেতো, কোনও বিশেষ কষ্ট হতো না। লোকটা যখন চুপড়ী প্রস্তুত কর্‌তে কর্‌তে ভক্তিভরে গান কর্‌তো, তখন অনেক লোক, বিশেষতঃ ছেলেরা দাঁড়িয়ে তার গান শুন্‌তো। একে তার গলার স্বর বড় মিষ্টি ছিল, তায় ভগবানের নাম, সুতরাং সে গানে সকলেরই প্রাণ গলে যেতো। তার হৃদয় অতি সরল ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ,—জীব জন্তুর কষ্ট দেখ্‌লেও তার প্রাণ আকুল হতো! সকলেই এই সকল গুণে তাকে ভালবাস্‌তো। সুতরাং তার কখন খরিদদারের অভাব হতো না।

তারে দেখ্‌তে পার্‌তো না কেবল সেই জমিদার। কারণ তার অত টাকা, অত চাকর নফর, অমন বাড়ী থেকেও তার মনে সুখ ছিল না। নানা রোগ তার সর্ব্বদাই লেগে ছিল। তার প্রাণে একটুকুও সুখ ছিল না বলে, কাকেও সুখী দেখ্‌লে তার বড়ই হিংসা হতো, সেই জন্যই তার এই গরীব বেচারীর উপর বড় রাগ। তার অপরাধ—সে পেট ভরে ডাল ভাত খেয়ে মনের আনন্দে ভগবানের নাম গান করে আর চুপড়ী তৈয়ার করে।

মানুষের মনে প্রথমে অসৎ চিন্তার উদয় হ'লে, ভগবানের নাম নিয়ে সাবধানে সে চিন্তা দূর করা দরকার। কেন না চিন্তার এমন একটা শক্তি আছে যে, পুনঃ পুনঃ উদয় হয়ে ক্রমে সবল হয়, শেষে মানুষকে তদনুসারে কার্য্য করিয়ে থাকে।

বড়মানুষটির মনে হ'লো ও গরীব ছোট লোকটারও সুখ নাশ করতে হবে। ওর স্পর্দ্ধা দেখ, কাল কি খাবে, তার ঠিক নেই অথচ তার জন্য মনে একটুও কষ্ট নেই—সদাই আনন্দে আছে, আর আমি যে মনে কর্‌লেই অমন শত সহস্র তুচ্ছ কীটকে মুহূর্ত্তে পদদলিত করতে পারি—যে আমি ধনে মানে কুলে শীলে ওর কোটী গুণে উচ্চতর, সেই আমার মনে সুখ মাত্রই নাই।"

অনবরত এইরূপ চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে তার মনে হল, এই কীটটির বিনাশ সাধন। একদিন গ্রীষ্মকালের রাত্রে অনিদ্রায় ছট্‌ ফট্‌ করতে করতে তার মনে হলো আর না, আজি ওর সর্ব্বনাশ করব। তখনি চাকরদের ডেকে আদেশ কল্লে—"যাও ঐ নলবনে আগুণ দাও।"

চাকরেরা কি করবে? মনিবের হুকুম ত অমান্য করবার শক্তি নাই। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও নলবনে আগুণ দিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নলবন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠ্‌লো। তার পর সে আগুণ, সমস্ত নলবন দগ্ধ করে দরিদ্রের কুটীর খানিও গ্রাস করলো। ভাগ্যক্রমে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বলে সে দিন সেই ব্যক্তি কুটীরে ছিল না, সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে নিদ্রাসুখ ভোগ করতেছিল, অগ্নির উত্তাপে তার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে দেখ্‌তে পেলে, যে তার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। সে একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বল্লে "হরি হে!" আর তার দুটি চক্ষুদিয়ে দর দর ধারে জল গড়াতে লাগলো।

কে যেন তার প্রাণের ভিতর থেকে বলতে লাগল—"ভয় নাই"—

তখন সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার পরিধান একখানি ক্ষুদ্র ধুতি। আর সব দগ্ধ হয়ে গেছে। সে ধীরে ধীরে সেস্থল ত্যাগ করে চলে গেল। কোথায় যে যাচ্ছে তার জ্ঞান নাই। ভগবান তারে যে দিকে নে যাবেন সে ভাসতে ভাসতে সেই দিকে যাবে।

ঘুরতে ঘুরতে বেলা দুপুরের সময় তার ক্ষুধার উদ্রেক হলো। তখন তার হুঁস হলো।—কিন্তু ক্ষুধা পেলে কি হবে?—খাবে কি?—আজত আর চুপড়ী বোনা হয় নাই! সে দেখলে, সম্মুখে আদালত—হাকিম গাড়ী থেকে নেমে আদালতে ঢোকবার উদ্যোগ করচেন। সে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পদতলে পড়ে নিজের দুঃখের কথা সব বল্লে।—হাকিম তাকে বড় ভাল লোক বলে চিন্‌তেন, তার প্রতি তাঁর স্নেহও ছিল, তিনি তাকে সঙ্গে করে কাছারীতে প্রবেশ করে, সেই বড়মানুষের নামে, আদালতে হাজির হবার হুকুম বাহির করিলেন।

হুকুম নিয়ে পেয়াদা ছুটলো—আদালতের হুকুম। বড়মানুষটি দু চার জন লোক সঙ্গে করে আদালতে হাজির হলেন। প্রমাণ হলো তিনিই নলবন ও সঙ্গে সঙ্গে গরীবের কুঁড়েখানি দগ্ধ করতে চাকরদের হুকুম করেচেন।

তখন হাকিম সেই গরীবের দিকে চেয়ে বললেন "দেখ বাপু, এই লোকটা মনে করেছে সে বড়লোক আর তুমি তুচ্ছ ব্যক্তি। কিন্তু যথার্থ কে বড় আর কে ছোট, শেখাবার জন্য আমি এক মতলব করেছি। আমি যে স্থানে একে স্থানান্তরিত করবো, আমার একান্ত ইচ্ছা তুমিও সেখানে যাও।"

দরিদ্র বল্‌লে, আপনি "হুজুর মালিক ঈশ্বরাবতার আপনি আমার পক্ষে যা ভাল মনে করবেন আমি তাই করবো।"

তখন সেই হাকিম, তাদের দুজনকে সমুদ্রের একটী দ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন। সে দ্বীপের লোকেরা অসভ্য। তারা তাদের নিয়ে গিয়ে চাকর করলে।

তখন সেই অসভ্য লোকেরা তাদের কাঠ বইতে নিযুক্ত করলে।

বড়মানুষটি কখন পরিশ্রম করেন নি, সুতরাং কাঠ বহা তাঁর পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার হলো না। কিন্তু গরীবের সকল কষ্টই সহা অভ্যাস ছিল, সে অনায়াসেই নির্দ্দিষ্ট কাজের চেয়ে বেশী করে ফেল্লে। তখন মনিব, যার যেমন কাজ তারে তারি মত খাবার দিলে। বড়মানুষটির সেরকম জিনিষ খাবার অভ্যাস ছিল না সুতরাং বড়ই কষ্ট হলো। দরিদ্রের উদর পূর্ণ হইলেই হইল। বিশেষ পরিশ্রমের পর যা খাও তাই ভাল লাগে। সুতরাং সে খেয়ে সুখে নিদ্রা গেল।

তার পর দিন আবার সেই কাজ, আজ বড়মানুষটি আবার ক্ষুধায় কাতর। দরিদ্র পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ করে, তালপাতার একটী সুন্দর মুকুট প্রস্তুত করে নিজের মনিবের মাথায় পরিয়ে দিলে। তখন মনিবের আমোদ দেখে কে, সে ত সেই মুকুট মাথায় দিয়ে সমস্ত গ্রামটা একবার ঘুরে এলো। তখন সে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মুকুটের জন্য পাগল। মনিব দরিদ্রটিকে নিয়ে এক সুন্দর

কারবার আরম্ভ করে দিলে। সে দেশে টাকা পয়সা চলন নেই, কিন্তু দরিদ্রের আর খাবার অভাব নাই। সে বড় মানুষটির কষ্ট দেখে বল্লে "বাবু—আপনি ত কাঠ বইতে পারেন না, যদি রাজি হন, আমি মনিবকে বলে আমার জন্য, নল আর তালপাতা আন্‌বার কাজ আপনাকে দিই, তাতে আপনার কষ্টের অনেক লাঘব হবে। খাওয়া দাওয়ার কষ্টও থাকবে না।"

বাবু ভেবে দেখলে, তাই শ্রেয়ঃ। বড় বড় কাঠের কুঁদো নেড়ে তাঁর নধর দেহ খানি ত শুকিয়া গেছেই—তার ওপর, যথোপযুক্ত পরিশ্রম করতে না পারায় আহারও পেটভরে জুট্‌তো না। এখন তাঁর আর খারাপ খাবারে অরুচি নাই, কিন্তু যা পান তাতে পেট ভরে না। কাজেই তিনি দরিদ্রের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

এইরূপে ছয়মাস অতীত হলে, একদিন, হাকিম লোকজন সঙ্গে সেই দ্বীপে এলেন। এসে দেখেন বড় মানুষটি একবোঝা নল কাঁধে করে আস্‌চেন আর দরিদ্র মনের সুখে, চুপড়ী প্রস্তুত করতে করতে গাইতেছে—

আমি, যে দিকেতে চাই
তোমায় দেখতে পাই,
নাহিকো তুলনা তোমার করুণার।
পশু পাখী গণ
হেরি অনুক্ষণ
আছে বেঁচে ভবে দয়াতে তোমার॥
তোমার কৃপায় হয় মরুভূ সাগর
পাষাণে নির্ঝর ঝরে নিরন্তর
আকিঞ্চনে দয়া কর গুণাকর
ভেসে যাই প্রেম সাগরে তোমার।

গান শুনে, হাকিমের চক্ষে জল এলো, তিনি বললেন—'বাপু হে, তুমি যেখানে—স্বর্গ সেখানে। স্বর্গ নহিলে কি এত সুখ আর কোথায়ও থাকতে পারে।'

এমন সময় বড় মানুষটি নলের বোঝা ফেলে, হাকিমকে নমস্কার করে বললেন—"আপনি ঠিক বলেছেন, এই সাধু যেখানে—স্বর্গও সেখানে, এত দিনে আপনার কৃপায় বুঝেছি—এই সাধু স্বর্গের দেবতা আর আমি নরকের কীট। নহিলে যে আমি এর কুটীর খানি দগ্ধ করে ছিলাম, সেই ইনি আমায় কৃপাকরে আজ অন্নদানে পালন করচেন।"

দরিদ্র কাঁদিতে কাদিতে বললেন এমন কথা বলবেন না। আমি নরাধম। দেবার নেবার মালিক সেই বই আর কেউ নাই।

তখন হাকিম বললেন "এখন যদি তোমাদের দেশে নিয়া যাই।

বড়মানুষটি বললেন "আমি দেশে যেতে পেলে এর দুঃখ দূর করবো।"

দরিদ্র বলল, 'বাবু আমার দুঃখ কিছুই নাই। দেশে যদি আবার সেই কুটীর আর নল বন পাই, তবে আমি পরমানন্দে জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিব।'

হাকিম, তাদের দেশে আন্‌লেন, বড়মানুষটি বাড়ী ঘর করে দিতে চাইলেও দরিদ্র তা নিলে না। কেবল একটুক কুটীর করে, সেখানে মনের সুখে বাস করতে লাগলো।

বস্তুতই সুখ ধনরত্নে নয়—সুখ মনে।

এমন সময় চাকর আসিয়া মনোরঞ্জনকে ও রামেশ্বরকে স্নান করাইবার জন্য লইয়া গেল।

ক্রমশঃ—
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

কা'র ?

উষার কোমল তরল আলোকে,
কুসুম-সৌরভ চুমিয়া পুলকে,
স্নিগ্ধ ধীর বায়ু বহিয়া ভূলোকে
কা'র যশ ওগো গাহিয়া যায় ?

কোমল মধুর লহরী তুলিয়া,
কা'র যশ ওগো 'পরাণ ভরিয়া,
গায় বন-পাখী আনন্দে জাগিয়া,
নিভৃত কুলায়ে কানন-গায় ?

ধরণীর কোলে কেন নেত্র-জল ?
কা'র যশ-গানে বিটপী সকল,
শিশিরের ছলে কাঁদে অবিরল,
প্রেমাশ্রু তা'দের পাতায় সাজে ?

বিশুষ্ক কঠিন মাটী ফাটাইয়া,
সুরভি কোমল কুসুম উঠিয়া,
কা'র লীলা ওগো যায় প্রকাশিয়া,
নীরবে গভীর বনের মাঝে ?

গোধূলি-গগনে ডুবে যায় রবি,
মেঘে মেঘে শোভে কত নানা ছবি !
কল-কণ্ঠে যশ কা'র বনকবি
বিহঙ্গেরা গাহি' কুলায় পশে ?

জ্বলে তারাদল নিশিথ-গগনে ;
লতায় পাতায় উজল কিরণে
জ্বলে জোনাকিরা ; ঝিল্লিগণ বনে
ভরে ধরাতল কাহার যশে ?

সিন্ধু-খদ্যোতিকা সাগরে সাগরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে জ্বালিয়া ভাস্বরে,
আঁধার নিশায় নাবিক-নিকরে
দেখাইয়া পথ কি বলি' যায় ?

শ্যাম কুঞ্জবন মরুভূ মাঝারে
নির্ঝর-শোভিত ফল ফুলভারে
দুলিয়া দুলিয়া জাগায় কাহারে
তৃষার্ত্ত পান্থে মুমূর্ষু প্রায় ?

হিংস্র শ্বাপদ উরগ হৃদয়ে,
পতঙ্গ ও কীট কীটাণু-নিচয়ে,
সন্তানবাৎসল্য হেরিয়া বিস্ময়ে,
কা'র পানে জ্ঞানী স্বতঃই চায় ?

অনন্ত জগৎ চন্দ্র সূর্য্য তারা,
নিলীম অনন্ত শূন্যে আত্মহারা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহিতেছে তা'রা
কাহার মহিমা, বল আমায় ?

পঞ্চভূতে মোরে করিয়া সৃজন,
আত্মা-মন- প্রাণ করিয়া অর্পণ,
দেখাইলা যিনি এ বিশ্বভুবন,
তাঁরই মহিমা-কৌশল-যশ ?

আমি ত গাহিনা কৃতঘ্ন পামর।
জড়াদপি নীচ মোহাচ্ছন্ন নর !
কেন এই মন ওহে বিশ্বেশ্বর !
সদা নীচ স্বার্থ-আকাঙ্ক্ষা-বশ ?

শ্রীক্ষিতিনাথ দাস।

ভাস্কর্য্য।

(২২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর)

যাহাই হউক সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লৌহে অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হয় না—কারণ, তাহা অতি কোমল, তাহাতে ধার করিয়া কোন বস্তু কাটিতে যাইলে ধার মুড়িয়া যায়—কাটে না। বিশুদ্ধ লৌহে শতকরা এক সের কঠিন লৌহ থাকিলে তবে ছুরি কাঁচি প্রস্তুতের উপযুক্ত ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা সামান্য অধিক কঠিন লৌহ মিশাইয়া ক্রমে কঠিনতর হইতে কঠিনতম ইস্পাত প্রস্তুত হয়, কিন্তু শতকরা দুই সের কঠিন লৌহের সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহা ইস্পাতের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়—তখন অতি ভঙ্গপ্রবণ হয়—তাহাতে ঘা মারিয়া কোন দ্রব্যই গড়িতে পারা যায় না, তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। হাপরের উত্তাপে তখন তাহা সহজেই গলিয়া যায় ; সুতরাং পুনরায় তাহা ঢালা-লৌহেই পরিণত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বকালে ইস্পাত প্রস্তুতের বিষয় যতদূর জানা গিয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

মৃত্তিকা মধ্যে একটী গভীর আবর্ত্তনী বা হাপর প্রস্তুত করিয়া কাষ্ঠের কয়লায় তাহা পরিপূর্ণ করিয়া পার্শ্ব হইতে জাঁতার (ভস্ত্রিকার) হাওয়া দিতে দিতে যখন খুব গন্ গনে আগুন হইত, হাপরের কয়লা পুড়িয়া অধোগামী হইত, তখন সেই লৌহ-প্রস্তর খণ্ড খণ্ড বা চূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে ঢালিয়া পুনরায় কাষ্ঠের কয়লায় পূর্ণ করিত। তাহাও জ্বলিয়া ক্রমে ধ্বসিয়া যাইলে পুনরায় লৌহপাথর ও কয়লায় পরিপূর্ণ করনান্তর জাঁতার হাওয়া প্রয়োগ করিত, কিয়ৎপরে হাপরের নীচে ক্রমে লৌহ গলিয়া একত্র হইত। অনন্তর সেই গলিতলৌহ লাল থাকিতে থাকিতেই বাহির করিয়া ক্রমাগত বলপূর্ব্বক পিটিতে পিটিতে উহার ছাই ময়লা ও অন্যান্য অসার সামগ্রী বাহির হইয়া যাইত। পরে পুনঃ পুনঃ পুড়াইয়া পিটিতে পিটিতে যখন অগ্নি কণার ন্যায় আর একটুও ময়লা বাহির হইত না, তখনই বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্তুত হইত। সাধারণ লৌহ হইতে এইরূপ বিশুদ্ধ লৌহ অতি সামান্যই বাহির হয়। উপর্য্যুপরি সেইরূপে পিটিতে পিটিতে পূর্ব্বকথিত গ্রন্থিবজ্রক, নীল-পিণ্ড, ও রোহিনী আদি নিরঙ্গ ও সাঙ্গ লৌহ প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিশুদ্ধ লৌহে অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ হইতে পারে না। কারণ তাহা অতিশয় কোমল। সুতরাং প্রথমে সেই কোমল বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্তুত করণান্তর অর্দ্ধসের লৌহ ধরিতে পারে, এইরূপ বহু সংখ্যক মৃত্তিকা নির্ম্মিত আধার বা "মুচি" প্রস্তুত করিয়া তাহা উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, সেই কোমল লৌহগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া "মুচির" মধ্যে কাঠের কুচির সহিত পূর্ণ করিয়া আকন্দপাতা দিয়া আচ্ছাদন করিত ও মৃত্তিকা দ্বারা মুচির মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দিত। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত হাপরের মধ্যে রাখিয়া অগ্নি প্রদান করিত। ক্রমাগত দুইঘণ্টা কাল জাঁতার বাতাস প্রদান করিলে, ক্রমে সেই মুচির লোহা গলিয়া কাষ্ঠস্থিত কার্ব্বণ্ মিশ্রিত হইয়া ইস্পাতে পরিণত হইত। প্রাচীন কালে কর্ম্মকার গণের এবিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হিসাব ছিল, কতটুকু বিশুদ্ধ লোহার সহিত কতটুকু কাঠ এবং কি কাঠ দিলে উত্তম ইস্পাত প্রস্তুত হইবে, তাহা তাহারা ভালই জানিত,

এখন সে সকল নিয়ম আর কেহই জানে না। তবে য়ুরোপীয় প্রণালী অপেক্ষা এখনও এই সাধারণ নিয়ম অনুসারেও সহজে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু খরচ অত্যন্ত অধিক পড়িয়া যায়। যাহা হউক এসকল বিষয় আর অধিক লিখিয়া পাঠকগণকে বিচলিত করিতে চাহি না। এ বিষয় বিস্তৃত করিয়া লিখিতে হইলে প্রকৃতই একখানি স্বতন্ত্র প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। জীবনে কুলাইলে, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থেই আলোচনা করিতে যত্ন করিব।

সেই প্রাচীন যুগে পূর্ব্বোক্ত ইস্পাতেই খড়্গাদি আয়ুধ সকল প্রস্তুত হইত। শিল্পীর অসি নির্ম্মাণ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য না থাকিলে, উৎকৃষ্ট লৌহ পাইলেও উত্তম অসি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে না। কোন্ অস্ত্রে কতবার পোড় দিয়া পিটিতে হয়, কতবার কি ভাবে কোন্ কোন্ উপাদানে তাহাতে পায়ন বা পান দিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক। এই কৌশলেই অস্ত্রের ধার তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় হয়। ইহার অভাবেই অস্ত্রশিল্পীর সকল পরিশ্রম বিফল হইয়া যায়। সুতরাং এই পায়ন-প্রণালী অতি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

বৃদ্ধশার্ঙ্গধর ও উদ্ধৃত শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই নিম্নে পায়ন-প্রক্রিয়া উদ্ধৃত হইতেছে।

এক্ষণে বাহুল্য ভয়ে সেই মূল শ্লোকগুলির উল্লেখ না করিয়া কেবল যথাযথ অনুবাদই প্রদত্ত হইল।

১। পিপুল, সৈন্ধবলবণ ও কুড়, এই তিনটী দ্রব্য গোমূত্রের সহিত খুব মিহি চন্দন ঘসার মত পিসিয়া, তাহাদ্বারা শরের ফলায় বা অন্য যে কোন শস্ত্রের উপর প্রলেপ দিয়া এক দিবস পরে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, যখন উহা পীতবর্ণ হইয়া আসিবে, তখন অগ্নি হইতে বাহির করিয়া তৈলে ডুবাইয়া নির্ব্বাপিত করিবে বা পান দিবে।

২। পঞ্চ-লবণ চূর্ণ করতঃ সরিষার সহিত মধু সিক্ত করিয়া শস্ত্রের উপর প্রলেপ দিবে। পরে পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নিতে দগ্ধ করিতে করিতে যখন ভিতর হইতে ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় বর্ণ হইয়া প্রলিপ্ত ঔষধ দগ্ধ হইয়া পীত বর্ণ হইবে, তখন নির্ম্মল সলিলে ডুবাইয়া দিবে।

৩। পূর্ব্বোক্ত তৈল বা জলের পরিবর্ত্তে ঘোটকী, উষ্ট্রী ও হস্তিনীর দুগ্ধে তীরের ফলায় পান দিলে তাহা অত্যন্ত ধারাল হয়।

৪। মাছের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুক্কুরীর দুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধ পান করাইলে অস্ত্রশস্ত্রে করিহস্ত ছেদনোপযোগী তীক্ষ্ণ ধার হয়। প্রবাদ আছে, মহারাণা প্রতাপ সিংহের এইরূপ একখানি তরবারি ছিল।

৫। আকন্দের আটা, হুড়ুশৃঙ্গের অঙ্গার, পারাবতের ও মুষিকের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অস্ত্রে বা অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত করিবে। তাহার পর তৈলসেক পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পান দিবে। ইহাতে পাথর পর্য্যন্ত কাটা যাইতে পারে।

৬। লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র কদলী ক্ষারে প্রলিপ্ত করিয়া একদিন একরাত্র পরে যথাবিধি পান দিবে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার ধার ভাঙ্গিবে না।

৭। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা করিলে, নৃপতিগণ শস্ত্রকে দগ্ধ করিয়া রুধির পান করাইতেন।

৮। গুণবান পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, পূর্ব্ববিধানানুসারে শস্ত্রে ঘৃত পান করাইতেন।

৯। অক্ষয় ধন কামনা করিলে শস্ত্রে জল পান করাইতেন।

১০। প্রাচীন কালে অস্ত্র ভীষণ করিবার জন্য নানা বিধ বিষ পান করান হইত। অস্ত্র শস্ত্রে এই পান দিবার সাধারণ বিধি এইরূপ যে, প্রথমতঃ অস্ত্রাদি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া অগ্নি মধ্যে উত্তপ্ত করিতে হয়। কিয়ৎপরে সেই অস্ত্রের গাত্র ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ হয়, তাহার পর ঘোর হরিদ্রা বর্ণ, ক্রমে গাঢ় রক্তবর্ণ, পরে নীল অবশেষে ধূসরবর্ণ হইয়া যায়। যদ্যপি অন্য ধাতু কাটিবার জন্য ধার করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হরিদ্রা বর্ণ থাকিতে থাকিতেই পূর্ব্বোক্ত কোনও বিধানে পান দিবে। যদি কাঠ কাটিবার উপযুক্ত ধার আবশ্যক হয়, তবে ঘোর হরিদ্রাবর্ণ হইলেই পান দিবে। ক্ষুরের অনুরূপ সূক্ষ্ম ধার করিতে হইলে, রক্তবর্ণ হইলে পান দিবে। তরবারি, ঘড়ির স্প্রিং, সূচ ও বঁড়শি আদি নীলবর্ণ হইলে পান দিবে। পান দিবার বিধান শিল্পীর বহুদর্শিতার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কোনও অস্ত্র পান দিবার সময় একেবারে শীতল করিতে নাই। প্রথমে অস্ত্রর মুখ পরে উহার সমস্ত অঙ্গে পান দিয়া অগ্নির পার্শ্বে রাখিয়া ক্রমে শীতল করিবে।

পান দিবার সময় অগ্নি হইতে নানাবিধ গন্ধ উত্থিত হয়, তাহাতে সেই অস্ত্রের ভবিষ্যৎ ফলাফল জানা যায়। অস্ত্র নির্ম্মানান্তে অস্ত্রের উপর নানা চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তাহাতেও উহার ফলাফল নির্দ্দিষ্ট হয়, শাস্ত্রে বিষদ্ ভাবে এই সকল কথা লিখিত আছে। শস্ত্রের ধ্বনি ও জাতি বিষয়েও অনেক কথা লিখিত আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে প্রাচীন ভাস্কর্য্য হইতে শস্ত্রের কয়েকটী আদর্শ-চিত্র দিয়া এই অংশ শেষ করিব।

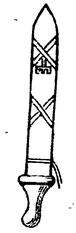

এই চিত্রের অনুরূপ তরবারি ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির ভাস্কর্য্য মধ্যে দেখা গিয়াছে—এতদ্ব্যতীত কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে কয়েক খানি তাম্র নির্ম্মিত প্রাচীন অসির আদর্শ আছে, তাহা দেখিতে কতকটা বড় ছোরার মত,—তাহার দুই দিকেই ধার ছিল। আমাদের দেশে অতি পুরাকাল হইতেই প্রবাদ আছে, তাল পত্রের ন্যায় তরবারির আকার। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, অতি দীর্ঘ পাতলা তলোয়ারই সে কালে ব্যবহৃত হইত। তলোয়ারের গঠন সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক বিধি আছে, যাহা ভারতের লোকেই জানিতেন, তাহা আর কিছুই নহে—সামান্য বক্র বা বৃত্তভাসাকারে তাহা নির্ম্মিত হইত। বস্তুতঃ য়ুরোপীয় তলোয়ার যেরূপ সোজা হয়, সে কালে তাহা ত হইতই, উপরিপ্রদত্ত দুইটী চিত্রে তাহা প্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট তলোয়ার যাহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ব্যবহার করিতেন, তাহাই অপেক্ষাকৃত বক্রভাবাপন্ন হইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভারতই অসির আদি স্থান। আরব ও পারস্য প্রভৃতি স্থানেও ভারতের অসি রপ্তানি হইত। সেই কারণ সে সকল দেশে এখনও গোলাকার অসির ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রাচ্য খণ্ডের প্রায় সকল প্রদেশেই বৃত্তাভাস আকার বিশিষ্ট

অসির প্রচলন আছে। সরল অসি অপেক্ষা এইরূপ অসির আঘাতে যে ভাল কাটে তাহা বিজ্ঞানবিদেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। য়ুরোপীয়েরাও তাহা বুঝিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আগ্নেয় অস্ত্রের অধিক প্রচলন হওয়ায়, উহার আর উন্নতি বা পরিবর্ত্তন করেন নাই। য়ুরোপীয় তরবারিতে কখনও কোন জিনিষ কাটিবার আবশ্যক হয় না, সুবিধাও হয় না—তাহাতে কেবল ছোরার মত খোচা মারা চলে। য়ুরোপীয় রণনীতিতে তাহাই প্রশস্ত।

প্রাচীন কালে ছোরারও যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। শাঁচী ও উৎকল ভাস্কর্য্যের মধ্যে তাহার বহুল আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

অসি আবরক কোষ বা খাপ—সেকালেও ঠিক্ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়ই ছিল; অর্থাৎ কাষ্ঠের উপর বেগুনি বর্ণের বা অন্য কোনও গাঢ় বর্ণের মূল্যবান বস্ত্র মণ্ডিত হইত। রাজা মহারাজদিগের ব্যবহারের জন্য সুবর্ণ ও মণি-মুক্তাদি মণ্ডিত হইত।

খড়্গ :—আমাদের দেশে দেবী পূজায় ছাগাদি বলি উপলক্ষে যে খড়্গ ব্যবহার হয়, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন, সুতরাং সে বিষয়ে অধিক বলিবার কিছুই নাই। নেপাল আদি প্রদেশের যে ভুজালির প্রচলন আছে, তাহাও এই খড়্গেরই অন্তর্গত। খড়্গ অসির নামান্তর হইলেও আমাদের দেশে এখন স্বতন্ত্র শস্ত্র-রূপে পরিগণিত। ইহা সাধারণতঃ যেমন অত্যন্ত ভারি হয়, অসি তেমনই অত্যন্ত হালকা হইলেই ভাল হয়। এমন অনেক অসি আছে যে, হাতে তুলিয়া সামান্য নাড়া দিলে সর্পের জিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করিতে থাকে। বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত কেহ তাহার ব্যবহারই করিতে পারে না। প্রবাদ আছে, মহারাজ রণজীত সিংহের একখানি সেইরূপ অসি ছিল; যুদ্ধান্তে তাহা প্রতিবার ধার করিবার জন্য এক কারিকরকে ১০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইত। মহারাজের একজন ভৃত্য সেই অসি মিস্ত্রীর নিকট লইয়া যাইত—মিস্ত্রী তলোয়ার খানি লইয়া নাপিতদিগের হাতের তালুতে ক্ষুর শাণ দিবার ন্যায় নিজ নাসিকার উপর সেই তলোয়ারখানি রাখিয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া ঘসিয়া দিত, তাহার পর ভাল করিয়া মুছিয়া প্রত্যর্পণ করিত ও প্রতিবার ১০৲ টাকা করিয়া লইত। একবার সেই ভৃত্য মনে করিল, এই সামান্য কার্য্যের জন্য দশটী টাকা দেওয়া হয়, এবার ইহা আমিই সম্পন্ন করিয়া দিব। এই ভাবিয়া যেমন মিস্ত্রীর অনুরূপভাবে তলোয়ারখানি নিজের নাসিকার উপর রাখিয়া ঘসিতে যাইবে, অমনি 'কুচ্' করিয়া নাকটী কাটিয়া গেল, তখন মহারাজ জানিতে পারিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন ও পুনরায় তলোয়ারখানি মিস্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এখনও সেই বংশ "নাক কাটাইয়া" বলিয়া পঞ্জাবে পরিচিত। যাহা হইক ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, এদেশে তলোয়ারে কত সূক্ষ্ম ভাবে ধার করা হইত।

অসি সর্ব্বদা বামদিকে বিলম্বিত থাকে, বাম হস্তে কোষ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে অসি নিষ্কাষণ করিতে হয়।

চর্ম্ম বা ঢাল :—এই প্রাচীন শব্দটী শুনিলেই মনে হয়, এই শস্ত্রটী চর্ম্মেই বিনির্ম্মিত হইত। গণ্ডার বা অন্য কোনও জন্তুর স্থূল কঠিন চর্ম্মে চিরকাল ঢাল প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু চর্ম্মের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও কঠিন কাষ্ঠেও ঢাল প্রস্তুতের বিধি আছে।

শরীরাবরকং শস্ত্রং চর্ম্ম ইত্যভিধীয়তে।

তৎপুনর্দ্বিবিধং কাষ্ঠ চর্ম্ম-সম্ভব ভেদতঃ।

বাণাদি অস্ত্র শস্ত্র হইতে শরীর রক্ষা করিবার জন্য এই ঢালের ব্যবহার হইয়া থাকে। কাষ্ঠ ও চর্ম্মের দ্বারা প্রস্তুত ভেদে ইহা দুই প্রকার। প্রাচীন শাস্ত্রেরই এই বিধি।

যুদ্ধ কালে শরীর রক্ষার জন্যই এই ঢাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, কিন্তু ইহার ভার অত্যন্ত অধিক হইলে চলিবে না, কারণ যুদ্ধ কালে তাহা সহজে বহন করিতে হইবে। এই সকল কারণে শাস্ত্রের বিধি আছে, ঢাল যেমন দৃঢ় হইবে সেইরূপ লঘুও হইবে। শরীরের বিস্তৃতি অনুসারে উহারও বিস্তৃতি অধিক হওয়া আবশ্যক।

ইহার আকার সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্র ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে নানা আদর্শের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহার আকার গোল ও উপরিভাগে বীরের বংশ-চিহ্ন প্রভৃতি (court of arms) অঙ্কিত থাকিত। সূর্য্য বংশীয় বা চন্দ্র বংশীয় অথবা অন্য কোনও প্রসিদ্ধ বংশের যোদ্ধৃ বীরপুরুষগণ যে সকল ঢাল ব্যবহার করিতেন, তাহাতে তাহাদের রাজবংশ চিহ্ন (court of arms) যেমন সূর্য্যবংশীয়দিগের সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, চন্দ্রবংশীয়দিগের অর্দ্ধচন্দ্র বা পূর্ণ চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি বিবিধ ভিন্ন স্বর্ণাদি বহুমূল্য ধাতু দ্বারা গঠিত ও তাহাতে রত্নাদিও খচিত হইত। স্বপক্ষ বা বিপক্ষ সৈনিকগণ তাহা দেখিয়াই ঢালধারী বীরের পরিচয় পাইত। প্রাচীন ভাস্কর্য্য হইতেও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্র হইতে

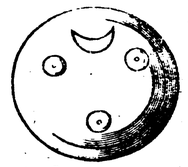

প্রস্তর খোদিত একটী ঢালের আদর্শ চিত্র পার্শ্বে প্রদত্ত হইল এটী সম্পূর্ণ গোলাকার এবং অর্দ্ধচন্দ্র ও তিনটী তারকা বিশিষ্ট চিহ্নে চিত্রিত। এতদ্ব্যতীত বাদামী আকারেরও ঢাল ভাস্কর্য্যমধ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সংগৃহীত একটী প্রস্তর মূর্ত্তিতে চতুষ্কোণ ঢালের আদর্শ আছে। ভিলসাস্তুপের ভাস্কর্য্য হইতে জেনারেল কানিংহাম সাহেব ঢালের যে সকল আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছেন,

পার্শ্বে তাহারই একটীর চিত্র প্রদত্ত হইল। শাঁচী, খণ্ডগিরি ও অন্যান্য প্রাচীন ভাস্কর্য্যমধ্যেও এইরূপ নানা-বিধ দীর্ঘ ঢালের আদর্শ আছে। সাধারণ পদাতিক সৈনিকগণ এইরূপ বৃহৎ ঢাল ব্যবহার করিতেন। রথী ও মহারথগণের ব্যবহার্য্য ঢাল সর্ব্বত্রই গোলাকার। কনরকের মধ্য হইতে ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় যে ঢালের আদর্শ আনিয়াছিলেন, তাহার অলঙ্কার-পরিপাট্য বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার চিত্র প্রদত্ত হইল

এটীর ব্যাস প্রায় ২৷৷০ ফিট হইবে। যাহাহউক এই প্রকার লৌহনির্ম্মিত ঢাল এখনও মুরাদাবাদ,

কাশী, দিল্লী ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। বহু ইয়ুরোপীয় পর্য্যটক ভারতে আসিয়া এই সকল প্রাচীন আদর্শের ঢাল 'Indian Curios' বলিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের দেখা দেখি এতদ্দেশীয় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণও নিজ নিজ গৃহভিত্তি অলঙ্কৃত করিবার জন্য ইহা ক্রয় করিয়া থাকেন। দেশী ধাতু-শিল্পীদিগের ইহাতে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন হইয়া থাকে। এই সকল ঢাল অধিকাংশই সাধারণ লৌহ-নির্ম্মিত ও পিতলের সাজ সজ্জায় শোভিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন ইহা কেবল সাজাইয়া রাখিবার জিনিস।

এ দেশে পার্ব্বত্য ভীল ও কুকীদিগের মধ্যে এখনও ঢালের ব্যবহার আছে। তাহা লৌহাদি কোনও ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত নহে। বেত বা বেতের অনুরূপ কোন লতা-কাষ্ঠে রচিত, উপরে বৃষচর্ম্ম বা অন্য কোনও চর্ম্মে আচ্ছাদিত, তদুপরি নানা পক্ষীর চিত্র-বিচিত্র পক্ষে শোভিত, দেখিতে মন্দ নহে। তলবারাদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিতে ইহা কতদূর উপযুক্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সকলের আকার কতকটা পূর্ব্বপ্রদত্ত কানিংহাম সাহেবের সংগৃহীত সাধারণ সৈনিক দিগের ঢালের অনুরূপ। আমাদের দেশীয় চিত্রশিল্পিগণের মধ্যে কেহ কেহ অনভিজ্ঞতা বশতঃ অর্জ্জুনাদি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় বীরচূড়ামণিরও পার্শ্বে এইরূপ পদাতিক সৈন্য ও ভীল জাতিসুলভ দীর্ঘ ও অতি সাধারণ ঢাল চিত্রিত করিয়া বসেন। ইহা শিক্ষিত শিল্পসমালোচকের চক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। পুরাচিত্রকরদিগের এই সকল অস্ত্র শস্ত্রের প্রাচীন আদর্শের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। নতুবা চিত্রের ঐতিহাসিক বিশুদ্ধিতা বিনষ্ট হইয়া কলাসম্পদ কলুষিত হইয়া যায়। যাঁহারা পুরাচিত্র অঙ্কনের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না, অথচ প্রাচীন ঐতিহাসিক-তত্ত্ব ও আদর্শকে নিতান্ত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতায় পদদলিত করেন, তাঁহারা যে আমাদের দেশের কতদূর অনিষ্টকারী বা গৃহশত্রু, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

যাহাহউক ঢালের অনুরূপ শরীর রক্ষণোপযোগী আর একটী জিনিস বীরেন্দ্রমাত্রেরই অবর্জ্জনীয়। তাহা পূর্ব্বে পরিচ্ছদাদির মধ্যে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই শরীররক্ষক 'বর্ম্ম' সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে।

বর্ম্ম—আমাদিগের অতি প্রাচীন সময় হইতেই প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদের সময় হইতে ক্রমে রামায়ণ মহাভারত পরে ভারতের শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতিদিগের সময় পর্য্যন্ত এই বর্ম্মের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত ও প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বর্ম্ম বা কবচ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ হইতে জানিতে পারা যায়, তাহা লৌহেই নির্ম্মিত হইত। স্থূল বর্ম্ম বা চর্ম্মের উপর মৎস্যের আঁইসের ন্যায় গোলাকার লৌহনির্ম্মিত আঁইস আবদ্ধ করিয়া অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহাঙ্গুরীয় পরস্পর সম্মিলিত করিয়া প্রস্তুত হইত। তরবারির আঘাত ইহাকে ভেদ করিতে পারিত না। অগ্নিপুরাণকার ধনুর্ব্বেদের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—

"ষড়ঙ্গুল পরীণাহং সপ্তহস্ত সমুচ্ছ্রিতম্ ॥৮
অয়োমধ্যঃ শলাকাশ্চ বর্ম্মাণি বিবিধানিচ।
অর্দ্ধ হস্ত সমেচৈব তির্য্যগূর্দ্ধ গতং তথা ॥"

ধনুর্ব্বেদে ছয় অঙ্গুলি উন্নত ও সাত হাত সমুচ্ছ্রিত লৌহ শলাকা ও বিবিধ বর্ম্ম ধারণের বিষয় অভিহিত হইয়াছে। ইহা ভেদ করিবার জন্যও নানাবিধ বিধি শাস্ত্রে লিখিত আছে।

আর্য্যের চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগমধ্যে ক্ষত্রিয়ের যে সাধারণ "বর্ম্মণ" উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, যোদ্ধৃজাতি ক্ষত্রিয় মাত্রেই অতি প্রাচীন সময় হইতে বিশিষ্ট সম্মান চিহ্ন বর্ম্ম পরিধান করিয়া আসিতেছেন। দেহ রক্ষা করিতে যেমন বর্ম্মের প্রচলন ছিল, শির রক্ষা করিতে আবার সেইরূপ শিরস্ত্রাণ বা কিরীট প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। সে সকল কথা পূর্ব্বেই পরিচ্ছদাংশে বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই যে বর্ম্মাদির প্রচলন ছিল সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আর্য্যের যুদ্ধাস্ত্র সমন্ধে প্রাচীন শাস্ত্র ও ভাস্কর্য্য হইতে এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, সংক্ষেপে তাহাই বর্ণিত হইল। এক্ষণে আর্য্য-ঋষিদিগের শল্যচিকিৎসার প্রবর্ত্তিত শস্ত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই শাস্ত্রাংশ শেষ করিব। ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

বারাণসী-পুনর্দ্দর্শনে।

এনেছ, মা অন্নপূর্ণে! পুনঃ তব দ্বারে,
আনিয়াছি সরোজিনী তুষিতে তোমায়।
পূর্ব্বভাব গেছে চলি' ত্যজি' অভাগারে,
নব ভাবে পূর্ণ মন—কে বর্ণিবে তা'য়॥
অপার করুণা তব, তাই, পদ্মাসনে!
ক্ষুদ্র জন হ'ল আজি পূর্ণমনস্কাম।
আসিয়া তোমার, মাতঃ! পবিত্র ভবনে
মনে ভাবি ধরামাঝে এই স্বর্গধাম॥
তা' না হ'লে কেন ক্ষুদ্র অন্তর আমার
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবে হইল বিভোর?
নিশ্চয় এ নহে কভু চিত্তের বিকার,
অথবা ক্ষণিক মাত্র নহে ঘুম-ঘোর॥
শিবের পবিত্র পুরে তুমি মা অন্নদা—
তোমার প্রসাদে কেহ অভুক্ত না রয়।
অধমের ভবক্ষুধা তথাপি সর্ব্বদা
কেন প্রশমিত তব কৃপাতে না হয়?
অথবা বুঝেছি, মাতঃ! কি কারণে আজ
শান্তি নাহি পায় এই অশান্ত হৃদয়।
গোপন করিয়া তাহা নাহি কোন কাজ—
প্রকাশিলে মনঃক্ষোভ আনন্দ উদয়॥
চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত যাহার অন্তর,
সে কভু পারে কি, মাতঃ! ভুঞ্জিতে সন্তোষ?
পাপস্রোতে মগ্ন মনে আশঙ্কা বিস্তর
কেমনে তরিব সিন্ধু—অদৃষ্টের দোষ॥
কাশীবাসী সবে সদা স্বধর্ম্মে নিরত,
বেদগান স্তুতিপাঠ করিছে শ্রবণ।
অপার আনন্দ তাহে পাইছে সতত,
পাপীমন তা'র স্বাদ না পায় কখন॥
সর্ব্ব-তীর্থ-ময়ী গঙ্গা রাজিছে যেথায়—
দেহান্তে যেখানে জীব পায় মুক্তিপদ—

যে জন না হেরিল সে ত্রিদিব ধরায়
তাহার কাটে কি কভু ভবের আপদ ?
ছাড়িতে এ স্থান, মাতঃ ! মন নাহি সরে—
তথাপি তোমারে আজি যাই তেয়াগিয়া।
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বদ্ধ পাপী ব্যস্ত কর্ম্ম তরে—
আসা বৃথা তব পদে মায়া না কাটিয়া॥
মাতা পিতা নাহি আর এ পাপ ধরায়—
জায়া পুত্রকন্যা লয়ে যাপিতেছি কাল।
জগতের মাতাপিতা তোমরা হেথায়—
মনে আশা পদসেবা করি চিরকাল॥
কিন্তু, হায় ! মনোবাঞ্ছা মিটিবে না আজ—
তাই ভিক্ষা মম সেই অন্তিম দশায়
পুনঃ এনো তব পদে—করো এই কাজ—
প্রাণ যেন যায়, শিবে ! মণি-কর্ণিকায়॥

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

নিবেদন।

বর্ত্তমান ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে আমাদিগের "শিল্প ও সাহিত্যের"—৮ম খণ্ড সম্পূর্ণ হইল। 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল' ও তৎসহ 'শিল্প ও সাহিত্য-কার্য্যালয়' এবং প্রেস প্রভৃতির স্থান পরিবর্ত্তন হেতু কয়েকমাস অবধি কার্য্যের নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগে "শিল্প ও সাহিত্য" নিয়মিত প্রকাশে অযথা বিলম্ব ও বিঘ্ন হইয়াছে। শিল্প ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠকমণ্ডলী এবং সহযোগী বন্ধুবর্গ আমাদিগের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

অনেক সময় মানুষে যাহা ইচ্ছা করে, কার্য্যে হয়ত তাহা ঠিক ঘটিয়া উঠে না ; ইহা কি মানবের নিয়মিত কার্য্য-পরিচালনা-শক্তির অভাব অথবা বিধিনির্দ্দিষ্ট ঘটনাচক্রের আবর্ত্তন-ফল, তাহা কে বলিবে ! বর্ষে বর্ষে এই ক্ষুদ্র শিল্প ও সাহিত্যের পরিচালনা ব্যপদেশে আমরা যেরূপ আশা ও ভরসা-পরিপুষ্ট হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকি, তাহাতে কতদূর সফলমনোরথ হই, আমাদিগের পাঠকবর্গ তাহা যে সহজে অনুভব করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা তাঁহাদের পরিতুষ্টির জন্য প্রতি বৎসর যেরূপ আশার সূচনা দিয়া থাকি—প্রকৃত পক্ষে সেই অভিলাষ কার্য্যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ করিয়া উঠিতে পারি নাই। যতটুকু সিদ্ধ হয়, হয়ত সহৃদয় পাঠকগণ তাহাতেই কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, কিন্তু আমাদিগের চিত্ত যে, তাহাতে কতদূর ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে তাহা ভাষায় ব্যক্তকরা সাধ্যায়ত্ত নহে। যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড অপেক্ষা ক্রমে ৮ম খণ্ডের শিল্প ও সাহিত্য চিত্র-সংখ্যা ও প্রবন্ধ পৃষ্ঠার অনেক পুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রথম বর্ষের অনুরূপ ভাবেও শিল্প ও সাহিত্যকে সাধারণসমক্ষে বাহির করিতে পারিলাম না। তাই মনে হয়—এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর হেতু কি, এবং ইহার সুফলদাতা পুরুষ কে ?

যাহা হউক আজ আবার শারদাগমে শারদীয়া জগন্মাতার চরণ চিন্তা করিয়া, নূতন উৎসাহে নূতন কর্ম্মভার মস্তকে লইয়া ৯ম খণ্ডের "শিল্প ও সাহিত্য" প্রকাশে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।—

৯ম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা আশ্বিনের 'শিল্প ও সাহিত্য' ও সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিকের সংখ্যাও মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এ বারের পূর্ব্ব সূচনা আমরা কিছুই দিব না। এবার জগদম্বার সম্পূর্ণ কৃপাভিখারীরূপে তাঁহারই কৃপাকণার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছি, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক !

মাসিকপত্র-পরিপ্লাবিত এই বঙ্গভূমির মধ্যে—'শিল্প ও সাহিত্যের' আবশ্যকতা ও উপযোগীতা কতটুকু আছে, তাহা আমরা স্বয়ং কিছু উপলব্ধি করিতে না পারিলেও মানাস্পদ সহযোগী সম্পাদকমণ্ডলী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীনভাবে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টা যে নিতান্ত অনর্থক হয় নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্থানান্তরে তাঁহাদের অভিমত সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত হইল।

এক্ষণে গ্রাহকগণের নিকট আমাদিগের সানুনয় নিবেদন—আমাদের শতচেষ্টা সত্বেও তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ব্যতীত শিল্প ও সাহিত্যের জীবন রক্ষা হওয়া বাস্তবিক অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ইহা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন।—'শিল্প ও সাহিত্য' পূর্ব্ব ও সমগ্র বঙ্গের গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক স্কুল ও কলেজের পাঠ্য-পত্রিকারূপে নির্ব্বাচিত। সমগ্র বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্ত—আসাম হইতে পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত—বেহারের আরা, পাটনা মতিহারি পর্য্যন্ত, দক্ষিণ উৎকল প্রান্ত—পুরী, কটক আদি বিভাগের প্রায় সকল সরকারী স্কুল ও কলেজ-লাইব্রেরী ইহার গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত। এতদিন গবর্ণমেণ্ট-কণ্ট্রোলার আফিস হইতে ইহার বার্ষিক মূল্য একত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইত, সম্প্রতি নূতন বিধানানুসারে উক্ত স্কুল ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণকর্ত্তৃক মূল্য প্রেরিত হইবার কথা—সরকারপক্ষ হইতে আমরা এইরূপই উপদেশ পাইয়াছি—কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় গত ও তৎপূর্ব্ব বৎসর হইতে 'শিল্প ও সাহিত্যের' বার্ষিক মূল্য বহু স্কুল ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও প্রেরণ করেন নাই। সামান্য বিষয় বলিয়া হয়ত তাঁহারা বিস্মরণ হইয়া থাকিবেন। তাঁহাদের পক্ষে ও সাধারণ গ্রাহকমহোদয়গণের পক্ষে 'শিল্প ও সাহিত্যের' ডাঃ মাঃ সহ মূল্য মাত্র দুইটী টাকা অতি সামান্য বিষয় হইলেও "শিল্প ও সাহিত্যের" পরিচালনা কল্পে উহার সমষ্টিই আমাদিগের একমাত্র সহায় ও সম্বল, কারণ এদেশে মাসিকপত্র পরিচালনা দ্বারা কেহ কখনও শোভমান হইতে পারেন নাই। পত্রিকাখানি সহসা বন্ধ না হইয়া কোনরূপে চলিয়া যাইলেই যে কোনও মাসিকের সম্পাদক ও সত্বাধিকারীগণ আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। এরূপ অবস্থায় যে সকল মহাত্মা বারমাসই বিনা আপত্তিতে পত্র গ্রহণ করিয়া বর্ষান্তে ভিঃ পিঃ যাইলে কৃপা করিয়া "Refused and Returned to the sender" লিখিবার জন্য অসীম পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের সহৃদয়তার কথা আমাদের এ ভাষা প্রকাশে নিতান্তই অসমর্থ ; প্রত্যেক পাঠকই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। যাহাহউক সে সকল সংকীর্ণচেতা ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প, ইহাই শুভ ! যাঁহারা আমাদিগের সম্পূর্ণ উৎসাহদাতা ও 'শিল্প ও সাহিত্যের' প্রকৃত উন্নতি-অভিলাষী, এরূপ গ্রাহকবৃন্দের নিকট আমরা পুনরায় অনুরোধ

করিতেছি যে, যাহাতে আমরা উক্ত বার্ষিক মূল্য সত্বর পাইতে পারি, সে বিষয়ে একটু লক্ষ্য ও মনোযোগ রাখিলে আমরা পরম উপকৃত ও বাধিত হইব।

অনন্তর শিক্ষিত পাঠক ও শিক্ষকতা-ব্রতে চিরব্রতী স্কুল ও কলেজের অধ্যাপকগণের নিকট আমাদিগের আর একটী আন্তরিক অনুরোধ ও প্রার্থনা আছে, তাহাও এই সঙ্গে প্রকাশ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। "শিল্প ও সাহিত্য" শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত পত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, ইহাতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদির বাহুল্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আমরা আশাকরি বহুদর্শী ও অধ্যাপকগণ তাঁহাদের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি 'শিল্প ও সাহিত্যে' প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়া, ইহার কলেবর পুরিপুষ্ট করেন এবং ইহার পরিচালনা কার্য্যে যথাসম্ভব পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে সহায়তা করেন। আমরা এই স্থলে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল ও কলেজের কতিপয় অধ্যাপক মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সোমদ্দার এফ, আর, এচ, এস প্রভৃতি সময় সময় 'শিল্প ও সাহিত্যে' প্রবন্ধ দিয়া সহায়তা করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লেখকগণের প্রতিও আমরা বিশেষ সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিগত বৎসরে আমরা শিল্প ও সাহিত্যের বিনিময়ে নিম্নলিখিত পত্র ও পত্রিকাগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

সাপ্তাহিক পত্র—

১ বঙ্গবাসী, ২ হিতবাদী, ৩ সময়, ৪ সঞ্জীবনী, ৫ বসুমতী, ৬ **শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার,** 7 Teligraph, ৮ এডুকেশন গেজেট, ৯ নীহার, ১০ হিন্দুস্থান, 11 Indian Echo, ১২ হাবড়া হিতৈষী, ১৩ বঙ্গবন্ধু, ১৪ খুলনাবাসী, ১৫ মানভূম, ১৬ মালদহ সমাচার, ১৭ যশোহর, ১৮ হিন্দুরঞ্জিকা, ১৯ পল্লীবাসী, ২০ মেদিনীপুর হিতৈষী, 21 Behar Herald ২২ পরগণা বার্ত্তাবহ, 23 The world and New Dispensation,

মাসিক পত্র—

২৪ নব্যভারত, ২৫ ভারতী, ২৬ ভারত মহিলা, ২৩ প্রবাসী, ২৮ পন্থা, ২৯ কৃষক, ৩০ মহাজনবন্ধু, 31 Gardeners Magazine, ৩২ উদ্বোধন, ৩৩ বঙ্গদর্শন, ৩৪ সাহিত্য সংহিতা, ৩৫ আরতি, ৩৬ অর্চ্চনা, ৩৭ বামাবোধিনী পত্রিকা, ৩৮ পল্লীচিত্র, ৩৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, **৪০ জৈনপতাকা ৪১ প্রভাকর,** ৪২ যাহ্নবী, ৪৩ কমলা, ৪৪ সাহিত্য, ৪৫ সেবিকা, ৪৬ বাল্যসখা, **৪৩ ব্যাপারী ঔর কারিগর,** ৪৮ জগজ্যোতি, 49 Printers provider, 50 Indian Medical record, **৫১ মাড়বাড়ী,** ৫২ বাসনা, ৫৩ বিজ্ঞান দর্পণ, ৫৪ চিকিৎসা প্রকাশ, ৫৫ সাধুসম্বাদ, ৫৬ দেবালয়, ৫৭ প্রজাপতি, 58 Co-operator, ৫৯ প্রকৃতি, ৬০ উদ্যান, 61 Young Behar, ৬২ অবসর, ৬৩ অলৌকিক রহস্য, ৬৪ ধর্ম্মপ্রচারক, ৬৫ শান্তিকণা, ৬৬ মরসী, ৬৭ তিলিবান্ধব, 68 The united trade Gazette, ৬৯ গৃহস্থ, ৭০ নবদর্শন, ৭১ কাজেরলোক, **৩৪ মাড়বাড়ী,**

ত্রৈমাসিক—

৭৩ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

এই সকল পত্র ও পত্রিকার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া পরিচালকবর্গের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশাকরি নূতন বর্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সকল সহযোগীই আমাদিগকে বিশেষ সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদানে বাধিত করিবেন।

'শিল্প ও সাহিত্য' সম্বন্ধে অভিমত।

"রঙ্গালয়" ৭ই চৈত্র ১৩০৯। * * মন্মথ বাবু 'দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য ও সাধারণের মধ্যে শিল্প আলোচনার সুবিধার জন্য বহুদিন যাবত 'শিল্প ও সাহিত্য' নামক এই উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র সম্পাদন করিতেছেন।

'অনুসন্ধান' ১লা পৌষ ১৩১০। শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী ইনি দেশের একজন বিখ্যাত শিল্পী, ইহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সূক্ষ্মদর্শী বঙ্গদর্শন সম্পাদক প্রবীন ও নিরপেক্ষ সমালোচক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর মহোদয় মন্মথবাবুর 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকা এবং অন্যান্য গ্রন্থাদির সমালোচনা করিয়া তাঁহার "বান্ধবের" আষাঢ় সংখ্যায় লিখিয়াছেন, "শিল্পের সুচারু বিকাশের সহিত জাতীয় সাহিত্যের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি। * * কিন্তু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী একই আধারে বিখ্যাত শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক; সুতরাং সাহিত্যসেবী মাত্রেরই সাদর পূজাস্পদ সুহৃৎ। এ দেশে ইদানিং বাঙ্গালীর জাতীয়-সাহিত্যের একটী বিরাট প্রতিমা ধীরে ধীরে গঠিত হইতেছে। মন্মথ নাথের ন্যায় সূক্ষ্ম শিল্পিরা সূক্ষ্ম শিল্পের যে সকল তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সেই প্রতিমার বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবে।" * * সুতরাং মন্মথবাবুর দ্বারা সম্পাদিত 'শিল্প ও সাহিত্য' মাসিকপত্রের আর পরিচয় কি?

"বঙ্গবাসী" ৬ই চৈত্র ১৩১০। "* * মন্মথ বাবু শিল্পী ও সাহিত্যিক। তাঁহার পরিচালিত শিল্প ও সাহিত্য যে সর্ব্বসাধারণের পাঠযোগ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? * *"

"স্বদেশ হিতৈষী" ২৪শে চৈত্র ১৩১০। "* * * শিল্প ও সাহিত্যের ছবি, উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জনে যথেষ্ট যত্ন পাইতেছেন। আর না হইবেই বা কেন? শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে মন্মথবাবু নিজেই কৃতীলোক। তাঁহার হস্তে যখন শিল্প ও সাহিত্যের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তখন তাহা যে শীঘ্রই উন্নতি মার্গে ধাববান হইবে, সে বিষয়ে আমাদের অধিক কথা বলাই বাহুল্য। * *"

"মানভূম"। ২৮শে বৈশাখ ১৩১১। "* * আমাদের দেশে এ শ্রেণীর মাসিক পত্রের অভাব ছিল, মন্মথবাবু তাহা এতদিনে দূর করিয়াছেন, শিল্প ও সাহিত্যের আকার, প্রকার, কান্তি, বেশভূষা, অন্তর, বাহির সকলই সুন্দর। * * ।"

"বঙ্গবাসী" ২৫শে আষাঢ় ১৩১১। "* * শিল্প ও সাহিত্যের প্রবন্ধ চিত্তাকর্ষক * * এ শ্রেণীর পত্রের শ্রীবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।"

"মিষ্টভাষী" ৮ই আশ্বিন ১৩১১। "* * শিল্প ও সাহিত্যে অনেক সার আছে * * * শিল্প-বিজ্ঞানের যুগে শীঘ্রই ইহার বহুল প্রচারের আশা করা যায়।"

"বঙ্গবাসী" ২০শে কার্ত্তিক ১৩১১। "এক একটী লেখা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার পড়িতে ইচ্ছা করে।" ১৮ই ভাদ্র ১৩১১। "* * * শিল্প ও সাহিত্য সাধারণের আদরনীয় সামগ্রী।"

'নীহার' ১লা ফাল্গুন ১৩১২। "** ইহাদ্বারা ভারতীয় শিল্পীকুলের বিশেষ কল্যাণ সাধনের আশা করা যায়। আমরা ইহার ক্রমোন্নতির বাসনা করি।"

"বঙ্গবাসী"—২৩শে আশ্বিন ১৩১৩। "* * শিল্প ও সাহিত্যের একাঙ্গীভূত সার সংগ্রহ। * * এই কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যেই শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরাণিক শিল্প প্রসিদ্ধ ভারতের বহুস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন। * * * তাঁহার সম্পাদিত এই মাসিক পত্র যে, কোটি কোটি বঙ্গবাসীর সমাদৃত ও পরিচিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।"

"নীহার" ২৩শে অগ্রহায়ণ ও ৪ঠা ফাল্গুন। "শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় সুন্দর সচিত্র মাসিক পত্র। * * * 'ভাস্কর্য্য' সম্পাদক মহাশয় বহুদিন ধরিয়া এই প্রবন্ধটীর মধ্যে বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। * * সুন্দর ও সরলভাবে চিত্রের দ্বারা আমাদের লুপ্ত গৌরব প্রাচীন স্থপতি বিদ্যার কল কৌশল সমূহ এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইতেছে। *"

"সময়" ২১শে ফাল্গুন ১৩১৫। 'ভাস্কর্য্য' উল্লেখ যোগ্য রচনা, ঠাকুরমা কাজের কথাপূর্ণ। এরূপ সারবান প্রবন্ধ সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষতঃ লেখকের লিখন প্রণালী প্রশংসনীয়।

"বঙ্গবাসী" ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫। "মাসিক পত্র সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। এই জন্য সুমাসিক পত্রের প্রচার শুনিলে আমরা আনন্দিত হই। 'শিল্প ও সাহিত্য' সচিত্র মাসিক পত্র। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পত্রের সম্পাদক। বহু খ্যাতনামা লেখক এই পত্রে লিখিয়া থাকেন। পত্রিকাখানি যেন রূপে গুণে মনোহর।"

"মেদিনীপুর হিতৈষী ১৪ই চৈত্র ১৩১৫। "* * মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, মন্মথবাবু যাহা লিখিতেছেন তাহা "রেকর্ড" হইয়া থাকিবে, ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগিবে।" ভাস্কর্য্য, নবতন্ত্রের অভিনব পদার্থ। ইহা মন্মথ বাবুর সম্পূর্ণ নিজস্ব। ঠাকুরমা, কবিরঞ্জন শর্ম্মার সমীচীন কৃতিত্ব। "শিল্প ও সাহিত্য—শিল্প ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি।"

"সময়" ৪ঠা আষাঢ় ১৩১৬। * * মন্মথ বাবুর বর্ণ-চিত্রণ অতি সুন্দর হইতেছে * * * অতি নিপুণতার সহিত সহজবোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছেন, শিল্প ও সাহিত্যের প্রবন্ধ নির্ব্বাচন বেশ হইতেছে।

'মালদহ সমাচার' ৫ই জৈষ্ঠ ১৩১৬। '* * * প্রবন্ধ জ্ঞানপ্রদ ও পত্রিকার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে।'

"যশোহর" ২২শে আষাঢ় ১৩১৬। ভাস্কর্য্য ও বর্ণ-চিত্রণ শিল্প ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ উপযোগী।

"সময়" ২১শে শ্রাবণ ১৩১৬। শিল্প ও সাহিত্যের প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে সম্পাদকের যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

"পল্লীবাসী,, ২৬শে শ্রাবণ ১২১৬। লেখার অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা দুইই আছে * * সহযোগীর আড়ম্বর নাই, কিন্তু দৃঢ়তা যথেষ্ট। ২৭।৮।১৬—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী একজন কাজের লোক। শিল্প ও সাহিত্যে তাহার বিলক্ষণ যোগ্যতা। 'উচা মহল কি নিচো দরোওজা' এই প্রবাদের যথার্থ তিনি প্রতিপাদন করিতেছেন। আড়ম্বর শূন্য হইয়া কাগজখানিকে শুদ্ধ কাজের কথায় উন্নতি করিতে তিনি অপারগ নহেন।